~ www.amarboi.com ~

তপোধীর ভট্টাচার্য

প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব

~ www.amarboi.com ~

প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

www.amarboi.com

PRATICHYER SAHITYATATTWA
A Treatise on "Western Literary Theory" in Bengali
by TAPODHIR BHATTACHARYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax (033) 2219-2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 300.00

ISBN 978-81-295-1419-6

পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৮
দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আশ্বিন ১৪২৩

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২
তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ দেবাশিস সাহা

৩০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্রী অশ্রুকুমার সিকদার
শ্রী অরুণকুমার বসু
শ্রী দেবেশ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"সেই পথ লক্ষ করে....

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূ চি

পূর্বলেখ	৯
প্রাক্কথন— ১, ২, ৩	১০
রোমান্টিকতাবাদ	১৯
বাস্তবতাবাদ	৪০
আকরণবাদ	৫৯
আকরণোত্তরবাদ	৭৮
বিনির্মাণবাদ	৯৭
পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ	১১৬
অনুবাদতত্ত্ব	১৩৯
নারীচেতনাবাদ	১৫৭
উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ	১৮০
মার্ক্সীয় সাহিত্যবীক্ষা	২১৩
প্রকরণবাদ	২৪১
মনোবিকলনবাদ	২৫৯
নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ	২৮০
অস্তিত্বের নতুন নন্দন	২৯৬
পরিভাষাসূত্রপঞ্জি	৩১১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পূর্বলেখ

এ বড়ো সুখের সময় নয়, এ বড়ো আনন্দের সময় নয়, এ বড়ো আনন্দের সময় নয়। এ সময় আসলে সংশয়ের, অনিশ্চয়তার, মীমাংসাবিহীন জিজ্ঞাসার। এক জিজ্ঞাসার ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই অন্য জিজ্ঞাসায় পৌঁছোনোর। এ সময় উদ্দাম গতির এবং একই সঙ্গে গন্তব্যবিহীন যাত্রারও। একুশ শতকের শূন্য দশক পেরিয়ে এলাম ছোটবড়ো মরীচিকা ও গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে। চোরাবালি আগেও ছিল, এখন তার বহর বেড়েছে এত যে দিগন্ত বলে নেই কিছু। সেই ঘোড়সওয়ার রয়ে গেছে শুধু আকাঙ্ক্ষায়। আত্মখননের পালা শেষ হয় নি। তবু, আছে তাতে নতুন-নতুন আরম্ভ।

ভুবনায়ন বহুদিন আগেই এসে গেছে বৌদ্ধিক জীবনে। মননে তার অনুশীলনের আয়োজন অবাধ, অগাধ। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কৌতূহল তাই অনিবার্যভাবেই প্রসারিত হয়েছে আরও। বিশ্বায়িত বাঙালির ব্যাপক আগ্রহকে সম্মান জানাতে এই বইয়ের নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণের পরিকল্পনা করতে হলো। সর্বত্র চাহিদা সত্ত্বেও নানাকারণে বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল ইদানীং। দেজ্ পাবলিশিং এর সুযোগ্য কর্ণধার শ্রী সুধাংশু শেখর দে-র কল্যাণে নতুনভাবে বেরোচ্ছে যে-সংস্করণ, তাতে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে মান্যতা দিয়ে রোমান্টিকতাবাদ ও বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে দুটি বয়ান যুক্ত হল। সুবেদী পাঠকের তরফে অনুরোধ রয়েছে আরও কিছু প্রতিবেদনের জন্যে। পরবর্তী সংস্করণে সেইসব হয়তো বা লাগ করব।

কোনো কৃত্যই এক, সম্পন্ন করা যায় না। সহযোগী সত্তাদের ভূমিকা এক্ষেত্রেও অনস্বীকার্য। আশৈশব বন্ধু রণবীর পুরকায়স্থ এবং সহধর্মিণী স্বপ্না ভট্টাচার্য এই উদ্যমেও আমার মৌল প্রেরণা। আমার ছাত্র ড. শেখ মফজ্জল হোসেন এবং স্নেহভাজন অপু ও সুমন প্রদীপের সল্‌তে হিসেবে কতখানি সক্রিয় ছিল, তা কেবল আমিই জানি। আর, উপাচার্যের সচিবালয়ের নীরব 'কর্মী' স্নেহাস্পদ সন্দীপ দে-র অকুণ্ঠ সহযোগিতা দ্বিরালাপিক জীবনের প্রতি আমার আস্থাকে পুনর্নবায়িত করেছে।

জীবনে বিচ্ছেদ ও চলমানতার দ্বিবাচনিক গ্রন্থণা কত অমোঘ সত্য, তা 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব'এর পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যেন। পথ আমাদের কেবলই নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, পথের সাথী ও পাথেয় বদলে যাচ্ছে চলার আবেগে। ধ্রুব শুধু অবারিত চলা, জিজ্ঞাসার পরম্পরা যে-কোনো মূল্যে অব্যাহত রেখে। এও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো সময়েরই পাঠ। একই সময়ে তো কত অবয়ব কত ভ্রান্তি, কত কুহক, কত সত্যভ্রম। আমরা এখন কালের যে-পরিধিতে পৌঁছেছি, কোনো অভিজ্ঞতা-কোনো উপলব্ধি-কোনো সিদ্ধান্ত স্থির ও অনড় নয়। এমন কী, জিজ্ঞাসাও নয় নিশ্চল। বিনির্মাণে-পুনর্নির্মাণে-আত্মবিনির্মাণে কেবলই পথ ও পাথেয় চিনে নেওয়া নতুন নতুন পদ্ধতিতে। এই তো জীবন। প্রতি প্রশ্নে বিদ্ধ হোক সমস্ত অবস্থান। আরও জোরালো হয়ে উঠুক পুনঃসংজ্ঞায়ন, পুনঃ প্রসঙ্গায়ন ও পুনর্ভাষ্যের উদ্যম।

আপাতত এই প্রত্যাশায় নিবেদিত হচ্ছে এ বইয়ের আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত সংস্করণ।

১ অক্টোবর, ২০১১ তপোধীর ভট্টাচার্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাক্‌কথন ১

রোলাঁ বার্ত লিখেছিলেন, "পড়া আসলে এক ধরনের বিশিষ্ট কাজ"। আপাত-সরল এই উক্তি অন্তর্নিহিত জটিলতার আভাস দেয় বলে আমাদের ভাবতে হয় খুব। কাজ মানে তো অধ্যবসায়, শ্রম। কে না জানে, বৌদ্ধিকবর্গ চিরকাল কাজকে উপেক্ষা ও করুণার চোখে দেখেছেন। পড়ার মতো ঐশ্বরিক আনন্দকে, পবিত্রতাকে, ধুলোমাটির মালিন্যে নামিয়ে আনাকে প্রীতির চোখে তাঁরা দেখতে পারেন না। বিশেষত যাঁরা কস্তুরীমৃগের মতো নিজের গন্ধে নিজেই মাতোয়ারা—তাঁরা 'পড়া'কে 'কাজ' বলে মানতে চাইবেন না কখনও। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'কাজ' অপাঙক্তেয়, 'পড়া' স্বর্গীয় আনন্দ। প্রায়ই দেখা যায়, কোনো কোনো সরলচিত্ত ব্যক্তি তাই প্রবল আত্মতৃপ্তিতে ঘোষণা করেছেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রাবন্ধিকেরা মৌলিক রচয়িতা নন। তাঁরা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী; তাঁরা 'কাজ' করতে জানেন, এইমাত্র। সৃষ্টির সৌরভ তাঁদের জন্যে নয়। তাঁরা চিরব্রাত্য। কবিতা বা গল্পের প্রতিবেদনে নান্দনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে; তাত্ত্বিকের সন্দর্ভে ঐ নন্দন কোথায়? নন্দনের সঙ্গে তত্ত্বের চিরকালের বিসম্বাদ এই হল প্রচারিত মত। এই স্বমেহনের দুনিয়ায় বার্তের কথাটি যেন তাই মূর্তিমান রসভঙ্গ হয়ে দেখা দেয়।

নব্বইয়ের দশকও অস্তায়মান। গত কয়েক বছরে দেখলাম কী অভাবনীয় দ্রুত গতিতে মুছে যাচ্ছে চিন্তাজগতে ভূগোলের সীমারেখা। নিত্য নূতন ভাবনার নিরবচ্ছিন্ন অভিঘাতে ভেঙে যাচ্ছে সব বালির বাঁধ। আধুনিকতার পরে আধুনিকোত্তর পর্যায়ও ভেতরে-বাইরে আন্দোলিত যখন, কোনো কোনো প্রাজ্ঞজন সেসময় নতুন জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিচ্ছেন আধুনিকতার প্রকল্প এখনও অসমাপ্ত। ধীরে, রজনী, ধীরে। প্রতিপ্রশ্ন বিচ্ছুরিত হচ্ছে আমাদের উদ্দেশে। সংশয়ে, দ্বন্দ্বে জীবন ও জগৎকে দেখছি ফলে দেখতে পাচ্ছিও না। আকরণবাদ থেকে আকরণোত্তরবাদে, বিনির্মাণপন্থায়, নারীচেতনা ও উপনিবেশোত্তর চেতনার নানা বিভঙ্গে পাঠকৃতির তাৎপর্য বদলে যাচ্ছে মুহুর্মুহু। কী দেখব, কেন দেখব, কোথায় দেখব—এইটুকু না-জেনে তথাকথিত সৃজনশীল সাহিত্যকে প্রাপ্ত মর্যাদা দিতে পারব কি? ছ'জন অন্ধের হাতি দেখার গল্পটা ফিরে ফিরে আসে বারবার।

আসলে আমরা বড়ো বেশি সহজিয়া মাগে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। একটুও বাড়তি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রম করতে কেউ রাজি নই। আত্মপ্রতারক যুক্তিশৃঙ্খলা তৈরি করতে যতটা সময় ব্যয় করি, তার ভগ্নাংশও জিজ্ঞাসাতে দিই না। ফলে সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে শুধু অন্ধেনৈব নীয়মান অন্ধজনের। তৃতীয় সহস্রাব্দের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে মানববিশ্ব যখন স্পষ্টভাবে অখণ্ড ও অবিভাজ্য হয়ে পড়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রকাশমাধ্যমগুলিতে কালান্তরের উদ্ভাসন তো অবশ্যম্ভাবী। তাকে বুঝব কী করে যদি তাকিয়ে থাকার চোখ মাত্র থাকে আমাদের, 'দ্রষ্টা চক্ষু' না থাকে? বাহির এবং ভেতরের দ্বিবাচনিকতায় স্থানিক-সত্য ও বিশ্ব-সত্যের আততিতে অনবরত ভেঙে যাচ্ছে সমস্ত নির্মিতি, সমস্ত পূর্বধার্য আকল্প। আবার নতুন আদল ও স্বভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ। হ্যাঁ, প্রবন্ধও। অধ্যবসায়ী 'কাজ' বলে যত তাকে অচ্ছুৎ করে রাখার চেষ্টা হোক, অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না। থাকবে না কখনও।

না, এই প্রাক্‌কথনে কোনো পূর্ববক্ষ ও উত্তরপক্ষ নেই। তবে সম্ভাব্য কিছু সংশয় সরিয়ে দেওয়ার দায় তো অস্বীকার করা যায় না। কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়নি কোনোদিন, হবেও না। জীবন থাকবে অথচ জিজ্ঞাসা থাকবে না এবং জিজ্ঞাসার আলোয় জীবনের প্রতিবেদন বদলাবে না—এমন হতেই পারে না। প্রাচ্য সীমিত থাকবে শুধুই প্রাচ্যের রহস্যলীন আঙিনায়, একথা কেউ বলবেন না নিশ্চয়। আমরা জানতে চাই এখন প্রতীচ্যকেও। তাই প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বে যত দিগন্ত বিস্তার ঘটেছে, বাঙালির মেধা ও হৃদয় তাতে সাড়া দিচ্ছে। নির্বিচার গ্রহণ বা নির্বিচার বর্জন করে কেবল অল্পদর্শী ও গোঁয়ারগোবিন্দ জনেরা। বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে 'এ আমার পিতৃপুরুষেরা খনন-করা কুয়ো, এই বলে কুয়োর দূষিত জল পান করে শুধু কাপুরুষেরা।' আমাদের প্রবাদে-প্রবচনে কূপমণ্ডূক শব্দটা নিছক নিন্দাবাচক নয়, সতর্কীকরণও। তাই প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব জানব আমরা, নিজেদের দর্পণকে পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজনে। বিখ্যাত আরেকটি সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়ে এখানেও 'অপরিচ্ছন্ন দর্পণে কখনও ঈপ্সিত সৌন্দর্যের ছায়া প্রতিফলিত হয় না।'

মোদ্দা কথাটা হল, মানুষের তত্ত্ববিশ্বে সমস্ত কিছুতে আমাদের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। তত্ত্ব নয়, পড়াটা কঠিন : কোনো তত্ত্বই দুরূহ নয়। তত্ত্ব হল জীবন-সত্যের অভিব্যক্তি; তাই তত্ত্ব ছাড়া কোনো প্রতিবেদন হয় না। কী কবিতায় কী গল্পে কী উপন্যাসে কী প্রবন্ধে তত্ত্ব থাকে জলের স্রোতের মতো। কখনও প্রকাশ্য কখনও প্রচ্ছন্ন। অতাত্ত্বিক সমালোচনা আর সোনার পাথরবাটি একই কথা। হয় না, হয়নি কোনোদিন। তাই দেখা যেমন শেখার ব্যাপার, তেমনই শিখতে হয় পড়াও। জীবনানন্দের প্রবাদ-প্রতিম কথাটি একটু বদলে নিয়ে বলতে পারি, 'সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক'। কাঠিন্য বা দুরূহতা আসলে এক ধরনের বদ অভ্যাস, বলা ভালো, আত্মরক্ষা-প্রকরণ। পাছে শ্রমের অনিচ্ছা এবং মধুর আলস্য ধরা পড়ে যায়—তাই 'ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ, ও যে চণ্ডালিনীর ঝি' বলে নব্যছুঁৎমার্গ প্রতিষ্ঠার আয়োজন।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা তো আত্মজিজ্ঞাসার অন্য নাম। আর, জিজ্ঞাসা মানে বিনির্মাণ। গড়ার জন্যেই ভাঙা। এখানে একাকার হয়ে যাচ্ছে পড়া এবং আত্মবিকাশের স্তর থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্তরান্তর। হ্যারল্ড ব্লুম বলেছেন, 'deconstruction is reading'। সমগ্রের সঙ্গে অংশ কীভাবে অন্বিত কিংবা কীভাবে অন্বিত নয়, একে বুঝতে পারি ঐ পড়ায় অর্থাৎ বিনির্মাণে। পড়া মানে বিশ্লেষণ, পড়া মানে সম্যক আলোচনা। অন্তর্বৃত বা বহির্বৃত তাত্ত্বিক অবস্থান ছাড়া সাহিত্য বা সমাজ-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, দু'ধরনের সমালোচনা হতে পারে। এক, যা আত্ম-উন্মোচক এবং যা জানে, কেন ও কীভাবে ঈপ্সিত জগতের সন্দর্ভ থেকে সমস্ত নির্মোক খুলে নিতে হয়; দুই, যা সমালোচনার ছলে আত্ম-আচ্ছাদক এবং এসব কোনো কিছুই যার জানা নেই। আমাদের শুধু বেছে নিতে হয়, দুইয়ের মধ্যে কোন পক্ষে দাঁড়াব! 'নিরপেক্ষ' শব্দটি থাকে শুধু অভিধানে, জীবনে তার মানে নেই কোনো। অতএব তথাকথিত 'তাত্ত্বিক' সমালোচনা সম্পর্কে যে-অভিযোগ প্রায়ই উত্থাপন করা হয়, তা আসলে তথাকথিত 'অতাত্ত্বিক' আলোচনা সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত। অভিযোগটা এই পাঠকৃতির উপর পূর্বনির্ধারিত তত্ত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে 'তাত্ত্বিক' সমালোচনায়; পাঠকৃতিকে 'যথাপ্রাপ্ত' হিসেবে পড়া হয় না। মুশকিল এই, 'অতাত্ত্বিক' আলোচনায় যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতির 'শুদ্ধতা' রক্ষা করতে গিয়ে 'খাঁটি পড়া'র যে-নমুনা পেশ করা হয়, তাতে উল্টো মেরুর ছুৎমার্গ প্রকট হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা-নিষ্পন্ন প্রতিবেদনের আদর্শায়িত প্রতিমা মাত্র নির্মাণ করা হয় তখন। তত্ত্বশূন্যতার নামে আশ্রয় নেওয়া হয় নিরক্ত বিমূর্ততায় যাতে সামাজিক-ঐতিহাসিক সংলগ্নতার আভাসমাত্র থাকে না। বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হতে গিয়ে উচ্চারণশূন্য ভাববীজরিক্ত 'না-মানুষের জমি'তে উপস্থিত হয় ঐসব 'অতাত্ত্বিক' রচনা। ভাষায়, চেতনায়, সন্দর্ভে সাম্প্রতিক মানুষের নিরন্তর বিক্ষোভ ও সংগ্রাম যে-সমস্ত অনেকান্তিক গ্রন্থিলতা তৈরি করে চলেছে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা মীমাংসাপ্রয়াস অতাত্ত্বিক বয়ানে থাকে না। ফলে যা দাঁড়ায় তা হল মিথ্যার স্থাপত্য, উড়ে-গিয়ে ফুরিয়ে-যাওয়া রঙিন বুদ্বুদ!

তাই ফিরিয়ে আনতে হয় বৈদিক উচ্চারণ 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ'! তত্ত্ববিশ্বে আমরা সবাই জিজ্ঞাসু। জীবনের পাঠ আর প্রতিবেদনের পাঠ কি আলাদা হতে পারে পুরোপুরি! পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্ন তাই অবান্তর। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি তবে উত্তরপক্ষের আভাস তৈরি হল! আসলে সর্বব্যাপ্ত অতিসরলীকরণ আর সহজিয়া মার্গের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে অন্তহীন তত্ত্বজিজ্ঞাসার বেলাভূমিতে দু'চারটে নুড়ি মাত্র কুড়িয়ে নিতে চেয়েছি। বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে আজও সুলভ নয় বিদেশের অমূল্য বইপত্র। অথচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, ছুৎমার্গীদের রক্ত-কষায় চক্ষু সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। জানি, একটি গণ্ডুষমাত্র জল তুলে ধরা হচ্ছে এই বইতে, এতে পিপাসা মিটবে না কারো। ঔ সুক্যকে যদি খানিকটা উস্‌কে দিতে পারি, এই তো সূত্রধার-গ্রন্থকারের যথেষ্ট পুরস্কার। পিপাসুজনেরা পিটুলিগোলা জল থেকে যেদিন দুধের সায়রে পৌঁছাবেন, সেই মুহূর্তে পুরস্কৃত হবে এই বইয়ের জিজ্ঞাসু উত্থাপক।

ক্রমাগত তাগিদ দিয়ে যিনি এই বইটির প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছেন, সমস্ত কৃতিত্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই অনুজ-প্রতিম সমীরণের। তত্ত্বতীর্থযাত্রায় যাঁরা আলো দেখিয়েছেন, সুহৃদ ডাঃ দেবপ্রসাদ কর, সহকর্মী গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সঞ্জয় রায়, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, অরুণকুমার জানা—কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে, তাতে তারাও অংশভাক। আমার চিন্তাকে যারা নানা প্রশ্নে, কূটতর্কে পরিণত হতে সাহায্য করেছে—আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেইসব ছাত্রছাত্রীরা যেন দ্বিবাচনিক অপরের নিদর্শন হয়ে রইল এই বইতে। তাদের উপস্থিতি প্রচ্ছন্ন, তাই অমোঘ। এদের একজন, শ্রীমান অমিতাভ চক্রবর্তী, পরিভাষাসূত্রপঞ্জি বিন্যাসে সাহায্য করেছে। তাকে ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞ রইলাম 'হাওয়া ৪৯' সম্পাদক সমীর রায়চৌধুরী, 'আলোচনাচক্র' সম্পাদক চিরঞ্জীব শূর, 'অনুষ্টুপ' সম্পাদক অনিল আচার্য, 'নিসর্গ' সম্পাদক সরকার আশরাফ, '১৪০০' সম্পাদক কামাল রাহমান, 'একবিংশ' সম্পাদক খোন্দকার আশরাফ হোসেন, 'লোকায়ত' সম্পাদক আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'তিস্তা-তোর্ষা' সম্পাদক নিখিল বসু, 'লিরিক' সম্পাদক এজাজ ইউসুফির প্রতি। এইসব তত্ত্বচিন্তার প্রতি তাঁদের ঔৎসুক্য আমার প্রেরণা, উদ্যমের উৎস। জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন দ্বিবাচনিকতা সম্পর্কে আমার প্রত্যয়কে নানাভাবে যারা দৃঢ়তর করেছে, এই বই গড়ে উঠেছে তাদেরই অমোঘ সাহচর্যে, প্রীতির নীলাঞ্জন ছায়ায়। অক্ষরে-অক্ষরে খচিত রইল সহমর্মিণী স্বপ্না ভট্টাচার্য, বন্ধু রণবীর পুরকায়স্থ, ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শাহিদুল ইসলাম বিজু, স্নেহভাজন দীপক চক্রবর্তী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, বিশ্বতোষ চৌধুরীর উপস্থিতির উত্তাপ। আর, যারা আলোর বিপ্রতীপে ছায়ায়, অন্ধকারে নিজেদের নেতি—উপস্থিতিকে প্রকট করে তুলেছে অহরহ—তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ রইলাম। কেননা, নইলে এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতাম না কখনও, দ্বন্দ্বে-যন্ত্রণায় সত্তা নিজেই নিজের শিক্ষক। আর, জীবন ও তত্ত্ব একই সত্যের দু'রকম উৎসারণ। অস্তিত্ববিষয়ক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা পরস্পরের পরিপূরক নয় শুধু, সত্তা ও সমাজের দ্বিবাচনিক সম্পর্কেরও অভিব্যক্তি।

ভরতবাক্যের আদলে ফিরিয়ে আনি এবার রোমান মনীষী টেরেন্সের চিরকালীন জীবনভাষ্য 'মানুষ আমি, মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছুই আমার পক্ষে দূরবর্তী নয়।'

১৯ অক্টোবর, ১৯৯৬ তপোধীর ভট্টাচার্য
শিলচর, কাছাড়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাক্‌কথন ২

তত্ত্বপথে যাত্রা শুরু হয়েছিল যখন, সহযাত্রী প্রায় ছিলেন না কেউ। যাঁদের কাছে পৌঁছাতে চাই, প্রাথমিক ভাবে তাঁরাও সংশয়ে দ্বিধায় উৎসাহ দেখাতে চাননি। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা বিদ্যাচর্চার রক্ষণশীল মনোভঙ্গি দুরপনেয়। আর, এর বাইরে যাঁরা নতুনভাবে ভাবতে চান, তাঁদের মধ্যেও প্রণালীবদ্ধ তাত্ত্বিক চিন্তার প্রতি অদ্ভুত ও অযৌক্তিক অনীহা লক্ষ করেছি। যাঁরা কোনো কিছু বুঝতে চান না, তাঁদের সংখ্যা চিরকালই বেশি থাকে। কিন্তু যাঁরা গ্রহিষ্ণু মনের অধিকারী, তাঁরা কেন চিন্তায় কপাট এঁটে বসে থাকবেন   তা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু পাশাপাশি এই বিশ্বাসও ছিল যে 'কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'। জানতাম, ঠিকমতো জিজ্ঞাসা যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, মননবিশ্ব থেকে সব কুয়াশা কেটে যাবে অচিরেই।

ঠিক তা-ই ঘটল। প্রাথমিক অপরিচয়ের জড়তা বেশিদিন স্থায়ী হল না। ক্রমশ দেখা দিল আগ্রহ ও উদ্দীপনা। তত্ত্বপথে সহযাত্রীদের সাক্ষাৎ পেলাম। সাম্প্রতিক বহুবাচনিক পর্যায়ে নতুন-নতুন উদ্যম দেখছি তত্ত্বজিজ্ঞাসার নানা অলিন্দে। মানববিশ্বে সমস্ত চিন্তাবিত্তে আমাদের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। গ্রহীতা নিজের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী তত্ত্বচিন্তা নিরন্তর পুনর্বিন্যস্ত করে নেবেন—এটাই বলার মতো কথা। তাঁরা আছেন বাঙালির নানা বাসভূমিতে ছড়িয়ে, নইলে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হত না। যত দিন যাচ্ছে, পাঠকের গ্রহণ-ক্ষমতার ওপর আস্থা ক্রমাগত বাড়ছে। তাঁরা আছেন, তাঁরা থাকবেন। তাঁদের প্রত্যাশার যোগ্য যেন হয়ে উঠতে পারি, একথাই নিজেকে বলি শুধু।

প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বে চারটে নতুন প্রবন্ধ যোগ করা হল। পরিভাষাসূত্রপঞ্জির বহরও বেড়েছে সেই অনুযায়ী। পুরোনো প্রবন্ধগুলি রয়ে গেল আগের মতো। প্রাজ্ঞ পাঠকেরা এই সংরূপকেই মান্যতা দিয়েছেন, এই ভেবে পরিমার্জন থেকে বিরত রইলাম। তাছাড়া, এই রচনাগুলি মূলত শিক্ষানবিশদের জন্যে; বিশেষজ্ঞ পড়ুয়াদের জন্যে রয়েছে বাচনের আন্তর্জাতিক মহাকাশ। তার ঠিকানা এখনও ইংরেজি ভাষার বিপুল রত্নভাণ্ডারে রুদ্ধ। এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণও পরিকল্পিত হয়েছে মূলত সেইসব উৎসুক পাঠকদের কথা ভেবে, যাঁরা উচ্চবর্গীয় এলিট নন। সাধারণ জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের প্রশ্রয় যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে গ্রন্থকার যথেষ্ট পুরস্কৃত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ ধরনের বিষয় নিয়ে গভীরতাসন্ধানী কাজ যেহেতু খুব বেশি হয়নি আগে, ভাষা-বয়নের সমস্যা ছিল বেশ বড়ো মাপের। সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক দ্যোতনাসম্পন্ন তত্ত্বকথা প্রকাশ করার জন্যে ভাষার প্রচলিত সংহিতা যথেষ্ট ছিল না। বয়ানে তত্ত্ববীজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; বাংলায় তা সঞ্চারিত করার জন্যে অনিবার্য ছিল পরিভাষার গ্রন্থন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কিছু পরিভাষা নিজের সাধ্যমতো তৈরি করে নিতে হয়েছে। এ ধরনের বিশিষ্ট প্রয়োগ শুরু হয়েছিল 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ' বইতে। আর, এ বইতে তার অনেকখানি বিস্তার ঘটেছে। জানি, অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে। কিন্তু আমার ভরসা ছিল সংবেদনশীল পাঠকদের গ্রহিষ্ণু ও সহিষ্ণু মনোভঙ্গির ওপর। প্রাথমিক কিছু দ্বিধা কাটিয়ে তাঁরা যে এইসব পরিভাষাতে ভরসা করেছেন, তার প্রমাণ যথেষ্ট পেয়েছি। বাংলা ভাষায় নতুন মাপ ও স্বভাবের শব্দগুলি প্রয়োগ করছেন প্রবীণ ও তরুণ প্রাবন্ধিকেরা। পশ্চিমবাংলায়, বাংলাদেশে এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এমন কী, অসমীয়া ভাষায় এ ধরনের রচনা অনূদিত হচ্ছে। তাহলে, উদ্যম ব্যর্থ হয়নি একেবারে।

হয়নি বলেই তো নানা ধরনের প্রতিপ্রশ্নও উঠে আসছে। কী হবে তত্ত্বকথা দিয়ে— এরকম মনোভঙ্গি এখনও আছে। কেউ কেউ থেকেই যাবেন কূপমণ্ডুক অভ্যাসের অচলায়তনে। শত রবি জ্বলে উঠলেও তাঁরা আঁখি মেলবেন না। বিশ শতকের গোধূলিবেলা থেকে একুশ শতকের উদয়-মুহূর্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিশ্বায়ন-ইন্টারনেট-সাইবারস্পেস ইত্যাদি ভাববীজ অনেকখানি অঙ্কুরিত হয়ে গেছে। বাঙালির ভাববিশ্ব এখন উথাল-পাথাল; বাংলা বিদ্যাচর্চায় নতুন আলো-হাওয়া-রোদ অনস্বীকার্য এই মুহূর্তে। আমাদের পথ সংস্কারের বদ্ধতায় নয়, সম্ভাবনাময় মুক্ত পরিসরের দিকে। ক্রমাগত তা প্রসারিত হয়ে চলেছে সামনের দিকে। এই উপলব্ধির শরিক হতে চাই বলেই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিপ্রশ্ন উঠে আসুক, কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ভাবে তা হোক। জিজ্ঞাসাই তো সত্যের আঁতুড়ঘর— এই অস্খলিত প্রত্যয় নিয়ে তত্ত্বতীর্থপথে সহযাত্রীদের কাছে চাইব উত্তাপ, চাইব সহমর্মিতা, চাইব বন্ধুতা।

আমার একক বাচন সার্থকতা খুঁজুক সামূহিক বাচনের উৎসারে। জীবনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের যুগলবন্দি যেন অনুভব করতে পারি অনাগত প্রতিটি মুহূর্তে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বের স্বতঃসিদ্ধ দ্বিরালাপের প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত থাকুক আমাদের প্রত্যেকের অভিযাত্রা।

১৯ অক্টোবর, ২০০৩ তপোধীর ভট্টাচার্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাক্‌কথন ৩

জিজ্ঞাসু ও উৎসুক পড়ুয়াদের অভাব দেখা দেয়নি এখনও, এই অন্ধবেগে ধাবমান সময়েও। ইন্টারনেট, ই-মেল, মোবাইল শাসিত সাম্প্রতিকেও বাংলা বিদ্যাচর্চা যুদ্ধ জারি রেখেছে। এই তো শুশ্রূষার বার্তা যা প্রতিনিয়ত আশ্বস্ত করে ঘনায়মান অন্ধকারের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আলো আছে পথ ও পথিকের উপরে স্থির, নিবাত নিষ্কম্প। নইলে 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব' তৃতীয় সংস্করণের ঘোষণা করত না, প্রাক্‌কথন-৩ লেখার প্রয়োজন হত না। সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে লেখকের আছে আনন্দ, পথ চলার ও পাথেয় খুঁজে নেওয়ার আনন্দ। তবে সবচেয়ে বেশি যা আছে, তা হল সংবেদনশীল পাঠক সমাজ সম্পর্কে অবাধ অগাধ আস্থার পুনর্নবায়ন। তাই তো তত্ত্ব-অনুশীলন সম্পর্কে অকারণ অস্বস্তি, মেকি আপত্তি ও সংঘবদ্ধ অপপ্রচার সত্ত্বেও এই বইয়ের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণও ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা ও প্রতিপ্রশ্নের পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখার মানবিক তাগিদ অক্ষুণ্ণ রাখতে তৃতীয় সংস্করণের আয়োজন করতে হয়।

ইতিমধ্যে 'মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব' ও 'রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি'—এই দুটি বইয়ের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 'জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ'-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এরও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে। এইসব তথ্য তো তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্নায়ক যা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম সৃষ্ট প্রতীত বাস্তবের সর্বব্যাপ্ত সন্ত্রাসের পর্যায়ে মানুষের অফুরান জিজ্ঞাসা আর অক্ষরজগৎ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকে পুরুজ্জীবিত করে। পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভাবুক পড়ুয়াদের মধ্যেই এই বই আদৃত শুধু, এমন নয়। বাংলাদেশের পাঠক মহলেও বিপুল আগ্রহ তৈরি করেছে তত্ত্ব-অনুশীলন। তাঁরা অনুরোধ করেছেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তত্ত্ব-ভাবনার তুলনামূলক অধ্যয়ন নিয়ে স্বতন্ত্র বই লিখি যেন। তেমনই অসমিয়া ভাষায় 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব' অনুবাদ করার উদ্যম গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব তো সংযোগের বহুমাত্রিক সম্ভাবনা আর মানববিশ্বের অপরিহার্য বৌদ্ধিক উপকরণ হিসেবে তত্ত্ববিশ্বের প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতির-ই প্রমাণ।

তৃতীয় সংস্করণে আর কোনও নতুন প্রবন্ধ যোগ হল না। ঈষৎ পরিমার্জন করা হল শুধু। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় যাঁরা সহযাত্রী, তাঁরা এই নতুন সংস্করণেরও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন নিশ্চয়। এই বইয়ের সম্পূরক আরেকটি বইয়ের পরিকল্পনা ইতোমধ্যে করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়েছে, এতে থাকবে উনিশ ও বিশ শতকে বিকশিত আরও কিছু তত্ত্বপ্রস্থানের কথকতা। জিজ্ঞাসার আরম্ভ আছে শুধু, শেষ নেই কোনো। তাই নিরন্তর বিস্তারের মূর্ছনায় সম্পৃক্ত রাখতে চাই নিজেকে, সহযোগী পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে—এই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করছি আজ।

পাঠক, আপনাকে নমস্কার।

১৯ অক্টোবর, ২০০৫ তপোধীর ভট্টাচার্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিকতাবাদ

কাকে বলে রোমান্টিকতাবাদ? এই প্রশ্ন সবচেয়ে মৌলিক ও অমোঘ। আবার সম্ভাব্য মীমাংসার খোঁজে সংশয় ও জটিলতা শুধু বেড়েই যায়। কেননা এর কোনও সহজিয়া মীমাংসা নেই। যেসব সাধারণ ও সহজ, বলা ভালো আপাত-সুবোধ্য, উত্তর রয়েছে, সেইসব থেকে অনিবার্য ভাবে আরও কিছু প্রতিপ্রশ্ন উঠে আসে। যেভাবে বাস্তব-বাস্তবতা-বাস্তবতাবাদ কিংবা আধুনিক-আধুনিকতা-আধুনিকতাবাদ একই উৎস থেকে বিচ্ছুরিত এবং সূক্ষ্ম দ্যোতনায় অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়েও স্বতন্ত্র নির্যাসের অধিকারী, তেমনি রোমান্টিক অভিজ্ঞান থেকে উদ্ভুত রোমান্টিকতা এবং সেই বিন্দু থেকে যৌক্তিকভাবে সম্প্রসারিত রোমান্টিকতাবাদ যেন স্বাতন্ত্র্য ও সমান্তরালতার যুগলবন্দি। ফলে প্রতিটি সংজ্ঞা ও তার অভিপ্রেত তাৎপর্যের পরিসর আমাদের সতর্ক অভিনিবেশ দাবি করে। ভালোবাসার অন্তহীন উদ্ভাসন ও বিস্ময়ের চমক অনুভব করে রবীন্দ্রনাথকে যেমন প্রগাঢ় অনুভবে লিখতে হয়েছিল 'সখি, ভালোবাসা কারে কয়'—তেমনি বহুবিধ সংজ্ঞা-সমারোহে বিহ্বল পাঠককেও ভাবতে হয়, এত কিছু ব্যাখ্যার পরেও রোমান্টিক কী, রোমান্টিকতা কী? আর এই দুটি বীজ-শব্দের তাৎপর্য সম্বলিত ভাষ্য একসঙ্গে উপস্থাপিত করলেই কি রোমান্টিকতাবাদ নামক নান্দনিক তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যাবে? আসলে এই তত্ত্ব তো নিছক নান্দনিক নয়, তার অনিবার্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও অনুষঙ্গ রয়েছে। রয়েছে রাজনৈতিক তাৎপর্যও।

আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপে কোন ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় রোমান্টিক চেতনার ধাত্রী-পরিসর সত্য হয়ে উঠেছিল, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য করতেই হয়। বিখ্যাত রোমান্টিক কবি পার্সি বিশি শেলি (১৭৯২-১৮২২) কিংবা বিখ্যাত চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল ও উইলিয়াম হ্যাজলিট যেসব বৈশিষ্ট্যকে যুগ-লক্ষণ (Spirit of the age) বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তাদের উৎস অবশ্যই নিহিত ছিল পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে। সেইসব ঘটনা যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক নিরিখে লক্ষণীয় ছিল, তেমনি সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক সৃষ্টির অনুষঙ্গ হিসেবেও এদের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজচিন্তা ও দর্শনচিন্তায় রোমান্টিকতাবাদের প্রেরণা ও উৎস খুঁজতে-খুঁজতে আমরা পৌঁছে যাই জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮), কার্ল হিল্বহেল্ম ফ্রিডরিখ হুন শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯), জে. সি. ফ্রিডরিখ হুন শিলের (১৭৫৯-১৮০৫) এর মতো মনীষীর কাছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ পর্বে দর্শন-নন্দন-সমাজচিন্তার স্বতঃসিদ্ধ যুগলবন্দিতে যে বহুমাত্রিক বিশ্ববীক্ষার উদ্ভাসন ঘটছিল, তাতে দীপায়ন বা এন্‌লাইটেনম্যান্ট ক্রমশ সুদূরপ্রসারী অভিঘাতের উৎস হয়ে উঠল। এতে নানাভাবে অবদান রেখেছেন জোহান গটফ্রিড হুন হের্ডের (১৭৪৪-১৮০৩),

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্রিশ্চিয়ান জোহান হাইনরিখ হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬), গিয়র্গ হ্বিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), জোহান ক্রিশ্চিয়ান ফ্রিডরিখ হোল্ডারলীন (১৭৭০-১৮৪৩), নোভালিস্ (গিয়র্গ ফিলিপ ফ্রিডরিখ) ফ্রাইহের হ্বন হার্ডেনবের্গ (১৭৭২-১৮০১) ফ্রিডরিখ হ্বিল্‌হেল্ম জোসেফ শেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪), অগুস্ট হ্বিলহেল্ম হ্বন শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫), এর্নস্ট কনরাড ফ্রিডরিখ শুলজে (১৭৮৯-১৮১৭), জোহান গট্লিবের ফিখ্‌টে (১৭৬২-১৮১৪) এবং অবশ্যই ফাউস্ট এর অমর স্রষ্টা একমেবাদ্বিতীয় জোহান হ্বলগাঙ্গ হ্বন গ্যয়ঠে (১৭৪৯-১৮৩২)। সৃষ্টি ও মননের যুগলবন্দি যেমন বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে ও দার্শনিক প্রতিবেদনে ব্যক্ত হয়েছে এই মনীষীদের অসামান্য অবদানে, তেমনি পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ইতিহাসের গভীরে তাঁরা সুদূরপ্রসারী আলোড়নেরও ফসল। বহুস্বরে ও বহুমাত্রায় ক্রমাগত পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আর চেতনার বর্ণিল বিচ্ছুরণ। সময়-স্বভাবে নিহিত ছিল স্থিতাবস্থা ও পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতা। নৈতিকতা-সামাজিকতা-রাজনৈতিক চেতনার জাড্য ও রক্ষণশীলতার কৃষ্ণবিবর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার তাগিদ যুগমানসেই প্রচ্ছন্ন ছিল। অভ্যাসের রুদ্ধতা থেকে নিষ্ক্রমণ মোটেই সহজ ছিল না। তবু ক্রমশ নানা ধরনের ঘটনার অভিঘাতে জোরালো হয়ে উঠল অতিনির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে নিষ্ক্রমণের আকাঙ্ক্ষা এবং অনির্দেশ্য অন্বিষ্টের জন্যে আর্তি।

রাজতন্ত্রের নিঃসপত্ন প্রতাপ এবং নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের অব্যাহত পরম্পরা সত্ত্বেও মুক্তি-পিপাসু ব্যক্তিসত্তা জেগে ওঠার নানা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। যেন ধীরে কিন্তু অমোঘভাবে স্বপ্নভঙ্গ ঘটছিল নির্ঝরের যদিও তার চারদিকে ছিল ঘোর কারাগারের সর্বাত্মক উপস্থিতি। কঠিন বিরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সর্বত্র উপস্থিত ছিল বলেই হয়তো মুক্তিপিপাসু মানুষ নিজেকে চেনার ও নবাবিষ্কৃত সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজের ভেতরে ক্রমশ তীব্র জাগরণের শক্তি আহরণ করে নিচ্ছিল বিরুদ্ধ সমাজ থেকেই। কীভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক ইতিহাস অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে বহুস্বর সন্নিবেশকে অনিবার্য করে তুলছিল, তা বোঝার জন্যে ঐ বিশিষ্ট সময়পর্বের বিচিত্র ঘটনাক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সময়ের ঐসব অনুষঙ্গ মন্থন করেই আসলে জেগে উঠছিল নতুন বিশ্ববীক্ষা প্রসৃত রোমান্টিকতা চেতনা। নিশ্চয় কোনও একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি বিশিষ্ট চেতনা-প্রস্থানের সূত্রপাত হয়েছে এমন ধারণা অনৈতিহাসিক। কেননা সূচনারও দীর্ঘায়ত প্রস্তুতিপর্ব প্রচ্ছন্ন থাকে সময়ের নানা অনুষঙ্গে। তবু আলোচনার সুবিধের জন্যে ১৭৭৫ সালকে আমরা বেছে নিচ্ছি যে-বছর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমেরিকায় স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। কিছু কিছু সংযোগ আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক হলেও বহুযুগের ওপার থেকে ফিরে তাকালে মনে হয়, সময়ের অন্তঃস্বরের অভিব্যক্তি ঘটছে এদের মধ্যে। যেমন এই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল যোসেফ প্রিস্টলি রচিত 'Hartley's Theory of the Human Mind'। পরবর্তী কালে অনুভূতি-কল্পনা-বিষয় ধারণা যখন তত্ত্ববীজ হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে, তা ছিল মানুষের মনোজগৎ সম্পর্কে চিন্তাবিদদের দীর্ঘকালীন অন্বেষণ ও মননের পরিণতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অন্তঃস্বর সমন্বিত সময়ের নিবিড় পাঠ থেকে বারবার যেন এই বার্তাই উঠে আসে যে বাইরের পৃথিবীতে সব কিছু যখন আপাতভাবে রুদ্ধ ও নিশ্ছিদ্র অচলায়তন, তখনই আশ্চর্যজনক ভাবে ক্রমশ খুলে যেতে থাকে গভীরে অবগাহনের পথগুলি। মানুষ নিরন্তর খোঁজে মুক্তি ও সম্প্রসারণের সম্ভাব্য সংকেত। সর্বদা তা প্রত্যক্ষগোচর না হলেও নিঃশব্দে লোকচক্ষুর আড়ালে নতুন আগুন জ্বালিয়ে নেওয়ার জন্যে সমিধ সংগ্রহের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। আপাতত লক্ষ করি, ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকায় স্বাধীনতার সনদ ঘোষিত হচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডে অটুট থাকছে রাজশক্তির চিরাগত পীড়নের মনোভঙ্গি। তাই ব্রিটেনে সংসদীয় সংস্কারের প্রথম প্রয়াস প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। আবার এ-বছরই বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রী অ্যাডাম স্মিথ এর Enquiry into the Wealth of Nation' ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেরেমি বেনথাম এর 'Theory of Legislation' প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ বৌদ্ধিক জগতে সমকালীন মানুষ নতুন সত্য উদ্ভাসনের নতুন প্রণালী সন্ধান করছে। এইসব তথ্য নিশ্চয় তথ্যমাত্র নয়। এদের প্রকাশনায় বৌদ্ধিক মহলে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের প্রাচীর তাতে খসে পড়েছে। বরং সমাজের গভীরে প্রত্যাঘাত ও সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে এবং সেইসঙ্গে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে নানাবিধ অনন্বয় ও কার্নিভালের উপযোগী পরিবেশ। আর, সব মিলিয়ে দেখা দিয়েছে বহুমাত্রিক মন্থনের সম্ভাবনা। তাই ১৭৭৭ সালে রিচার্ড শেরিডানের বিখ্যাত নাটক 'School for Scandal' লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হচ্ছে।

ফ্রান্সিস বার্নি রচিত 'Evelina' প্রকাশিত হয়েছে ১৭৭৮ সালে। এবছরই বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা বীঠোফেনের প্রথম প্রকাশ্য কনসার্ট জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে যেন তখন 'আলো ক্রমে আসিতেছে'। কিন্তু দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আলোর সহগামী অন্ধকারও প্রবলভাবে উপস্থিত। প্রসঙ্গত আমরা চূড়ান্ত অমানবিক দাস-ব্যবসার কথা উল্লেখ করতে পারি। সভ্যতা-গর্বী ব্রিটেনে কিন্তু দাসপ্রথা রহিত করার আইন সহজে তৈরি হয়নি। উপলব্যথিত গতিতে প্রতিবাদী আন্দোলন কখনও এগিয়েছে আবার কখনও স্তিমিত হয়ে গেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে সংবেদনশীল কবি-শিল্পী ও ভাবুকদের মনে মানবমুক্তি, সত্তার স্বাধিকার, চেতনার সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রতিকূল জগতের বাধা সত্ত্বেও দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এ বছর উইলিয়াম পীট দাস-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্যে নতুন আইনের প্রস্তাবনা করেছেন। পাশাপাশি ব্রিটিশ সংসদে বিতর্কিত 'Catholic Relief Act' অনুমোদিত। প্রতিক্রিয়ায় আয়ারল্যাণ্ডে পরবর্তী বছরগুলিতে নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সূত্রপাত হয়। আর, দু-বছর পরেই অর্থাৎ ১৭৮০ সালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে কুখ্যাত গর্ডন দাঙ্গায় বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে এবং বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭৭৯ সালে হান্না ম্যুর এর 'The Fatal Falsehood' প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে, তার নিদর্শন হিসেবে সেভের্ন নদীর উপরে প্রথম লোহার সেতু নির্মিত হয়েছে জন উইলকিনসন এর চেষ্টায়। ১৭৮০তে কুখ্যাত দাঙ্গার পাশাপাশি সংসদীয় সংস্কার ও ভোটাধিকারের জন্যে আন্দোলনেরও সূচনা। বস্তুত একদিকে রক্ষণশীলতার অন্ধকার আর অন্যদিকে গতিময় আলোর আবাহনের দান্দ্বিক উপস্থিতি এভাবেই অব্যাহত থাকে। এ বছর জার্মান তত্ত্ববিদ লেসিং এর 'The Education of the Human Race' প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এর 'Critique of Pure Reason' জার্মানিতে প্রকাশিত হয় ১৭৮১ সালে আর ইংল্যাণ্ডে আন্না লেটিটিয়া বার্বো 'Hymns in prose for Children' প্রকাশ করেন। একদিকে বৌল্টন ও ওয়াট উন্নততর বাস্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ করছেন এবং অন্যদিকে আমেরিকায় সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ব্রিটেন পরাজিত। কিন্তু এ-বছরের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা হল 'জঙ্গ' নামক দাস-ব্যবসায় নিযুক্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন লিউক কলিনউডের চূড়ান্ত নৃশংসতা। ১৩৩ জন দাসকে নিয়ে হাঙ্র অধ্যুষিত গভীর সমুদ্রে সে পণবন্দী করে রাখে বিমার শুল্ক আদায়ের জন্যে। এহেন দানবিক ঘটনায় দাসপ্রথা রদ করার আন্দোলন ব্রিটেনে জোরালো হয়ে ওঠে। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৮২ সালের ৩ নভেম্বর আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তি। বিখ্যাত চিন্তাবিদ রুশোর 'Confessions' (প্রথম পর্ব) এর মরণোত্তর প্রকাশ। ফ্রান্সিস বার্নির 'Cecilia' প্রকাশিত। ইতিমধ্যে চিত্রকলায় যে নতুন প্রবণতার প্রাথমিক সূচনা হয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ফুসেলির 'The Nightmare' নামক ছবির প্রদর্শনীতে। অন্যদিকে মোজার্ট ও বীঠোফেনের নতুন সাঙ্গীতিক সৃষ্টিরও উদ্ভাসন ঘটে এ বছর।

১৭৮৩ তে উইলিয়াম পীট (ছোট) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৩ সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত। ব্রিটেনে সংসদীয় সংস্কারের জন্যে ডিউক অফ রিচমণ্ড উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি দু'বছর আগে 'জঙ্গ' নামক জাহাজের বর্বরতার বিচার শুরু এবং দাসপ্রথা রহিত করার জন্যে সংসদের কাছে আবেদনপত্র পেশ। অবশ্য রাজশক্তির টালবাহানায় এই বর্বরতা সহজে রদ হয়নি। অন্যদিকে জার্মানির দার্শনিক হের্ডের 'Ideas on the philosophy of the History of Mankind' প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মানুষের প্রকৃত অবস্থান, তার হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে মনীষীদের সন্ধান পশ্চিম ইউরোপে অব্যাহত রয়েছে যার সূক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে কবিতায় চিত্রকলায় সঙ্গীতে নন্দন-ভাবনায়। সর্বত্রব্যাপ্ত অনন্বয়-সংঘাত-অচলায়তনের রুদ্ধতা এই স্রষ্টাদের নিঃসন্দেহে পীড়িত করেছিল; নিজেদের নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত ও নিঃসঙ্গ বলে উপলব্ধি করছিলেন তাঁরা। যন্ত্রণার কালকূট তলানি পর্যন্ত পান করছিলেন; তবু অনতিক্রম্য বাস্তবের নিরন্তর দহন সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে জেগে উঠেছিল নিবিড় আনন্দের বোধ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'The Prelude' কবিতায় যে 'Visionary dreariness' এর কথা লিখেছেন, তা সমস্ত জাগতিক অনুপুঙ্খকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রূপান্তরিত করে সৃজনী কল্পনার অনুষঙ্গে। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সীমাহীন বদ্ধতা ও অমানবিক কুশ্রীতা যে স্রষ্টাদের অন্তর্মুখী যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল, তা লক্ষ করে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

তিন

সমকালীন ইতিহাসের বহুবিচিত্র অনুপুঙ্খগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমরা বুঝে নিই, নিরবচ্ছিন্ন দানবিক পীড়নের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধ সমাজে তৈরি না হলেও সৃষ্টিবিশ্ব জুড়ে কিন্তু তখনই সার্বিক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা ও আত্মতার জাগরণ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো উপস্থিত ছিল। বহির্বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করে অনিকেত সত্তা দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্মুখী ভ্রমণের পথে সমান্তরাল অপর ভুবনকে আবিষ্কার করতে চায়, এরকম যদি ভাবি, তাহলে রোমান্টিক চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয় শুধু। এতে এই চেতনার বহুস্বর স্পষ্ট হয় না। বাস্তবের নানাবিধ ঘটনা-সংস্থানের ফলে সত্তা বিদীর্ণ হয়, নিরাশ্রয় হয়, ক্ষয় ও বিকার দ্বারা আক্রান্ত হয়; কিন্তু এখনও মানুষ ফুরিয়ে যায় না। এই প্রত্যয় রোমান্টিক ভাবনা-প্রস্থানের অন্যতম আধারশিলা। কৃত্রিমতার বদলে মৌলিকতা, স্থিরতার বদলে চলিষ্ণুতা, অশুদ্ধতার বদলে শুদ্ধতা, বুদ্ধিমার্গের বদলে অনুভূতিপন্থা এইসব কালান্তরের স্রষ্টাদের স্বর ও অন্তঃস্বর, অন্তর্বস্তু ও প্রকরণকে সংগঠিত করেছে। এই রূপান্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল সৃজনী কল্পনা যা কোলরিজের বাচন অনুযায়ী এরকম 'It dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate; or where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles to idealize and unify. It is essentially vital, even as all objects as objects are essentially fixed and dead.' (২০০৬ ৬৯২)

এই যে মৌল জীবনীশক্তির কথা বলা হল, চারদিকে ব্যাপ্ত জীবন-বিরোধিতা, অশ্মীভূত সমাজের চূড়ান্ত সংবেদনহীনতার মধ্যে তা কীভাবে প্রধান সঞ্চালক হয়ে উঠল, তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। আগেই লিখেছি, সমকালীন ইতিহাসের অজস্র দ্বন্দ্বময় প্রেক্ষিতেই বিপ্রতীপ প্রবণতাকে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মতো লালন করেছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথ কথিত অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর নিদর্শন। এর খোঁজে আরও একবার ফিরে যেতে পারি চলমান ইতিহাসের তথ্য-সন্নিবেশে। ১৭৮৪ সালে কবি-চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেক-এর 'An island in the moon', জেমস রাম্‌সের 'Essay on the treatment and conversion of African Slaves,' প্রকাশিত হয়েছে। এবছরই প্রধানমন্ত্রী পিট এর 'India Act' অনুমোদিত হওয়াতে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য খর্ব হয়ে ব্রিটেনের সম্রাটের কাছে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত মন্তব্য অনুযায়ী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিয়েছে রাজদণ্ড রূপে। শিল্পবিপ্লবের শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার আগেই নবজাগ্রত পুঁজির দাপট এভাবেই উপনিবেশবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পথে প্রথম ধাপ পেরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে এই সময়ই নতুন বিশ্ববীক্ষা সাহিত্যে-চিত্রকলায়-সামাজিক আন্দোলনের পূর্বাভাসে ব্যক্ত হয়েছে। এবছরের শুরুর দিকে (১৫ জানুয়ারি) কলকাতায় স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর সভাপতিত্বে 'The Asiatic Society of Bengal এর সূচনা।

১৭৮৫ তে জেমস্ বস্ওয়েলের 'Tour to the Hebrides' ও উইলিয়াম কাউপারের 'The Task' প্রকাশিত। ভারতের গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ভারত থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে উইলিয়াম পীট সংসদীয় সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

১৭৮৬ সালে হুলগ্যাঙ্গ আমাডিউস মোজার্টের বিখ্যাত সাঙ্গীতিক সৃষ্টি 'Le Nozze di figaro' শ্রোতাদের উদ্দেশে নিবেদিত হল। অন্যদিকে ব্রিটেনে টমাস ক্লার্কসন 'An Eassay on the Slavery and Commerce of the Human Species' বইতে দাসপ্রথা রদ করার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরলেন। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে এর অবদান কম নয়।

১৭৮৭তে বিখ্যাত সঙ্গীত-স্রষ্টা মোজোর্টের 'Don Giovanni' রচিত। ব্রিটেনে দাস-ব্যবসা রহিত করার উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত কেননা জনমনে অসন্তোষ রাজশক্তি আর উপেক্ষা করতে পারছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতের শাসন-ভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। পরের বছর (১৭৮৮) উইলিয়াম পীট দাস-ব্যবসার আতিশয্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাব পেশ করেন। লেখার জগতেও এর ছাপ পড়ে; প্রকাশিত হয়েছে হান্না ম্যুর এর 'Salvery A Poem', জন নিউটনের 'Thoughts upon the African slave Trade' ও টমাস ক্লার্কসনের 'Impolicy of the Slave Trade' প্রভৃতি বই। পাশাপাশি' 'Analytical Review' এর প্রকাশনার সূচনা। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা ঘটে ফ্রান্সে, বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্যে। সেইসঙ্গে সে-দেশের জাতীয় সংসদের আগস্ট অধিবেশনে সাধারণ মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ অনুমোদিত। এবছর ব্রিটেনে উইলিয়াম ব্লেক এর 'Songs of innocence', 'Book of Thel, 'Confessions (অন্তিমপর্ব) এবং অ্যান র‍্যাডক্লিফের 'The Castles of Athlyn' ও 'Dunbane' প্রকাশিত।

১৭৯০ সালে প্রকাশিত হয় বেশ কিছু বিখ্যাত বই। যেমন অ্যাডমাণ্ড বার্ক এর 'Reflections on the revolution in France', মেরি হুলস্টোনক্র্যাফট এর 'Vindication of the Rights of Man', উইলিয়াম ব্লেক-এর 'The Marriage of Heaven and Hell', অ্যান র‍্যাডক্লিফ-এর 'The Sicilian Romance', হান্না ম্যুর এর 'The Slave Trade' ও 'An Estimate of the Religion of the fashionable World' এবং বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর 'The Critique of Judgement'। পাশাপাশি বীঠোফেন ও মোজার্টের নতুন সংগীত-সৃষ্টি উদ্ভাসিত করেছে শ্রোতাদের। অন্যদিকে ব্রিটেনে রাজশক্তির দমন-পীড়ন অব্যাহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকেছে। হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে সাময়িকভাবে। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারি, নাগরিকদের নিষ্পেষণ নিশ্ছিদ্র থাকলেও এই সময় কিন্তু একমাত্রিক নয়। প্রতিবেশি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব, মুক্তি-চেতনা, নতুন দর্শনচিন্তা, নান্দনিক সামর্থ্য, সমাজ-ভাবনার কোনো-না-কোনোভাবে অচলায়তনের অন্ধকার ঝরোখায় কাঁপন তুলেছে। মানুষকে মানুষের জন্যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে—এই প্রত্যয় ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে বলে মানবাধিকার ও লিঙ্গ-বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতার উন্মেষ হয়েছে। কবিতায়-চিত্রকলায় নতুন সৃষ্টির স্ফুরন হচ্ছে তাই।

চার

আঠারো শতকের অন্তিম দশকের প্রথম বছর অর্থাৎ ১৭৯১ অবশ্য নতুন আরম্ভের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি খুব একটা। এবছর বার্মিংহামে দাঙ্গা হয়েছে। হাইতি দ্বীপে অত্যাচারিত দাসদের বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় সমাজের অভিভাবক পোপ নতুন ফরাসি সংবিধানের নিন্দা করেছেন। ব্রিটেনের সংসদে দাসপ্রথা রদ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত অন্যদিকে মানুষ পেয়েছে মোজার্টের নতুন সৃষ্টি। যদিও এ বছরই তাঁর দেহাবসান ঘটে। প্রকাশিত হয়েছে টমাস পেইন এর বিখ্যাত বই 'Rights of Man' (প্রথম খণ্ড) এবং আন্না বার্বোর 'Epistle to William Wilberforce', হান্না ম্যুর এর 'cheap repository Tracts' জেমস বস্‌ওয়েল এর 'Life of Johnson' ও অ্যান র‍্যাডক্লিফের 'The Romance of the Forest'। অন্যদিকে ব্রিটেনে দাসপ্রথা রদ করার জন্যে গণ-আন্দোলন ও গণস্বাক্ষর অভিযান সংগঠিত হয়েছে। ফলে সরকারি দমননীতি কার্যকর হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৯২ সালে ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রবল। এর প্রমাণ পাচ্ছি রাজপরিবারের কারাবাসে, প্যারিসে কুখ্যাত সেপ্টেম্বর দাঙ্গায় এবং অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণায়। অন্যদিকে ব্রিটেনে চিন্তানায়ক টমাস পেইন রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে যান। এই পরিবেশেই অবশ্য প্রকাশ পায় মেরি হুলস্টোনক্র্যাফট এর যুগান্তকারী বই 'Vindication of the rights of women' যাকে নারীচেতনাবাদের উৎস-গোমুখী হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এছাড়া প্রকাশিত হয় আন্না বার্বো-র 'Civic Sermons to the People' এবং জার্মান দার্শনিক শিলের-এর 'On the Ground of Pleasure in the Tragic Object'। সুতরাং এই কালপর্ব ছিল আলো-অন্ধকারের দ্বান্দ্বিকতায় বিধুর।

১৭৯৩-এর শুরুতে (২১ জানুয়ারি) ফ্রান্সের সম্রাট যোড়শ লুই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কিছুদিন পরেই (ফেব্রুয়ারি) ইংল্যান্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। সেপ্টেম্বরে কুখ্যাত প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ মূলক সন্ত্রাসের ফলে সর্বত্র অস্থিরতার সূচনা হয়। জার্মানিতে অবশ্য তখন বীঠোফেন নতুন সৃষ্টিতে উদ্দীপিত। ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়েছে উইলিয়াম গডউইনের 'Enquiry into Political Justice', শার্লট স্মিথ-এর 'The Old Manor House' এবং উইলিয়াম ব্লেক-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'Visions of the Daughters of Albion' ও 'The Gates of Paradise'। স্পষ্টতই সাহিত্য ও চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিকশিত হচ্ছিল বুদ্ধিজীবীদের সমাজ-চিন্তা ও রাজনৈতিক বিচারবোধ। অল্প কিছুদিন পরে এইসব বৌদ্ধিক প্রবণতা ও উপলব্ধির সার্বিক মন্থনে স্পষ্টতর হলো রোমান্টিক ভাবাদর্শ।

১৭৯৪ সালে ব্রিটেনে সারাবছর ধরে দেশদ্রোহিতার বিচার অব্যাহত থাকে। মে মাসে হেবিয়াস করপাস এর সুবিধা সাময়িকভাবে প্রত্যাহৃত হয়। পাশাপাশি প্রকাশিত হয় উইলিয়াম ব্লেক-এর 'Europe', 'Songs of Innocence and of Experience' ও 'Unizen', উইলিয়াম গডউইনের 'Calab Williams or things as they are', মেরি হুলস্টোনক্র্যাফ্‌ট-এর 'An Historical and Moral view of the origin and process of the French Revolution' এবং অ্যান র‍্যাডক্লিফের 'The Mysteries of Udolpho'। একইসঙ্গে চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেক-এর ছবি 'The Ancient of days' প্রকাশ পেয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ব্লেক তাঁর বহু ছবির প্রেরণা পেয়েছেন বাইবেল থেকে। তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য 'I am under the direction of messengers from heaven' বুঝিয়ে দেয় যে শিল্পী হিসেবে তিনি ঐশী প্রেরণায় বিশ্বাসী। কিন্তু এই কালপর্বেরই প্রধান অন্বিষ্ট ছিল সামাজিক সাম্যের ঘোষণা। তিন বছর আগে শোনা গেছে সেই যুগের পক্ষে কালাতিগ ঘোষণা টমাস পেইনের কণ্ঠে 'All men are born equal'। আর, কালান্তরের পথিক মেরি হুলস্টোনক্র্যাফ্‌ট তখনকার দিনের নিরিখে যথেষ্ট দুঃসাহসী উচ্চারণে লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রতি তর্জনি সংকেত করেছেন। সাম্যের ধারণা যে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কেও প্রযোজ্য, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বিবাহ প্রথাকে খারিজ করেছেন। কেননা, মেয়েদের তা ন্যূনতম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। মেরি ছিলেন প্রকৃত যৌন শিক্ষা প্রবর্তন ও মেয়েদের জীবিকার পক্ষে জোরালো দাবিদার। এই সবই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ইতিহাসের গতি একরৈখিক নয়। এমনকী ঐশী প্রেরণায় বিশ্বাসী কবি-চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেকও বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক ন্যায় স্বর্গীয় সুষমার বিষয় নয়, তা নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর মানুষের জন্যে।

অবশ্য রক্ষণশীল ব্রিটেনে সামাজিক রূপান্তরের ভাবনা বারবার কঠিন দেয়ালে প্রতিহত হচ্ছিল; তবু সমাজ-মনের গভীরে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল বলেই অচিরেই মুক্তি-চেতনায় স্পন্দিত ও বিশুদ্ধ আত্মতার প্রতিষ্ঠাকামী রোমান্টিক সৃষ্টিবীক্ষা নতুন আলোর বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে আবির্ভূত হল কবিতায়, চিত্রকলায়। এই বছরই ফরাসি উপনিবেশগুলিতে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে। ফ্রান্স হল্যান্ড অধিকার করে। ১৭৯৫ সালে ব্রিটেনে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনবিরোধী দুটি আইন প্রচলন করে রাজশক্তি জনসাধারণের ক্ষোভ দমন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে উইলিয়াম ব্লেক এঁকেছেন 'The Eternal struggle' ও 'God judging Adam' নামক বাইবেল ভিত্তিক দুটি ছবি। টমাস পেইনের 'The Age of Reason' (প্রথম খণ্ড) এবং জার্মান দার্শনিক শিলের-এর বহুপঠিত বই 'On Naive and Sentimental poetry'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে। লক্ষণীয় যে এই দু'টি বই যেন জায়মান নতুন কালের বহুস্বরিকতার প্রতিনিধি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে টমাস পেইনের বইগুলি ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে, বিশেষ ভাবে বাংলাদেশে, নতুন জাগরণের অন্যতম প্রধান প্রেরণাস্থল। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সূচনাপর্বে টমাস পেইন তখনকার তরুণদের মধ্যে চিন্তাগুরু হিসেবে বন্দিত হয়েছেন। সব ধরনের অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দীপনা জাগিয়েছিল যাঁর বই, আঠারো শতকের শেষ দশকে ব্রিটেনের উন্মুখ তরুণেরাও তাতে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। অন্যদিকে শিলেরের বইটিও রোমান্টিকতাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ কী ইউরোপে কী ঔপনিবেশিক বাংলায়। এ বছর বীঠোফেন সৃষ্টি করলেন তাঁর পিয়ানো সোনাটা। আর ইংল্যান্ড-এ বিখ্যাত এক বন্ধুতার সূত্রপাত হলো কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ও উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মধ্যে যা রোমান্টিকতাবাদের ক্রমবিকাশে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নিয়েছে। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৯৬ সালে ব্রিটেনে ফরাসি আক্রমণের আশঙ্কা ঘনীভূত হল। এডুয়ার্ড জেনার গুটিবসন্ত রোগের প্রতিষেধক টীকার প্রথম প্রয়োগ করেন। দাসপ্রথা বাতিলের প্রস্তাব হাউস অফ কমনস্-এ প্রত্যাখ্যাত। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইতালি জয় করেন। বীঠোফেন-এর আরও সোনাটা সৃষ্টি হলো। পাশাপাশি ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে প্রকাশিত হল এইসব বই কোলরিজের 'Poems on various subjects', ম্যাথিউ লুইস্-এর 'The Monk', মেরি রবিনসনের 'Sappho and Phaon', অ্যান ইয়াস্লির 'The rural lyre', ফ্রান্সিস বার্নিস-এর 'Camila', টমাস পেইনের 'The Age of Reason' (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং মহাকবি গ্যয়েঠের 'Wilhelm Meister' (প্রথম খণ্ড)।

পাঁচ

১৭৯৭ সালে একদিকে যেমন ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত, অন্যদিকে ব্রিটেনে নৌবিদ্রোহ কঠোরভাবে দমিত হল। এবছর প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে 'Anti Jacobin' পত্রিকাটি। বিখ্যাত চিত্রকর জে এম ডব্ল্যু টার্নার লেক ডিস্ট্রিক্ট ভ্রমণ করেছেন যা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বহু কবিতার প্রেরণাস্থল। অ্যান র‍্যাডক্লিফের 'The Italian' এর পাশাপাশি জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত কিছু বই ফ্রিডরিখ হ্বন শ্লেগেল এর 'Critical Fragments', শিলিং এর 'Ideas on the Philosophy of Nature' ও হেল্ডারলিনের 'Hyperion I'। এইসব বইয়ের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে রোমান্টিকতাবাদের নান্দনিক ও দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা পরিণততর হয়ে ওঠে। এবছরই কন্যা মেরি শেলির (ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের লেখক ও কবি শেলির স্ত্রী) জন্ম দিতে গিয়ে মেরি হ্বলস্টোনক্র্যাফটের মৃত্যু হয়।

১৭৯৮ সালে ব্রিটেনে আয়কর প্রথম প্রবর্তিত হয়। আয়ারল্যান্ডে বিদ্রোহ দমিত হলো। নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করলেন কিন্তু নীল নদের যুদ্ধে ফরাসি বাহিনী পরাজিত হল। সেইসঙ্গে ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, রাশিয়া, তুরস্ক ও ন্যাপল্স্ ফ্রান্সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মিত্রশক্তি গঠন করল। যুদ্ধের দমোমা যখন বাজছে ইউরোপে, বীঠোফেন আরও পিয়ানো সোনাটা সৃষ্টি করেছেন। ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়েছে টমাস ম্যালথাস-এর 'Essay on the Principle of Population', উইলিয়াম গডউইন-এর 'Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Women' এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের বিখ্যাত বই 'Lyrical Ballads'। তাছাড়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বহুপঠিত 'The Preludes' এর প্রথম খসড়া তৈরি করেছেন (যদিও তা ছাপা হয়েছে ১৮৫০এ)। তার মানে পশ্চিম ইউরোপের সমাজে দীর্ঘবিলম্বিত মন্থনের সুফল সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত হতে শুরু করেছে। তবে এই অভিব্যক্তি একরৈখিক ছিল না। বরং এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেছে ইতিহাস। তাই লক্ষ করি ১৭৯৯ সালে শ্রমিক সংগঠনের কার্যকলাপ স্তব্ধ করে দিতে ব্রিটিশ রাজশক্তি একগুচ্ছ আইন তৈরি করেছে। তখন নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রথম কনসাল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। বীঠোফেন তাঁর প্রথম সিম্ফনি সৃষ্টি করেছেন। উইলিয়াম ব্লেক 'The Last Supper' নামক ছবি এঁকেছেন। পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছে ম্যাথিউ লুইয়ের 'Tales of Terror' এবং জার্মানিতে কবিতায়-দর্শনে জেগেছে নতুন জোয়ার। এবছর হের্ডের এর 'Understanding and Experience', শ্লেগেলের 'Lucinde' ও হেল্ডেরলিন-এর 'Hyperion II' প্রকাশিত।

১৮০০ সালে আয়ারল্যান্ড ও ব্রিটেনের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয়। মাল্টাদ্বীপ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে আবিষ্কৃত হয় বৈদ্যুতিক ব্যাটারি। বইয়ের পৃথিবী ঋদ্ধতর হয় মেরি রবিনসন-এর 'Lyrical Tales', শিলিং-এর 'System of Transcendental Idealism' ও নোভালিস-এর 'Hymn of the Night' এর প্রকাশনায়। বীঠোফেন আরও সোনাটা ও তৃতীয় পিয়ানো কনসার্টো সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিস্ দ্য গোইয়া এঁকেছেন 'The Royal Family' ও 'The Naked Maja' নামক ছবি। এভাবে আঠারো শতকের অন্তিম বছরে আভাসিত হলো জীবনমন্থন জাত সত্যের দ্বান্দ্বিক স্বভাব। একদিকে রাজশক্তি ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দম্ভে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং প্রজাবর্গের উপরে অব্যাহত রেখেছে নিরবচ্ছিন্ন পীড়ন; অন্যদিকে এরই মধ্যে ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে দীপায়নের অমোঘ বিচ্ছুরণ এবং সেইসূত্রে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে সৃষ্টির অপূর্ব উদ্দীপনা।

উনিশ শতকের প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৮০১ সালে বীঠোফোন আরও কিছু পিয়ানো সোনাটা সৃষ্টি করেন। প্রকাশিত হয় রবার্ট সাউদে-র 'Thalaba, The Destroyer', জেম হগ-এর 'Scottish Pastorals' ও 'Poems and songs'। এবছর ক্যাথলিক মুক্তি সংক্রান্ত আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে সম্রাট তৃতীয় জর্জ এর সঙ্গে মতভেদ হওয়ার ফলে প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পীট পদত্যাগ করেন। ইউনিয়ন জ্যাক ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হয়। পরের বছর, ১৮০২ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী শান্তিপূর্ণ সমঝোতার সূচনা। অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের জন্যে কাজের সময়সীমা ১২ ঘন্টা নির্ধারিত। পাশাপাশি 'Edinburgh Reveiw' ও 'The Weekly Political

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Register' নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। জার্মান দার্শনিক স্পিনোজার 'Works'ও এবছর প্রকাশ পায়।

১৮০৩ সালে বীঠোফেনের তৃতীয় সিম্ফনি সৃষ্টি হয়। ইরাসমাস ডারউইনের 'The Temple' ছাড়া অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ বই এবছর ছাপা হয়নি। আমেরিকা ফ্রান্সের কাছ থেকে লুইজিয়ানা প্রদেশ কিনে নেয়। মে মাসে ব্রিটেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধঘোষণা করে। আয়ারল্যান্ডের ব্যর্থ বিদ্রোহের নেতা রবার্ট এম্মে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। ১৮০৪ এ উইলিয়াম পীট দ্বিতীয়বার ব্রিটেনে কোয়ালিশন সরকার গড়েন। নেপোলিয়ান-এর ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে শাসনভার গ্রহণ। অন্যদিকে স্পেন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। সৃষ্টিভুবনে লক্ষ করি উইলিয়াম ব্লেক এর 'Jerusalem' ও 'Milton' বই-এর প্রকাশনা এবং বীঠোফেনের তৃতীয় পিয়ানো কনসার্টো ও পঞ্চম সিম্ফনির সৃষ্টি। কোনও সন্দেহ নেই যে রাজনৈতিক পরিসরে উথাল-পাথাল যে-সময় অব্যাহত থাকছে, তখনই চিত্রকলায়-সঙ্গীতে-কবিতায়- দর্শনচিন্তায় অবারিত থেকেছে সৃষ্টির নতুন নতুন উদ্ভাসন।

ছয়

১৮০৫ সালে যখন ট্রাফালগারে বিখ্যাত যুদ্ধ হচ্ছে কিংবা দাসপ্রথা নিবারণের প্রস্তাব হাউস অফ কমনস্-এ আবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তখনই পাশাপাশি বীঠোফেন চতুর্থ পিয়ানো কনসার্টো সৃষ্টি করছেন। আর, প্রকাশ পাচ্ছে ওয়াল্টার স্কট এর 'The Lay of the Last Ministrel', উইলিয়াম গডউইনের 'Fleetwood or the new man of feeling' ও উইলিয়াম হ্যাজলিটের 'Principle of Human Action'। ১৮০৬ সালে লর্ড উইলিয়াম গ্রান্ভিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জন কনস্টেবল অপরূপ নৈসর্গিক শোভায় সমৃদ্ধ লেকডিস্ট্রিক্ট ভ্রমণ করেন। প্রকাশিত হয় মেরি রবিনসনের 'Poetical works'। আর, বীঠোফেনের সৃজনী প্রতিভা সম্প্রসারিত হয় তাঁর চতুর্থ সিম্ফনিতে।

১৮০৭ এ প্রধানমন্ত্রী গ্রান্ভিল ক্যাথলিক মুক্তি সংক্রান্ত আইনের প্রশ্নে পদত্যাগ করেন। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (Duke of Portland) নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। আর এ বছরই দাস-ব্যবসা রহিত করার আইন অনুমোদিত হয়। ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছি যে এ বিষয়ে জনমনে প্রবল বিক্ষোভ থাকলেও এতদিন রাজশক্তি নানাভাবে এই আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করত। সুতরাং বোঝা যায়, নিষ্ঠুর অমানবিক পীড়নের প্রতিস্পর্ধী মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাকে শাসক আর অগ্রাহ্য করতে পারেনি। এ-বছরই প্রকাশিত হয় চার্লস ও মেরি ল্যাম্বের 'Tales from Shakespeare' এবং রোমান্টিকতাবাদের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'Poems'। ১৮০৮ এর আগস্টে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। লেই হান্ট সম্পাদিত সংবাদপত্র 'The liberal' প্রকাশনার শুরু। চিত্রকর আঁতোয়ান-জাঁ গ্রোস 'Napoleon on the battlefield of Elyan' ছবিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঁকলেন। ছাপা হল জন ডেল্টন এর 'New system of Chemical Philosophy' (প্রথম পর্ব) ও ওয়াল্টার স্কট এর 'Marmion'। তবে এবছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ঘটনা হল জোহান হ্বন গ্যয়ঠের অসামান্য রচনা 'Faust' এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা।

১৮০৯ এ প্রধানমন্ত্রী ডিউক অফ পোর্টল্যাণ্ড পদত্যাগ করায় স্পেনসার পার্সিভেল দায়িত্ব নিয়েছেন। লণ্ডনে এই প্রথম গ্যাসের আলো ব্যবহৃত। উইলিয়াম গিফোর্ড সম্পাদিত 'Quarterly Review' এবং বিখ্যাত কবি কোলরিজ সম্পাদিত সাময়িকপত্র 'The Friend' এবছর প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এছাড়া ছাপা হয়েছে লর্ড বায়রনের 'English Bards and 'Scotch' Reviewers' এবং চার্লস ও মেরি ল্যাম্ব-এর 'Poetry for children'। অন্যদিকে পোপের ক্ষমতার প্রতি প্রত্যাহ্বান জানানোয় নেপোলিয়ন খ্রিস্টীয় সমাজ থেকে নির্বাসিত। ১৮১০-এ সম্রাট তৃতীয় জর্জ সরকারিভাবে উন্মাদ বলে ঘোষিত। এবছর প্রকাশ পেয়েছে জোয়ানা বেইলি 'The Family Legend', স্কটের 'The lady of the lake', রবার্ট সাউদের 'The curse of Kehema'। আর, চিত্রকর কাসপার ডেভিড ফ্রিডরিখ এঁকেছেন 'Abbey in the oakwoods' নামক ছবি। সুতরাং রাজনৈতিক সমাজের বিবিধ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই শেষ হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথম দশকটি আর এরই মধ্যে শমীগর্ভে আগুনের মতো প্রচ্ছন্ন রোমান্টিক সৃষ্টিচেতনার উদয়লগ্নও সূচিত হয়েছে।

১৮১১ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জেন অস্টেন এর 'Sense and Sensibility' প্রকাশিত। পাশাপাশি কবি পার্সি বিশি শেলী ও টমাস জেফারসন হগ্ 'The Necessity of Atheism' প্রকাশ করায় অক্সফোর্ড এর ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত। এতে বোঝা যাচ্ছে যে মুক্তি-পিপাসু রোমান্টিক চেতনার সূচনাপর্বে রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজের অসহিষ্ণুতা যেমন অত্যন্ত প্রবলভাবে বাস্তব, তেমনি অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্যে ব্যক্তি-সত্তার প্রয়াসও সমান সত্য। ১৮১২ তে প্রধানমন্ত্রী স্পেন্সার পার্সিভেল হাউস অফ কমনস্ এর চত্বরেই আততায়ী দ্বারা নিহত (১১ মে)। লর্ড লিভারপুল রবার্ট জেনকিনসন নতুন প্রধানমন্ত্রী। ধর্মীয় সহনশীলতা আইনের নতুন ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ধর্মীয় আচরণকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। লর্ড বায়রন ক্যাথলিকদের মুক্তি সংক্রান্ত ধারণার সপক্ষে হাউস অফ লর্ডস-এ ভাষণ দিয়েছেন। এবছর তাঁর 'Childe Harold's Pilgrimage' এর প্রথম দুটি সর্গ প্রকাশিত। এছাড়া বেরিয়েছে আন্না বার্বোর 'Eighteen hundred and Eleven', ফেলিসিয়া হেমান্স এর 'Domestic Affections and other poems'। অন্যদিকে নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁকে মস্কো থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে হয়।

১৮১৩ সালে লক্ষ করছি সংসদে আইন তৈরি করা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত। যুবরাজ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার দায়ে লেই হান্টের কারাবাস। রাজকবির খেতাব নিতে ওয়াল্টার স্কট এর অস্বীকৃতি ও রবার্ট সাউদে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজকবি হিসেবে ঘোষিত। এবছর প্রকাশিত হয়েছে জেন অস্টেনের বহু-পঠিত উপন্যাস 'Pride and Prejudice'। এছাড়া বেরিয়েছে লর্ড বায়রনের 'The Bride of Abydos', পার্সি বিশি শেলি-র 'Queen Mab', কোলরিজের নাটক 'Remorse', ওয়াল্টার স্কট-এর Rokeby, a poem। ১৮১৪ এর মার্চে মিত্রশক্তির আক্রমণে ফ্রান্স পরাজিত ও প্যারিসের পতন। নেপোলিয়ন ক্ষমতাচ্যুত ও এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনর্বাসন ও ভিয়েনায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির পুনর্বিন্যাস। অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে জেন অস্টেনের নতুন উপন্যাস 'Mansfield Park' এবং লর্ড বায়রনের 'Corsair' ও 'Lara',ওয়াল্টার স্কট এর 'Waverley, লেই হান্টের 'Feast of the Poets',ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'The excursion'। এবছর ফ্রান্সিস দ্য গোইয়া এঁকেছেন 'The third of May 1808'। ১৮১৫ এর শুরুতে নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ থেকে পালিয়ে এসে 'শতদিন' শাসনের জন্যে ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন। কিন্তু ১৮ জুন ওয়াটারলুর যুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে ফ্রান্সের পরাজয়। নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁর নির্বাসন। ফরাসি রাজদণ্ড আবার অষ্টাদশ লুই এর হাতে। ভিয়েনায় কংগ্রেস-ব্যবস্থার সূচনা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার আঁতাত। ব্রিটেনে শস্য আইন বলবৎ হওয়াতে কৃষকদের নিপীড়ন নতুন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবছর প্রকাশিত হয়েছে লর্ড বায়রনের 'Hebrew Melodies', ওয়াল্টার স্কট এর 'Guy mannering', উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর 'Poems'। কাস্‌পার ডেভিড ফ্রিডরিখ এঁকেছেন 'Wanderer looking over a sea of fog' নামক ছবি। স্পষ্টতই পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ, রাজশক্তির উত্থানপতন ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যেই রোমান্টিক চেতনায় নিষ্ণাত কবি ও চিত্রকরদের নিজস্ব ভুবন-নির্মাণ অব্যাহত রয়ে গেছে।

সাত

এই প্রবণতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে পরবর্তী বছরগুলিতেও। তাই লক্ষ করি ১৮১৬ তে একদিকে প্রকাশিত হচ্ছে জেন অস্টেন এর 'Emma', লর্ড বায়রনের 'Childe Harold's Pilgrimage' এর তৃতীয় খণ্ড ও 'The prisoner Chillon' স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের 'Christabel', 'Kublakhan' ও The pains of sleep', ওয়ালটার স্কট এর 'The antiquary', লেই হান্টের 'The story of Remini' ও পার্সি বিশি শেলির 'Alastor and other poems' এবং অন্যদিকে বছরের শেষে ঘটছে কুখ্যাত স্পাফিল্ডস্‌ দাঙ্গা। স্পষ্টতই বহির্বাস্তব যত কদর্য ও অগ্রহণীয় হয়ে উঠেছে, রোমান্টিকতার প্রেরণা ততই কবি-লিখিয়েদের গভীরতর অন্তর্মুখী যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৮১৭ এর মার্চে হেবিয়াস কর্পাস আইন আবার সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এবছর প্রথম প্রকাশ পেয়েছে 'Blackwood's Edinburgh' ম্যাগাজিন। এছাড়া বেরিয়েছে লর্ড বায়রনের 'Manfred A dramatic poem,' উইলিয়াম গডউইনের 'Mandevilla', স্যামুয়েল টেলর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোলরিজের বিখ্যাত 'Biographia literaria' ও 'Sibylline leaves' জন কীটস্ এর 'Poems' উইলিয়াম হ্যাজলিটের 'Characters of Shakespear's plays' ও 'The round table', ফেলিসিয়া হেমান্স এর 'Modern Greece' ও টমাস ম্যুরের 'Lalla rookh'।

১৮১৮ তে পুরুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার সহ আরও কিছু সংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব ব্রিটিশ সংসদ অগ্রাহ্য করেছে। পাশাপাশি বেরিয়েছে জেন অস্টেনের 'Northanger Abbey' ও 'Persuasion' (মরণোত্তর), জন কীটস্ এর 'Endymion', মেরি শেলির 'Frankenstein or the modern promitheus', উইলিয়াম হ্যাজলিটের 'Lectures on the English poets'ও লেই হান্টের 'Foliage'।

১৮১৯ এ ব্রিটিশ সরকার বিতর্কিত 'ছয় আইন' প্রবর্তন করে। ম্যাঞ্চেস্টারে কুখ্যাত পিটারলু হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৬ আগস্ট যার সীমাহীন বর্বরতা সমস্ত সংবেদনশীল মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এবছর প্রকাশিত হয় লর্ড বায়রনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Don Juan' এর প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ, শেলির 'Rosalind and Helen with other poems' ও 'The Cenci', ফেলিসিয়া হেমান্স এর 'Tales and Historic Scenes in verse', স্কট এর 'Ivanhoe' ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Peter bell। আর ফ্রিডরিখ এঁকেছেন 'Chalkcliffs on Rugen' নামক ছবি। ১৮২০ সালের জানুয়ারিতে স্পেনে ও জুলাইয়ের নেপল্স এ বিপ্লব ঘটে। ব্রিটেনে সম্রাট তৃতীয় জর্জ এর মৃত্যু হওয়াতে যুবরাজ চতুর্থ জর্জ পদবি নিয়ে শাসনভার গ্রহণ করেন। ক্যাটো স্ট্রিট চক্রান্ত ব্যর্থ ও বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড হতে দেখি এবছর। রানী ক্যারোলিন সংক্রান্ত সমস্যায় ব্রিটিশ সংসদ ইতিবাচক ভূমিকা নেয়, অন্যদিকে প্রকাশিত হয় কীটস্ এর 'Lamia', 'Isabella', 'The eve of St. Agnes and other poems', শেলির বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'Prometheus Unbound with other Poems'। এবছরই লন্ডন ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত ও 'Royal Astronomical Society' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২১-এ নতুন দশকের সূত্রপাত হয় গ্রিসে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ও নেপোলিয়ানের মৃত্যু (৫ মে) দিয়ে। এবছর বেরিয়েছে লর্ড বায়রনের 'Marino faliero', Sardanapalus, The two Foscari, Cain, এবং Don Jaun এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ, জন ক্লেয়ারের 'The village Ministrel', Confessions of an Opium Eater, পার্সি বিশি শেলি-র 'Adonais' ও 'Epipsychidion'। এছাড়া উইলিয়াম হ্যাজলিট-এর পত্রিকা 'Table talk' ও প্রকাশিত হতে শুরু করে। পূর্ববর্তী দশকে রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষার যে-উদ্ভাসন সূচিত হয়েছিল, তা ইতিমধ্যে ভরা কোটাল হয়ে উঠেছে। ১৮২২ এ এই ধারা অব্যাহত রয়েছে ফেলিসিয়া হেমান্স-এর 'Welsh Melodies'ও ওয়াল্টার স্কট এর 'The Fortunes of Nigel' প্রকাশনায়। এবছর চিত্রকলার ভুবনে পাচ্ছি কাসপার ডেভিড ফ্রিডরিখ-এর 'Village landscape in Morning light' ও 'Moonrise over the Sea' এবং ইউজিন দেলাক্রোয়া-র 'The Barque of Dante' শীর্ষক ছবিগুলি। ১৮২৩ সালে লর্ড বায়রনের 'Don Juan'এর ষষ্ঠ থেকে চতুর্দশ সর্গ, ফেলিসিয়া হেমান্স এর 'The Siege of Valencia

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

and Other Poem's এবং চার্লস ল্যাম্ব-এর 'Essays of Elia'এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলো। এছাড়া 'The Lancet' নামক পত্রিকা প্রকাশেরও সূচনা হলো। এভাবে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবের সমান্তরাল পরিসরে, যেন প্রতিস্পর্ধী হয়েই, অনুভূতি ও বৌদ্ধিকতার জগতে একে একে উন্মোচিত হচ্ছিল সম্ভাবনার নুতন নতুন অলিন্দ।

১৮২৪-এ লক্ষ করছি, ২৫ বছর আগে (১৭৯৯) প্রবর্তিত দমনমূলক 'Combinations Act' প্রত্যাহার করা হলো। একদিকে যেমন ক্রমশ মানবকেন্দ্রিকতা অনস্বীকার্য সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দূর করার লক্ষ্যে 'রয়েল সোসাইটি' স্থাপিত হচ্ছে। লন্ডনে ন্যাশনেল গ্যালারি এবছরই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সে অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু (১৬ সেপ্টেম্বর) হওয়াতে দশম চার্লস্ শাসনভার গ্রহণ করেন। এশিয়ায় ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ শুরু। অন্যদিকে গ্রিসের মিসোলঙ্ঘি-তে লর্ড বায়রনের মৃত্যু হলো (১৯ এপ্রিল)। 'Don Juan' এর পঞ্চদশ ও ষোড়শ সর্গের মরণোত্তর প্রকাশনা। এছাড়া টমাস জেফারসন হগ-এর 'Confessions of a justified Sinner', ওয়াল্টার স্কট-এর 'Red Gauntlet' এবং মেরি শেলি-র সম্পাদনায় কবি পার্সি বিশি শেলি-র 'Posthumous Poems' প্রকাশিত। আর, কাসপার ডেভিড ফ্রিডরিখ 'The Arctic Shipwreck'ও ইউজিন দোলাক্রোয়া 'The Massacre of Chios' শীর্ষক ছবি এঁকেছেন। ১৮২৫-এ প্রথম বাস্পীয় ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি প্রবর্তিত হলো। আন্না বার্বো-র 'Works'-এর মরণোত্তর প্রকাশনা ছাড়াও বেরোল উইলিয়াম হ্যাজলিট-এর 'The Spirit of the Age' ও স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-এ 'Aids to Reflection'।

আট

নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহে পঞ্চাশ বছর (১৭৭৫-১৮২৫) একটি গুণ্ডূষমাত্র। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অজস্র কৌণিকতা ও জটিলতার ঘেরাটোপে গহন কোন্ অন্ধকারে কালান্তরের চেতনা জন্ম নিয়েছিল অনিবার্য ও অমোঘভাবে—এই জিজ্ঞাসা কেবলই নতুন নতুন বিস্ময় ও চমৎকারিত্বের মুখোমুখি করে দেয়। কেন্দ্রীয় সত্য এই যে মানুষ বড়ো রতন এবং আপনাকে এই জানা তার ফুরোয় না কখনও। মানুষ কখনও কখনও হেরে যেতেও পারে কিন্তু পর্যুদস্ত হয় না শেষপর্যন্ত—অস্খলিত এই প্রত্যয় রোমান্টিক সংবেদনাকে অবধারিতভাবে বহুস্বরিক দার্শনিক বিশ্ববীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছে। প্রাগুক্ত পঞ্চাশ বছরের অনুপুঙ্খ-বিন্যাসের প্রতি নিবিড় দৃষ্টিপাত করে ঐ কেন্দ্রীয় সত্যের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হতে চেয়েছি। সময়-স্বভাবের এই বর্ণিল বিচ্ছুরণের আরও নির্বাচিত নিদর্শন এরকম:

১৮২৬ লন্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজ-এর প্রতিষ্ঠা।
উইলিয়াম ব্লেক-এর ছবি 'The Body of Abel Found by Adam and Eve'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮২৭ ইউজিন দেলক্রোয়ার ছবি The Death of Saradanapalus'।
১৮২৮ ব্রিটেনে ধর্মবিষয়ক আইন 'Test and Corporations Act' প্রত্যাহৃত।
১৮৩০ ইউজিন দেলাক্রোয়ার ছবি 'Liberty Leading the People'
১৮৩২: ব্রিটেনে সংস্কারমূলক আইন (Reform Bill) প্রবর্তিত। 'Anatomy Act' গৃহীত হওয়ায় ব্রিটেনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক যুগের সূচনা।
১৮৩৩ ব্রিটেনের উপনিবেশগুলিতে দাস-প্রথার বিলুপ্তি সংক্রান্ত আইন অনুমোদিত।
১৮৩৪ ইউজিন দেলাক্রোয়ার ছবি 'Women of Algiers'।
১৮৩৫ কাসপার ডেভিড ফ্রিডরিখ-এর ছবি 'The Stages of life'।

আরও দশবছর এগিয়ে দেখা গেল, রক্ষণশীলতার দুর্গে ফাটল ধরেছে এবং প্রকৃতই 'আলো ক্রমে আসিতেছে'। এরও পাঁচবছর পর (১৮৪০) পাচ্ছি বিখ্যাত চিত্রকর জোসেফ টার্নার এঁকেছেন 'Slaves throwing overboard the Dead and Dying' এবং 'Typhoon coming On' শীর্ষক ছবি দুটি। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের সমাজপ্রেক্ষিত যখন অভ্যন্তরীন ও বহির্বৃত দ্বন্দ্বে উথালপাথাল, বিপুল বিক্ষোভের এই মন্থনেই সামন্ততান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার অস্তপর্ব দেশে দেশে সূচিত হচ্ছিল। পুরোনো পৃথিবী সহজে কিন্তু জায়মান নতুনের জন্যে পথ ছেড়ে দেয়নি। বরং আমরা লক্ষ করলাম কীভাবে বারবার আধিপত্যবাদী বর্গ ব্যক্তি-সত্তার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাকে পর্যুদস্ত ও নিরাশ্রয় করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এগিয়ে গেছেন কালান্তরের পথিকেরা। তাঁদের নতুন চিন্তা ও কল্পনা, স্বপ্ন ও বিশ্বাস যেন বিভিন্ন শিল্প-প্রকরণকে প্রত্যাঘাতের আয়ুধ হিসেবেই নির্মাণ করে নিয়েছে। গদ্যে-পদ্যে-কবিতার ভাবকল্পে-চিত্রকলার রূপকল্পে-ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে দেশে দেশে দেখা গেছে রোমান্টিক জীবন-স্বপ্নের অভিঘাত। নতুন নন্দনের স্রষ্টা শিল্পী প্রত্যাখ্যান-যোগ্য বাস্তবের বিকার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিছক কল্পস্বর্গ রচনা করেছেন, তা অবশ্যই নয়। তাঁদের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার বিচ্ছিন্নতা যেমন ট্র্যাজিক সংবেদনার আকর, তেমনি অজ্ঞাতপূর্ব আনন্দবোধেরও উৎস। রোমান্টিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সর্বব্যাপ্ত এই আনন্দের উপলব্ধি যা জাগতিক সুখের সমতুল্য নয় 'Joy whose grounds are true'। সামাজিক অচলায়তন, আর্থ-রাজনৈতিক পীড়নের নিষ্ঠুরতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও প্রগতির পথ রুদ্ধ করার যাবতীয় ছল-চাতুরি সত্ত্বেও রোমান্টিক ভাবাদর্শ নবীন সত্যের উদ্ভাসনময় আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যত নৈরাশ্য-যন্ত্রণা-পরাজয়-তিক্ততা থাকুক না কেন, রোমান্টিক জীবন-স্বপ্ন নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চাইছিল, 'Though late, though dimmed, though weak, yet tell/Hope to a world new-made'!

এই নবনির্মিত পৃথিবীর আশা দেখিয়েছে অপরাজেয় সৃজনী কল্পনা যাতে সত্তার উত্তরণ ঘটে। সমস্ত ক্ষয়-মৃত্যু-অবসানের পরিধি অতিক্রম করে দেখিয়েছে সেই পথ যে-পথে নির্মীয়মান নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন, কল্পনার উত্তাপ-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নতুন অনুভব ও সংবেদনশীলতা দিয়ে যখন বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল পরাজগতের নির্মাণ ঘটে শিল্পে, নবার্জিত উপলব্ধি দিয়ে যুক্তিহীন বিশ্বাস ও নৈতিকতার বদলে উন্নততর প্রত্যয় ও শ্রেয়োবোধের জাগরণ ঘটতে পারে মলিন ও বিকলাঙ্গ বাস্তবেও। স্বপ্নদর্শী স্রষ্টা যে-জীবনীশক্তির কথা একটু আগে লিখেছি, সেই জীবনীশক্তি যেন ঐন্দ্রজালিক সামর্থ্য নিয়ে অধঃপতিত বাস্তবের সার্বিক রূপান্তরের আশ্বাস নিয়ে আসে। শিল্পকে তাহলে জীবন থেকে পলায়নের অভিব্যক্তি বলব কেন? বরং তা তো জীবনকে পরিপূর্ণ ও শুদ্ধতর করে তোলার জন্যে মানবিক আয়োজন যেহেতু শিল্প মানবিকতার সারাৎসার। ক্রিয়াত্মক পৃথিবী থেকে অনেকদূরে কবির অবস্থান এবং তিনি নেহাত-ই নির্জনতার সন্ধানী—এই ধারণা একদেশদর্শী। বরং লক্ষ করা যেতে পারে কীভাবে রোমান্টিক চেতনায় সমৃদ্ধ স্রষ্টা আত্মিক জাড্য-ক্ষয়-মৃত্যু এবং অপরীক্ষিত নৈতিকতার অবসাদ ও কুহক-ভরা পিঞ্জর থেকে নিষ্ক্রমণের জন্যে যাবতীয় ক্ষুদ্রতা ও মালিন্যের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করেন। রোমান্টিক চেতনার অন্তিমপর্বের প্রতিনিধি ইয়েট্‌সও মনে করতেন যে কবির স্বপ্ন 'Shall have a potency to defeat the actual at every point'!

পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস মন্থন করে দেখা গেল, রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষা স্বভাব-বৈশিষ্টে স্থিতাবস্থার প্রতি বিদ্রোহী, সমসাময়িক গ্লানিভরা জীবন থেকে সার্বিক উত্তরণের জন্যে ব্যাকুল, চিরসজীব যৌবনের জন্যে উৎসুক। রোমান্টিক চেতনায় ঋদ্ধ শিল্পস্রষ্টারা একই সঙ্গে সুগভীর কল্পনা ও সংবেদনার ভাষ্যকার এবং সন্ধানী রূপকার। সমসাময়িক জীবনে নৈতিকতার স্খলন ও মানবিকতার বিপর্যয় যখন সমাজের মূল কাঠামোকে শিথিল করে দিচ্ছিল, রোমান্টিক কল্পনা ও অনুভব হয়ে উঠল শুদ্ধতার অভিজ্ঞান। বিকারগ্রস্ত বাস্তব থেকে স্বপ্নের অন্তহীন সম্ভাবনার পরাজগতে নিজেদের সংস্থাপিত করলেন রোমান্টিকেরা। এবার তাহলে এই প্রতিবেদনের শুরুর দুই আদি জিজ্ঞাসায় ফিরে যেতে পারি কাকে বলে রোমান্টিক, কাকে বলে রোমান্টিকতা! রোমান্টিকতাবাদ আসলে কী? এরকম বলা যেতে পারে যে রোমান্টিকতাবাদের মূল ভিত্তি হল যথাপ্রাপ্ত বাস্তবতার অগ্রহণযোগ্যতা, বাস্তবের সংরূপ ও স্বভাব সম্পর্কে সংশয় ও আতঙ্ক। আর, অনিবার্যভাবে বাস্তবতার সন্ত্রাস থেকে বহু দূরে সরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে বাস্তবের বন্দীশালা থেকে সৃজনী কল্পনার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। নির্জনতা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির একান্ত নিজস্ব পরিসরে সত্তার মুক্তি সন্ধানই রোমান্টিকতাবাদের প্রধান অন্বিষ্ট। দীপায়ন লালিত বুদ্ধিবাদকে এই ভাবনা-প্রস্থান সংযোগের শ্রেষ্ঠ প্রকরণ বলে মেনে নেয় না। বরং বিশ্বাস করে যে ব্যাপক বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ শুশ্রূষার বিশল্যকরণী পেতে পারে কেবল অনুভব ও কল্পনার তারুণ্য-ঋদ্ধ পরিসরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়

১৮০১ সালে বিখ্যাত কবি কোলরিজ লিখেছিলেন Deep thinking is attainable only by a man of deep feeling and that all truth is a species of revealation'। যুক্তির চেয়ে অনুভবের গুরুত্ব বেশি ছিল তাদের কাছে কেননা কালে কালান্তরে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বদলে যায়। কিন্তু হৃদয় অপরিবর্তিত থাকে। এইজন্যে রোমান্টিক চেতনার সৃষ্টি তুলনামূলক ভাবে শুদ্ধতর ও মহত্তর। যদিও রোমান্টিকতাবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নয়, তবু বলা যেতে পারে যে এই চেতনাপ্রস্থানে নিকটের চেয়ে দূর, বাস্তবের চেয়ে প্রকল্পনা, সীমার চেয়ে সীমাতিযায়িতা, স্থিতির চেয়ে গতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এদের চোখে বাস্তব প্রতিভাত হয় ভ্রান্তিপূর্ণ পরিসর বা অবভাস হিসেবে। এইজন্যে অস্তিত্বের প্রকৃত তাৎপর্য সন্ধানে ও মানবিক নিষ্কর্ষের খোঁজে রোমান্টিকেরা বারবার ফিরে যান অতীতে। ঐতিহ্যের আয়তন তাঁদের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়। এই অতীত আসলে অনন্তের অনুপস্থিত উপস্থিতির দ্যোতক। তাই কোনও বিশেষজ্ঞের মতে রোমান্টিকতাবাদ হল 'The illusion of beholding the infinite within the stream of nature itself, instead of apart from that stream'। প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি অনন্তের ও সুন্দরের স্মারক হয়ে রোমান্টিকদের সঙ্গে যেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়। এই জলস্রোত থেকে বিযুক্ত হয়ে নয়, সম্পৃক্ত হয়েই রোমান্টিকেরা যথাপ্রাপ্ত জীবনের অন্তরালে অন্তহীন মহাজীবনের বিচ্ছুরণ অনুভব করেন। এই অনুভব তাঁদের শুদ্ধতার বোধে উত্তীর্ণ করে। সেইসঙ্গে সমকালের যাবতীয় শৃঙ্খলকে অস্বীকার করার সামর্থ্যও যোগান দেয়। এই সামর্থ্যের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ দেখি ভালবাসার তীব্র উত্তাপে, নিসর্গলীন সুন্দরের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্পণে, মানবমুক্তির স্বপ্নে। রোমান্টিকদের তীব্র সংবেদনশীলতা ও প্রগাঢ় আবেগ কখনও কোমলতায় আর কখনও শৌর্যে আত্মপ্রকাশ করে। উপলব্ধির উত্তাপে ও উজ্জ্বলতায় তারা যেমন ভাস্বর, তেমনি রহস্যময় নিরালোকের হাতছানিও তাদেরে নিয়ে যায় সাধারণ বৃত্তের বাইরে। অবধারিতভাবে রোমান্টিকদের ভবিতব্য হয়ে ওঠে পারাপারহীন নিঃসঙ্গতা এবং অনতিক্রম্য বিষাদ ও বিচ্ছিন্নতার বোধ। তবে যে-কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো, তা হল সমকালীন উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের বিধি-ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, সামাজিক ও নৈতিক ধ্যানধারণার প্রতি তাদের সোচ্চার প্রত্যাখ্যান। তাদের চোখে সমকালীন বুর্জোয়া সমাজ ছিল রুচিহীন বিকার ও কৃত্রিমতায় অধঃপতিত এবং এইজন্যে বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু। পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে কবি-চিত্রকর-সঙ্গীতস্রস্টারা এই প্রত্যাখ্যানযোগ্য বাস্তবের সঙ্গেই সচেতনভাবে দূরত্ব তৈরি করে নিচ্ছিলেন। এই প্রবণতাই তাঁদেরে সর্বতোভাবে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। শুধুমাত্র ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা জার্মানিতেই নয়, স্পেনেও 'The Romantics parade and expression of dark revolt, a look as of man marked by face, bizarre ideals and speech, crude manners and a scorn of convention' (A.K. Throlby The

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Romantic movement :1966 :25)। এই রোমান্টিক বোহেমিয়ানরা প্রকৃতপক্ষে জীবনে ও মননে ছিলেন বিনির্মাণপন্থী। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থার নিশ্ছিদ্র অচলায়তনগুলি তাঁদের মধ্যে সংক্ষুব্ধ বিবমিষা জাগিয়ে তুলেছিল যেন। রাষ্ট্রীয় প্রতাপের নিষ্ঠুর অমানবিক পীড়ন যুগের নিভৃত মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাকে যদিও আপাতভাবে রুদ্ধ করে রেখেছিল, রোমান্টিকেরা তাঁদের প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিত্বের একক দীপ্তি ও কল্পনার উত্তরণ-সামর্থ্য দিয়ে নিরন্তর ঐ প্রতাপের মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। অমানবিক বর্তমানের ইতরতার বিরুদ্ধে তাঁরা ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকে প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অস্তায়মান আঠারো শতক ও উদীয়মান উনিশ শতকের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বময় প্রহরগুলিতে রোমান্টিকতা এভাবে হয়ে উঠেছিল আত্মপ্রত্যয়ের অন্য নাম। বিরূপ বিশ্বে সত্তার মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে রোমান্টিক চেতনা শুধুমাত্র নান্দনিক বোধে ও উপস্থাপনায় পর্বান্তরের সূচনা করেনি, সত্তার প্রাপ্য মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার পথও নির্দেশ করেছে।

রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বের প্রধান স্তম্ভগুলি হল প্রকৃতির সানুরাগ সান্নিধ্য ও তাতে ঐশীসত্তার অনুভব, সৃজনী কল্পনার ক্রমিক ঊর্ধায়ন, প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, বহুবিচিত্রের সংশ্লেষণ, প্রতীকিতার রহস্যময় বিন্যাস ও সার্বিক কেন্দ্রাতিগতা। চেতনার অন্তর্মুখী যাত্রায় উদ্ভাসনের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে রোমান্টিকতা আর এভাবেই তাৎপর্যের সূক্ষ্মতর ও গভীরতর অন্তঃস্বর নির্ণয় করে সময় ও পরিসরের দ্বান্দ্বিকতাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টিকল্পনার ইন্ধন করে তোলে। আত্মতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা যদিও রোমান্টিক চেতনার প্রধান অন্বিষ্ট, বস্তুজগৎও প্রতিভার জাদুস্পর্শে সংকেতবিশ্বে রূপান্তরিত হয়। এই যুগের কবি-চিত্রকর-দার্শনিকদের কাছে সত্তা ও বস্তুবিশ্ব, আত্মা ও শরীর, ঐশী প্রেরণা ও পার্থিবতা অনন্য দ্বিবাচনিকতায় অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। রোমান্টিক ভাবাদর্শের অন্যতম প্রধান প্রত্যয় হল মানুষের সামর্থ্য অপরিমেয়। অস্তিত্বের সীমাকে নিরন্তর প্রসারিত করে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর রোমান্টিকেরা। তাঁদের চেতনায় সমগ্র বিশ্বই প্রতিভাত হচ্ছিল প্রতীকিতা ও চিহ্নায়কের প্রণালীবদ্ধ সমাবেশ হিসেবে। জীবনের অজস্র ছন্দে নিয়ত স্পন্দিত এইসব উপকরণের মধ্যে সংযোগ যেন স্বতঃসিদ্ধ। নিসর্গের ভাষাই যেন অস্তিত্বের ভাষা যাকে পাঠ করতে পারেন একমাত্র কবি ও শিল্পীরা। এই বর্ণমালা একইসঙ্গে নৈঃশব্দ্যেরও, যার আপাত-শূন্যতার অন্তরালে রয়েছে সম্ভাবনার পূর্ণতা। রূপান্তর ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা সর্বত্র ব্যাপ্ত চেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চান। ভিক্তর উগো এই সর্বব্যাপ্ত চেতনার অভিব্যক্তিতে দেখতে পেয়েছিলেন 'Victory of unity over diversity, of All over the ephimeral, the victory of universal and palpitating life over all that limits, curtails. frustrates and denies' স্পন্দনময় জীবনের অন্তহীন সম্ভাবনার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে রোমান্টিক নন্দন-ভাবনা সব ধরনের সংকোচন, গণ্ডিবদ্ধতা ও খণ্ডতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের মতো রোমান্টিকতার পথিকৃৎ কবি বিশ্বাস করতেন 'In the continued existence of the past, in the wonderful possiblities of its

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

revival.'(M.H.Abrams 1960)। রোমান্টিক চেতনায় বিগত কাল ও পরিসর লুপ্ত নয়। কেননা এরা পুনর্জীবিত হয় সৃজনী কল্পনায়, অনুভবে, পুনর্নবায়িত বীক্ষায় এবং ভাবনার মধ্য দিয়ে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে। রাস্কিন যাকে 'wandering fancy'বলেছেন, সেই পরিব্রাজক কল্পনার শক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে রোমান্টিক চেতনা নিজেকে অস্তিত্বের কেন্দ্র হিসেবে আবিষ্কার করে। প্রকৃত রোমান্টিক আত্মতাকে সত্তার সবচেয়ে বৈধ প্রকাশ বলে বুঝে নেয়। চারদিকে ব্যাপ্ত স্পন্দনময় জগৎ প্রতিবিম্বিত হয় সত্তায়। না লিখলেও চলে যে সত্তার উদ্বোধনেই মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অস্তিত্বের অনিঃশেষ কিরণ-সম্পাতে প্রতিটি মুহূর্ত তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে বলে ভালোবাসা-নিসর্গ-ঈশ্বর অদ্বৈত উপলব্ধিতে সমন্বিত হয়ে যায়। কবি-চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেক এই অনুভব থেকেই লিখেছিলেন 'To see a world in a grain of sand./And a heaven in a wild flower/ Hold infinity in the palm of your hand,/And eternity in an hour.'।

কাল ও পরিসরকে রোমান্টিক চেতনা সম্প্রসারিত করে নিসর্গে, প্রেমে, বাধাহীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। সত্তার ঐ সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই আবার রোমান্টিক চেতনা ফিরে আসে বোধের সেই কেন্দ্রে যে-বিন্দুতে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এতে একাকার হয়ে যায় বাহির ও ভিতর, বয়ান ও ভাষ্য। কেন্দ্র ও পরিধির এই সম্পর্ক যুগপৎ অদ্বৈত ও দ্বিবাচনিক। এ প্রসঙ্গে কবি পার্সি বিশি শেলির একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য 'Each is at once the centre and the circumference, the point to which all things are referred and the line in which all things are contained...poetry is at once the centre and circumference of knowledge.'। তাহলে অসামান্য এই রোমান্টিক কবির উপলব্ধিতে নান্দনিক অস্তিত্ব ও জ্ঞান পরস্পর-সংলগ্ন, অন্তত তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ কবির কাছে গ্রাহ্য ছিল না। সত্য যে-ভাব যখন সঞ্চালিত করে আর প্রকাশের বিশিষ্ট ধরন সহ যেদিকে পথ নির্দেশ করে, রোমান্টিক চেতনায় ঋদ্ধ স্রষ্টা তা অনুসরণ করেন। কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে আপাতভাবে যত টানাপোড়েনই থাকুক, সংশ্লেষণী উপলব্ধির বিচ্ছুরণে দ্বৈতাদ্বৈত অবস্থান হয়ে ওঠে সর্বগ্রাহী।

কবি জন কীটস্ জানিয়েছিলেন, 'Every point of thought is the centre of an intellectual world'। লিখতে পারি একথা যে চিন্তাবীজ যেমন বৌদ্ধিক জগতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য, তেমনই উপলব্ধিতে উৎসারিত ও পরিলক্ষিত চিহ্নায়ক-রূপকল্প-প্রত্নকথা প্রভৃতি রয়েছে প্রগাঢ় ও সর্বব্যাপ্ত অনুভূতিবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে রোমান্টিকতাবাদের অভিব্যক্তিতে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যও। কবি-চিত্রকর-সঙ্গীতস্রষ্টা-দার্শনিকেরা ব্যক্তিসত্তাকে অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে সংস্থাপিত করেও ব্যাপকতর ও ব্যঞ্জনাময় অস্তিত্বের সন্ধানে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের বাইরে ও ভেতরে যুগপৎ যাত্রা করেছেন। ফলে তাঁদের সৃষ্টিবিশ্ব অপার রহস্য-খচিত যার প্রকৃত ঠিকানা না আলোয় না অন্ধকারে। আত্মার সেই গহনে রোমান্টিকতাবাদ অবগাহন করতে চেয়েছে যাকে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্থিবতার গণ্ডিতে সীমায়িত করা যায় না কখনও। সময় ও পরিসরের দ্বিবাচনিকতাকে মন্থন করেই রোমান্টিক চেতনা অস্তিত্বের গভীর গোপন সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছে। এই প্রক্রিয়াই স্রষ্টাকে নিয়ে গেছে অভ্যস্ত বস্তুসম্বন্ধ ও পরিচিত অবস্থানের আওতার বাইরে। এই অতিযায়িতার প্রবণতাই 'Turns our existence here and now into a simple point on the line of an infinite destiny'। এই নিরিখে শেলি-কীট্‌স-বায়রন-বীঠোফেন এর মতো স্রষ্টাদের জীবনকথা ও সৃষ্টির বিশিষ্ট তাৎপর্য যেন নতুনভাবে বুঝে নিতে পারি। যেন আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর প্রেরণাই এঁদের অন্তহীন ইন্ধন হিসেবে সক্রিয় ছিল। জীবন-ব্যাপ্ত দহনে নিজেদের ইন্ধনে রূপান্তরিত করেছিলেন বলে তাঁরা প্রত্যেকেই সত্তার যাবতীয় উৎক্রান্তির সম্ভাবনাকে চূড়ান্ত ভাবে নিংড়ে নিয়েছিলেন আর যাত্রা করেছিলেন দুর্নিবার অন্তহীন নিয়তির দিকে।

সত্তার গভীরে প্রচ্ছন্ন কোনও এক অনির্দেশ্য ও রহস্যময় নিরালোকে রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণার উৎস, এমন মনে করেন কেউ কেউ। এই নিবন্ধের সূচনা-পর্বে লক্ষ করেছি কতভাবে সমসাময়িক জীবন রুদ্ধ কারাগার ও নিরেট অচলায়তন বলে প্রতিভাত হচ্ছিল সংবেদনশীল মানুষদের কাছে। সার্বিক বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা যেহেতু ঐ রুদ্ধতার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল, কবি-শিল্পীরা চেতনায় প্রোথিত যাবতীয় শৃঙ্খল চূর্ণ করার তাগিদেই রূঢ় ও দানবিক বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আবার এই প্রত্যাখ্যানেই সূচিত হয়েছিল নতুন জীবনস্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের উপযোগী নান্দনিক প্রক্রিয়ার নির্মাণ। তাই রোমান্টিক চেতনায় পরিশীলিত জনেরা হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং-উদ্দীপক, কল্পনায় আনখশির নিমজ্জিত এবং অপার্থিব উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত। নোভালিস এই আত্মিক পরিস্থিতির মর্মে অনুভব করেছিলেন 'Magic idealism' এর উপস্থিতি। রোমান্টিকেরা এরই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে খুঁজে নিয়েছিলেন আত্মিক শুশ্রূষার বিশল্যকরণী। এই সূত্রেই এল কল্পনার সার্বভৌমত্বে ও সংবেদনার কেন্দ্রিকতায় অস্খলিত প্রত্যয়। রোমান্টিক চেতনায় কল্পনা সর্বাত্মক মূল্যবোধেরও অবলম্বন যা সৃষ্টির মাধ্যম-অন্তর্বস্তু-উপকরণকে দেয় নান্দনিক বৈধতা। এবং, যাবতীয় স্খলন ও অশুদ্ধতা মোকাবিলা করার জন্যে যোগান দেয় প্রতিষেধকও। তাই সৃজনী কল্পনা সার্বিক মুক্তিরও দ্যোতক। মুক্তি-স্বপ্নে বিভোর রোমান্টিক ভাবাদর্শই অগ্রহণযোগ্য যথাপ্রাপ্ত জগৎকে রূপান্তরিত করে স্বপ্নলোকের অধরা মাধুরীতে।

~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতাবাদ

প্রতিদিনকার জীবনযাপনে যে-বাস্তব আমাদের অভিজ্ঞতায় মূর্ত হয়ে ওঠে, তার তাৎপর্যের নিষ্কর্ষই বাস্তবতা তা কোনও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে সহজভাবে বলা যায়, বাস্তবতা মানে বাস্তবতার বোধ। বোধ জেগে ওঠার মধ্যেই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নিশ্চয়। কিন্তু আপাতভাবে একে মনে হতে পারে প্রতিরূপবাচন (Tautology)। কিন্তু এতে সংশয়ের অবকাশ নেই যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে কালাতিপাত করেও যদি কেউ ঐ বোধের অধিকারী না হয়, তাহলে অন্ধজনের কাছে চিররুদ্ধ জগতের মতো বাস্তবতার প্রতীতিও তার হয় না। সাহিত্যে-শিল্পে বাস্তবতার এই বোধ যখন প্রণালীবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়, বিশিষ্ট বিশ্ববীক্ষার উদ্‌ভাসন ঘটে। বিশিষ্ট ধারার ঐ সাহিত্যিক ও শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে আমরা বাস্তবতাবাদের নিদর্শন খুঁজে পাই। প্রতিদিনকার জীবনযাপনে বাস্তবের যে-রূপ ও চরিত্র আমাদের কাছে ধরা দেয়, তার নান্দনিক রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে জীবন ও বাস্তবের প্রতীয়মান ও গভীর আকরণ সম্পর্কে নান্দনিক ভাষ্য। এই ভাষ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের যথাপ্রাপ্ত জীবন ও প্রতিদিনকার বাস্তব অন্তর্লীন নিষ্কর্ষ সহ আমাদের কাছে পুনরুত্থাপিত হয়। যাপনের অনেক রহস্য উন্মোচিত হয় তখন। আমরা যেন নিজেদের পুনরাবিষ্কার করি। এইজন্যে সাহিত্যের বাস্তবতায় দৈনন্দিন বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি পাই না, বর্ণনার উদ্বৃত্তও পাই। এই বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে বাস্তবের মা যেমন করে কাঁদে, সাহিত্যের মা তেমন করে কাঁদে না। অর্থাৎ সাহিত্যে-শিল্পে সক্রিয় বাস্তবতাবাদ মূলত নির্ভর করে তথ্য ও সত্যের মূলগত স্বাতন্ত্র্য ও দ্বিবাচনিকতার ওপর।

প্রশ্ন হলো, বাস্তব ও তথ্য কি সমার্থক? যথাপ্রাপ্ত বাস্তব বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে মূর্ত হয় যখন, নানা অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে তার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই। বিভিন্ন অনুষঙ্গ ছাড়া বাস্তবের ধারণা স্পষ্ট হয় না এবং তথ্য হিসেবে তাদের অস্তিত্ব গ্রাহ্য হয়ে ওঠে না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের 'Hard times' এর অন্যতম কুশীলব গ্রাডগ্রিন্ড-এর একটি সংলাপ মনে পড়ে 'Now what I want is Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life!' এই শেষবাক্যটি প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির দ্যোতক জীবনে শুধুমাত্র তথ্যের প্রয়োজন! কেননা তথ্যের বাইরে কোনও বাস্তব থাকতে পারে না। কিন্তু এমনও তো অনেকেই রয়েছেন যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গির শরিক নন। তাঁদের মতে তথ্যাতিযায়ী আত্মিকতাই উচ্চতর বাস্তব এবং জীবনে উপলব্ধির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরমতাই প্রকৃত অন্বিষ্ট। যাঁরা পরাবাস্তববাদী বা ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার অনুসারী অথবা অস্তিত্বের সার্বিক উদ্ভাসনে যাঁদের প্রত্যয় সর্বাধিক—তাঁরা তথ্য ও বাস্তবের ডিকেন্সীয় উপস্থাপনাকে সীমাবদ্ধ বলেই মনে করবেন। সুতরাং বাস্তবের সম্পূর্ণতার জন্যেই প্রয়োজন বাস্তবের উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত অনুভব। এই উদ্বৃত্ততেই প্রচ্ছন্ন থাকে সত্য যা তথ্যের তুলনায় অনেক ব্যাপক ও গভীর। আদর্শবাদী চিন্তা-প্রস্থান থেকে বাস্তবতাবাদের ভিন্নতার ওপর গুরুত্ব তাই আরোপ করেছেন বিদ্বৎজনেরা।

তবু বাস্তবতাবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ হয়নি। সাহিত্যিক-শৈল্পিক-দার্শনিক বাস্তবতাবাদ এর মতো নানা প্রশাখায় বিন্যস্ত করা হয়েছে এই চিন্তা-প্রস্থানকে। কবি আলজেরনন চার্লস স্যুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) আবার গদ্যময় বাস্তবতা ও কাব্যিক বাস্তবতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছেন। অন্য আরেকটি অভিমত অনুযায়ী বস্তুবিশ্বের প্রণালীবদ্ধ উন্মোচনই বাস্তবতাবাদ। আঠারো ও উনিশ শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যত বিকশিত হলো, তাদের সমবেত উদ্ভাসনে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞানের পরিধিও তত প্রসারিত হলো। আমূল রূপান্তরিত হলো বাস্তবতার বস্তুবাদী প্রতীতি। সত্যের কালাতীত ও সার্বভৌম স্বভাব সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি যদিও সমান্তরালভাবে শিখর থেকে শিখরান্তরে পৌঁছে যাচ্ছিল, বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অবদানে নির্বিশেষের পাশাপাশি বিশেষ এবং অনির্দেশ্যের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট বস্তুগত অনুপুঙ্খও দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যাচ্ছিল। এই সবের সম্মিলিত অভিঘাতে সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে সূচিত হলো নতুন পর্যায়। এই বোধ ক্রমশ জেগে উঠল যে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতীয়মান সংরূপ নয়, প্রণালীবদ্ধ ও সৃষ্টিশীল উপস্থাপনাই প্রকৃত বাস্তবতা। অক্সফোর্ড অভিধানে এই প্রতীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে বাস্তবতাবাদ হলো 'Close resemblance to what is real; fidelity of representation, the rendering of precise details of the real thing or scene'। অর্থাৎ যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রায়-সদৃশ অস্তিত্ব ব্যক্ত হয় বাস্তবতাবাদী উপস্থাপনায় তা কখনও হুবহু প্রতিলিপি হয় না। সাহিত্যের নিরিখে বলা যায়, শব্দ দর্পণ হলেও তার ব্যবহারবিধি নিশ্চয় প্রচলিত আয়নার মতো নয়। সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদ মূলত উপস্থাপন ও পুনরুত্থাপনের প্রকরণ। উপস্থাপিত বিষয় যেহেতু কোনো-না-কোনোভাবে পরিশীলন-লব্ধ, তা কখনও যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সমরূপ হয় না। এখানেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার রহস্য। জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে সাহিত্যিক-শিল্পী স্বতশ্চলভাবে কিছু কিছু নির্বাচন করেন এবং সেইসব নির্বাচিত অনুপুঙ্খের মধ্যে আনেন নতুন বিন্যাস, নতুন প্রেক্ষিত, নতুন মূল্যমান। এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে যায় তথ্যনির্ভর বাস্তবের উপযোগিতা; বস্তুত অপরীক্ষিত জীবন কখনও শিল্পিত সত্যের আকর হতে পারে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

বাস্তব নিছক বস্তুগত অনুপুঙ্খের সমাবেশমাত্র নয়; বাস্তব আসলে বিশিষ্ট বোধ ও প্রত্যয়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেমন তাকে প্রাথমিকভাবে চিনি, তেমনি ক্রমশ যাচাইও করে নিই। এভাবে বুঝতে পারি যে কী কী উপাদান দিয়ে গড়ে ওঠে বাস্তব—এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোনও জবাব থাকে না। বলা যেতে পারে যে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নবায়মান সমীকরণের মধ্য দিয়ে যে-অস্তিত্বের প্রতীতি নিরন্তর ঘটতে থাকে, তার নিষ্কর্ষ ও উপযোগিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা করতে পারি বলে এই বাস্তব ও বাস্তবতা কখনও স্থির ও অবিচল হয় না। নতুনের সন্ধানী সাহিত্যিক ও শিল্পী তাই বাস্তবের প্রতীয়মান সংরূপে সন্তুষ্ট থাকেন না; বহিরঙ্গ নির্মোকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন বাস্তবতার নিয়ন্তা বোধকে কেবলই পুনরাবিষ্কার করতে চান। ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা অনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) এই চলিষ্ণুতাকেই তাঁর বাস্তবতাবাদী আখ্যানের কেন্দ্রীয় প্রবণতা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বহুমাত্রিকতাকে অন্বিষ্ট বাস্তবের মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে যখন এর বিচিত্র অভিব্যক্তি থেকে দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের তত্ত্বায়ন গড়ে ওঠে, তাকে আমরা বাস্তবতাবাদের অভিধা দিই। অস্তিত্বের বস্তু-ভিত্তি এই চিন্তাপ্রস্থানের প্রধান উৎসভূমি; তবে ব্যক্তি-সত্তার আত্মগত অনুভব এতে অস্বীকৃত হয় না। ইংরেজি সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তবে একটু আগে বাস্তবতার নান্দনিক স্বভাব সম্পর্কে যে-কথা লিখেছি, সেইসূত্রে মনে রাখতে হয় যে বাস্তবতাবাদের পরিধি বহুদূর অবধি ব্যাপ্ত। বস্তুত পর্বে-পর্বান্তরে বিশ্ব-সাহিত্যে যেসব ভাবনা-প্রস্থান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের মধ্যেও বাস্তবতাবাদী অনুভব নানাস্বরে ও স্বরান্তরে উপস্থিত। এই নিরিখে অনরে দ্য বালজাকের পাশাপাশি জেন অস্টেন, জর্জ এলিয়ট, স্তাঁদাল, বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট, এমিল জোলা, ম্যাক্সিম গোর্কি, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, টমাস মান, ডি. এইচ. লরেন্স প্রভৃতি বহু কথাকারের নাম উল্লেখ করতে পারি।

এতে অবশ্য একটা সমস্যা হতে পারে। বাচনিক ও চাক্ষুষ উপস্থাপনার কিছু কিছু বিশিষ্ট রীতি ও মনোভঙ্গি যদি বাস্তবতাবাদের নান্দনিক অভিব্যক্তির প্রেরণা হয়, তাহলে বলা যায়, তা তো ইতিহাসের যে-কোনও পর্বে হতে পারে। কিন্তু কোনও বিশিষ্ট চিন্তাপ্রস্থান যখন তত্ত্বায়নের সামর্থ্য অর্জন করে, তার সংজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি দোষ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া সর্বমানবিক প্রবণতা ও সংবেদনার সময়-নিরপেক্ষ প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েও একথা মনে রাখতে হয় যে কোনও বিশিষ্ট সময়পর্বে একান্ত নিজস্ব চরিত্রের প্রাথমিকতা অনস্বীকার্য। বাস্তবতাবাদও এর ব্যতিক্রম নয় যার উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়। দীপায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্ভূত হয়েছিল যে ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী চিন্তাপরিসর, তাতে মানুষই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জ্ঞানতত্ত্ব ও সত্তাতত্ত্বের কেন্দ্রে। পাশাপাশি আঠারো শতকের ইউরোপে বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্রমিক উন্নতি, শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নৈতিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারমার্থিক চিন্তাপ্রণালীতে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার ক্রমিক অবসান—সব মিলিয়ে নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ আর তার নতুন বাস্তব ও নতুন চেতনাবিশ্ব চলে এল উপলব্ধি ও অভিনিবেশের কেন্দ্রে। আমূল বদলে গেল বাহির ও ভিতরের সংজ্ঞা। তথ্য ও সত্যের স্বরূপ-সন্ধানে দার্শনিক জিজ্ঞাসায় যত নতুন নতুন ধারার সূত্রপাত হলো, বাস্তবের প্রতীতি ও তার উপস্থাপনায় অবধারিত হয়ে উঠল কালান্তর।

সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখনই ভাবি, অভিব্যক্তির দিকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় কেননা উপস্থাপনাতেই বাস্তবের প্রতীতি যেমন হয় তেমনি তার যথার্থতাও যাচাই হয়। এই প্রক্রিয়ার বাইরে বাস্তবের নান্দনিক মাত্রা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই সূত্রেই এসে যায় উপস্থাপক ও গ্রহীতার সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং বিশ্ববীক্ষার প্রসঙ্গও। অবস্থান-নিরপেক্ষ কোনও সত্য নেই। তেমনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের তাৎপর্য অনুধাবন করা অসম্ভব। এই বাস্তবতা শ্রেণি-লিঙ্গ-ভৌগোলিক পরিসর-জাতিসত্তা-দার্শনিক প্রত্যয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চালক বোধ দ্বারা রঞ্জিত বলে এর কোনও একরৈখিক চরিত্র থাকে না। নানা দেশে সাংস্কৃতিক রাজনীতির উচ্চাবচতা অনুযায়ী বাস্তবের সংরূপ ও উপলব্ধি অনিবার্যভাবে আলাদা হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমাদের যে-বাস্তবে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার উৎস ও চারণভূমি, তা-ই সাহিত্যিক বাস্তবতার আধার ও আধেয় নিয়ন্ত্রণ করেছে। আরও লক্ষণীয় যে শৃঙ্খলিত ঔপনিবেশিক মননেই বঙ্গীয় যুক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। ফলে প্রগতি ও প্রতিগতির দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান আধুনিকতা ও বাস্তবতার যুগলবন্দির নিয়ন্তা। উনিশ শতকে এই যে প্রবণতার সূচনা, বিশ শতকে তা জটিলতর ও দৃঢ়তর হয়েছে। অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ জুড়ে লক্ষ করি দ্বান্দ্বিকতারই নানা বিচিত্র ধরন।

তিন

প্রতীচ্যের প্রেক্ষিতে যাপনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত বলেই জীববিশ্বের দার্শনিক বোধ, কাহিনি সম্পর্কে ধারণা, কুশীলবদের পরিকল্পনা ও নির্মাণ, সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদিতে দৈনন্দিন জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াটা প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আবার সমসাময়িকতার মধ্যে যেহেতু অনেকেই বিগতকাল ও আসন্নকালের সংকেতও পেতে চান, তাঁদের বাস্তবতার প্রতীতিতে রৈখিকতা থাকে না। সময় ও পরিসরের আন্তঃসম্পর্কে কেউ কেউ বাস্তবের উদ্বৃত্তও প্রত্যাশা করেন। বস্তুত বিবরণের বা উপস্থাপনার সীমানার বাইরে যে-সঞ্চালক বোধ জেগে ওঠে এবং নতুন অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণায় বয়ানকে উদ্ভাসিত করে তোলে, তাকেই বলছি বাস্তবের উদ্বৃত্ত। পাঠতত্ত্বের দিশারিরা যাকে পাঠকৃতির সঞ্চালক পরাপাঠ হিসেবে নির্দেশ করেছেন, ঐ উদ্বৃত্ততেই প্রচ্ছন্ন থাকে তাৎপর্যের ইশারা। সুতরাং শিল্পিত বাস্তবতায় শুধু সামাজিক অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ কিংবা বহুবর্গ-বিন্যাসের আলোছায়াই থাকে না, পরিশীলিত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বিবিধ আকরণে সীমাবদ্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাস্তব সম্ভাব্যতার আকরণোত্তর বিন্যাসে উত্তীর্ণ হয়। বাস্তবতাতেই প্রচ্ছন্ন থাকে অর্জিত ও অর্জিতব্য উপলব্ধির দ্বিরালাপ। এই সূত্রেই দেখা যায় কখনও রাজনৈতিক আর কখনও অস্তিত্বতাত্ত্বিক আর কখনও নৈতিক অন্তঃস্বরের টানাপোড়েন। যখন এইসব অনুষঙ্গ সহ আত্মতা ও বস্তুত্বের মিথস্ক্রিয়া প্রণালীবদ্ধ চিন্তাপ্রস্থানের চরিত্র অর্জন করে, তা বাস্তবতাবাদের অভিধা পেয়ে যায়। তথ্য উত্তীর্ণ হয় সত্যে যার তাৎপর্য ও উপযোগিতা যাচাই করে নেওয়া যায়।

প্রতীচ্যের বহুমাত্রিক সামাজিক ইতিহাসের যে-পর্বে অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রুদ্ধতায় আক্রান্ত মানুষ সার্বিক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে রোমান্টিক চেতনার উদ্ভাসন ঘটিয়েছিল, যেন তারই সমসাময়িক উত্তরসূরি হিসেবে ক্রমশ সৃষ্টি-সামর্থ্য অর্জন করে নিয়েছিল বাস্তবতাবাদ। বিষয়টি খুবই কৌতূহলজনক এবং অবশ্যই গভীরতর সাংকেতিকতায় ঋদ্ধ। আবার এই নিরিখে বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতাবাদের অসমঞ্জস যুগলবন্দিও লক্ষণীয়। এভাবে লিখতে পারি বাস্তবতাবাদ ও পরাবাস্তববাদ কিংবা বাস্তবতা ও ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা কিংবা নব্যবাস্তব ও আধুনিকোত্তর পরিস্থিতির সম্পর্কাতিযায়ী সম্পর্কের কথাও। প্রশ্ন হলো, এদের মধ্যে সম্পর্কের যে-বিন্যাস লক্ষ করি, তাতে যাচাইযোগ্য সত্য কতখানি রয়েছে? বাস্তব কি অনেকখানি তথ্য ও অবভাসের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে না? উনিশ শতকের প্রতীচ্যে, বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে যখন অচলায়তনের দেওয়ালগুলি ভেঙে পড়ছিল, বাস্তবের আদল ও স্বভাব আমূল পাল্‌টে যাচ্ছিল। আঠারো শতকের শেষে উপন্যাস শিল্পিত বাস্তবের সন্ধানে ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক জগৎ থেকে পাড়ি দিচ্ছিল উদীয়মান নতুন সমাজের দিকে। তবে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ঐ সন্ধান বিশিষ্ট নান্দনিক ভাবনাপ্রস্থানের চরিত্র অর্জন করতে থাকে। ঐ সময় লেখক-শিল্পী-সমালোচক-দার্শনিক-নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস জোরালো হয়ে উঠতে শুরু করে যে যথাপ্রাপ্ত জগতের বিশ্বস্ত উপস্থাপনাই শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর, এটাই বাস্তবতাবাদের প্রাথমিক মৌল নীতি।

আবার, এই জাগতিক বাস্তবকে কেন্দ্রে রেখে বিকশিত হয় জ্ঞানতত্ত্ব ও সত্তাতত্ত্ব। সুতরাং সমস্ত তত্ত্ববীক্ষা ও সৃজনীবীক্ষা মূলত সামাজিক নির্মিতি যেহেতু সমাজের বাইরে বাস্তবের অস্তিত্ব নেই কোনো। তাহলে সমাজ নিজস্ব তাগিদে ও প্রয়োজনে যে-বাস্তবকে নিরন্তর বিনির্মাণ করে চলেছে, তারই বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনা বাস্তবতাবাদের মৌল প্রাক্‌শর্ত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক স্তাঁদালের লা রো এলানোয়া (Red and Black) নামক উপন্যাসে (১৮৩০) ব্যবহৃত বিখ্যাত উদ্ধৃতির কথা 'A novel is a mirror walking down the road'। বাস্তব জগতের নির্বাধ প্রতিফলন ঘটে উপন্যাসে এবং ঔপন্যাসিক তাতে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করেন না—এই ধারণা উনিশ শতকে খুব মান্যতা পেয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য সাধারণভাবে চারুকলায় ও সাহিত্যে বাস্তবতার কেন্দ্রিকতাকে কাব্যিক অনুভবের মতো অপ্রতিরোধ্য ভেবেছিলেন। বাস্তবতা দর্পণের মতো নিজেকে ব্যক্ত করে আর প্রতিবিম্বিত অস্তিত্বের মধ্যে জগৎ পুনঃসৃজিত হয়। যতক্ষণ দর্পণের অস্তিত্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অটুট থাকে, ততক্ষণই তার বৈধতা। স্পষ্টত প্রতিবিম্বিত বাস্তবতা সত্য হয়েও সত্য নয়, ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। এই মৌল উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত থাকে বাস্তবতাবাদী নন্দনের ভিত্তি। তবে সূচনাপর্ব থেকেই এ বিষয়ে বিতর্কেরও শেষ নেই। দর্পণের কেন্দ্রীয় চিহ্নায়কটি রূপক হিসেবে যেহেতু সঞ্চালক নান্দনিক নীতিরও নিয়ন্তা, এর উপযোগিতা প্রতিটি সৃষ্টি-মাধ্যমেই নানাধরনের তর্ক উস্কে দিয়েছে। উপন্যাস-শিল্পে বাস্তবতা ও তার উপস্থাপনার তাৎপর্য যেহেতু সুদূরপ্রসারী, ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস-ভাবুকদের প্রতিবেদনে এর গুরুত্বও খুব বেশি। যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মানে কি ঔপন্যাসিকের সৃজন-সামর্থ্য ও সৃষ্টির স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেওয়া? সম্ভাব্য পাঠকের দাবি মেটানো বা ইচ্ছাপূরণ করা ঔপন্যাসিকের কৃত্য নয় নিশ্চয়। কোনও লেখক যদি তা করেন, তাহলে প্রাগুক্ত দর্পণরূপকটির প্রাসঙ্গিকতা কতটা বজায় থাকবে! শেষপর্যন্ত অবশ্য জিজ্ঞাসা কেন্দ্রীভূত হয় শিল্পিত বাস্তবের পরিসর ও অধিকার নিয়ে। উচ্চতর শিল্পিত বাস্তবে স্বতঃসিদ্ধভাবে যে-নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিহিত থাকে, তা সূক্ষ্মভাবে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সমালোচনা ও ভাষ্যকে একসঙ্গে ধারণ করে।

চার

বাস্তবতাবাদের অভিযাত্রী ঔপন্যাসিকেরা সূচনাপর্ব থেকেই যে এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তার নিদর্শন রয়েছে জর্জ এলিয়টের প্রথম উপন্যাস 'Adam Bede' (১৮৫৯) বইতে। এই উপন্যাসের কথকস্বর কোনও এক পাঠকের মন্তব্য-সূত্রে ভেবেছে যে উপন্যাসের কুশীলবদের সংলাপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ কিংবা মনোরঞ্জক ভাষা হয়তো বা ব্যবহার করা যায় কিন্তু তাতে ঔপন্যাসিকের সবচেয়ে বড় দায় হয়ে দাঁড়াবে 'to represent things as they never have been and never will be' (১৯৪৮ ১৭৮) অর্থাৎ যা কোনওদিন ছিল না এবং কোনওদিন হবে না—সেইসব উপস্থাপনা করাই ঔপন্যাসিকের কাজ। তার মানে স্পষ্টতই মিথ্যার বেসাতি এবং সম্ভাব্য বাস্তবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা। জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং সেইসব ঘটনার সূত্রে দেখা মানুষ-মানুষীদের যখন নিজস্ব চেতনার দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেন কোনও লেখক, তাতে তাঁর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, উদ্দেশ্য-অন্বিষ্ট, রুচিবোধ-নান্দনিক প্রত্যয় সক্রিয় থাকবেই। সৃজনশীল বিনির্মাণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লেখকের মনে প্রতিবিম্বিত বাস্তব স্বতশ্চল ভাবেই অন্যতর বাস্তব হয়ে ওঠে। এলিয়টের ঐ কথকস্বর অবশ্য এই উপলব্ধির কথাও জানিয়েছেন যে, 'The mirror is doubtless defective, the outlines will sometimes be disturbed,the reflection faint or confused; but I feel as much bound to tell you as precisely as I can what that reflection is, as if I were in the witness box narrating my experience on oath.' (তদেব)। দর্পণ কিছুটা অস্বচ্ছ ও তির্যক হলে এর প্রতিফলনেও তার প্রভাব পড়ে নিশ্চয়। কিন্তু রূপকের সীমা যতদূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবধি, তাকে পেরিয়ে গিয়েই সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক নতুন ও সমান্তরাল অস্তিত্ব সম্পন্ন দ্বিবাচনিক জগৎ নির্মাণ করেন। এই জগৎ যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্ভাব্যতাকে আবিষ্কার করে। বাস্তবতাবাদ যদি এই কেন্দ্রীয় প্রতীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, একে বলা যেতে পারে অতিপরিচিত বাস্তবের নান্দনিক পুনর্বিন্যাস।

এই পুনর্বিন্যাসে তথ্য ও সত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্পিত বাস্তবের নান্দনিক সত্তা নৈতিকতা বা প্রয়োজন সিদ্ধিকে গুরুত্ব না দিয়েও গভীরতর ভাবে এই সবই লালন করে। যে-সৃজনী চেতনা বাস্তবতার কাছে দায়বদ্ধ, তা আসলে জীবনকেই নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নেয়। এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ায় জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ ও পরিস্থিতি মিশে যায় পরস্পরের মধ্যে; পরিশীলিত ও অপরিশীলিত উপাদান অনায়াসে নিজেদের মধ্যে স্থান বদল করে নেয়। এই বিনিময় ও মিথস্ক্রিয়ার অভিঘাতে জন্ম নেয় বাস্তবতার নতুন নন্দন, নতুন প্রতীতি। উপস্থাপিত অস্তিত্বের মধ্যে অবলম্বিত বিষয়ের যথাযথতা কতখানি অটুট রয়েছে, তা জিজ্ঞাস্য নয়; গ্রহীতা কোনও নতুন উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হল কীনা, এটাই বিবেচ্য। বাস্তবতাবাদী শিল্পিত প্রতিবেদনে শুদ্ধতা (Correctness) কাম্য নাকী সম্ভাব্যতা (Plausibility)—এই নিয়ে প্রতীচ্যের বিদ্বৎজনদের মধ্যে একসময় খুব বিতর্ক হয়েছিল। অতিপরিচিত বাস্তবকে খুবই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করলে যে-যান্ত্রিকতার উদ্ভব হয় অনিবার্যভাবে, তা নান্দনিক চেতনার পরিপন্থী কীনা—এ-বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অন্যদিকে পরিচিত বাস্তবের মধ্যে সম্ভাব্যতাকে কর্ষণ করলে যে-অপরিচয়ের নীলাঞ্জন ছায়া তৈরি হয়, তাকেই নান্দনিক বিচারে কাঙ্ক্ষিত মনে করেছেন অনেকেই। ইংরেজি সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স ও অ্যান্টনি ট্রলোপ এর মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধতা সুবিদিত। বস্তুত বাস্তবতাবাদের প্রকৃত অন্বিষ্ট কী, এ সম্পর্কে মত-পার্থক্যের অভাব নেই। প্রসঙ্গ অবশ্যই চায় প্রেক্ষিতের সমর্থন। এইজন্যে বিবৃত কুশীলবেরা, কাহিনি-বিন্যাস, বিবরণ, বিচিত্র স্বর-সমাবেশ সমস্তই প্রেক্ষিত-নির্ভর। আর, ঐ প্রেক্ষিতের সূত্রে আসে মানুষের পৃথিবীর সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক-নৈতিক মাত্রা। আসে সময়ের নানা স্তর ও বিভঙ্গের টানাপোড়েন। সেইসঙ্গে আসে সাম্প্রতিক ও সংলগ্ন পরিসরের কেন্দ্রিকতা। প্রশ্ন হলো, দর্পণ কি এত উচ্চাবচতা ও জটিলতা ধারণ করতে পারে? প্রশ্নটা সামান্য বদলে নিয়ে লেখা যেতে পারত : আপাত-সহজ বাস্তবের মধ্যেও কেন এত রন্ধ্র ও অলিন্দ? কেন আলো-ছায়া-অন্ধকারের এত বিচিত্র সহাবস্থান? কেনই বা ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে এত বেশি অনন্বয় ও চোরাবালি? আসলে বাস্তবতাবাদের উত্থান হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত জনিত প্রতিক্রিয়ার আবহে। ক্রমশ ধর্ম-কেন্দ্রিকতার বদলে দেখা যাচ্ছিল মানব-কেন্দ্রিকতার উদ্ভাসন। পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান ও মানবিকীবিদ্যার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল এবং বিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ অনুশীলনে চিন্তাজগতে দৃঢ়তর হচ্ছিল যুক্তিবাদ ও ঐহিকতার প্রতিষ্ঠা। অবশ্যই বাস্তবতাবাদের প্রেক্ষিতে এইসব উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের আন্তঃসম্পর্ক ও সহাবস্থান বহুরৈখিক এবং অত্যন্ত জটিল। নতুন কালের নতুন মানুষেরা যেহেতু নিঃশ্বাস নিচ্ছিল এই আবহে, বাস্তবতাবাদের অনুশীলনে স্থিতাবস্থার প্রকট প্রভাব এবং সেই বলয় থেকে মুক্তির প্রবণতা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

এমন নয় যে সাম্প্রতিকতার অনুভব শুধুমাত্র পরিশীলিত নাগরিকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক সুষমায় সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সাম্প্রতিকতার অনুভব নানাভাবে প্রকট হচ্ছিল। সেইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বাস্তবতাবাদী নন্দনের পাশাপাশি রোমান্টিকতাবাদী নন্দনভাবনাও প্রবলভাবে উপস্থিত তখন। বিশ্ববীক্ষার দু'টি ভিন্ন ধরনের সমান্তরাল উপস্থিতি কোন তাৎপর্য সূচিত করে, তাও গভীরভাবে বিবেচ্য। অনাগরিক জীবনের অগাধ অবাধ প্রসৃতিতে পরস্পর-ভিন্ন বিশ্ববীক্ষার সহাবস্থান আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। কিন্তু সৃজনশীল সংবেদনার গভীর অবতলে অবশ্যই সক্রিয় ছিল দ্বিবাচনিকতার প্রক্রিয়া। উনিশ শতক জুড়ে মানবিকীবিদ্যা, বিজ্ঞান ও দর্শন যত বহুধাপ্রসারিত হলো, ঐ দ্বিবাচনিকতা তত বেশি শানিত হলো সাহিত্যে ও চারুকলায়। রোমান্টিকতাবাদের মর্মমূলে ছিল ভাববাদী অধিবিদ্যা এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সত্তার অবস্থান। অন্যদিকে, ব্যাপকতর অর্থে, বস্তুবাদী ভাবধারা হয়ে উঠল বাস্তবতাবাদী নন্দনের মূল প্রবর্তক। জি জে বেকার 'Documents of modern literary realism' বইতে লিখেছেন 'Realism really did constitute a fresh start because it was based on a new set of assumptions about the Universe. It denied that there was a reality of essences or forms which was not accessible to ordinary sense perception, insisting instead that reality be viewed as something immediately at hand, common to ordinary human experience and open to observation.' (1963 6)

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে যেহেতু সাধারণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, লেখক এবং পাঠক অনিবার্যভাবে মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত ধারণা, মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য-ব্যবহারবিধি-ক্রিয়াপ্রকরণ এবং শিল্পকলার ভূমিকা সম্পর্কে সমসাময়িক রোমান্টিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি করে নিলেন। বাস্তবতার যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন যদিও বারবার উঠে এল, বিশেষভাবে ইংরেজি বাস্তবতাবাদী উপন্যাসে অনাগরিক সাম্প্রতিকতার মুখ্য ভিত্তি হয়ে উঠল মানবতাবাদী প্রেরণা। এখানে আমাদের মনে পড়ে কবি আলেকজান্ডার পোপের বিখ্যাত দু'টি পঙ্‌ক্তি, যা দিয়ে 'Essay on man' এর 'Epistle II' শুরু হয়েছে

> 'Know then, thyself, presume not God to scan
> The proper study of mankind is man.'

বিখ্যাত এই উচ্চারণের সূত্রে বাস্তবতাবাদী কথাসাহিত্যের মৌল প্রেরণাকে চিহ্নিত করা যায়। চার্লস ডিকেন্সের 'Hard times', জর্জ এলিয়টের 'Middle March' ও 'Mill on the Floss', উইলিয়াম থ্যাকারের 'Vanity Fare', অ্যান্টনি ট্রলোপ-এর 'Barchester Towers' ও 'The Warden' প্রভৃতি বুঝিয়ে দেয় কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথাসাহিত্যিকদের অন্বিষ্ট বাস্তবে মানবিক অস্তিত্বের সানুপুঙ্খ অধ্যয়নই উপজীব্য। ফরাসি সাহিত্যে অনরে দ্য বালজাক ঐসময় বাস্তবতাবাদের মহাকাব্যিক সম্ভাবনা সম্পন্ন 'La Comedie Humaine' লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যার মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক ইতিহাস প্রকাশিত হবে। এই 'স্বাভাবিক' বিশেষণটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিতর্কেরও উৎস।

ফরাসি কথাসাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিত যদি লক্ষ করি, বাস্তবতাবাদী জীবন অনুশীলনের অনেকান্তিক প্রবাহ আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে মাদাম জারমেন দ্য স্টেইলের 'Delphine' এবং 'Corenne'। ১৮১৬ তে বেরিয়েছে বেঞ্জামিন কনস্তান্তের 'Adolphe'। সমসাময়িক ফরাসি ইতিহাসে তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্তের উত্থান-পতন ঘটছে, রাজনৈতিকভাবে ফ্রান্স চূড়ান্ত অস্থিরতার মধ্য দিয়ে বাস্তবকে অনিশ্চিত ও আশঙ্কা-সঙ্কুল বলে অনুভব করছে। এরই মধ্যে ১৮২৩ এ প্রকাশিত হয়েছে মাদাম দ্য দুরার 'Ourika' এবং ১৮৩০ এ আঁরি স্তাঁদাল এর 'Le Rouge et Le Noir'। পরের বছর ভিক্তর উগোর 'Notre-Dame-De-Paris' ও বালজাকের 'La peau De Chagrin' প্রকাশিত হয়েছে। জর্জ সাঁদ এর 'Indiana' বেরিয়েছে ১৮৩২-এ আর 'Lelia' ১৮৩৩-এ। বালজাকের 'Le pere Goriot' ১৮৩৫ এ, স্তাঁদাল এর 'La Chartreuse De Parme' ১৮৩৯-এ, আলেকজান্ডার দুমা-র 'Les Trois Mousquetaires' ১৮৪৪-এ প্রকাশিত হলো। আর, ১৮৪৬-এ বেরোল অনরে দ্য বালজাক-এর 'La Cousine Bette'।

এই সময়পর্বে ১৮৪৮ সাল আলাদাভাবে লক্ষণীয় কেননা এবছর বেরিয়েছে মার্ক্স-এঙ্গেলস এর 'Communist Manifesto' যা অবধারিতভাবে বাস্তবের সংজ্ঞা পাল্টে দিয়ে যথাপ্রাপ্ত জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিশা দেখিয়েছে। পাশাপাশি ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের পরবর্তী টালমাটাল অবস্থায় লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে ফরাসি রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার হয়েছেন। পরের বছর বেরিয়েছে জর্জ সাদ-এর 'La Petite Fadette'। ১৮৫১ তে নেপোলিয়ন সম্রাট হয়েছেন। ১৮৫৬ তে গুস্তাভ ফ্লবেয়ার এর সুবিখ্যাত বই 'Madame Bovary' প্রকাশিত হলো। ১৮৬২ তে বেরোল ভিক্তর উগো-র 'Les Miserables'। আরও পাঁচবছর পর অর্থাৎ ১৮৬৭ তে কার্ল মার্ক্সের 'Das Kapital' প্রকাশিত হলো যা পরবর্তী দশকগুলিতে মানুষের চিন্তাজগৎ ও কর্মজগতে বিপুল আলোড়ন তুলবে। ১৮৬৯ এ বেরোল ফ্লবেয়ারের 'L Education Sentimentile'।

আপাতত এখানেই এই ধারাবাহিক বিবরণে ইতি টানছি। ফরাসি ইতিহাসের চূড়ান্ত অস্থির ও বিক্ষুব্ধ পর্বে বাস্তবের বিভিন্ন বিভঙ্গ উপন্যাস-স্রষ্টাদের প্রাণিত করেছে। স্বল্প পরিসরে বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিঘাত স্পষ্ট করে তোলা অসম্ভব। আমরা শুধু লক্ষ করতে পারি কীভাবে ফরাসি উপন্যাস অভিজাত বর্গের সীমাবদ্ধতা থেকে সরে এসেছে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ বাস্তবে। অজস্র অনুপুঙ্খখচিত বাস্তবের উপস্থাপনায় বালজাক অদ্বিতীয় ছিলেন। বিগতকালের স্মৃতি তাঁর বয়ানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রগাঢ় ছায়াপাত করেছে। তাঁর সৃজনী সত্তায় নিহিত দ্বান্দ্বিকতার কথা অনেকেই বলেছেন, কারো কারো মতে এই দ্বন্দ্ব আসলে স্ববিরোধিতা জনিত। বিলীয়মান কালের প্রতি সচেতনভাবে পক্ষপাতী ছিলেন তিনি অথচ অবচেতনে ও সংবেদনায় তাঁর সমর্থন ছিল জায়মান কালের প্রতিনিধিদের প্রতি। উপস্থাপিত বাস্তবের মধ্যে বালজাক সর্বাত্মক দ্বিবাচনিকতাকেই অবলম্বন করেছিলেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক গিয়র্গ লুকাচ 'Studies in European Realism' বইতে চমৎকার মন্তব্য করেছেন 'What makes Balzac a great man is the inexorable veracity with which he depicted reality even if that reality ran counter to his own personal opinions, hopes and wishes. Had he succeeded in deceiving himself, had he been able to take his own utopian fantasies for facts, had he presented as reality what was merely his own wishful thinking, he would now be of interest to none.' (1978 22)। বাস্তবের শিল্পিত উপস্থাপনায় এই যে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কারের সীমা পেরিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য, এর তাৎপর্য বাস্তবতাবাদী নন্দনের পক্ষে অনেকখানি।

ছয়

বালজাক-ফ্লবেয়ার-প্রুস্ত-স্তাঁদাল-জিদ-টলস্টয়-জয়েস-মান-এর মতো অসামান্য স্রষ্টাদের চেতনাবিশ্ব পরিক্রমা করে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের নান্দনিক পুনঃসৃজন সম্পর্কে আমরা যে-প্রতীতিতে পৌঁছাই, তা এত ব্যাপক, গভীর, অনেকান্তিক ও বহুমাত্রিক যে স্বল্প পরিসরে এর সূত্রায়নও সম্ভব নয়। আমরা বরং লিখতে পারি যে বস্তুজগতের অনুসৃতির নামে ছদ্মজগৎ নির্মাণ কিংবা আত্মগত অনুভূতির কর্ষণছলে মিথ্যাবোধের অভিব্যক্তি: এই দু'টি চূড়ান্ত অবস্থানের মধ্যে কোনও ধরনের মধ্যপন্থা গ্রহণ করে না বাস্তবতাবাদ। অজস্র বৈপরীত্য কিংবা ছদ্ম-সংকট উপস্থাপনা করে সমকালকে গোলকধাঁধা বলে প্রমাণ করাও বাস্তবতাবাদের অন্বিষ্ট নয়। প্রকৃত বাস্তবতাবাদ মানুষ ও তার সমাজকে পরস্পর-সম্পৃক্ত অথচ সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তার অধিকারী হিসেবে উপস্থাপিত করে। নানাবিধ সম্পর্কের আলো আঁধারিতে যে-বাস্তব ব্যক্ত হয়, বাস্তবতাবাদী লিখিয়েরা ক্রমশ তাতে নারীপরিসরের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নিশ্ছিদ্র অচলায়তন সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবশ্য এসেছে অনেক পরে। তবে নারীপরিসরের সম্ভাব্য অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল পাঠকদের অবহিত করার প্রাথমিক দায়টুকু বাস্তবতাবাদী উপন্যাসবিশ্বই প্রথম গ্রহণ করেছে। উন্মেষপর্বে তা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে ঘটেনি; কিন্তু পরোক্ষভাবে অবশ্যই এই প্রক্রিয়া সচল ছিল। স্বনামখ্যাত বাস্তবতাবাদী লিখিয়েদের মধ্যে যতখানি আত্মবিরোধ ও অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়, তা মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে অনিবার্যই। মহৎ লেখকের চেতনায় সত্যের জন্যে যে অবধারিত তৃষ্ণা বা বাস্তবতার প্রকৃত নির্যাসের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করি, তাতেই নিহিত রয়েছে বাস্তবতাবাদী নন্দনের সামাজিক সামর্থ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখানে আরো একবার গিয়র্গ লুকাচের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি 'Every great historical period is a period of transition; a contradictory unity of crisis and renewal, of destruction and rebirth; a new social order and a new type of man always come into being in the course of a unified though contradictory process. In such critical, transitional periods the task and responsibility of literature are exceptionally great. But only truely great realism can coup with such responsibilities.' (তদেব ১০)। মহৎ বাস্তবতাবাদী রচনার দায়িত্ব নিশ্চয় অনেকখানি। বিশেষত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নন্দনও হয়ে ওঠে জীর্ণ পুরোনোর অভ্যস্ত নির্মোক পরিহার করার আয়ুধ। এবং অবশ্যই সেইসঙ্গে জায়মান নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম। ধ্বংস ও পুনর্জন্ম কিংবা সংকট ও পুনর্নবায়নের দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার সূত্রধার মহৎ বাস্তবতাবাদ। হয়তো বা বাস্তবতাবাদের বিশেষণ নিয়ে সামান্য বিতর্ক তৈরি হতে পারে। নান্দনিক নিরিখে কোনটা বেশি কাম্য মহত্ত্ব না কী বিশুদ্ধতা! এই তর্কের সহজ মীমাংসা নেই কোনো। লুকাচ প্রসঙ্গত যে ধ্রুপদী বাস্তবতাবাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তা লিও টলস্টয়-থিওডর ডস্টয়েভস্কি-ম্যাক্সিম গোর্কি সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য কী না, এই জিজ্ঞাসা এড়ানো যায় না। সময়ের দু'টি পর্বে বালজাক ও টমাস মান কি একইসূত্রে গ্রথিত হতে পারেন? নিঃসন্দেহে ধ্রুপদী বা মহৎ বাস্তবতার সঙ্গে মানবতাবাদী সংবেদনার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু সময়-স্বভাবের বিবর্তন যখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের অবতলে নিঃশব্দে সক্রিয়, বাস্তবতাবাদী বয়ানে এর অভিব্যক্তি এক ধরনের। আবার তা যখন অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, বাস্তবতাবাদী উপস্থাপনাও সম্পূর্ণ আলাদা হতে বাধ্য। সুতরাং প্রাগুক্ত মহৎ লেখকদের মধ্যেও রয়েছে বীক্ষা ও অভিব্যক্তিগত তারতম্য। বলা ভালো, স্বর ও অন্তঃস্বরের স্বতন্ত্র বিন্যাস ও প্রতিন্যাস। বহুবিধ দ্বন্দ্বময় সময় ও সমাজের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা কত বিচিত্রভাবে চলমান ইতিহাসে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থেকেও কখনও কখনও তার সঞ্চালকও হয়ে ওঠে বাস্তবতাবাদী বয়ান, সেই সত্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলে। এতে অনবরত ঘটে জীবনের পুনর্মূল্যায়ন ও ক্রমিক উর্ধায়ন। অর্থাৎ বাস্তবের প্রতি নিষ্ঠা অটুট রেখেও তার দৃশ্য ও অদৃশ্য গণ্ডিগুলি পেরিয়ে যান বাস্তবতাবাদী স্রষ্টা।

বালজাকের 'Lost illusions' কিংবা স্তাঁদালের 'Le Rouge et Le noir' পাঠকের কাছে বিবেচিত হয়েছে বহুস্বরিক সময়ের অভিজ্ঞান সম্পন্ন সেই সামাজিক বাস্তবের সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা হিসেবে যা বিলীয়মান প্রবণতা থেকে নতুন সম্ভাবনার উদয়-মুহূর্তের স্মারক। বালজাকের 'Old Goriot' কিংবা স্তাঁদালের 'The Monastery of Parma' যেন বিবর্তনশীল বাস্তবের দুটি ভিন্ন মেরুর প্রতিনিধি। বাস্তবতাবাদী লিখনশৈলী সম্পর্কে তাঁদের তিক্ত মতপার্থক্য এখন ইতিহাস। আসলে দু'জনের প্রকৃত পার্থক্য নিহিত ছিল বিশ্ববীক্ষার ভিন্নতায়। বস্তুত বিশ্বসাহিত্যের প্রতিটি পরিসরে এধরনের মত-পার্থক্য খুবই সুলভ ঘটনা। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিরল নয়। শিল্পিত বাস্তবের উপস্থাপনায় যথাপ্রাপ্ত জীবনের নবনির্মাণের স্থপতি কোন দার্শনিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান এবং বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী সৃষ্টিশীল, তাতেই নির্ধারিত হয়ে যায় কেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিমেরু-বিষম। তেমনি জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ি। মহত্তম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সর্বাত্মক পুনঃসৃষ্টি করেছেন। তবুও তাঁকে কখনও সাধারণ নিরিখে বাস্তবতাবাদী লেখক বলা চলে না।

কিংবা, হয়তো বা এই বিন্দুতেই, অন্য আরেকটি বিতর্কের সূচনা হয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়কে যদিও বা ব্যাপকতর অর্থে বাস্তবতাবাদী বলে গ্রহণ করি, ভাবাদর্শ-কেন্দ্রিক কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা বড়ো হয়ে ওঠে। এইসব মীমাংসার অতীত, এমন নয়; কিন্তু তাতে বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে। আপাতত শুধু একথা লেখা যায় যে বাস্তবতাবাদের আশ্রয় যেহেতু জীবন, শ্রেয়োবোধ-নৈতিকতা-সামাজিক দায়-রাজনৈতিক অবস্থান-দার্শনিক মনন প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গ স্বর ও অন্তঃস্বরের আততি তৈরি করে। এদের উপেক্ষা করে কোনও শিল্পিত বাস্তবই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। টলস্টয় সম্পর্কে জুলি লেমাত্র-এর এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সেইসঙ্গে বালজাক বা টমাস মান সম্পর্কেও 'As though he were re-discovering the human race; and then one forgives literature, and regains confidence in it, the hope that it will not die inspite of every thing. All that is needed is only to see correctly, to feel deeply, to be a genius.'। মাঝে মাঝে এমন হয় যে মানুষের ভেতরকার পুঞ্জীভূত অন্ধকার কোনও একটি সময়পর্বে চূড়ান্ত পাশবিকতা, দানবিক জিঘাংসা ও কদর্য বিকারগ্রস্ত স্থূলতা নিয়ে দেখা দেয় এবং দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ততার মানে নিশ্চয়ই দানবিক ইতরতার উপস্থাপনা নয়। বহুবর্গ-বিভাজিত সমাজে স্খলন ও কেন্দ্রচ্যুতি ক্রমশ প্রতাপের চরিত্র অর্জন করে। তবুও তখনও অব্যাহত থাকে অপরাজেয় মানুষের নিজস্ব যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধকে আবিষ্কার করাই তখন শিল্পিত বাস্তবের গোত্রলক্ষণ। লেখক-শিল্পীর দ্রষ্টাচক্ষুতে ধরা পড়ে হিংস্র মিথ্যা ও অসামঞ্জস্যের সঙ্গে মানবসত্তার সংগ্রামে সম্পৃক্ত ট্র্যাজিক কারুণ্য। এভাবেই তথ্য থেকে সত্যে পৌঁছায় মানুষের সংবেদনায় অস্খলিত প্রত্যয় সম্পন্ন বাস্তবতাবাদ। ম্যাক্সিম গোর্কির মতো লেখককে এই নিরিখেই গ্রহণ করতে পারি। আর, বিদ্বৎজনেরা একেই শনাক্ত করেছেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ হিসেব।

বিশ্লেষণী বাস্তবতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ নামে যে দু'টি প্রধান ধারার কথা বলা হয়েছে বারবার, তা কতখানি সার্থক এই প্রশ্ন বারবার উঠেছে। একটু আগে আমরা প্রসঙ্গক্রমে ধ্রুপদী বাস্তবতাবাদের কথা লিখেছি। তেমনি রয়েছে পরাবাস্তববাদ, ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতাবাদ ও নব্যবাস্তবতাবাদের প্রসঙ্গও। চুলচেরা তর্ক এবং বয়ান ও পাল্টা বয়ানের মধ্য দিয়ে কখনও বড় হয়ে উঠেছে বাস্তবের শ্রেণিগত ভিত্তি, কখনও বা অন্বিষ্ট আর কখনও প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুর সমস্যা। কিংবা চেতনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও অবচেতনার ভূমিকা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে। আবার মতাদর্শের সঞ্চালক ভূমিকা বাস্তবতাবাদের অভিব্যক্তিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেয়। এ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন ক্যাথারিন বেল্‌সি 'Ideology is both a real and an imaginary relation to the world—real in that it is the way in which people really live their relationship to the social relations which govern their conditions of existence but imaginary in that it discourages a full understanding of these conditionss of existence and the ways in which people are socially constituted within them.' (1991 57)। আসলে সমস্ত বিশ্বাস এবং উপলব্ধিই গভীরভাবে সামাজিক নির্মিতি। সমাজের বাইরে যেহেতু ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, সব ধরনের অনন্বয়-কূটাভাস-অন্ধবিন্দু জনিত সংকট সামাজিক অনুষঙ্গেই ধরা পড়ে আর তার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে সমাজ-প্রেক্ষিতকেই আশ্রয় করতে হয়।

সাত

দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত ছক ও বস্তু-সম্বন্ধের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্ধবিন্দুগুলিই বাস্তবতাবাদী নন্দনের অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিময় পুনর্নির্মাণের উদ্দীপক। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার সামাজিক অস্তিত্ব নতুনভাবে প্রমাণিত হয়। সেইসঙ্গে লক্ষ করি যে এই নন্দনের শিল্পিত কৃৎকৌশল অনিবার্যভাবে পরস্পর-ভিন্ন। ফলে কোনও একটি নির্দিষ্ট বর্গের মধ্যে বাস্তবতাবাদী লিখনশৈলীকে সীমিত করা কঠিন। প্রসঙ্গত মনে করতে পারি আকরণোত্তরবাদের প্রবক্তা ও বিশিষ্ট সাহিত্যতাত্ত্বিক রোলাঁ বার্ত-এর 'The Reality Effect' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধের কথা যেখানে তিনি বাস্তবতাবাদ ও প্রতীত সাদৃশ্যবোধের মধ্যে পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে যা তথ্য বা যা ঘটেছে বলে দেখানো যেতে পারে তা-ই বাস্তব। অন্যদিকে প্রতীতসাদৃশ্য (Verisimilitude) হল কোনও কিছুর জীবন-সদৃশ অস্তিত্ব যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে পারে এবং যে-বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামতও গ্রাহ্য। অর্থাৎ প্রতীতসাদৃশ্য তথ্য নয়, যথাপ্রাপ্তের উপস্থাপনা বা পুনরুত্থাপন। বার্ত দেখিয়েছেন উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে বিশ্ববীক্ষায় যত রূপান্তর দেখা গেল, ততই এই দুই-এর পার্থক্য ঝাপসা হয়ে এল। কেননা উপস্থাপনা বা পুনরুত্থাপনের গুরুত্ব ক্রমশ কমে গেছে। ফলে শিল্পিত বাস্তবে গুণগত তারতম্যই মুখ্য হয়ে উঠল, পরিমাণগত বিচার নয়। গুণগত তারতম্যের এই বোধই হল 'reality effect'। এ প্রসঙ্গে তিনি ফ্লবেয়ারের বই থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই নিবন্ধের শুরুতে যে লিখেছি, বাস্তব মানে বাস্তবতার বোধ তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে বার্তের প্রাগুক্ত নিবন্ধে। তিনি লিখেছেন 'These authors (among many others) are producting notations'। আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতাতেও মনে হয়, আমরা আসলে শিল্পিত বাস্তবের মধ্যে যাপনের বাস্তবের অভিজ্ঞতাকেই খুঁজি। কেননা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরিশীলিত বাস্তবতা শিল্পসৃষ্টির উপাদান হয় না। বার্ত এইজন্যে 'referential illusion' এর কথা বলেছেন। তাঁর মন্তব্যের নিম্নোধৃত অংশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 'The truth of this illusion is this eliminated from the realist speech-act as a signified of denotation, the 'real' returns to it as a signified of connotation; for just when these details are reputed to denote the real directly, all that they do—without saying so is signify it... in other words, the very absence of the signified, to the advantage of the referent alone, becomes the very signifier of realism the reality effect is produced, the basis of that unavowed verisimilitude which forms the aesthetic of all the standard works of modernity' (১৯৬৮ ১৪৮)।

বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতার সম্পর্ক নিয়ে অবশ্য কিছু তর্ক হতে পারে। তবে এখানে তা অপ্রয়োজনীয়। বরং তাকানো যেতে পারে পশ্চিম ইউরোপের অন্য দু'টি প্রধান সাহিত্যের অভিজ্ঞতার দিকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানিতে ও জার্মান ভাষাভাষী সংলগ্ন অঞ্চলে যে বিপুল অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, তাতে রাজনৈতিক ইতিহাসে তুমুল পালাবদলের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। শিল্পোন্নতি, নগরায়ন, জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার, শিক্ষার দ্রুত বিস্তৃতি, শ্রেণি-সচেতন সর্বহারাবর্গের উত্থান, পরিশীলিত বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ এবং লৈঙ্গিক সচেতনতার সূচনা সমাজের গভীরে সুদূরপ্রসারী উথালপাথাল তৈরি করেছিল। স্বভাবত জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতির উৎসভূমি হিসেবে বাস্তবও হয়ে উঠল বহুমাত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক জার্মান সমাজে বিশ শতকের সূচনা পর্যন্ত মেয়েদের দ্বিতীয়শ্রেণির নাগরিক হিসেবে কালাতিপাত করতে হয়েছে। ফলে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি, পুরুষ ও নারী, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান হয়ে উঠেছিল কার্যত অনতিক্রম্য। বিশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ কেবল জার্মানির রাজনৈতিক মানচিত্রই পাল্টে দেয়নি, মনোভঙ্গির রুদ্ধতা ও অবসাদ অপসারিত করেছিল। তবে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে উনিশ শতকের যে-সময়পর্বে বাস্তবতাবাদের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল, জার্মান সাহিত্য তখন পিছিয়েছিল অনেকখানি। অর্থাৎ রোমান্টিকতাবাদে যেমন জার্মানি ছিল ইংল্যান্ডের সহযাত্রী, বাস্তবতাবাদে এমন হয়নি। কথাসাহিত্যে জার্মানিতে প্রবল হয়ে উঠেছিল 'বিলডুঙ্গস্‌রোমান' বা শিক্ষামূলক উপন্যাসের ধারণা। এতে অন্তর্বস্তুই প্রাধান্য পায় যেখানে উপন্যাসের নায়ক ক্রমশ পরিণতির দিকে কীভাবে যাত্রা করেছে, তার বিশ্বস্ত উপস্থাপনাই মুখ্য। বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকেও অক্ষুণ্ণ ছিল এই প্রবণতা। এই বর্গের উপন্যসে বাস্তব সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বনির্ধারিত পরাপাঠ দ্বারা এবং নায়কের ব্যক্তিগত তাৎপর্য সন্ধানই সমস্ত উপস্থাপনার কেন্দ্রীয় স্বর। এই ধারার রচনার মধ্যে রয়েছে গুস্তা ফ্রেইটাগ এর 'Soll und Haben' (১৮৫৫), 'Debit and Credit' (১৮৫৭), গট্‌ফ্রিড কেলের এর 'Der Gune Heinrich' (১৮৫৪-৫৫) এবং (১৮৭৯-৮০), অ্যাডালবের্ট স্টিফ্‌টের এর 'Der

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Nachsommer' (১৮৫৭) ইত্যাদি। তবে আপন বহুমাত্রিক ইতিহাসে পরিশীলিত বাস্তবতাবাদ জার্মান সাহিত্যে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে টমাস মানের রচনায়। তার ঠিক আগে থিওডোর ফন্টানের 'Effi Briest' (১৮৯৫) প্রকাশিত হয়েছে। টমাস মানের সাহিত্যিক আবির্ভাবের পূর্ববর্তী অর্ধশতকের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই, দেখব, ঐ সময়ের চিন্তাজগৎ তোলপাড় হয়েছে ফ্রিডরিখ নীৎশে নামক অসামান্য দার্শনিক মনীষার বিচ্ছুরণে। মানের সাড়া-জাগানো বই 'BuddenBrooks' (১৯০১) প্রকাশিত হওয়ার পূর্ববর্তী একাদশকে পাচ্ছি এইসব সাহিত্যিক প্রতিবেদন থিওডোর ফন্টানের 'Irrungen Wirrungend' (১৮৮৮), 'Stine' (১৮৯০), 'Unwiederbringlich' (১৮৯১), 'Frau Jenni Triebal' (১৮৯২), 'Die Poggenpuhls' (১৮৯৬), 'Der Stechlin' (১৮৯৮) হাইনরিখ্ মান্ এর 'In Ciner Familie' (১৮৯৪), 'Im Schlaraffenland' (১৯০০), গাব্রিয়েল রয়টার এর 'Ausguter Familie' (১৮৯৫), হেলেন বোহ্‌লোউ এর 'Das Recht der Mutter' (১৮৯৬), সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'Die Traudeutung' (১৯০০), গুস্তাভ ফ্রেন্‌জেন এর 'Jorn Uhl' (১৯০১)।

ইতিমধ্যে নতুন বাস্তবের পতাকাবাহী হয়ে ক্রমশ আবির্ভূত হয়েছেন টমাস মান, রবার্ট মুসিল, ফ্রান্‌ৎস কাফকা, হার্মেন হেস, এরিক মারিয়া রেমার্ক প্রমুখ। জার্মান জাতির ইতিহাসে যখন প্রলয়ঙ্কর ঘনঘটা তৈরি হয়েছে, বাস্তবতাবাদের বিভিন্ন অনুষঙ্গ কীভাবে আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তা আলোচনার জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিবেদন প্রয়োজন। শুধুমাত্র একথা এখানে লেখা যেতে পারে যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন নৈরাশ্য-অবসাদ-পরাজয় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, তিক্ততা, অবসাদ-অসাড়তা ধীরে ধীরে বাস্তবের অভিব্যক্তিকেও আচ্ছন্ন করেছিল। টমাস মানের 'Doctor Faustus' ও 'Magic Mountain' দুঃসহ সময়ের দুটি ভিন্ন ধরনের শিল্পিত অভিব্যক্তি। এখানে হ্যারি লেভিন এর এই মন্তব্যটি স্মরণ করা যায় 'Etymologically, realism is thingism. The adjective 'real' derives from the Latin 'res' (meaning thing) and finds an appropriate context in real Estate.' (The Gates of Horn Oxford University Press New York 1963 34) সময়ের ঘূর্ণিপাকে কীভাবে সমস্ত বস্তু ও বস্তুত্ব রূপান্তরিত হয়ে যায়, তার হদিশ আমরা যথার্থই খুঁজে পাই সাহিত্যিক প্রতিবেদনে। ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-জার্মানির মতো স্পেনের সাহিত্যেও এর প্রমাণ রয়েছে।

স্পেনের বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যেসব লেখকের অবদানে, তাদের মধ্যে প্রধান বেনিটো পেরেজ গাল্‌ডোস্ (১৮৪৩-১৯২০), লিউপোল্ডো আলাস্ (১৮৫২-১৯০১)। স্পেনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘনঘন উথালপাথাল ঘটেছে বলে স্পেনীয় বাস্তবতাবাদ স্বভাবধর্মে অনেকখানি আলাদা। এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় না-গিয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ সমালোচক হ্যারিয়েট টার্নার এর এই মন্তব্যটি বরং লক্ষ করতে পারি 'In the Spanish realist novel, tricking out the larger meaning through the interplay of part and whole called for

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

experimentation with the tropology of image and motif. In telling narrators keep associating one thing with another, digressing from plot to atmosphere to character, while objects become transformed into synedochic close-ups .and metonymic set-ups. the interplay of part and whole also requires disguises narrator as character and vice-versa; the illusions of shadows, alter egos, or imagined personae; the interplay of voices through monologue, dialogue and the free indirect style. These are linguistic strategies that construct the dialogic or polyphonic novel.' (2003 82-83). গাল্‌ডোস যে ডন কিহোতের অমর স্রষ্টা সারভান্‌তেস ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ভেলাৎসকোয়েৎস এর কাছে স্পেনের বাস্তব জীবনে আধারিত সামাজিক উপন্যাসের ঋণের কথা বলেছেন, সেই সূত্রে স্পেনীয় সাহিত্যে ব্যক্ত বাস্তবতাবাদী নন্দনের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৯৭ সালে স্পেনিশ রয়েল একাডেমিতে প্রদত্ত ভাষণে গাল্‌ডোস্‌ জানিয়েছিলেন, বাস্তব ও অবাস্তবের যুগলবন্দিতে গড়ে ওঠে সাহিত্যিক বয়ান। তাঁর মতে, এভাবেই শিল্প ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় 'there should always exist that perfect point of balance between the exactness and the beauty of the reproduction.' (1992:220)

আট

বাস্তবের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা বাস্তবতাবাদ উন্নততর পর্যায়ে ঐ 'Perfect point of balance' খুঁজে নেয়। জীবন যেরকম অর্থাৎ জাতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি- আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতির তারতম্যে তা যেভাবে চেতনায় বিম্বিত হচ্ছে—তার উপস্থাপনার ধরন অনুযায়ী ঐ সামঞ্জস্য-প্রয়াসও আলাদা। বাস্তবতাবাদী বয়ানে কখনও প্রাধান্য পায় জীবনপ্রবাহের কার্যকারণগত সচেতন বা অবচেতন বিশ্লেষণ আর কখনও মানুষের সামাজিক সত্তার ঔচিত্যবোধক উপস্থাপনা। যেহেতু আখ্যানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা, বাস্তবতাবাদ এই আধারেই বিশ্বাস্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্যবেক্ষণযোগ্য জগৎকে যখন নতুন প্রেক্ষিতে পুনরবলোকন করি, তাতে কখনওই যথাপ্রাপ্ত জীবনের যান্ত্রিক প্রতিবিম্বমাত্র দেখি না। যদি এমন দেখতাম, বাস্তবতা এবং স্বভাববাদ একাকার হয়ে যেত। কিংবা বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা কিংবা ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতাকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজনও পড়ত না। অস্কার ওয়াইল্ড ১৮৯১ সালে লিখেছিলেন 'As a method, realism is a complete failure'। এও মূলত দৃষ্টিভঙ্গিরই অভিব্যক্তি। দেশে দেশে যখন আধুনিকতাবাদের উদ্ভব ঘটছিল, নান্দনিক অগ্রাধিকারের ভিন্নতায় চিন্তা-প্রস্থানের দ্বিমেরু-বিষম অবস্থানই প্রত্যাশিত। অন্যদিকে গিয়র্গ লুকাচের মতো বস্তুবাদী এই মত প্রকাশ করেছেন যে 'Realism is the recognition of the fact that a work of literature can rest neither on

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

a lifeless average, as the naturalist suppose, nor on an individual principle which dissolves its own self into nothingness... realism means a three-dimensionality and allroundedness, that endows with independent life, characters and human relationships.' (1972:6)

প্রশ্ন হলো এই যে ত্রিমাত্রিকতা ও সর্বব্যাপকতার নিরিখে বাস্তবতাবাদকে দেখানো হলো, মানবিক সম্পর্কের যাবতীয় গ্রন্থনা ও সম্ভাবনা এতেই সীমিত হয়ে যায়? মানুষের অনেকান্তিকতা জটিলতর সময় ও পরিসরের সঙ্গে সঙ্গে কি অনবরত আরও বেশি গ্রন্থিল হচ্ছে না? সে-ক্ষেত্রে মানুষের ঐ বাস্তবকে ধারণ করার প্রকরণ তো সময়ের পর্বান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হয়ে পড়বে। আর, নবীনতর সত্যের সন্ধানে মানুষকেও তৈরি করে নিতে হবে নতুন প্রকরণ ও ভাবনার নতুন কৃৎকৌশল। বস্তুত এইজন্যেই বাস্তবতাবাদের পাঁজর থেকে দেখা দেয় স্বভাববাদ আবার কিছুকাল পরে তার নান্দনিক প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। একই কথা প্রযোজ্য পরাবাস্তবতাবাদ সম্পর্কে কিংবা বিশ্লেষণী বাস্তবতা ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিবির-বিভাজন সম্পর্কেও। অস্তিত্ববাদী-মানবতাবাদী-নারীচেতনাবাদী-উপনিবেশোত্তরচেতনাবাদী চিন্তা-প্রস্থানের সঙ্গে বাস্তবতাবাদের বহুকৌনিক মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধেও তা সমানভাবে বিবেচ্য। তার ওপর রইল ঔপনিবেশিক আধুনিকোত্তরবাদের প্রসঙ্গও। এই সব কিছুর সম্মিলিত অভিঘাতে বাস্তবতাবাদ তার উৎসমুহূর্ত থেকে বহুদূরে সরে এসেছে।

নান্দনিক পরিশীলনের অজস্রতা ও মাত্রাগত ভিন্নতা যথাপ্রাপ্ত বাস্তব জগতের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই দূরত্বের বোধ তৈরি করে দেয়। গড়ে ওঠে বহুধরনের অবভাস এবং সেইসব অবভাস বিনির্মাণ করার মধ্য দিয়ে অনবরত দেখা দেয় আরও অনেক সমান্তরাল শিল্পিত বাস্তব। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবিমাত্র নির্মাণ করে না শিল্পকলা কিংবা প্রতিফলিত বাস্তবতার প্রতীতি তৈরি করেই শিল্পসৃষ্টির দায় ফুরিয়ে যায় না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত জীববিশ্বের প্রেক্ষিতকে নিরন্তর বিদীর্ণ করে নিত্যনবায়মান শিল্পকলা, এরকম ভাবনা বিশ শতকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আভাঁগার্দ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে পরিচিত বাস্তবতায় হস্তক্ষেপ, এমনকী অন্তর্ঘাত করেছে। পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক প্রতাপের দাপটে যে-বাস্তব কার্যত পিঞ্জর বা কারাগার হয়ে উঠেছিল, প্রান্তিকায়িত মানুষের অস্তিত্বও যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল অনতিক্রম্য নিঃসঙ্গতা ও বিষাদের বোধে, তা থেকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই দেখা দিয়েছিল আভাঁগার্দ আন্দোলন, দাদা-পরাবাস্তববাদের অভিযাত্রা, ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতাবাদের মায়াবী সঞ্চরণ। দীপায়নের বুদ্ধি-বিভাসা যখন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল, বাস্তবতাবাদের পাঁজর থেকেই জন্ম নিল বিভিন্ন প্রতিবাদী শিল্পপ্রস্থান। কেউ কেউ মনে করেন বাস্তবতাবাদ যখন রক্ষণশীলতায় আক্রান্ত হল, তখনই জোরালো হয়ে উঠেছিল প্রগতিশীল আধুনিকতাবাদ। কিন্তু কথাটি আংশিক সত্য মাত্র। আধুনিকতাবাদের ঐতিহাসিক উদ্ভব-বিকাশ-ক্রমপরিণতি যেহেতু পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, বাস্তবতাবাদের শিল্পিত অস্তিত্ব ও স্বভাবের সঙ্গে তার বহুমাত্রিক সম্পর্ক নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ। দীপায়ন-যুক্তিবাদ-মানবতাবাদের অজস্র বিভঙ্গের কথা যদি মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না রাখি, বাস্তবতাবাদের ধীরবিলম্বিত বিবর্তন বা রূপান্তরের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকট হবে না কখনও।

ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামাজিক সত্তার অনিশ্চয়তা এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রক্রিয়ায় সেইসব অনিশ্চয়তা থেকে নিষ্ক্রমণের উদ্যম আর এইসব উদ্যমের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্য বা তাৎপর্যের অন্তঃস্বর আবিষ্কারের প্রয়াস এবং সেইসব প্রয়াসের স্বপ্ন ও ব্যর্থতা, এই সব কিছু নিয়েই তো গড়ে উঠেছে সৃষ্টিশীল বাস্তবতাবাদের বিস্তীর্ণ পরিসর। এই প্রেক্ষিতেই ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার স্বতন্ত্র তাৎপর্য বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বিশ শতকের কুড়ির দশকে জার্মান ভাষায় পারিভাষিক অর্থে যে 'Magischer Realismus' ব্যবহৃত হয়, তা ওলন্দাজ ভাষায় 'Magisch - realisme', ইংরেজিতে 'magic realism' বা 'marvellous realism' এবং স্পেনীয় ভাষায় 'Realismo Magico'তে পরিণত হয়। কাকে বলে এই 'Lo Real Maravilloso', তা নিয়ে কেবল স্পেনের সাহিত্যতাত্ত্বিকেরাই নন, অন্য ইউরোপীয় ভাষার তত্ত্ববিদেরাও বহু আলোচনা করেছেন। বিশ শতকের কুড়ির দশকে জার্মানিতে চিত্রকলার একটি বিশেষ ধারায় বাস্তবতার প্রতীয়মান আকরণের গভীরে প্রচ্ছন্ন জীবনের রহস্য আবিষ্কারের যে-প্রবণতা দেখা দেয়, সেই সূত্রে প্রাগুক্ত পারিভাষিক শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। আর, চল্লিশের দশকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে ও শিল্পকলায় যখন বহুবাচনিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে জীবন সম্পর্কিত বাস্তবতাবাদী ও ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিকোণ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হতে শুরু করে, 'Lo real maravilloso' তখনই মান্যতা পায়। মোটামুটিভাবে এর একদশক পর থেকে লাতিন আমেরিকার আখ্যানে 'Realismo Magico' বা ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা প্রধান অভিজ্ঞান হয়ে উঠতে শুরু করে। এসময়ের অন্যতম বিখ্যাত কথাকার সলমন রুশদির ভাষ্য অনুযায়ী তা হলো 'commingling of the improbable and the mundane' (1982:9)। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ('One hundred years of solitude', 'chronicle of death foretold', 'The autumn of the Patriarch ইত্যাদি), ইসাবেল আলেণ্ডে (The house of the spirits), হোর্হে লুই বোর্হেস (A Universal history of infamy), মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তরিয়াস্ (Man of Maize), আলেহি কার্পেন্তিয়ের (The Kingdom of this world) প্রমুখ এই ধারার প্রতিনিধি। তবে লাতিন আমেরিকার বাইরে যাঁদের লেখার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবের অ ভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইতালো ক্যালভিনো, অ্যাঞ্জেলা কার্টার, গুন্টের গ্রাস, সলমন রুশদি, টনি মরিসন, টমাস পিনশোঁ, অমিতাভ ঘোষ এবং বিশেষভাবে পর্তুগালের হোসে সারামাগো। কোনও সন্দেহ নেই যে বাস্তবতাবাদের এই বিশিষ্ট ঘরানাটি স্বতন্ত্র পরিসর দাবি করে। আপাতত সমালোচক ফ্রান্ৎস রোহ এর মন্তব্য অনুসরণ করে লিখতে পারি যে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতাবাদী চিত্রকলায় যখন মানুষের অন্তর্জীবন নানা সংকেতের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হতে শুরু করল, ভাষাশিল্পীরাও ঘটনা-বস্তু এবং তাদের সম্বন্ধকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। অস্তিত্বের এই পুনরাবিষ্কারের অন্বিষ্ট ছিল আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য পরদাটি সরিয়ে দেওয়া। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে পুনরুদ্ভাসিত হয়, আমরা বুঝে নিই যে বাস্তবের অন্তরালেও রয়েছে আরেক বাস্তব। তার গভীরে যখন প্রবেশ করি 'in an intuitive way, the fact, the interior figure, of the exterior world' (রোহ্ ১৯৯৫ ২৪)। তখন অতিপরিচিত জীবনের বিলুপ্তপ্রায় তাৎপর্য নতুনভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

এবার আমাদের সমে ফিরে আসার পালা। নিয়ত রূপান্তরশীল বাস্তবতা সম্পর্কে শেষ কথা বলা অসম্ভব। অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ বা সর্বাত্মক সন্ত্রাসের আবর্ত সম্পন্ন আধুনিকোত্তরবাদের অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও বাস্তবতাবাদের অভিযাত্রা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তার যাত্রাপথ বারবার বদলে গেছে, নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে গন্তব্যও; তবু অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের নিরন্তর দ্বিবাচনিকতার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হচ্ছে যে বাস্তবের চূড়ান্ত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। আমরা শুধু বুঝে নিই যে শিল্পিত পুনর্নির্মাণ অনিবার্য। বিচার-বিশ্লেষণের নতুন নতুন পদ্ধতি নির্মিত হবে, তাও অবধারিত। সব কিছু সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত তর্কাতীত 'Mastery of the great realists lie deeper than technical virtuosity. A writer's greatness springs from the depth and richness of his experience of his reality. The study of the masters of past and contemporary realism will have to focus on the depth of these masters' experience; and the lessons learnt will be a subtler and more profound understanding of reality.' (লুকাচ ১৯৭৯:১৩৪)

বাস্তবতার প্রকৃত প্রতীতিকে প্রতিষ্ঠিত করাই বাস্তবতাবাদের অন্বিষ্ট। বহমান সময় শুধু বুঝিয়ে দেয়, 'এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়'। আর, 'ভাঙন পেছনে থাক, সম্মুখে নির্মাণ'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকরণবাদ

জগৎ ও জীবনকে আপাতদৃষ্টিতে যেরকম মনে হয়, আসলে তাদের স্বরূপ সেরকম নয়। আর, নয় বলেই এই স্বরূপ আবিষ্কার, তাৎপর্য নির্ণয় এবং পুনর্নির্মাণের তাগিদ নানাভাবে প্রবল হয়ে ওঠে। সত্য যদি নানাভাবে প্রতীয়মানের আড়ালে ঝাপসা হয়ে না যেত, বিশ্লেষণ ও পুনঃপাঠের কোনো প্রয়োজনই থাকত না! আমাদের ভাষা, চেতনা, সংস্কৃতি ও শিল্পবোধ প্রকৃতপক্ষে কিছু চিহ্নায়কের সমষ্টি। জীবন ও জগতের নানা অভিজ্ঞতা ঐ সমস্ত চিহ্নায়কের মধ্যে প্রতীকী চরিত্র অর্জন করে। আবার এরা যে সবসময় সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাও নয়। কীভাবে কোন প্রতিবেদনে এরা উপস্থাপিত হচ্ছে, তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে এদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। তাই গ্রহীতাকে মনে রাখতে হয়, জগৎ ও জীবন একদিকে বস্তুকে প্রতীক করে তুলছে আবার অন্যদিকে প্রতীককে গ্রহণ করছে বস্তুর প্রত্যক্ষতায়। এ আসলে বহুমাত্রিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া, যা সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে স্পষ্ট হতে পারে। মানুষ তার সহজাত প্রবণতা অনুযায়ী বাস্তবের অর্ন্তবর্তী রূপককে বুঝতে চেষ্টা করে আবার রূপকের অন্তঃশায়ী বাস্তবের ভিত্তিভূমিকে চিনে নিতে চায়। তার মানে, জগৎ ও জীবন একদিকে সংকেতের আশ্রয়-ভূমি, অন্যদিকে সূত্রায়িত তাৎপর্য বিশ্লেষণের লক্ষ্য। যা মনে হয়, বস্তু ও ঘটনা যেহেতু তা নয়, আমরা সব সময়ই আমাদের জগৎকে কিছু নির্দিষ্ট আকল্প অনুযায়ী অনবরত সূত্রায়িত ও বিশ্লেষণী পাঠ করে চলেছি। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চিন্তা ও অনুভূতিকে কিছু কিছু কাঠামোয় বিন্যস্ত করি এবং সেসব কাঠামোর পরম্পরা থেকে সমগ্রের প্রতীতিতে পৌঁছাতে চেষ্টা করি।

আমরা আসলে সংকেতের পাঠক এবং বহু বিচিত্র নির্মোকে আবৃত জগৎ ও জীবনের উন্মোচক। নানা ইঙ্গিতে, নানা প্রসাধনে নানা রূপকে জগৎ ও জীবন আমাদের কাছে যে-বাচন তুলে ধরে, আমরা তারই ভাষ্যকার এবং অনুবাদক। অনবরত নতুন পাঠকৃতি নির্মাণ করা এবং সেই সূত্রে বহুস্তরান্বিত প্রতিবেদনে পৌঁছানো আমাদের দায়। সাধারণভাবে প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে—তা সে ব্যাকরণই হোক কিংবা সামাজিক ভব্যতা, শিল্পকলা, নৈতিকতা অথবা অবচেতনার বিধি-বিন্যাস। প্রতিবেদনের দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট ধারণাই প্রতিফলিত হচ্ছে পাঠকৃতিতে। কিছু বিশ্বাস সূত্রায়িত হচ্ছে, কিছুটা হয়তো প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে আবার পুরোপুরি নতুন প্রতীতি উন্মোচিত হচ্ছে কখনও কখনও। সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যায়নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ থাকছে সর্বদা, চিন্তা সাকার হয়ে উঠছে কিছু কিছু আকরণের আশ্রয়ে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, প্রতিবেদনের নির্মিতি-বিজ্ঞান অনুশীলন করে দেখা যায়, সামাজিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় যে-সমস্ত প্রতীতি খুবই মৌলিক ও সর্বজনগ্রাহ্য, তাদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্যে কোনো ধরনের বাইরের প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যায়নের প্রক্রিয়ায় সেইসব যথাপ্রাপ্ত বলে অনায়াসে গৃহীত হয়।

আকরণবাদী বা চিহ্নায়ন-বিশেষজ্ঞ সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যায়নের প্রক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে জগৎ ও জীবনের নির্মিতি-প্রকরণে উদ্ভাসনী আলোকপাত করেছেন। সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও যথাপ্রাপ্ত প্রকরণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পাঠকৃতির সমগ্রতায় স্থাপন করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যায়নের প্রক্রিয়া খুবই জরুরি। আপাত-দৃষ্টিতে যাকে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, সমগ্রের সঙ্গে অংশের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের সূত্রে তাকেই আকরণবাদ কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট ভাববৃত্তের ফলশ্রুতি বলে চিনিয়ে দেয়! বিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে ইঙ্গ-মার্কিন 'New Criticism' সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে-ধরনের প্রায়োগিক বিধিকে গুরুত্ব দিচ্ছিল, ঠিক তার উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে আকরণবাদ ও তার সহযোগী চিহ্নবিজ্ঞান সাহিত্য বিচারের পুরোপুরি নতুন পদ্ধতিকে সামনে নিয়ে এল। এর আগে বাস্তবের বিশ্বস্ত উপস্থাপনাকে লক্ষ করাই ছিল মূলত সাহিত্য সমালোচনার দায়; এবার পাঠকৃতির গভীরে গিয়ে নির্ণায়ক উপাদানের সন্ধানে সাহিত্যতত্ত্ব পৌছাল তাৎপর্য বিকশিত হওয়ার গভীরতর প্রক্রিয়ায়। চিন্তা ও অনুভূতির বিশিষ্ট প্রবণতায় বস্তু প্রতীকে রূপান্তরিত হয় আবার প্রতীকই হয়ে ওঠে বস্তু। আকরণবাদ পাঠকৃতি-নির্ণায়ক পরাপাঠের সেই অধিবাস্তবতা থেকে তত্ত্বের নির্যাস আহরণ করতে চাইল। ফলে একদিকে কবিতা অন্যদিকে কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণ উত্তীর্ণ হলো পুরোপুরি নতুন আরেক পর্যায়ে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিখ্যাত তাত্ত্বিক মিশেল রিফাটেরের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে কবিতা পাঠের স্পষ্ট দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে সাধারণ পড়ুয়া কবিতায় ব্যবহৃত ভাষাকে দৈনন্দিন ভাষা-চেতনা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু একটু পরেই তাঁর নজরে পড়ে কবিতার পাঠকৃতিতে এমন কিছু নৈঃশব্দ্যের পরিসর রয়েছে যার হদিশ প্রচলিত বাক্-অভ্যাস দিয়ে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, প্রচলিত যুক্তি-শৃঙ্খলার বাইরে যেতে চায় কবিতার ভাষা। তখনই শুরু হয় কবিতা পাঠের দ্বিতীয় পর্যায়, যেখানে সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যায়নের প্রক্রিয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় জীবনানন্দ এই ভাষার প্রথম স্থপতি। ভাষা ও পরাভাষার দ্বিবাচনিকতায় গড়ে ওঠে কবিতার যে-অণুবিশ্ব, তাকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে চিন্তা ও অনুভূতির অজস্র কাঠামো প্রকট হয়ে পড়ে। রিফাটেরের কবিতা বিশ্লেষণের মতো রোলাঁ বার্তের উপন্যাস বিশ্লেষণও আমাদের মনোযোগ দাবি করে। আকরণবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বার্ত দেখিয়েছেন যে উপন্যাস নিছক বাস্তবতাকে অনুকরণ করে না, বাস্তবানুগ প্রতিক্রিয়া উপন্যাসে সন্নিবেশিত করে সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে বাস্তবতার গভীরে নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলে। উপন্যাসের কথা-বয়নে চিহ্নায়কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরম্পরা যদি সার্থকভাবে ব্যবহৃত না হয়, বাস্তবতার কোনো প্রামাণ্য অভিব্যক্তি সেই উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব পাঠকৃতির তাৎপর্য অনুসন্ধানে যে-সমস্ত কৃৎকৌশল অবলম্বন করে, তাদের আশ্রয় কোনো জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও কথা-বয়নের পরম্পরা। সুনির্দিষ্ট যে-পদ্ধতি ও প্রকরণ থেকে গ্রন্থনার উৎপত্তি, প্রতিবেদনের তাৎপর্য নিহিত থাকে তারই মধ্যে। অভিব্যক্তির লোকায়ত পরম্পরা এবং সূত্রায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি যেহেতু চেতনা ও অবচেতনাকে একই সঙ্গে ছুঁয়ে থাকে, আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞান পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী স্তর-বিন্যাস বিশ্লেষণের পক্ষে খুবই উপযোগী।

বিশিষ্ট এক সমালোচক জানিয়েছেন, 'meaning is intertextual' খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্তব্য। কোনো পাঠকৃতি নিছক শূন্য থেকে জন্ম নেয় না; অন্তর্বয়নের সূত্রে পূর্ববর্তী পাঠ-পরম্পরার স্মৃতিকে গেঁথে নেয় নিজের অস্তিত্বে। পূর্বাগত বিভিন্ন পাঠের স্মৃতি প্রতিবেদনের মধ্যে চিহ্নায়কের মতো অবস্থান নিয়ে থাকে। এইজন্যে কোনো পাঠকৃতির নিবিড় অনুশীলন মানে কার্যত ঐতিহ্যের সঞ্চরমান ছায়ার স্বীকৃতি। বিশিষ্ট চিহ্নবিজ্ঞানী উমবের্তো একো এইজন্যে বলেছেন, আমরা যখন পাঠকৃতির তাৎপর্য অনুসরণ করি, সে-সময় প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা আসলে অলিখিত এক সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষকে অনুসরণ করি। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, নিবিড় পাঠ একটি কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া; বরং সার্থক প্রতিবেদন মাত্রেই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্নস্মৃতির নিয়ত সঞ্চরমান আকরণগুলিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। বস্তুত আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞান মূলত সেইসব তত্ত্বের বিন্যাসকে উপস্থাপিত করে যাদের প্রাথমিক দায় হল, ভাষা ও সাহিত্যগত কৃৎকৌশলের তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা। কবিতা বা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন চিন্তাবীজ, ভাবকল্প, নানা ধরনের আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদিকে মূলত আকরণ হিসেবে দেখতে শিখি আমরা। ভাষাগত, মাধ্যমগত, ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে যখন সুনির্দিষ্ট আকরণের সমষ্টি বলে বুঝতে পারি, আমাদের অভিজ্ঞতা কীভাবে প্রতিবেদনে রূপান্তরিত হতে গিয়ে নানা উচ্চারণের মধ্যে সমন্বয়সূত্র সন্ধান করে—এও আমরা লক্ষ না করে পারি না।

সমস্ত আকরণবাদী সমালোচকেরা যে একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন, তা কিন্তু নয়। একদিকে রিফাটেরের মতো তাত্ত্বিক উল্লেখ-পরম্পরাকে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নিরুদ্ধ বলে ভেবেছেন অর্থাৎ ভাষার পরিসরের বাইরে অন্য কোনো জগৎকে তিনি স্বীকার করেননি; আবার অন্যদিকে লোটম্যান ও স্কোলস-এর মতো তাত্ত্বিক জানিয়েছেন যে, প্রতিবেদন সম্পর্কে আমাদের তাৎপর্যের উপলব্ধি শুধুমাত্র ভাষাগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না, ভাষাতীত অনুভূতিও তাকে গঠন করে। পূর্ববর্তী 'New Criticism'-এর চিন্তাধারা যেখানে মনে করে, কোনো পাঠকৃতিকে প্রসঙ্গ-নির্ভর না-ভেবে প্রসঙ্গ-থেকে-স্বাধীন অস্তিত্ব হিসেবে দেখানো যেতে পারে—আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞান সেখানে তাৎপর্যকে দেখতে পায় শুধুমাত্র নানা ধরনের সম্পর্কের বিন্যাসে। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী সাহিত্য বহুবিধ প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়, কোনো একটি একক পাঠকৃতিতেও অর্থবোধ সম্ভব হয় কেবলমাত্র অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত সম্পর্কের বিন্যাসে। কীভাবে এই সমস্ত বিন্যাস ক্রমশ সংগঠিত রূপ নেয়, তাকে বিশ্লেষণ করাও এই দুই ঘরানার চিন্তাবিদদেরই দায়।

দুই

আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞানকে যে একসঙ্গে উপস্থাপিত করছি, এর কারণ, সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে এদুটি খুবই নিবিড়ভাবে অন্যোন্যসম্পৃক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য। তাছাড়া ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত আকরণোত্তরবাদী চিন্তাধারার সঙ্গেও সমানভাবে সম্পর্কিত। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করব বলে এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যমে, প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং চিন্তার ইতিহাসে এদের পারস্পরিক সীমান্ত প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং একে অপরকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্যও করেছে। এই ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে কয়েকটি জরুরি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। নয়ের দশকের মাঝামাঝি পেরিয়ে এসে দেখতে পাচ্ছি, আকরণবাদী তত্ত্বের তাৎপর্য গত পনেরো বছরে অনেকটা পাল্টে গেছে। একসময় এই তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর উত্তপ্ত বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছে; কিন্তু ইদানীং আকরণবাদ আর ততটা মনোযোগের বিষয় নয়। এর অন্যতম বড়ো কারণ, বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার অভিঘাতে এর গতি-প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা বিপুলভাবে বিবর্তিত হয়ে পড়েছে। ছয়ের দশকের গোড়ায় আকরণবাদী ভাবনা ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই পর্যায়ে এর তত্ত্ব ও প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত ছিল না। ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার বাইরে বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আকরণবাদ সম্পর্কিত বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ পড়ুয়াদের কাছে এই পারিভাষিক শব্দটি পরিচিত হলেও এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এত শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যায় যে এই তত্ত্বচিন্তার প্রকৃত তাৎপর্য অনেক সময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। কারো মতে আকরণবাদ প্রশ্নাতীত ভাবে নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা; সুতরাং এর পক্ষপাতীরা মনে করেন, মানবিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণের আয়ুধ হিসেবে এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বিপরীত পক্ষের সমালোচকেরা আকরণবাদকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে চান এই বলে যে, চিন্তাপ্রকরণ হিসেবে এর শুষ্ক পাণ্ডিত্য, যান্ত্রিকতা, অন্তর্নিহিত অমানবিকতা স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাচর্চার পক্ষে প্রতিকূল। বস্তুত সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বগুলির মধ্যে আর কোনো কিছুই আকরণবাদের মতো এতটা বিতর্কিত নয়। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সমর্থক ও বিরোধীদের উদ্দাম কলহ প্রশমিত হয়ে গেছে, এমনকি বিশিষ্ট তত্ত্ব হিসেবে এর নাম খুব একটা উচ্চারিত হয় না ইদানীং। সুতরাং এখনই এ-বিষয়ে নিবিষ্ট আলোচনার উপযুক্ত সময়।

গত চার দশকের বিতর্ক ও বিতণ্ডা যখন ধুলোর ঝড় ও আঁধি তৈরি করেছিল,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেসময় হয়তো পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্ন ছিল। এখন সে-প্রশ্ন আর নেই। যুদ্ধের গোলা-বারুদ কিংবা সব-পেয়েছির দেশে যাওয়ার ছাড়পত্র নয় আর আকরণবাদ; নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ দূরত্বে গিয়ে এর ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক তাৎপর্য, দোষ-ত্রুটি, পাওয়া-না পাওয়ার পরিমাপ এখন করা যেতে পারে। এতে সংশয় নেই যে, এতদিনে আকরণবাদী ভাবনা মানবিক তত্ত্ববিশ্বের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দও বিভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্বচ্ছন্দে ঠাঁই পেয়ে গেছে। যেমন 'চিহ্নায়ক' (Signifier) ও 'চিহ্নায়িত (Signified), 'সার্বিক বাচন' (Langue), ও 'একক বাচন' (Parole) ইত্যাদি। ভাষা ও প্রতিবেদন সম্পর্কিত আকরণবাদী আলোচনার ফলে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার তাত্ত্বিক বয়ান সমৃদ্ধতর হয়েছে। আকরণবাদী তত্ত্বের পুনর্বিবেচনা আরো জরুরি হয়ে উঠেছে কারণ, আটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ আকরণোত্তরবাদী চিন্তাধারা নানা দিক দিয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় ডালপালা ছড়িয়েছে। অতি সম্প্রতি বাংলা ভাষার জগতেও এই সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখা যাচ্ছে। আকরণোত্তবাদী ভাবনার নাটকীয় ও বহুবিচিত্র প্রসারের ফলে একদিকে যেমন আকরণবাদ নিয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দ্বিবাচনিক দর্পণে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝার অবকাশ তৈরি হয়েছে।

আকরণবাদের যে প্রথম বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে, তা হল, কোনো একক চিন্তাবিদের প্রাধান্য তা স্বীকার করে না। মানুষের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদনে সাধারণত দেখা যায়, কোনো ব্যক্তিপ্রতিভার মৌলিক ভাবনাকে একান্তিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমকালীন চিন্তা-জগৎকে তুলনামূলকভাবে গৌণ করে দেখা হয়। রোমান্টিক যুগের প্রবল আধিপত্যের দিন থেকে ব্যক্তিবাদী ভাবাদর্শ যেভাবে অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে আসছিল, আকরণবাদী চিন্তা দাঁড়াতে চেয়েছে তারা উল্টো মেরুতে। তার মানে, আকরণবাদ প্রশ্নাতীতভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে পৌত্তলিকতা-বিরোধী অবস্থান নিয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তিপূজার প্রামাণ্যতা স্বীকার করেনি। ব্যক্তির উপরে স্থান দিয়েছে চিন্তার নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিকে। কেননা আকরণবাদ মনে করে, কোনো অনন্য ব্যক্তি-প্রতিভাও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিশেষ আবহে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সময়নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক অবস্থান সম্ভব নয় কখনও। আকরণবাদ উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে নৈর্ব্যক্তিককে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অবশ্যয় এও এক ইতিহাসের কৌতুক যে, প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি ও নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানের সপক্ষে আকরণবাদ যত যুক্তি-জালই বিস্তার করুক, একটি নির্দিষ্ট আন্দোলন হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা কিন্তু মূলত কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল ভাবমূর্তির ওপর নির্ভরশীল।

ছয়ের দশকে মূলত পাঁচজন ফরাসি চিন্তাবিদ আকরণবাদী চিন্তাকে জনমানসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা হলেন : ফ্রান্সের অগ্রগণ্য নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভিস্ট্রাউস, অগ্রণী দার্শনিক ও ভাবনা-ইতিহাসের প্রণেতা মিশেল ফুকো, সংস্কৃতি সমালোচক ও সাহিত্য-তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্ত, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণবিদ জাক্ লাকাঁ এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক দর্শনবিদ ও মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক লুই আলত্যুসের। এই পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কিন্তু স্বতন্ত্র ও সমান্তরালভাবে নিজেদের ভাবজগৎকে বিকশিত করেছেন এবং নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৃথক ব্যক্তিসত্তাকে কখনও ছায়াচ্ছন্ন হতে দেননি কিংবা সবাই মিলে নির্দিষ্ট কোনো ভাবনাপ্রস্থানও সূচনা করেননি। কিন্তু তবু নিঃসন্দেহে তাঁদের চিন্তা ছিল অন্যোন্য-সম্পৃক্ত এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক; ফলে সমসাময়িক চিন্তাজগতে তাঁদের সমবেত উপস্থিতিতে একটি নতুন পর্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান এত মৌলিক যে তাঁরা প্রত্যেকেই বিরল মর্যাদার অধিকারী এবং সব মিলিয়ে বলা যায়, তাঁর এক অভিন্ন আকরণবাদী সময়ের অধিবাসী। বৌদ্ধিক প্রয়াসের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক সূত্রের উদ্ভাবনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য বলেই প্রাথমিক বিচারে তাঁদেরই বলা হয়ে থাকে আকরণবাদী চিন্তার স্থপতি। বিশেষভাবে লেভিস্ট্রাউস-এর অবদান বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি, তিনি মানবিক চিন্তার সার্বভৌম স্বভাবের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মানব-মনের সক্রিয়তা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আকরণবাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জুগিয়েছে। অবশ্য পরবর্তী কালে আকরণবাদী ভাবনা যখন আমূল পুনর্বিবেচিত হয়েছে—ফুকো-বার্ত-লাকাঁ-আলত্যুসের-এর বক্তব্য পুনর্বিশ্লেষণের ফলে পুরোপুরি নতুন অর্থে প্রতিভাত হচ্ছে। এতে অবশ্য আরো কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাগুক্ত চিন্তাবিদদের দার্শনিক ও বৌদ্ধিক অবস্থানে যদি কোনো নিশ্চয়তা ও স্থির প্রেক্ষণবিন্দু না থাকে, তাঁদের মধ্যে কোনো সাধারণ ঐক্যসূত্র রয়েছে বলে কল্পনা করব কেন? তাছাড়া নিজেদের জীবৎকালে তাঁরা কেউই একটি নির্দিষ্ট 'সংঘ' হিসেবে পরিচিত হতে রাজি হননি! বিশেষত আকরণবাদের তক্‌মা মেনে নিতে চাননি তাঁরা (লেভিস্ট্রাউস একমাত্র ব্যতিক্রম)। কেননা তাঁদের মনে হয়েছিল, এতে চিন্তার সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্য শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে। বার্ত এবং ফুকো তো চিন্তার সচলতায় এতদূর বিশ্বাসী ছিলেন যে, নিজেদের প্রকাশিত রচনাও তাঁদের কাছে কার্যত হয়ে উঠেছিল বন্দীশালা। নিত্যনূতন বৌদ্ধিক চর্যা আবিষ্কার করার প্রয়োজনে তাঁরা, এমন কি, নিজেদের বিশ্বাসও বারবার ভাঙছিলেন আর বারবারই নতুনভাবে গড়ে তুলছিলেন। কিন্তু তবু এর মানে এই নয় যে, আকরণবাদ নামে কোনো চিন্তাপ্রস্থানের অস্তিত্বই ছিল না কখনও; এ শুধু সুবিধাবাদী কিছু লোকের আত্মপ্রচারের চতুর কৌশল মাত্র। তাই অতি আগ্রহে এঁরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন চিন্তার পারস্পর্যহীন সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। নিঃসন্দেহে প্রাগুক্ত পাঁচজন মনীষীর গভীর ঐক্যসূত্র ও নিবিড় সংলগ্নতা রয়েছে যার ভিত্তিতে বলা যায়, আকরণবাদ প্রশ্নাতীতভাবে বিশশতকীয় বৌদ্ধিক চিন্তার বিবর্তনে একটি বহুস্তরান্বিত মৌলিক পর্যায়ের স্মারক। সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ইতিহাসের ধারায়, অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত কারণের চাপে, বিশিষ্ট ঐ পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল এবং এইজন্যে, 'আকরণবাদী মুহূর্ত' পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই চিন্তাপ্রস্থানের গুরুত্ব খর্ব হয়নি। এর প্রবক্তারা সামাজিক ইতিহাসের অনিবার্য তাড়নায় পরবর্তীকালে নিজেদের ভাবনাকে যতই পাল্টে থাকুন না কেন, তখনকার ধ্যানধারণাগুলি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে—এমন ভেবে নেওয়াটা ভুল! আমাদের জগৎ ও জীবন সর্বতোভাবে ছোট-বড়ো, সূক্ষ্ম-স্থূল, দৃশ্য-অদৃশ্য আকরণ বা কাঠামোর সমষ্টি, তবু যে কাঠামোর মধ্যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে সন্নিবেশিত করায় অনেকে নিছক যান্ত্রিকতা খুঁজে পেয়েছেন—এর পেছনে রয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা। যে-কোনো ধরনের শেকলের সম্ভাবনাকে সবাই প্রতিহত করতে চায়, যেতে চায় মুক্তির সন্ধানে। তাই নিজেদের আকরণবাদী বলে প্রচার করতে চান খুব কম সংখ্যক চিন্তাবিদ। কিন্তু একথা অস্বীকার করা কঠিন যে, আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে কতকগুলো কাঠামোর সমাবেশে। আমাদের সংস্কৃতি, অভ্যাসের পরম্পরা কিংবা প্রতিটি শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের শাখা জুড়ে রয়েছে আকরণেরই বিন্যাস। এতে লেভিস্ট্রাউসের মূল প্রতিপাদ্য সমর্থিত হচ্ছে; তাঁর মতে মানুষের মানসিক ক্রিয়ার সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যই হল কাঠামোর সমাবেশ। আপাতদৃষ্টিতে যাকে অবিভাজ্য বলে মনে করি, গভীর বিশ্লেষণে তার মধ্যেও ধরা পড়ে ভাবকল্পের সুবিন্যস্ত কাঠামো। কোনো একক অস্তিত্বকে এই বীক্ষা অনুযায়ী আমরা জটিল এক সমগ্রের আয়তন বলে চিনে নিতে পারি। ঐ সমগ্রকে বিশ্লেষণ করে দেখি, কীভাবে তাকে গড়ে তুলেছে কিছু কিছু অন্তর্বৃত উপকরণ স্বাধীন অস্তিত্ব হিসেবে, যাদের ব্যাখ্যা করা যায় না; কোনো একটি নির্দিষ্ট বিচারপদ্ধতি বা কাঠামোর মধ্যে কীভাবে এইসব উপকরণ একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করে—সেই আন্তঃসম্পর্কের সূত্রে তাদের তাৎপর্য বিবেচ্য। কখনও কখনও কাঠামো স্পষ্টত দৃশ্যমান, যেমন প্রাণীদেহের অস্থি-সংস্থান, আর কখনও বা বিমূর্তায়িত যেমন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি।

তিন

একথা তাহলে বলা যায় যে, আকরণবাদ আমাদের শেখায় কীভাবে বিশ্লেষিতব্য বস্তুকে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করতে হয় সমগ্র হিসেবে এবং সেইসঙ্গে গুরুত্ব দিতে হয় অংশকেও। তবে সেসময় মনে রাখতে হয়, ঐসব অংশের তাৎপর্য নির্ণীত হতে পারে কেবলমাত্র সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাসে। অন্যভাবে বলা যায়, সমগ্রের সংগঠন গড়ে তুলতে টুকরো টুকরো উপকরণগুলি কতটা কার্যকরী ভূমিকা নেয়, তারই পরিমাপ করে আকরণবাদ। এদিক দিয়ে যদি দেখি, মানবিকী বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই চিন্তাপ্রস্থানের প্রধান সূত্রগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং আকরণবাদের প্রথম কাজ হল, সেইসব উপকরণের অস্তিত্ব নির্ধারণ যাদের সমবেত উপস্থিতিতে আলোচিতব্য কাঠামোটি গড়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংগঠন বিশ্লেষণ সহজসাধ্য হলেও কোথাও কোথাও অংশ ও সমগ্রের আন্তঃসম্পর্ক এতই জটিল যে তার ব্যাখ্যা নিতান্ত দুরূহ। একথা মনে রেখে জন স্টারোক এভাবে আকরণবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন : 'Statics of dynamic systems' (১৯৯৩ তেরো); কেন না এটা হল সেইসব পদ্ধতির বিশ্লেষণী পাঠ যাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অফুরন্ত গতির সম্ভাবনা, কিন্তু বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তাদের দেখাতে হয় নির্দিষ্ট সময় ও পরিসরে স্থিরীভূত একক হিসেবে। মানুষের বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছোট বড়ো আকরণের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কীভাবে স্বতঃসিদ্ধ, সেকথা স্পষ্ট চিকিৎসাবিদ্যা থেকে পদার্থবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব থেকে মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি থেকে রাজনীতি, শিল্পকলা থেকে প্রায়োগিক পরিবেশবিজ্ঞান সমস্ত ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলোচনায়। একথা মনে রাখলে আমাদের বরং মনে হয় যে তুলনামূলকভাবে আকরণবাদীদের প্রতিপত্তি ভাবনার ইতিহাসে স্বল্পস্থায়ী। মানবিকী বিদ্যার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর প্রভাব শিকড় ছড়িয়েছে; এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষাতত্ত্ব। এছাড়া আকরণবাদের ছায়া ব্যাপ্ত হয়েছে সামাজিক নৃতত্ত্ব, ইতিহাস রচনাতত্ত্ব, সাহিত্য বিশ্লেষণ এবং চিহ্নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ভাষা, মানবমন কিংবা সাহিত্যের পাঠকৃতির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আকরণবাদী মনোভঙ্গি কতটা কার্যকরী—এই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকে আবশ্যিক বলে দেখানোর চেষ্টা আকরণবাদী তাত্ত্বিকেরাও করেননি। তাঁরা এইমাত্র বলেছেন যে আরো অনেক বিকল্প দৃষ্টিকোণের মতো এও এক বিশিষ্ট বিশ্লেষণী আয়ুধ মাত্র। আলোচিত বিষয়ে আকরণের অস্তিত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই অনুযায়ী যেহেতু তাত্ত্বিকদের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে, আকরণবাদ কখনও দর্শনের মান্যতা পায়নি। কোনো কোনো সমালোচক আকরণবাদে দুধরনের অভিব্যক্তি লক্ষ করেছেন। সংকীর্ণ অর্থে আকরণবাদ হল, আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী এক বৌদ্ধিক আন্দোলন, যা বিশ শতকের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে উদ্ভূত হয়ে মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় নিজেকে বিশ্লেষণী কৃৎকৌশল হিসেবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। আর, ব্যাপকতর অর্থে আকরণবাদ হল মানবিক জিজ্ঞাসার এক বিশিষ্ট ধরন যা প্রায় সমস্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে এক সাধারণ প্রবণতা হিসেবে লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে, বাস্তবতার সঙ্গে উদ্ভাসনী সম্পর্ক পুনর্নির্ণয়ের চেষ্টা করে আকরণবাদ; এর ফলে জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য পুরোপুরি নতুন অর্থবহ হয়ে উঠবে, এই তার অন্তর্লীন প্রত্যয়। মূর্তকে বিমূর্ত করা এর উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রাথমিকভাবে যা ধারণাতীত তাকে গভীরতর প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলাই তার লক্ষ্য। তবু কেন আকরণবাদ বিস্মৃতির চোরাবালিতে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করাও পরবর্তী প্রজন্মের এক জরুরি দায়। বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের সেতু রচনা এই চিন্তাপ্রস্থানের অভিপ্রেত হলেও কেন একাজেই তা ব্যর্থ হল, তা এখন তলিয়ে ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট পর্যায়কে দিগন্তের ওপারে বিলীয়মান হতে দেখে আমরা মনে করতে পারি স্টারোকের আরেকটি মন্তব্য যেখানে তিনি আকরণবাদের স্থায়ী মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে তাকে একটি সম্ভ্রান্ত ও সুফল-প্রসূ বৌদ্ধিক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, আকরণবাদ আমাদের সমৃদ্ধ করেছে 'With an impressive intellectual tool by which to try and unify our seriously fragmented understanding of the world around us.' (তদেব ষোলো)—এই কথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। অনবরত টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া জগতের অধিবাসী হিসেবে আমরা যখন সমগ্রের উপলব্ধি দ্রুত হারিয়ে ফেলছি, সেসময় আকরণবাদ সমগ্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকরী কৃৎকৌশল হিসেবে গণ্য হতে পারে। আজও এই তার অনন্য সার্থকতা।

মধ্য ইউরোপের প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ফর্দিনান্দ দ্য সোস্যুর আকরণবাদী চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন তাঁর পৃথিবীখ্যাত গ্রন্থ 'Course in general Linguistics'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

(১৯১৫)-এর মধ্যে। তাঁর প্রভাব শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যতত্ত্বের ক্রমবিকাশে তাঁর চিন্তাধারার গুরুত্ব অপরিমেয়। সোস্যুর-এর দুটি মূল প্রশ্ন হল—'ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কী' এবং 'শব্দ ও বস্তুর প্রকৃত সম্পর্ক কী'! আমরা আগেই লিখেছি, তাঁর দুটি যুগান্তকারী পারিভাষিক প্রয়োগ হল 'Langue' এবং 'Parole' এর ধারণা। এই দুইয়ের মধ্যে তিনি মৌলিক ব্যবধান দেখিয়েছেন। একটি হল ভাষার মৌল পদ্ধতি যা কিনা সেই ভাষার প্রকৃত দৃষ্টান্ত গড়ে ওঠার আগেই বর্তমান থাকে এবং দ্বিতীয়টি হল একক উচ্চারণ। সোস্যুর-এর মতে 'Langue' হল ভাষার সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সেই বিশেষ পদ্ধতি, যাকে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই এবং ভাষার ব্যবহারকারী হিসেবে অবচেতনভাবে সেই উৎস থেকে নিরন্তর রসদ সংগ্রহ করি। অন্যদিকে 'Parole' হচ্ছে সেই পদ্ধতির একক উপলব্ধি যা ভাষার প্রকৃত দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই ব্যবধান পরবর্তী আকরণবাদী তত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক অনুশীলনে কোনো একক উচ্চারণ আলোচনার প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না; মানুষের নানা ধরনের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা পদ্ধতিই অনুশীলনের আধেয়। তার মানে, আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট কবিতা বা প্রত্নকথার বিশ্লেষণ করি, আমরা আসলে প্রয়োগের অন্তঃশায়ী বিধি-বিন্যাস আবিষ্কার করতে চাই।

ভাষার প্রাথমিক কাজ জগতের বিভিন্ন বস্তুগত অভিধার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা—সোস্যুর একথা মানতেন না। তাঁর মতে শব্দ হল মূলত চিহ্ন; লেখ্য বা কথ্য ভাষা নির্বিশেষে এই চিহ্নের একটি অংশ হল চিহ্নায়ক (Signifier) এবং অন্য অংশ হল চিহ্নায়িত (Signified)। কোনো শব্দ যখন চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কোনো চিন্তাবীজ শরীরী রূপ নিয়ে থাকে। মানুষের পৃথিবীতে নানা ধরনের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে; ভাষা তাদের অন্যতম বিশিষ্ট দিক। ভাষার মূল প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিকেরা চিহ্নবিজ্ঞানের ধারণা প্রবর্তন করেছেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞান একই তত্ত্ববিশ্বের দুটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আকরণবাদ প্রায়ই এমন কিছু কিছু পদ্ধতিকে আলোচনার বিষয় করে তোলে যাদের সঙ্গে চিহ্নায়নের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন নৃতত্ত্বের অন্তর্গত আত্মীয়তার সম্পর্ক-বিন্যাস। আধুনিক চিহ্নবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট নাম হল য়ুরি লোটম্যান, যিনি সোস্যুর প্রবর্তিত ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রচলিত আকরণবাদকে অনেকটা বিকশিত করেছিলেন। 'The analysis of the poetic text' (১৯৭২) বইটি এবিষয়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ফরাসি আকরণবাদীদের সঙ্গে লোটম্যানের তফাত রয়েছে। একদিকে তিনি যেমন আকরণবাদী ভাষাতত্ত্বের কঠোর বিধিবিন্যাস অনুসরণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন 'New criticism' অনুপ্রাণিত নিবিড় পাঠের পদ্ধতি দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, অসাহিত্যিক প্রতিবেদনের তুলনায় সাহিত্যের পাঠকৃতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এরা তুলনামূলকভাবে চিন্তাবীজে সমৃদ্ধতর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার

আকরণবাদী পাঠের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল ধ্বনিম বিশ্লেষণের সূত্রে। কোনো ভাষা ব্যবহারকারী যাকে ন্যূনতম তাৎপর্যবহ ধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকেই বলা যেতে পারে ধ্বনিম। কোনো বিশেষ ভাষায় বিভিন্ন বক্তারা অজস্র ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত ধ্বনিম নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এই আলোচনার আদল অনুসৃত হয়েছে পরবর্তীকালে বিকশিত অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যায়। যেমন ক্লদ লেভিস্ট্রাউস তাঁর সামাজিক নৃতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রত্নকথা লোকাচার আত্মীয় সম্পর্ক-বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত আলোচনা-রীতির জটিলতর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। কোনো সমাজে প্রচলিত প্রত্নকথা বা লোকাচারের উৎস কিংবা বিধি-নিষেধের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা উত্থাপিত না করে আকরণবাদী তাত্ত্বিক কোনো নির্দিষ্ট মানবিক প্রক্রিয়ায় নিহিত পার্থক্যের সূত্রগুলি সন্ধান করেন। আখ্যানমূলক প্রতিবেদনেও একইভাবে অন্তর্নিহিত আকল্পের খোঁজে আকরণবাদীর অধ্যবসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রোলাঁ বার্তের লেখক-জীবনের আদিপর্যায়ে এ ধরনের বিশ্লেষণ রীতির চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁর Mythologies, Elements of Semiology এবং Writing Degree Zero এই পর্যায়ের পরিচয় বহন করছে। বার্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বিভিন্ন বস্তু-সন্নিবেশের মধ্যে পার্থক্যমূলক সম্পর্কই সাধারণভাবে সমস্ত মানবিক প্রক্রিয়ার প্রাক্‌শর্ত। এই মুখ্য সূত্রকে তিনি কার্যত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়ায় প্রয়োগ করে চিহ্নায়নের এক নতুন তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। ভাষাগত আকল্পকে সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে বার্ত যে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, পরবর্তী তাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় তা আরো সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এটা ঠিক যে ভাষা সাহিত্যের মাধ্যম, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, সাহিত্যের আকরণ আর ভাষার আকরণ অভিন্ন। কেননা সাহিত্যিক আকরণের বিভিন্ন এককগুলি ভাষাগত আকরণের সঙ্গে একইভাবে তুলনীয় হতে পারে না।

বিখ্যাত বুলগেরীয় আখ্যান-তত্ত্ববিদ টোডোরোভ যখন সাহিত্যের সাধারণ ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে পুরোপুরি নতুন এক নন্দনের সূত্রায়ন করতে চান, তিনি আসলে সাহিত্যিক প্রক্রিয়ায় নিহিত আকরণবাদী বিধির সন্ধানই করেন। আকরণবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে; সাহিত্যিক আকরণগুলি আসলে ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ও সম্পদের প্রতি উদ্ভাসনী আলো নিক্ষেপ করতে চায়।

কারো কারো মতে, আকরণবাদী নন্দন তাই এদিক দিয়ে প্রকরণবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভাষা-বিচার থেকে অর্জিত কিছু কিছু প্রাথমিক সূত্রের ভিত্তিতে আকরণবাদী আখ্যানতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। টোডোরভ এবং আরো কয়েকজন তাত্ত্বিক যখন আখ্যানগত অন্বয় বা 'narrative syntax'এর কথা বলেন, তখন আমরা বুঝতে পারি, বাক্য গঠন ও পদান্বয়ে উদ্দেশ্য ও বিধেয়গত প্রাথমিক বিভাজনকে এঁরা কাজে লাগাতে চাইছেন। লোককথার পৃথিবীখ্যাত গবেষক ভ্লাদিমির প্রোপ অনুরূপভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুশ লোককথার তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। অতি সম্প্রতি কোনো কোনো বাঙালি লোককথাবিদ এই আকল্পের সার্থক প্রয়োগ করেছেন; কাহিনির বিচিত্র বিবরণ থেকে আখ্যানতত্ত্বে পৌঁছানোর বিপুল উদ্যমের ফলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। ক্লদ লেভিস্ট্রাউস রাজা অয়দিপৌসের বিখ্যাত প্রত্নকথাকে আকরণবাদী আকল্প অনুযায়ী যেভাবে সার্থক বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে পরবর্তী তাত্ত্বিকেরা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আখ্যানের পারম্পর্য কোনো প্রত্নকথাকে তাৎপর্যবহ করে না, আকরণ-গত আকল্পই তাৎপর্যের প্রকৃত আধার। তাঁর মতে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের কাঠামো অনুসরণ করেই আমরা মানব-মনের মৌলিক আকরণ আবিষ্কার করতে পারব। সুতরাং আকরণ কোনো যান্ত্রিক অস্তিত্ব নয়, বরং তা 'governs the way human beings shape all their institutions, artifacts and forms of knowledge' (সেলডেন ১৯৯৩ ১১১)

ভ্লাদিমির প্রোপের তত্ত্বকে পরবর্তীকালে এ. জে. গ্রাইমাস আরো সুবিন্যস্ত করেন। প্রোপ যেখানে একটিমাত্র সাহিত্য-মাধ্যমে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, গ্রাইমাস সেক্ষেত্রে বাক্য-কাঠামোর শব্দার্থবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে আখ্যান-তত্ত্ব বিষয়ে সর্বজনমান্য সূত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি প্রোপ প্রস্তাবিত সাত ধরনের ক্রিয়ার প্রেক্ষিতের বদলে মোট তিন জোড়া পারস্পরিক বৈপরীত্যের প্রস্তাব করেছেন বিষয়/বিষয়ী, প্রেরক/গ্রহীতা এবং সহায়ক/বিরোধী। তাঁর মতে এদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তিন ধরনের মৌলিক আকল্প, যা সমস্ত আখ্যানে কোনো-না-কোনোভাবে ফিরে ফিরে আসে। যেমন ক) আকাঙ্ক্ষা, সন্ধান বা লক্ষ্য (বিষয়/বিষয়ী): খ) সংযোগ (প্রেরক/গ্রহীতা) গ) সমর্থন অথবা বাধা (সহায়ক/বিরোধী)। ইউরোপীয় তাত্ত্বিক প্রাগুক্ত আকল্পগুলিকে যেমন সার্থকভাবে সফোক্লিসের 'রাজা অয়দিপৌস' নাটক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন, তেমনি ভারতীয় তাত্ত্বিকও অনায়াসে রামায়ণ বা মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান আলোচনার ক্ষেত্রে এর সার্থক প্রয়োগ করতে পারেন। প্রত্নকথা বা লোককথার কিছু কিছু আলোচনায় এধরনের প্রায়োগিক চেষ্টা হয়েছে। উপন্যাসের আখ্যান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। যাই হোক, প্রোপের বক্তব্য পুনর্বিন্যস্ত করে গ্রাইমাস অনেকটা পরিমাণে লেভিস্ট্রাউসের আকল্পের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। রুশ প্রকরণবাদে দীক্ষিত প্রোপের প্রতিতুলনায় গ্রাইমাস ঢের বেশি আকরণবাদী কেন না, তিনি বস্তুপুঞ্জের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে আগ্রহ দেখিয়েছেন, বস্তুর নিজস্ব চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামাননি। আখ্যানের সম্ভাব্য পর্যায়ক্রম নিয়ে সানুপুঙ্খ আলোচনা করে তিনি এদের তিনটি প্রধান কাঠামোয় বিন্যস্ত করেছেন : বিধিনির্ভর (contractual), কৃত্যমূলক (performative) ও বিচ্ছেদসূচক (disjunctive)। প্রথমোক্ত বিন্যাসটি সবচেয়ে কৌতূহল-জনক এটি বিধিনিয়মের প্রতিষ্ঠা বা লঙ্ঘনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আখ্যানে নিম্নোক্ত দুটি আকরণের যে-কোনো একটি ব্যবহৃত হতে পারে

ক, বিধি (বা নিষেধ) → লঙ্ঘন → শাস্তি

খ, বিধির অভাব (বিশৃঙ্খলা) → বিধি বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অয়দিপৌসের আখ্যানে প্রথম আকরণটি অনুসৃত হতে দেখি। তিনি পিতৃহত্যা ও যৌন সম্পর্ক বিষয়ে প্রচলিত বিধিকে লঙ্ঘন করেছেন এবং এর ফলে নিজের জন্যে শাস্তি ডেকে এনেছেন। তেমনি রামায়ণ-মহাভারতের বহু প্রত্নকথায় এই আকরণটি অনুসৃত হয়েছে; বিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলমের মুখ্য কথাবস্তুকেও এই আকল্প অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

টোডোরোভের বিশ্লেষণে যেন প্রোপ, গ্রাইমাস এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের সার-কথা সংকলিত হয়েছে। তাঁর মতে আখ্যানের ন্যূনতম একক হল 'বিজল্প' (proposition), যা কোনো ব্যক্তি (agent) হতে পারে কিংবা কোনো ক্রিয়া (predicate)। কোনো আখ্যানের বিজল্পমূলক কাঠামোকে খুবই বিমূর্ত ও নির্বিশেষভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। টোডোরোভ একদিকে যেমন ন্যূনতম একক নিয়ে ভেবেছেন, তেমনি অন্যদিকে আকরণের দুটি উচ্চতর স্তরের কথাও বলেছেন পর্যায়ক্রম (sequence) এবং পাঠকৃতি (text)। তাঁর মতে কয়েকটি বিজল্পের সমাবেশে গড়ে ওঠে ঐ পর্যায়ক্রম যার মৌল রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে পাঁচটি বিজল্প। এদের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ পরিস্থিতির স্থিতাবস্থায় ভাঙন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যক্ত হয়ে থাকে। এগুলি হল সাম্যাবস্থা (শান্তি) → শক্তির হস্তক্ষেপ (শত্রুর আক্রমণ) → বৈষম্য (যুদ্ধ) → শক্তিপ্রয়োগ (শত্রুর পরাজয়) → সাম্যাবস্থা (নতুনভাবে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা)। আবার, বেশ কিছু পর্যায়ক্রমের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পাঠকৃতি। টোডোরোভ বলেন, বিভিন্ন উপায়ে পর্যায়ক্রমগুলি বিন্যস্ত হতে পারে যেমন ক, কাহিনির ভেতরে কাহিনি বা কথাবস্তুর মধ্যে পরিকল্পিত বিচ্যুতি ঘটিয়ে; খ, একটি পর্যায়ক্রমের সঙ্গে আরো অনেক পর্যায়ক্রমের শৃঙ্খলিত প্রবাহ তৈরি করে; গ, একের সঙ্গে অন্যের বিকল্প সম্পর্ক তৈরি করে কিংবা এই তিনটি উপায়ের মিশ্রণে। টোডোরোভ দৃষ্টান্ত হিসেবে বোকাচ্চিয়োর ডেকামেরনের বিশ্লেষণী পাঠ উপস্থাপিত করেছেন।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন জেরার্ড জেনেট। প্রুস্তের রচনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে তিনি প্রতিবেদন (discourse) সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক বক্তব্য পেশ করেছেন। রুশ প্রকরণবাদ 'গল্প' ও 'কথাবস্তু'র মধ্যে যে-পার্থক্য তুলে ধরেছে, তাকে জেনেট আরো পরিশীলিত করেছেন। আখ্যানকে তিনি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন গল্প, প্রতিবেদন ও কথান্যাস। উদাহরণ হিসেবে ভার্জিলের ঈনিড মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের কথা বলা হয়েছে, যেখানে নায়ক ইনিয়াস কাহিনির কথক হিসেবে শ্রোতাদের সম্বোধন করেছে; এটা হল কথান্যাসের পর্যায়। এর মধ্য দিয়ে নায়ক তার বাচনিক প্রতিবেদনকে তুলে ধরেছে। তৃতীয়ত তার প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এমন কিছু ঘটনা যার মধ্যে সে নিজে বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। এটা হল রচনার গল্পাংশ। আখ্যানের এই স্তরগুলিকে যদি ঠিকমতো বুঝতে না পারি, লেখক ও কথকের যুগ্ম অবস্থান কিংবা অবস্থানগত ভিন্নতা স্পষ্ট হবে না। বিশেষত উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে আখ্যানের কথক এবং কোনো বিশিষ্ট চরিত্রের কণ্ঠস্বর পাঠকের কাছে যথাযথভাবে ধরা পড়ছে না কিংবা লেখক ও কথকের উচ্চারণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাত্রাগত পার্থক্য অস্পষ্ট হওয়াতে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের তাৎপর্য রয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' -এর কথা ভাবা যেতে পারে। আখ্যানের কোনো কোনো চরিত্র লেখকের মনোভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেছে, একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, লেখকের সচেতন ও অবচেতন অভিপ্রায়ের দ্বন্দ্ব আখ্যানে বিচিত্র উচ্চাবচতা ও কৌণিকতা তৈরি করেছে। আবার জেনেটের সূত্র অনুযায়ী বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে একদিকে লক্ষ করি লেখক ও কথকের যুগলবন্দি উচ্চারণ, আবার অন্যদিকে লেখক ও কথকের অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি।

পাঁচ

আকরণবাদ বিষয়ক আলোচনায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক হচ্ছেন রোমান য়্যাকবসন, ডেভিড লজ এবং জোনাথন কুলের। তাঁদের যৌথ অবদানে গড়ে উঠেছে আকরণবাদের সাহিত্যিক তত্ত্বরূপ। এখানে বলা প্রয়োজন আকরণবাদী ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব কিংবা চিহ্নবিজ্ঞান যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আকরণবাদ যে-ধরনের উত্তাপ ও তিক্ততার কারণ হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এর সম্পর্কে মূল আপত্তি হল, সৃষ্টিশীল পাঠকৃতির বিশ্লেষণে আকরণবাদী তত্ত্ব নিতান্ত ক্ষতিকরভাবে সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফলে আত্মপ্রকাশের চমৎকার দৃষ্টান্ত হওয়ার বদলে সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায় শুষ্ক ও নৈর্ব্যক্তিক কৃৎকৌশলের মল্লভূমি। সাধারণভাবে ব্যবহার-যোগ্য বস্তুগত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় হওয়া ছাড়াও শিল্প-সংবিদ হিসেবে সাহিত্যের যে সূক্ষ্মতর ভূমিকা রয়েছে, এই তত্ত্ব তা স্পষ্ট করতে পারে না। এই আপত্তি সম্পর্কে আকরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একথাই বলা যেতে পারে যে—আত্মবোধের বিশিষ্ট দর্পণ হয়েও সাহিত্যকে অনিবার্যভাবে একটা স্পষ্ট বস্তুগত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতেই হয় এবং কোনো সৃষ্টিশীল লেখকই তা অস্বীকার করতে পারেন না। প্রথমত লেখকের ব্যবহৃত ভাষা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং সেই ভাষার অন্তবর্তী সাহিত্যিক প্রথার কাছে লেখকের প্রাথমিক কিছু দায় থাকেই। এই বস্তুগত ভিত্তি ও উপকরণ লেখক এবং পাঠককে একটি অভিন্ন অবতলে এনে দেয়।

সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন ধারায় পাঠকৃতি ও লেখকের অসামান্যতা স্বীকৃত হলেও কিছু কিছু প্রাচীন অভ্যাসের পরম্পরায় যে সামঞ্জস্য বোধের অভাব দেখা যায়, আকরণবাদী ধ্যান-ধারণা তাকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক লেখক এবং প্রতিটি পাঠকৃতি অসামান্য নিশ্চয়, কিন্তু এই অসামান্যতা কী এবং কেন—এটা বোঝার জন্যে এদের দেখতে হবে প্রচলিত পদ্ধতি ও ধারাবাহিক প্রবাহের দর্পণে। নইলে এরা কীভাবে ও কোথায় আলাদা, তা স্পষ্ট হবে না। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট শিল্প-মাধ্যমের মধ্যে বিভিন্ন পাঠকৃতি ও লেখকেরা কতটা পরস্পর-সংলগ্ন এবং কতটা পরস্পর-ভিন্ন, আকরণবাদী সাহিত্য-পাঠ আমাদের সে-বিষয়ে অবহিত করে তোলে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোস্যুরের পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায়, পাঠকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আকরণবাদ সেই সার্বভৌম 'Langue' এর সন্ধান করে যার মধ্যে প্রতিটি একক সাহিত্যকর্ম 'Parole' হিসেবে উপস্থিত। কিন্তু আকরণবাদীরা যা-ই বলুন, তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে অনেকেই নিয়ন্ত্রণবাদের ছায়া লক্ষ করে প্রবল বিরোধিতার মনোভঙ্গি গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মতে, আকরণবাদের জয় মানে সাহিত্যে মানবতাবাদের মৃত্যু। এ সম্পর্কে আকরণবাদীদের বক্তব্য হল, তাঁরা কোনো ধরনের হ্রস্বীকরণ বা অবমূল্যায়ন বা সীমিতকরণের পক্ষপাতী নন; বরং তাঁরা আসলে একের মধ্যে বহুর উপস্থিতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা শুধু একথাই বলতে চান যে, সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন বিকল্প কৃৎকৌশল আসলে একটিমাত্র সমবায়ী পদ্ধতি গড়ে তুলছে এবং এদের মধ্যে যে-কোনো একটির মূল্য নির্ণয় করা যেতে পারে শুধুমাত্র অন্যগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচারের সূত্রে। কিন্তু এই বক্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে আকরণবাদীরা যেহেতু কখনও কখনও অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক ও খানিকটা পরিমাণে ভাববাদ সুলভ অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের সংশয় কিছুতেই কাটতে চায় না। বরং একথা হয়তো বলা যেতে পারে, আকরণবাদ মূলত আত্মগত চিন্তার জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে তোলার প্রস্তাবনাই পেশ করতে চেয়েছে।

সাহিত্যে প্রতিফলিত আকরণবাদী তত্ত্ব অতিসূক্ষ্ম পরিশীলনের দৃষ্টান্ত যা বিধি-বিন্যাসের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নিজস্ব অবস্থানে পৌঁছেছে। যে-সমস্ত নিয়ম ও প্রথা সাধারণভাবে সাহিত্যের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে, আকরণবাদীরা তাদের অনিবার্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। আকরণবাদী তাত্ত্বিকেরা আসলে বিমূর্ত কিছু বিধি ও প্রথাকে মূর্তায়িত করে তুলতে চেয়েছেন। আকরণবাদী সমালোচনায় বিভিন্ন পাঠকৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা, একমাত্র এভাবেই আমরা বুঝতে পারি, বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে কোনগুলি বিশিষ্ট রচনা-মাধ্যমের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় নন্দনতত্ত্বের আঙিনায় যার মধ্য দিয়ে সঞ্চরমান অনুপুঙ্খপুঞ্জ কীভাবে ধীরে ধীরে সাহিত্যিক সন্দর্ভে রূপান্তরিত হয়, এই সত্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়ে উঠি। এইজন্যে আকরণবাদের সঙ্গে পাঠক-কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। লেখকের কণ্ঠস্বর নানা স্তরে নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া কীভাবে পাঠকৃতিকে তাৎপর্যবহ করে তুলছে, সেই সত্য আবিষ্কার-ই পাঠকের দায়। লেখকের উচ্চারণেও থাকে অভিব্যক্তি এবং বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্যের টানাপোড়েন। সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশের অমোঘ প্রভাবে অনেক কিছু থেকে যায় অব্যক্ত, আবার পাঠকৃতির মধ্যে কিছু কিছু অবদমিত কণ্ঠস্বরও থেকে যেতে পারে।

নতুন কালের নতুন চেতনায় নিষ্ণাত পাঠক পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে এমন বীক্ষণবিন্দুতে পৌঁছে যেতে পারেন, যেখানে গিয়ে তাঁর কাছে অতিব্যক্ত উচ্চারণও গৌণ হয়ে যেতে পারে এবং আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অনতিব্যক্ত উচ্চারণও প্রাধান্য অর্জন করতে পারে। আখ্যানের অন্তর্বর্তী কাঠামোর পরম্পরা তখন পুরোপুরি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং অনালোকিত অংশও অর্জন করে নেয় নবীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উজ্জ্বলতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' পুনঃপাঠ করে কুন্দনন্দিনীর অবদমিত উচ্চারণকে আমরা কেন্দ্রীয় আকল্প বলে পুনরাবিষ্কার করতে পারি। কিংবা বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসে অতি উদ্ভাসিত ভবানী বাঁড়ুয্যের তুলনায় প্রান্তিকায়িত নালু পালের জীবন-কাঠামোকে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝে নিতে পারি। এধরনের দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যায়। প্রসঙ্গত ফ্রেডরিক জেমসন-এর একটি সুচিন্তিত মন্তব্য স্মরণ করতে পারি 'The most characteristic feature of structuralist criticism lies precisely in a kind of transformation of form into content.'(১৯৭২ ১৯৮)।

আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, কোনো পাঠকৃতির তাৎপর্য খুঁজতে হবে পাঠকৃতিরই গভীরে—বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্রের আন্তঃসম্পর্ক বিচার করে। এক্ষেত্রে একটা সমস্যা অবশ্য দাঁড়িয়ে যায়। পড়ার প্রক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত বেশি আত্মগত অর্থাৎ বিষয়ী-নির্ভর হয় যে বস্তুগত বিশ্লেষণের বদলে 'নিজস্ব' তাৎপর্য প্রবল হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত হয়েও থাকে। পাঠকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও যে-সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক তথ্য স্বতন্ত্র থেকে যায়, মূল পাঠকৃতির ওপর তাদের ছায়া সূক্ষ্ম ও অমোঘ হয়ে ওঠে। ফলে সাহিত্যিক প্রতিবেদনের মূল্য পাঠকৃতির অন্তর্বৃত উপকরণ ও কাঠামোর সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে গেলেও বহিঃপৃথিবীর উপস্থিতিকে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার ওপর রয়ে গেছে আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তুর তুলনামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে বহু পুরোনো সংশয় ও প্রশ্নের অবকাশও। প্রকরণবাদীরা সাহিত্যে অন্তর্বস্তুর গুরুত্বকে খুবই লঘু করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে সাহিত্যের অন্তর্বস্তু কেবলমাত্র আঙ্গিকের প্রয়োজনেই থাকে। এ ধরনের চিন্তা প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বলেই আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ক্রমশ বিবর্তিত হলো। এই চিন্তা-প্রস্থানের দুটি মৌলিক দিক হলো, অংশের সঙ্গে সমগ্রের সংযোজন এবং গতিময়তা সম্পর্কিত ধারণা। কোনো পাঠকৃতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সমগ্রের আকল্প স্পষ্ট না হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে টুকরো-টুকরো কাঠামোর সমবায়ে সমগ্রের গড়ে-ওঠা প্রমাণিত না-হচ্ছে—অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো শিল্প-সার্থকতা নেই। এর ওপর রয়েছে অন্তঃশীল গতির প্রবাহ; বলা বাহুল্য, অংশের বিন্যাসে যত মুন্সিয়ানা-ই থাক, লক্ষ্যাভিমুখী গতির মধ্য দিয়ে গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত সাহিত্যিক উপযোগিতা প্রমাণিত হয় না। বিশ্লেষণী পাঠের পদ্ধতি হিসেবে আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব একারণেই বিশিষ্ট যে, তা তাৎপর্য সন্ধানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াত্মক প্রয়োগকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট পাঠকৃতিতে কেন কিছু কিছু বিশেষ উপাদান বেশি গুরুত্বকূর্ণ বিবেচিত হয় আবার অন্য আরেক পাঠকৃতিতে আরেক ধরনের উপকরণ বেশি প্রাধান্য পেয়ে যায়—পাঠক এই প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে পারেন না। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া তাৎপর্যমণ্ডিত হতে পারে আবার অন্যত্র তা-ই তাৎপর্যশূন্য বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি না হত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র অন্তর্বৃত আকরণগুলি অভিন্ন দ্যোতনা বহন করত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছয়

আকরণবাদী সাহিত্য-পাঠে প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত প্রতিটি উপকরণই কোনো-না-কোনোভাবে পর্যায়ক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সেইজন্যে তাৎপর্যবাহী। কিন্তু পাঠকৃতি যেখানে দীর্ঘায়িত এবং জটিল গ্রন্থিযুক্ত, সেখানে এধরনের পাঠ কতদূর কার্যকরী হতে পারে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়ে পারে না। গ্রাইমাসের মতো পদ্ধতি যদি ব্যবহার করি, আকরণবাদী পাঠ খানিকটা গাণিতিক ও দূরান্বয়ী বলে মনে হয়। আসলে আকরণবাদের মূল উদ্দেশ্য হল, শাখা-প্রশাখায় প্রলম্বিত আখ্যানের মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলার ক্রম আবিষ্কার করে তার সূক্ষ্ম ও অন্তর্বৃত স্নায়ুতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেই সঙ্গে এটাও দেখানো যে, চিন্তাকে যত বিমূর্তই মনে করি না কেন, তাদেরকে আকরণের মধ্যে বিন্যস্ত করা সম্ভব। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ অধ্যায়ন বা মার্কসবাদী পাঠ বা আদিকল্পাশ্রয়ী অধয়নের মতো বিভিন্ন ধারাকেও আকরণবাদের ছায়ায় আরো বেশি তাৎপর্যবহ করে তোলা সম্ভব। এদিক দিয়ে যদি দেখি, আকরণবাদী পাঠের মূল শক্তি হয়ে ওঠে সংশ্লেষণী প্রবণতা। সেই সূত্রে বলা যায়, কোনো একজন সমালোচকের কাছে, এমন কি একটিমাত্র পাঠকৃতিরও, সম্পূর্ণ আকরণবাদী পাঠ প্রত্যাশা করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না। অর্থাৎ একাধিক উৎস থেকে উৎসারিত স্রোতধারা নানাখাতে প্রবাহিত হয়ে আকরণবাদী মোহনায় গিয়ে সার্থকতা লাভ করতে পারে। আমাদের শুধু মনে রাখতে হয় এই কথা, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হোক বা না হোক, পাঠকৃতির প্রতিটি অনুপুঙ্খই আমাদের মনোযোগ দাবি করে। রোলাঁ বার্ত-এর মতে আকরণবাদের মূল কথা হলো, পাঠকৃতিতে প্রতিটি অনুপুঙ্খই চিহ্নায়ক। এ বিষয়ে বার্ত-এর নিম্নোক্ত মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য 'In the order of discourse what is noted is, by definition, notable; even when a detail may seem irreducibly insignificant and alien to all function; it will still in the end mean absurdity or uselessness itself; either everything has meaning or nothing does.' (১৯৭২ ৫০)। এই মন্তব্যের নিহিতার্থ হল, মানুষের চেতনা- শৃঙ্খলের সঙ্গে সমন্বিত হওয়াতে পাঠকৃতির প্রতিটি পর্যায়ই অনন্ত তাৎপর্যের সম্ভাবনা যুক্ত অর্থাৎ পাঠকের তাত্ত্বিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী একই পাঠকৃতি থেকে বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বার্তের পৃথিবী-বিখ্যাত গ্রন্থ 'S/Z' এর কথা বলা যেতে পারে। এতে বালজাকের একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস বিশ্লেষিত হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব থেকে বই-এর নামকরণের সূত্র গ্রহণ করে বার্ত আখ্যানের ভেতরে উচ্চারিত ও অনুচ্চার সত্যের কৌণিকতাময় সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পাঠকৃতির বিভিন্ন স্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে তার বিচিত্র ভাষ্য রচনার সম্ভাবনা; উচ্চারিত সত্য আর নিরুচ্চার বার্তা কত ধরনের ধূপছায়া অঞ্চল তৈরি করে প্রতিবেদনে, এটা বোঝার জন্যে বিভিন্ন আকরণের আন্তঃসম্পর্ক পরিমাপ করা প্রয়োজন।

গ্রাইমাসের আকরণবাদী পাঠ থেকে বহুতাৎপর্যবাহী পাঠ স্বভাবত আলাদা। কিন্তু দুটোই যে আকরণবাদের ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছে, এটা লক্ষণীয়। এই সূত্রে ক্রমশ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিকশিত হচ্ছে আকরণোত্তরবাদ এবং পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব। পাঠকৃতিতে নিহিত সত্য একান্তিক নয়, অনেকান্তিক; এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে-পৌঁছাতে আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নিঃশব্দে আমূল বদলে গেছে। এই বিবর্তন অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি, তাৎপর্য বিশ্লেষণে চূড়ান্ত বিন্দু বলে কিছু নেই। আপাতদৃষ্টিতে জগতের বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করি, জগৎ গড়ে ওঠে সম্পর্কের বিচিত্র বিন্যাসে। বস্তুত আকরণবাদের প্রথম কথা হল, বস্তুবিশ্ব বলে যাকে জানি তা আসলে আমাদের চিন্তার দর্পণে প্রতিফলিত তত্ত্ববিশ্ব। সেইজন্যে বস্তুজগতের সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক বীক্ষা অসম্ভব; পর্যবেক্ষক তাঁর নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী জগৎ ও জগতের অন্তর্বর্তী সম্পর্কগুলিকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে পুনর্নির্মাণ করে নিচ্ছেন। পর্যবেক্ষক ও তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয়ের মধ্যে দ্বিবাচনিক সম্পর্কই অনবরত চিন্তায় আকরণ তৈরি করে; স্বভাবত ভাষাতত্ত্ব নির্দেশিত বাচনিক কাঠামোর সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং বাস্তবতা আসলে নিছক বস্তুর মধ্যে নিবদ্ধ নয়; বাস্তবতার প্রতীতি বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যাকে দেখি, দেখতে-দেখতে নিজের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাকে কিছু-না-কিছু পরিমাণে গড়ে তুলি। এভাবে যা গড়ে ওঠে, তার বাইরে কোনো আলাদা বাস্তব নেই কিংবা তাৎপর্যও নেই। অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ককে আগে আমরা নির্মাণ করি এবং তারপর সেই নির্মিত আন্তঃসম্পর্কের কাঠামোকে পর্যবেক্ষণ করি। সুতরাং কোনো যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে প্রতিটি অনুপুঙ্খের 'নিজস্ব' কোনো তাৎপর্য নেই। বরং তার তাৎপর্য নির্ধারিত হয় বিভিন্ন অনুপুঙ্খের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের সূত্রে। কোনো অভিজ্ঞতা বা সত্তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে নির্দিষ্ট কাঠামোর সংহত অংশ হিসেবে বুঝতে পারছি। তাই আকরণবাদী চিন্তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানবিক ক্রিয়া, পর্যবেক্ষণ, অবস্থানের স্থায়ী আকরণে পৌঁছানো যা-থেকে প্রতিটি অনুপুঙ্খ, প্রতিটি উপকরণ তাদের মৌল প্রকৃতি অর্জন করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে ফ্রেডরিক জেমসন বর্ণনা করেছেন এভাবে 'an explicit search for the permanent structures of the mind itself. The organizational categories and forms through which the mind is able to experience the world, or to organize a meaning in what is essentially in itself meaningless. (১৯৭২ ১০৯)

সুতরাং আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব পাঠকৃতিকে জগৎ ও জীবনের সেই উচ্চারণ-শৃঙ্খলা হিসেবে আমাদের দেখতে শেখায় যাকে যতবার পুনঃপাঠ করি ততবারই নতুন তাৎপর্যে আবিষ্কার করি। বলা ভালো, এই আবিষ্কার আসলে পুনরাবিষ্কার! জগৎ ও জীবনের নতুন ভাষা ও ভাষা প্রতিষ্ঠা। আকরণবাদী নন্দন আমাদের বুঝিয়ে দেয়, আমরা যেভাবে জগৎকে বাঙময় করে তুলি, ঠিক সেভাবেই নির্ধারিত হয় বাস্তব আর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রতিবেদনের সত্য। তাই শুধুমাত্র বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হলে চলে না, অন্তর্বস্তু কোন প্রক্রিয়ায় সাকার হয়ে উঠছে আর অংশ চিহ্নায়ক হিসেবে সমগ্রের মধ্যে বিন্যস্ত হয়ে তাৎপর্যবহনক্ষম চিহ্নায়ন-পদ্ধতিকে অনিবার্য করে তুলছে —সেবিষয়ে অবহিত হওয়াই বেশি জরুরি। আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব এই কাজটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে; অনুপস্থিতকে সমন্বিত করে উপস্থিতের সঙ্গে। আর, ঘটনা ও সম্ভাবনা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি সংহত হয়ে ওঠে অভিন্ন সমগ্রতার উপলব্ধিতে! আকরণবাদী নন্দনের ভূমিকা কী, এ সম্পর্কে প্রখ্যাত তাত্ত্বিক জোনাথন কুলের এই সহজ সূত্র দিয়েছেন 'to make as explicit as possible what is implicitly known' (১৯৯৪ ২৫৮)! আগেই লিখেছি, আকরণবাদের সঙ্গে পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। কুলের যেমন বলেছেন, 'এ হল পাঠাভ্যাসের তত্ত্ব' (তদেব ২৫৯) প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে বার্তের সেই বিখ্যাত মন্তব্য পাঠকৃতি হল পেঁয়াজের মতো, খোসার পরে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু কাঠামোর স্মৃতি! প্রতিবেদনের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্যবোধের সূত্র খুঁজে পেতে আকরণবাদ আমাদের সাহায্য করে। মনে রাখতে হয় শুধু একথা যে, পাঠকৃতিতে অন্তর্বস্তু দুভাবে প্রতিভাত হয় প্রকাশ্য (manifest) এবং প্রচ্ছন্ন (latent); আর, এটাও ঠিক যে, এমন কোনো একক আকরণবাদী সূত্র নেই যাকে সব-খোলো-চাবির মতো প্রয়োগ করে স্বতশ্চলভাবে কোনো পাঠকৃতির পর্যায়ক্রম বা কাঠামো আবিষ্কার করা সম্ভব।

বার্তের মতে পাঠকৃতি হল 'a construction of layers (or levels or systems) whose body contains finally no heart, no kernel, no secret, no irreducible principle, nothing except the infinity of its own surfaces.' (1971 10) আবার সেই সঙ্গে Writing Degree Zero বইতে তিনি এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন 'What is at stake in structural analysis is not the truth of the text but its plurality' (1967 155)। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আসল দায়ভার এসে বর্তায় সংবেদনশীল পাঠকের ওপরে। এ বিষয়ে কুলেরের চমৎকার বক্তব্য অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রধান ও অপ্রধান, বাদী ও সম্বাদী, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন, বহির্বৃত ও অন্তর্বৃত কাঠামোর দ্বিবাচনিক আন্তঃসম্পর্ক দিয়ে কীভাবে গড়ে উঠেছে পাঠকৃতির বয়ান—এটা লক্ষ করাই পাঠকের দায়। তাই 'To read is to participate in the play of the text, to locate zones of resistance and transparency, to isolate forms and determine their content are then to treat that content in turn as a form with its own content, to follow, in short the interplay of surface and envelop.' (প্রাগুক্ত ২৫৯)। এইজন্যে আকরণবাদী নন্দনের আলোয় পাঠক হয়ে ওঠেন লেখকের সহযোগী সত্তা; লেখক-প্রস্তাবিত সন্দর্ভকে আদি-পাঠ হিসেবে গণ্য করে পাঠক তার আকরণগুলিকে এবং আকরণসমূহের আন্তঃসম্পর্ককে বিনির্মাণ করেন। তখন, ঐ প্রক্রিয়ায় তাঁর ভূমিকা সক্রিয় পর্যবেক্ষকের। এইসব আকরণের বিন্যাসে যান্ত্রিক জ্যামিতি নেই কেবল, আছে ছন্দের লাবণ্যও; তার মানে, পড়াও আসলে ছন্দের নির্মিতি এই ছন্দের উৎস আকরণের সূক্ষ্ম ও ধারাবাহিক অভিব্যক্তির প্রতীতি। তাহলে আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বের লক্ষ্য হল, পাঠকের আনন্দানুভূতির ভিত্তিতে নব্য নন্দনের বিকাশ। এ সম্পর্কে বার্তের 'The Pleasure of the Text' বইটি আমাদের খুব কাজে লাগে। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য থেকে শৃঙ্খলা ও সুমিতিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবয়বশূন্য বস্তুপুঞ্জ থেকে ছন্দোময় অবয়বে পৌঁছানোয় এই সাহিত্যতত্ত্বের নির্যাসও ব্যক্ত হচ্ছে। একদিকে বৌদ্ধিক এবং অন্যদিকে নৈতিক দায় তাকে বইতে হয় প্রয়োগের প্রতিটি স্তরে।

সবশেষে স্মরণ করতে পারি জোনাথন কুলেরের প্রজ্ঞাদীপ্ত মন্তব্য 'We read and understand ourselves as we follow the operations of our understanding and more important, as we experience the limits of that understanding. To know oneself is to study the intersubjective processes of articulation and interpretation by which we emerge as part of a world. He who does not write...he who does not actively take up and work upon this system–is himself 'written' by the system. He becomes the product of a culture which eludes him.' (প্রাগুক্ত ২৬৪)। এই মন্তব্যের মধ্যে সামাজিক প্রতিবেদনের অর্থবহ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় পড়ুয়ার সক্রিয় ও অনিবার্য যোগদান যেমন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তেমনি একটি সংকেতও আভাসিত হচ্ছে যে ঐ প্রক্রিয়া যেন পড়ুয়াকে গ্রাস না করতে পারে। তার মানে, প্রকৃত পাঠক কখনো কোনো পদ্ধতির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন না। প্রতিবাদী না হোক, অন্তত প্রশ্নময় অবস্থান তিনি অটুট রাখবেন আকরণবাদী প্রক্রিয়ায় তাঁর নির্লিপ্ত উপস্থিতি দিয়ে। এইজন্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হল পরিপ্রেক্ষিতের বোধ আর চলিষ্ণুতার প্রত্যয়! সম্ভবত একারণেই ঐতিহাসিক ও যৌক্তিকভাবে অবশ্যম্ভাবী ছিল আকরণবাদের বিবর্তন এবং আকরণোত্তরবাদে তার ক্রমিক প্রয়াণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকরণোত্তরবাদ

চিন্তা প্রবহমান। স্তরে-স্তরে পর্যায়ে-পর্যায়ে চেতনা সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নানা তরঙ্গাভিঘাত চিন্তা-চেতনাকে অহরহ আলোড়িত করছে। প্রচ্ছন্নভাবে ও প্রকাশ্যে কত ভাঙচুর হচ্ছে মানুষের অভ্যাসে, উপলব্ধিতে। তত্ত্ববিশ্ব এক বিন্দুতে স্থির থাকে না। তবে পরিবর্তনের সমস্ত চিহ্ন একসঙ্গে প্রকটও হয় না। কখনও কখনও তার গতি স্তিমিত, আর কখনও কখনও দ্রুত লয়ে বেজে ওঠে রূপান্তরের বার্তা। আকরণবাদের পাঁজর থেকে আকরণোত্তরবাদের জন্মও এমনি এক ঘটনা যার প্রতিক্রিয়া দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছে! এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সমকালীন ইউরোপীয় ইতিহাসের টালমাটাল পাঠ। ১৯৬৮ সালে পারী শহরের ছাত্রযুব মহাবিক্ষোভ যেন এক জল-বিভাজন রেখা যার পরে প্রতীচ্যের তত্ত্বচিন্তা নতুন ধারায় বইতে শুরু করেছে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন আকরণোত্তরবাদী ভাবনার প্রয়োগ লক্ষ করি, মনে হয়, চিন্তাপ্রকরণে ভাষাতাত্ত্বিক আকল্পের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে এবং তুলনামূলক ভাবে সাহিত্যগত আকল্প বেশি কাঙ্ক্ষিত বিবেচিত হচ্ছে। আকরণবাদী ভাবনায় সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক আকল্প ছিল ভিত্তিভূমি; জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও তথ্য-সন্নিবেশের প্রাথমিকতা স্বীকৃত হয়েছিল। 'চিহ্নায়িত' বর্গের ওপর তা যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে, পরবর্তী আলোচকদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে এর অনেকখানি অস্বীকৃত হয়ে যায়। ফলে সাধারণভাবে সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে পাঠকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। ফুকো, লাকাঁ, আলত্যুসের এবং দেরিদার তত্ত্ববিশ্বে এই রূপান্তরের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

একটি কথা অবশ্য গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো। আকরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আকরণোত্তরবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানোর জন্যে ফরাসি চিন্তাবিদেরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে নিয়েছিলেন, এমন কিন্তু নয়। আকরণবাদী ভাববৃত্ত অনুযায়ী দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের আধেয়কে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যখন পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছিল, এর অপূর্ণতা সম্পর্কে ক্রমশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলেন তাঁরা। আকরণবাদের সমালোচনা উপস্থাপিত করে চিন্তাবিদেরা তাকে আরো পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী করে তুলতে চাইলেন। এভাবে তাঁরা আকরণবাদের সীমারেখা পেরিয়ে গিয়ে এমন এক বিপুল সম্ভাবনার ইশারা দেখতে পেলেন, যাকে নতুন অভিধা না দিয়ে উপায় নেই। আকরণোত্তরবাদকে তাই বলা যেতে পারে একটি অভিন্ন তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের পরস্পর-ভিন্ন অথচ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত দৃষ্টিকোণ। মূলত এই সমস্যা সত্তা ও ভাষার সম্পর্ক নিয়ে। এই সম্পর্ক অবশ্য আকরণবাদেরও লক্ষ্য। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিন্তাপ্রকরণে নমনীয়তার অভাব ছিল বলে এবং তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার জন্যে সত্তা ও ভাষার সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ক্রমপ্রসারিত সম্ভাবনার দিগন্তকে আকরণবাদী ব্যাখ্যায় পুরোপুরি ধরা যায়নি। বস্তুত কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের কাঠামো দিয়েও ঐ ঘটমানতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আকরণবাদের সঙ্গে আকরণোত্তরবাদী ভাবনার বড়ো তফাত হয়ে যায় এখানেই। চিন্তার বহুত্ব দিয়ে অস্তিত্ব ও উচ্চারণের অনেকান্তিকতাকে পরবর্তী চিন্তাবিদেরা বহুলাংশে স্পষ্ট করতে পেরেছেন।

আকরণোত্তরবাদে দুটি বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমত, 'বিষয়ী' বা মানবচৈতন্য যদি বিশ্লেষণের 'বিষয়' হয়ে ওঠে, তাহলে এই বিষয়ী নিজেই জ্ঞাতা বা পর্যবেক্ষক হয় কীভাবে? দ্বিতীয়ত, আকরণবাদী পূর্বানুমান অনুযায়ী জগৎ ও সত্তার জ্ঞান শেষ পর্যন্ত ভাষাভিমুখী (এটা প্রযোজ্য মানবিকী বিদ্যার যে-কোনো শাখা নির্বিশেষে অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য) এবং এটা স্বাভাবিকও হতে পারে কিংবা নির্মিতও হতে পারে (গণিতের মতো)। কিন্তু সেক্ষেত্রে আত্মবোধের প্রয়োজনে, ভাষাকে কীভাবে প্রয়োগ-সিদ্ধ করা সম্ভব, এই হল আকরণোত্তরবাদীদের সংশয়। ভাষা যেহেতু জ্ঞানের আধার, তাকে আধেয় হিসেবে কীভাবে দেখা সম্ভব? তাঁদের বক্তব্য, বহির্বৃত দৃষ্টিকোণ থেকে আধারের পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। তাঁরা আরো বলেছেন যে, সোস্যুর যখন চিহ্নকে 'চিহ্নায়ক' ও 'চিহ্নায়িত'-এর সমষ্টি বলে নির্দেশ করেছেন—তখনই এইসব সংশয়িত জিজ্ঞাসার বীজাধান ঘটে গেছে। কোনো চিহ্নায়ক যখন বিশিষ্ট ধারণাকে প্রকাশ করে, এই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা আরো শব্দ, আরো চিহ্নায়কের পরম্পরা তৈরি করে ফেলি। ভাষা সার্থক হতে পারে প্রায়োগিক পদ্ধতির মধ্যে; তার মানে, সামূহিক প্রণালীবদ্ধ প্রকরণে যখন কোনো বিশিষ্ট শব্দ বিন্যস্ত ও অন্বিত হয়, তখনই তা তাৎপর্যবহ হতে পারে। তাহলে চিহ্নায়কের পরম্পরা যত তৈরি হতে থাকবে, তাৎপর্যের সম্ভাবনাও বাড়তে থাকবে। ভাষা এইজন্যে অনন্ত এবং, জগৎ পরিক্রমার পরে, ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে সুরের সমে ফিরে আসার মতো, ভাষা নিজের প্রতি তর্জনি সংকেত করে। এভাবে তৈরি হয় স্থিতি ও গতির দ্বিবাচনিকতা। ভাষা আছে এবং ভাষা থাকতে পারে কেবলমাত্র বয়নের মধ্যে। বয়ন-নিরপেক্ষ কোনো ভাষা নেই, বিস্তার-নিরপেক্ষ কোনো সুর নেই। এই বয়ন মানে প্রতিবেদন অর্থাৎ পাঠকৃতি। ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কোনো জ্ঞাতব্য বাস্তবতা নেই কোথাও। এই ভাষাকে জানি তার প্রকাশে, তার সন্দর্ভে; এই হল আকরণোত্তরবাদী ভাবনার প্রধান বক্তব্য।

আকরণবাদকে যেহেতু বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কোনো-না-কোনো স্তরে সত্যকে স্বয়ংপ্রকাশ হতেই হবে। কতখানি গেলে চোরাবালি, কতখানি গেলে জল—মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে স্তর থেকে স্তরান্তরে পৌঁছাচ্ছেন যাঁরা, এই প্রশ্ন জাগবেই তাঁদের মনে। ভাষা বলি কিংবা মানসিক কাঠামো, সত্যের আশ্রয় এবং লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র এরাই হয়ে থাকে, তবুও সর্বদা তথ্যের বিস্তারে এদের পরীক্ষা এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে। বস্তুত এখানে তার শক্তি এবং দুর্বলতা যুগপৎ ব্যক্ত হচ্ছে। আকরণোত্তর চিন্তা অনুযায়ী আকরণবাদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামো ও সংকেত কোনো ধরনের 'বিশেষ' মর্যাদার দাবিদার হতে পারে না যেহেতু এই সবই তো ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্মিতি। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এতে নতুন নতুন তাৎপর্য ও মাত্রা যুক্ত হয়। বহমান জল কখনও বুদ্বুদ তৈরি করে, কখনও আবর্ত; কখনও ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত, কখনও হ্রদের মতো স্থির। সব কিন্তু একই জলের নানা রূপ, নানা বিভঙ্গ! তেমনি ভাষার নির্মিতিও নানাভাবে নানা মাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বাস্তবের প্রতিফলন নিশ্চয় তবু ঐ প্রতিফলনকে 'বাস্তব' মনে করারও কারণ নেই। রোলাঁ বার্তের চিরস্মরণীয় শব্দবন্ধ অনুযায়ী ভাষার নির্মাণ আসলে ছায়ারও ছায়া। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুভূতি-লব্ধ বিশ্লেষণই তাৎপর্যের আকর; যেহেতু ভাষা ঐ বিশ্লেষণের আধার ও আধেয়, বাচনিক আকরণের বাইরে কোনো তাৎপর্য নেই এবং হতেও পারে না।

দুই

আকরণোত্তরবাদী ভাবনায় জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জিত হবে পারে কেবলমাত্র মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কাদের মধ্যে ঘটে এই মিথষ্ক্রিয়া? একদিকে রয়েছে মূলত অন্তর্বস্তুশূন্য এক প্রাথমিক অস্মিতার উপলব্ধি এবং অন্যদিকে সত্তা বা অহং এর উদ্ভাবক পরাভাষা (বা সামূহিক বাচন) যা তার ব্যবহারকারীদের ওপর নির্ভরশীল নয়। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, আমরা যাকে জানি বলে মনে করি, ভাষা আসলে তাকেই প্রকাশ করে। তার মানে, ভাষার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ও স্বাধীন কোনো জ্ঞান নেই যাকে প্রকাশ করার জন্যে আমাদের ভাষা মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। এখানেই জ্ঞাতার অস্মিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সাহিত্যতাত্ত্বিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন পাঠকৃতি বিশ্লেষণ করতে চান, কার্যত তিনি সীমিত পরিসরে থেকেও অনন্ত সম্ভাবনার সঙ্গে গ্রন্থি রচনা করেন। ফলে আকরণোত্তর চেতনায় সত্য কোনো নির্দিষ্ট, গণ্ডিবদ্ধ আয়তন নয়, সংশয় থেকে সংহতির দিকে যাত্রায় নেই কোনো পূর্বনির্ধারিত আকল্পের বাধ্যবাধকতা। এমন কি দার্শনিকও এই পর্যায়ে 'privileged access to truth' দাবি করতে পারেন না। সত্য যেন পরিবর্তনশীল স্রোতের অনুভব

পথ ও পাথেয়ের মতো দৃষ্টির বহুত্ব স্বীকৃত যেহেতু অনেকার্থ-দ্যোতনা আর বহুস্বরসঙ্গতির জন্যে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকা এবং অস্মিতা ও বস্তুবিশ্বের সম্পর্কে নিরন্তর পুনর্বিন্যাস গড়ে তোলা এই পর্যায়ের প্রধান কথা। আকরণবাদের সঙ্গে আকরণোত্তরবাদের সবচেয়ে জোরালো এবং স্পষ্ট সম্বন্ধ-সূত্র দেখতে পাই সত্তাবিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে। দুপক্ষই মনে করে যে, সত্তা (বিষয়ী, মন, অহং, জ্ঞাতা) কোনো কার্টেজীয় অস্তিত্ব নয়; তাকে সংগঠিত করে তুলতে হয়! আর, এই সংগঠন মূলত ঘটে ভাষার সাহায্যে। সাধারণভাবে বলা যায়, আকরণবাদ মূলত মানবিক ধীমত্তার তত্ত্ব; এই 'ধী'র মধ্যে অন্তর্বৃত রয়েছে যুক্তি, উপলব্ধি, জ্ঞাতৃত্ব, চিন্তা। ফলে শেষ পর্যন্ত এই তত্ত্ব হয়ে ওঠে ইতিহাস-নিরপেক্ষ ('Synchronic') যার আকরণগুলি কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত নয়, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সম্পর্কিত। সময় এখানে বীজগণিতের সূত্রের মতো ক্রমক্ষীয়মান। কাঠামোগত ও প্রায়োগিক সাদৃশ্য এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য; যেমন দেখা যায় সমস্ত ধরনের আখ্যান এবং কবিতার বিশ্লেষণী পাঠে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এসব ক্ষেত্রে বিন্যাসক্রমের কোনো নিয়ন্তা ভূমিকা স্বীকৃত হয় না। আবার, সেইসঙ্গে ধীমত্তার অন্তর্বস্তুকে সত্তার সমান পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে তোলা হয়। ভাষা ও সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত হয় ঐ অন্তর্বস্তু এবং ফলে আকরণবাদের সঙ্গে দার্শনিক নিয়ন্ত্রণবাদের একটি গোপন সম্পর্কও তৈরি হয়ে যায়। তবু, সব মিলিয়ে, আকরণবাদের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি এখানেই যে, মানব-অস্তিত্বের কোষে কোষে সময়ের মাত্রা কত গভীরভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে—এ সম্পর্কে মীমাংসায় পৌঁছাতে তা আমাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারে না।

উল্টোদিকে, আকরণোত্তরবাদ ভাষা ও সত্তার তত্ত্বে সময়ের মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এইজন্যে তাই ধীমত্তার বদলে আকাঙ্ক্ষা প্রাথমিক বলে ঘোষিত হয়েছে। যেহেতু আকাঙ্ক্ষা অস্মিতার সূচক, অস্মিতা আর নিছক গ্রহীতা থাকছে না, হয়ে উঠছে নিজস্ব প্রেক্ষিত এবং সন্দর্ভের জনয়িতাও। বিষয়ী বা অহং যখন সংগঠিত হচ্ছে, তা হতে পারছে সময়েরই আবহে। তখন একে আর নিছক উৎপাদিত বস্তু বলা যাচ্ছে না, মূলত তা হয়ে উঠছে অস্তিত্বের প্রক্রিয়া। জাক দেরিদাও লক্ষ করেছিলেন যে আকরণবাদ 'Conceptualization of intensity or force' [Writing and Difference 27] হতে দেয় না। উপলব্ধির নিবিড়তা ও শক্তির সন্ধানে যেতে হল তাই আকরণোত্তর ভাবনাকে। তাত্ত্বিক বয়ানের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল ঘটল, এর কারণ, নতুন প্রেক্ষিত ও নতুন পাঠ সহ সময়ের নতুন বোধ জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া এই পর্যায়ের প্রধান অবদান। মানবিক বৃত্তি ও প্রকরণে সঞ্চালক উত্তাপ যুক্ত করার জন্যে মৌল মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে আকরণোত্তর চেতনা প্রাধান্য দিয়েছে বলে মানবপ্রকাশের নানা ক্ষেত্রে এর প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। বিভিন্ন উৎস-জাত প্রতিবেদনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের ভাববিশ্ব এই পর্যায়ে যথার্থই বহুবাচনিক। ফুকো-লাকাঁ-আলতুস্যের-দেরিদা-বার্ত প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে চেতনার সীমান্তকে পাল্টে দিয়েছেন। অন্তর্বয়নের সমৃদ্ধিতে সময় এবং পরিসরের উপলব্ধি আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সাহিত্যতত্ত্ব এবং পাঠকৃতির বিশ্লেষণ এরই নিগূঢ় অভিঘাতে এখন অভূতপূর্ব সম্ভাবনায় স্পন্দিত হচ্ছে।

আকাঙ্ক্ষা এবং সৃজনী উদ্যমের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য লেখক এবং পাঠকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত পুরোনো দার্শনিক প্রশ্ন আবার দেখা দিয়েছে। লেখকের মৃত্যু এবং পাঠকের জন্ম বিষয়ে বিখ্যাত তাত্ত্বিক বক্তব্য মনে রেখেও সংশয় পুরোপুরি কাটেনি। লেখক সার্বভৌম নন আর; ঠিক, কিন্তু পাঠককে কি অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে? অর্থাৎ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পর্যবসিত হচ্ছে কিনা, এটা দেখা, বোঝা ও বিচারের জন্যে কোনো পরিসর থাকছে কি কোথাও? আকরণোত্তর ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণবাদ কিন্তু পুরোপুরি বিবদমান প্রতিপক্ষ নয়। এক ধরনের নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিসর সম্পর্কে সচেতনতা এই ভাবনায় রয়েছে। বস্তুত আর্ট বারম্যান (১৯৮৮ ১৭৫-এর মতে, পরিসর '(space) is the primary metaphor of poststructuralism in which desire has limited free (unconstricted) room to operate.'। এব্যাপারে অবশ্য ইউরোপীয় ও মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তত্ত্ববিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। নিজের পাঠকৃতি স্বাধীনভাবে গড়তে গিয়ে পাঠক যখন লেখকের বয়নে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে অবদমিত ও নিরুচ্চার কিংবা প্রায়-নিরুচ্চার কণ্ঠস্বর পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ করতে চান—তখনই অবধারিতভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রাগুক্ত মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিসর। তার ওপর রয়েছে পাঠকের ভাবাদর্শগত অবস্থান; ইতিবাচক ও নেতিবাচক, উপস্থিত বা অনুপস্থিত চেতনার টানাপোড়েনে তাঁর পাঠকৃতির নির্মাণও হয়ে ওঠে বিশেষভাবে সময়-স্বভাবেরই ফসল।

আগেই লিখেছি, আকরণবাদ থেকে আকরণোত্তরবাদে উত্তরণ আসলে ভাষাতাত্ত্বিক আকল্প থেকে সাহিত্য-নির্ভর আকল্পে পৌঁছানোর ইতিবৃত্ত। দুপক্ষের তাত্ত্বিকেরা ভাষা এবং সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করেন মৌল উপকরণের প্রয়োগ-পদ্ধতি হিসেবে। ঐসব উপকরণ তাদের তাৎপর্য খুঁজে পায় সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যে; তার প্রতিটি অনুপুঙ্খ ভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পর-সম্পর্কিত। এভাবে এদের সামূহিক উপস্থিতিতে গড়ে ওঠে সমগ্রের প্রতীতি। আকরণবাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কোনো উপাদানের তাৎপর্য কেবল প্রণালীবদ্ধ সম্পর্কই নির্ধারণ করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, সমগ্র হল তার অংশগুলির একীভূত সমবেত উপস্থিতি। যেহেতু প্রতিটি সাহিত্যকর্মের প্রাথমিক উপাদান রয়েছে, কোনো আলোচক সাধারণত তাঁর তাৎপর্য সন্ধানের যাত্রা শুরু করেন সূচনাবিন্দু থেকে অর্থাৎ মৌল উপকরণগুলিকে চিহ্নিত করে। কিন্তু সমস্ত উপকরণ সমগ্রের প্রতীতির পক্ষে সমান অপরিহার্য নয়। স্তর থেকে স্তরান্তরে যেতে যেতে নেতিনেতি করতে করতে অনবরত কম প্রয়োজনীয় উপাদানকে রেখে যেতে হয় পেছনে। অর্থাৎ কিছু কিছু অনুপুঙ্খ তাৎপর্যগূঢ় এবং বেশ কিছু থাকে শুধু পরিসরের সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনে। অতএব অর্থদ্যোতনা এবং অর্থহীনতার মধ্যবর্তী লক্ষ্মণের রেখা ঝাপসা হয়ে গেলে জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। সাহিত্য-নির্ভর আকল্পে সমগ্র অবশ্যই তার অংশের চেয়ে মর্যাদায় বড়ো। বিশ্লেষণী পাঠ শুরু হয় পূর্বানুমিত প্রয়োগপদ্ধতির ঐক্যবোধ মেনে নিয়ে এবং ক্রমশ এগিয়ে যায় বিভিন্ন উপকরণের সম্বন্ধশৃঙ্খল বিনির্মাণ করে। তবু বিশ্লেষণ কখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না; কিছু কিছু তাৎপর্য সবসময় অনিঃশেষ ও অপরীক্ষিত রয়ে যায়। একে বলা যেতে পারে পাঠকৃতিতে নিয়ত বর্তমান নৈঃশব্দ্যের পরিসর যা কিনা অপরিমেয় ও অপরিজ্ঞাত। যত নিপুণ ও গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হোক না কেন, পরবর্তী পাঠকের জন্যে রয়ে যায় আরো মন্থনের সম্ভাবনা, আরো কিছু অপূর্ণ পরিসর।

এই উপলব্ধির পরিণতিতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে, চিহ্ন থেকে পাঠকৃতিতে, ভাষা থেকে প্রতিবেদনে। শুধুমাত্র সাহিত্য বিশ্লেষণ নয়, ইদানীং মানবিকী বিদ্যার সমস্ত সন্দর্ভ বিবেচিত হচ্ছে জায়মান পাঠকৃতি হিসেবে। তার মানে, সাহিত্য সমালোচনা এখন অন্য সব সমালোচনার পক্ষে আদর্শ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এইজন্যে দেখা যাচ্ছে, দেরিদার কাছে কথা বা বাচন লিখন-প্রক্রিয়ায় অঙ্গীকৃত : ফলে, গ্রহীতার কাছে এর মৌল তাৎপর্য হল 'পাঠ', 'শ্রবণ' নয়। এই পাঠ মানে আবিষ্কার, অর্থপ্রতীতি। আকরণোত্তরবাদী ভাবনায় বিশ্লেষণের গভীরতম বিন্দুটি অর্জিত হয় না কখনও, কেননা, যে-বিষয়ী বা জ্ঞাতা বিশ্লেষণীক্রিয়ার সূত্রধার, তিনি নিজেই তো তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয় অর্থাৎ তাঁর পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য 'ভাষাচেতনা' দ্বারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্মিত ও সংগঠিত হচ্ছেন। বিশ্লেষণ যত এগোয়, উদ্ভাসনী আলোর পরিধি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত কতভাবে মিলিত হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে, যত তা বিশ্লেষিত হয়, ততই তাদের সম্পর্ক শিথিলতর হয়ে নতুন সম্বন্ধের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। তা যদি না হত, বিশ্লেষিত পাঠকৃতি থেকে উত্তরপ্রজন্মের কোনো পাঠক নতুন স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পেতেন না কখনও। পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনায় আরো কিছু কথা বলা হবে তাই এ বিষয়ে আর কিছু লিখছি না। আপাতত এইটুকু লেখা যথেষ্ট হবে যে, আকরণোত্তর চেতনা নতুন পাঠ নির্ণয়ের জন্যে নতুন নতুন কৃৎকৌশল আবিষ্কারে মগ্ন রয়েছে এখন। এইজন্যে বার্ত সাহিত্যের ভাষাকে বলেছেন 'প্রহেলিকাতুল্য', তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ মন্তব্য এরকম 'The critic composes rather than recovers the sense of it.'

তিন

এবার আকরণোত্তরবাদীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। একটু আগে একে বলেছি পরিসরের রূপক, আসলে এ হল পরিসরের নন্দন। আকরণোত্তর চেতনায় গ্রথিত বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বে এই বোধ, পরিসরের প্রতীতি, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ স্থান পেয়ে গেছে। কেননা তাৎপর্য সৃষ্টির জন্যে বিষয়ী বা জ্ঞাতার (খানিকটা শিথিলভাবে যাকে বলা যেতে পারে পাঠকসত্তা) যে-অবকাশ ও প্রেক্ষিতের সমর্থন চাই, ঐ পরিসর তার যোগান দেয়। বস্তুত আকরণোত্তরবাদ এখানে আলাদাভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরিসর ও সময়ের আন্তঃসম্পর্ক দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যতাত্ত্বিকদের চিরকালই প্রিয় আলোচ্য বিষয়। দেরিদা যখন তাঁর বহুচর্চিত 'পার্থক্যবোধ'-এর কথা বলেন, সেসময় তাতে সময় এবং পরিসর দুটি দিকই ইশারায় উপস্থিত থাকে। তার 'differance'-এর পরিসরগত দ্যোতনা হল 'আলাদা হওয়ার প্রক্রিয়া' বা 'diferring' এবং সময়গত দ্যোতনা হল 'স্থগিত রাখার প্রক্রিয়া' বা 'deferring'। তেমনি সোস্যুরের চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত বর্গগুলির সম্বন্ধ যত দুর্বল হতে থাকে, তাদের মধ্যে দেখা দেয় সম্ভাবনার ক্রমবর্ধমান পরিসর এবং ফলে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কেবল বাড়তেই থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ 'Time and New will' বইতে বলেছেন, প্রতীচ্যের চিন্তাবিদদের ভাববিশ্বে সময় পরিসরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কবিতার ভাষায় এলিয়ট ঐ পার্থক্যের প্রতীতিকে এভাবে জানিয়েছেন 'Between the act and the motion/falls the shadow.' এই পরিসরকে পূর্ণ করার জন্যে বিভিন্ন আকরণোত্তরবাদী চিন্তাবিদ ভিন্নভিন্ন আকল্প উত্থাপন করেছেন। যেমন ফুকো ঐ পরিসরে এনেছেন 'মানুষ'-এর ধারণাকে, লাকাঁ ও আলত্যুসের এনেছেন 'মানবিক অহং'-এর ধারণাকে এবং দেরিদা উত্থাপন করেছেন 'সত্তা' ও 'জ্ঞান'-এর প্রসঙ্গ।

আকরণোত্তরবাদী সাহিত্যতত্ত্ব পরিসরের সামাজিক ও নান্দনিক মাত্রা খুঁজতে খুঁজতে আত্মস্থ করছে নারীচেতনা, উপনিবেশোত্তর চেতনা, আধুনিকোত্তর চেতনাকে তাদের সমস্ত বিভঙ্গ সহ। তাই এই সাহিত্যতত্ত্বে প্রধান প্রবণতা বলে কিছু নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অজস্রতাই তার শক্তি। জীবন যেহেতু নির্মীয়মান, পাঠকৃতি এবং বিশ্লেষণ অনেকান্তিক। অসংশয়িত শেষ কথা আকরণোত্তরবাদী প্রতিবেদনে ঘোষিত হয় না, হতে পারে না। তাই পাঠকের মনশ্চর্যা, সামাজিক রীতি ও পরম্পরা, শব্দ ও অর্থের মধ্যবর্তী অরিক্ত শূন্যতা, লক্ষ্য ও উপকরণের মধ্যেকার ফাঁক, কৃৎকৌশল ও অভিপ্রায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান এবং এজাতীয় সমস্ত পার্থক্যবোধ স্বীকৃত ও আত্তীকৃত হচ্ছে। চিন্তায় কোথায় কেন্দ্র আর কোথায় পরিধি এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করেন না আকরণোত্তর চেতনায় বিশ্বাসী তাত্ত্বিক। বরং বাধাবন্ধনহীন মুক্তিতে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন অনন্ত সম্ভাবনার কর্ষণযোগ্য পরিসর। ইউরোপীয় ভাববিশ্বের প্রবণতাগুলি ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সমালোচক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দার্শনিকেরা একদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষাধর্মিতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং অন্যদিকে খুঁজেছেন এর নানা ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প। ফলে এই দুটি পরস্পর-বিরোধী বীক্ষণের সংঘর্ষ ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসকে রচনা করেছে। তাঁদের ধারণা, আকরণবাদ ঐ পর্যবেক্ষণপন্থী মতবাদের ধারাকে অনুসরণ করেছে। আর, আকরণোত্তরবাদ তাকে রূপান্তরিত করেছে সংশয়বাদে। কেউ কেউ মার্ক্সীয় ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তবে যেহেতু মার্ক্সবাদের অন্যতম প্রধান আধেয় হল নিয়ন্ত্রণবাদ, সংশয়কে তা খুব বেশি মান্যতা দিতে পারে না। ফলে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক লুই আলত্যুসের যখন আকরণবাদী এবং আকরণোত্তরবাদী এই দুই পর্যায়কেই আত্তীকৃত করতে চান, তাঁকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হয়। ইতিহাসে আধারিত সত্য এবং সত্তার তত্ত্ব সন্ধান এই দুইয়ের মধ্যে অস্বস্তিকর সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে আলত্যুসের আকরণবাদ থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন আবার আকরণোত্তরবাদের আঙিনায় খোলা মনে দাঁড়াতে পারেননি। ফুকো, লাকাঁ এবং দেরিদার ক্ষেত্রেও কম বেশি একই ব্যাপার ঘটেছে; ফলে তাঁদের নিজস্ব পথে প্রাগুক্ত সন্ধানও কোনো চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছায়নি। গ্রিক প্রত্নকথার বিখ্যাত চরিত্র সিসিফাসের মতো বারবার তাঁরা চূড়োয় তুলেছেন জিজ্ঞাসার পাথরকে এবং বারবারই নতুনভাবে শুরু হয়েছে তাঁদের অধ্যবসায় এক শীর্ষবিন্দু থেকে অন্য আরেক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্যে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দুর্গম চড়াই বারবার পেরোতে হয়েছে তাঁদের।

তাহলে, একথা অন্তত নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ফুকো-লাকাঁ-আলত্যুসের এবং সেইসঙ্গে, দুটি ভিন্ন ধরনে, বার্ত ও দেরিদার রচনায় আকরণোত্তর চেতনার প্রধান অন্তর্বস্তুগুলি বিকশিত হয়েছে। মূলত এই অন্তর্বস্তু কী কী, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, নতুন চেতনা ভাষাকে কেবলমাত্র সার্বভৌম পদ্ধতি এবং সত্তাকে বাচনিক নির্মিতি বলে ক্ষান্ত হয়নি; এই চেতনা ভাষার অন্যপরতা অর্থাৎ সাপেক্ষতাকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছে। এসব প্রবণতা আকরণবাদেও প্রচ্ছন্ন ছিল, আকরণোত্তরবাদ তাকে পূর্ণতা ও গতি দিয়েছে। সোস্যুরের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি চিহ্নায়ক সীমিত ছিল একটি নির্দিষ্ট চিহ্নায়িতের গণ্ডিতে। মূলত এই হল আকরণবাদী চিন্তার ভিত্তি। অন্যদিকে আকরণোত্তরবাদ এমন একটি তত্ত্ব তুলে ধরছে যাতে ভাষা বিবেচিত হয় অজস্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিহ্নায়কের পরম্পরা হিসেবে। ফলে ভাষার মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে বিপুলায়তন শূন্য পরিসর, আর, সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় এই পরিসরের প্রতীতি। আমাদের মনে পড়ে ঋগ্বেদের বহুচর্চিত সেই শ্লোকটির কথা 'সৃষ্টির আদিতে কোনো কিছুই ছিল না, ঐ অনন্ত না-এর মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে যা-কিছু আছে।' এ যেন আকরণোত্তর চেতনার ঐ নাস্তি-অস্তিতে দোলায়িত পরিসর, সমস্ত নন্দন-সম্ভাবনা সমস্ত প্রতিবেদনের উৎস তবুও ঐ পরিসরের প্রতীতি। তাই আকরণোত্তরবাদী চিন্তাবিদ শব্দান্তর্বর্তী সেই পারাপারহীন নৈঃশব্দ্যকে খনন করে চলেছেন; শেক্সপীয়ারের ভাষায় বলা যায়, তাঁরা যেন 'airy nothing' কে দিতে চাইছেন, 'local habitation and a name!' স্বরূপ সন্ধান করছেন তার, বর্ণনা করছেন, বিশ্লেষণও করছেন। মানবিক সম্ভাবনার জনয়িতা আকাঙ্ক্ষা অধিকার করছে নিষ্ক্রিয় আকরণে বিভাজিত ধীমত্তার সাম্রাজ্যকে। ফলে আকরণোত্তর চেতনায় নিষ্পন্ন সাহিত্যের বা কবিতার ভাষা রঞ্জিত করছে অন্য সব ধরনের ভাষাকে। একটি কথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন। ফুকো-লাকাঁ-আলত্যুসের-দেরিদার অসামান্য অবদানে মানবিক প্রতিবেদন আমূল বদলে যাচ্ছে যদিও, তাঁদের বিচিত্রগামী চিন্তার ভগ্নাংশ মাত্র ধারণ করতে পারছে সাহিত্যতত্ত্ব। দর্পণে যতটুকু বিম্বিত হচ্ছে, বিভিন্ন আলোচক তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। সুতরাং এটা অনিবার্য যে তাত্ত্বিক সন্দর্ভও এখন বিকেন্দ্রায়িত; পরিধির নিরবচ্ছিন্ন বিস্তার লক্ষ করে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আকরণোত্তর চেতনা মূলত বহুত্ববাদী। যাঁরা যেভাবে তাৎপর্য খুঁজুন না কেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে শুধু এই কথাটি 'তাৎপর্য সর্বদা প্রসঙ্গনির্ভর'। এইজন্যে প্রসঙ্গনির্ভর পাঠের পর্বে পৌঁছে আমাদের ঠিক করে নিতে হচ্ছে সামাজিক ইতিহাসের আবহে ঐ প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা কতখানি। কেননা, তা না হলে সত্যের সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য।

চার

আকরণবাদী ভাবনা থেকে আকরণোত্তরবাদী চেতনায় বিবর্তন বা উত্তরণের ইতিহাস নিঃসন্দেহে কৌতূহলজনক। প্রতীচ্যের বহু অগ্রণী চিন্তাবিদের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। ইতিমধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে রোলাঁ বার্তের দৃষ্টান্তটি আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজের চিন্তাজীবনের বিবর্তন সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন 'In the former text (1966), I appealed to a general structure from which would be derived analyses of contingent texts in S/Z I reversed this perspective there I refused the idea of a model transcendent to several texts (and this all the more so, of a model transcendent to every text) in order to postulate that each text is in some sort, its own model, that each text, in other words, must be treated in difference, "difference" being understood here precisely in a Nietzschean or a Derridean sense the text is not the parole of a narrative langue.' (১৯৭৫ ২৪২)। এই মন্তব্যের শেষ কথাটি হল মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাবিকাঠি প্রতিটি পাঠকৃতি অনন্য, যা কোনো আখ্যানের সঞ্চালক 'সার্বিক বাচন' এর যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত 'একক বাচন' নয়। এখানেই বার্ত আকরণবাদের গণ্ডি পেরিয়ে এসে গেছেন আকরণোত্তর চেতনার আঙিনায়। স্পষ্টই জানিয়েছেন, প্রতিটি পাঠকৃতি তার নিজের 'আদর্শ' নিজেই তৈরি করে। অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিবেদনকে বিচার করতে হবে অন্য পাঠকৃতি থেকে তার 'পার্থক্য' এর উপলব্ধিতে। এই পর্যায়ে বার্ত এক আদলের অনেক অনুসৃতি মেনে নিতে রাজি নন! খোলাখুলি তিনি দেরিদার 'পার্থক্য-প্রতীতি'র তত্ত্বের কথা বলেছেন। একটু আগে আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর যুগান্তকারী অবদানের কথা উল্লেখ করেছি। প্রাগুক্ত মন্তব্যে বার্ত তাঁর নিজের ঋণ স্বীকার করেছেন মূলত দেরিদার বহু আলোচিত নিবন্ধ 'structure, sign and play' এর প্রতি।

এই নিবন্ধের শুরুতে লক্ষ করি দেরিদার এমন কিছু দৃঢ়প্রত্যয়ী উচ্চারণ, যার প্রতিটি একক আকরণোত্তর চেতনার ওপর উদ্ভাসনী আলো নিক্ষেপ করছে। তাই বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিচ্ছি 'the structurality of structure has always been neutralized or reduced, and this by a process of giving it a center of referring it to a point of presence, a fixed origin. The function of this center was above all to make sure that the organizing principle of the structure would limit what we might call the 'free play' of the structure the center closes of the free play it opens up and makes possiltle... it has always been thought that the center, which is by definition unique, constitute that very thing within a structure which governs the structure while escaping structurality the center is at the center of the totality, and yet, since the center does not belong to the totality the totality has its center elsewhere.' (১৯৭২ ২৪৭-২৪৮)। এখানে দেরিদা যেসব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উত্থাপন করেছেন তা হলো, নির্ধারিত একটি কেন্দ্রের উপস্থিতিতে ও অনুষঙ্গে যেহেতু আকরণের আকরণত্ব ব্যক্ত হয়ে থাকে— অবধারিত ভাবে তার প্রভাব ক্ষীণ বা মূল্যনিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। যদিও আকরণের সন্নিবেশ আকরণবাদী ভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, ঐ মৌলিক উপকরণের স্বাধীনতা ও সাংগঠনিক ক্রিয়াকে কেন্দ্রের প্রতীতি খর্ব করে দেয়। বস্তুত যে-পরিমিতি ও শৃঙ্খলা তৈরির জন্যে কেন্দ্রের প্রয়োজন, মানবিক অস্তিত্ব ও উপলব্ধির সমস্ত প্রতিবেদনে ঐ কেন্দ্রই শেষ পর্যন্ত আকরণের স্বাধীন সঞ্চরণকে অসম্ভব করে তোলে। কেন্দ্র সম্পর্কিত উপলব্ধি আকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে অথচ নিজে থাকে আকরণের অতীত। আমরা যাকে সমগ্রতার প্রতীতি বলি, তাতে উপলব্ধির কেন্দ্র থাকবেই; কিন্তু ঐ সমগ্রের অপরিহার্য আকরণ হিসেবে। কেন্দ্রকে কখনও শনাক্ত করা যায় না। এই কেন্দ্র আসলে আকাঙ্ক্ষার শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। বিশেষত উপন্যাসের প্রতিবেদন যখন বিশ্লেষণ করি, নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার পরিধি-বহির্ভূত ভাবকেন্দ্রকে একইভাবে অনুভব করি। দেরিদা যাকে 'force of desire' বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূরণের ভঙ্গিতে তা প্রতিবেদনের নিয়ন্তা ভাবকেন্দ্রটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গড়ে তোলে। স্পষ্টত আকরণবাদের আওতার বাইরে এই চিন্তা গড়ে উঠছে।

দেরিদা যেখানে পৌঁছাতে চান, সেই কেন্দ্রবিহীন আকরণ ('decentered structure') আসলে আকরণোত্তর ভাবনায় দৃঢ়প্রোথিত। বিখ্যাত সমালোচক নর্থ্রপ ফ্রাই ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে 'an endless labyrinth without an outlet' (১৯৬৭ ১১৮) এর কথা লিখেছিলেন। একটু আগে সম্ভাবনার সীমাহীন পরিসরের কথা লিখেছি ফ্রাই-কথিত নিষ্ক্রমণহীন গোলকধাঁধা থেকে তা কিন্তু অনেকটা স্বতন্ত্র। আজকের বাস্তবও বিন্যাসে জটিল; গ্রন্থি আর নির্মোক খুলতে খুলতে গোলকধাঁধার অনুষঙ্গ তৈরি হতে পারে যদিও, আকরণোত্তর চেতনা কিন্তু সমগ্রতার প্রতীতি দিয়ে সমস্ত সম্ভাব্য বাধা পেরিয়ে যেতে চাইছে। ফুকো-লাকাঁ-আলত্যুসের এবং বার্ত-দেরিদা তো কেবল বিশ্লেষণী কৃৎকৌশলের খোলনলচে পালটে দিতে চাননি, মানুষের তাৎপর্য সন্ধানের প্রক্রিয়াকে নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন। কোনো স্থির বিষয় বা স্থির লক্ষ্য বা স্থির উপকরণ তাঁদের অন্বিষ্ট নয় কখনও, তাঁরা বহতা সময়ের অনুবাদক এবং ভাষ্যকার। তাই দেখি, মানবচৈতন্যের আকরণোত্তর পর্যায় এত সর্বগ্রাহী এত চলিষ্ণু। পথের বিস্তার ঘটানোয় তাদের যত উৎসাহ, গন্তব্য বা সাফল্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এজন্যে পথ অতিবাহনের আগ্রহে চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে ঘটছে আকরণোত্তর মনোভঙ্গির প্রসার। পল দ্য মান, জে. হিলিস মিলের, জিওফ্রে হার্টম্যান, এডোয়ার্ড সাঈদ, জুলিয়া ক্রিস্তোভার মতো বরেণ্য তত্ত্ববিদেরা ক্রমশ নিজেদের প্রতিবেদনে প্রাগুক্ত মনোভঙ্গির পরিশীলন করেছেন। এছাড়া রয়েছেন রবার্ট স্কোলস, ফ্রেডরিক জেমসন ও জোনাথন কুলের-এর মতো অগ্রণী তাত্ত্বিকেরা, এঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতীচ্যের ভাববিশ্বে সংখ্যাতীত বিপুল পরিবর্তনের আবহকে নিজেদের প্রতিবেদনে আত্তীকৃত করে নিয়েছেন। চলমান ইতিহাস তাঁদের চিন্তাচেতনাকে বদলে দিচ্ছে আবার তাঁরাও ইতিহাসের প্রতিবেদনকে পালটে দিচ্ছেন। আরো একটু গভীরে গিয়ে যদি ভাবি, মনে হবে আকরণবাদের আঁটোসাঁটো বাঁধুনি যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক অচলায়তন হয়ে দাঁড়িয়েছিল— আকরণোত্তর ভাবনা তাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শৌর্যে অন্তর্ঘাত করেছে। ইতিহাসের আধিপত্যবাদী সন্দর্ভকে ভাঙতে হয় ভেতর থেকে, এই তাঁদের বার্তা।

এবিষয়ে দেরিদা স্মরণীয় হয়ে ওঠেন আরও একবার। 'Writing and Difference' (১৯৭৮ ৩৬) বইতে তিনি লিখেছেন, প্রতীচ্যের চিন্তাজগৎ যেহেতু বহু শতকের ধারাবাহিক দীপায়ন ও ভাববিপ্লবের প্রভাবে যুক্তিবাদের শৃঙ্খলাকে অমোঘ, অনতিক্রম্য, অনন্য ও অনন্ত ঐশ্বর্যময় বলে জেনেছে—স্পষ্টতই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিহাসের দ্বারা নির্ধারিত মহা-আকরণ। একে অস্বীকার করতে চাইলেই করা যাবে না; এর পক্ষে না দাঁড়ানো মানে অস্তিত্বের অভ্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। প্রতিবাদ যদি করতে হয় কাউকে, তা করতে হবে আকরণের ভেতর থেকে। মানুষকে যেহেতু কোনো শেকলে বাঁধা যায় না কখনও, এই সম্ভাবনা ঔচিত্যার্থক বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; সমস্ত ধরনের অতিকেন্দ্রায়নকে প্রত্যাখ্যান করে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে আকরণোত্তর চেতনা। যুক্তিকে প্রতিযুক্তি আর প্রশ্নকে প্রতিপ্রশ্ন দিয়ে মোকাবিলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করছেন সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকেরা, চেতনাকে মুক্ত করছেন অভ্যাসের প্রাতিষ্ঠানিক পিঞ্জর থেকে। ভাষায়, বাচনিক আকরণে, প্রতিবেদনে জেগেছে এখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রতিবাচন পথ খুলে দিচ্ছে বাচনের নতুন চেতনার 'Language is the house of being. In its home man dwells. Those who think and those who create with words are the guardians of this home. Their guardianship accomplishes the manifestation of Being.'

হাইদেগের এই অনুভূতি-নিবিড় উচ্চারণে যে-সত্য প্রকাশ করেছেন, তাকে যদি নীড়ে ফেরার উৎসব বলি, আমাদের মনে পড়বে বাখতিনের অনুরূপ উচ্চারণ 'Every meaning has its own home-coming festival.' এই অর্থ অর্জনীয় কেবল সংঘর্ষে, দ্বিবাচনিকতায়। এখানে আবার ফিরিয়ে আনি দেরিদাকে, যাঁর স্পষ্ট দিক্‌নির্দেশ এরকম 'যুক্তিশৃঙ্খলার আকরণকে প্রতিপ্রশ্ন করতে হবে ঐ শৃঙ্খলারই ভেতরে থেকে। মোদ্দা কথা হল, এখন তৈরি করতে হবে অন্তর্বৃত সংঘর্ষের বাতাবরণ' (প্রাগুক্ত)। প্রশ্ন এই, আকরণোত্তরবাদী তাহলে কি নিজেদের জন্যে নতুন ধরনের আরও কিছু বিধিনিয়ম তৈরি করবেন? যদি তা না করেন, তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে বিন্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য কীভাবে স্পষ্ট হবে? আবার, যদি বিধিবিন্যাসের দ্বারা তাঁরাও অধিকৃত হন, তাহলে তো আকরণবাদের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র তাঁদেরও আক্রমণ করবে। এব্যাপারে ফুকোর বক্তব্য খুব প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে 'Rules are empty in themselves and unfinalized they are impersonal and can be bent to any purpose. The successes of history belong to those who are capable of seizing these rules, to replace those who had used them to disguise themselves so as to pervert them, invert their meaning and redirect them against those who had initially imposed them; controlling this complex mechanism, they will make it function so as to overcome the rulers though their own rules.' (১৯৭৭ ১৫১)। এখানে ফুকো যেসব কথা বলেছেন, ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-দর্শন-সাহিত্যিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা বিশেষ কার্যকরী। এতে কোনো সংশয় নেই যে, নিয়ম কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয়। যতক্ষণ প্রয়োগে তাদের উপযোগিতা পরীক্ষিত না হচ্ছে ততক্ষণ তাদের শূন্যগর্ভ বলে বিবেচনা করতেই হবে। প্রথাগত ইতিহাস যেখানে ধারাবাহিকতাকে আর্দশায়িত করে, ফুকো সেখানে খোঁজেন 'কার্যকরী ইতিহাস' যা ছেদকে সংরক্ষিত করে। কোনো এক নিয়মবহির্ভূত মুহূর্তের বিস্ফোরণকে, প্রতিস্পর্ধাকে গরীয়ান করে তোলে ঐ ইতিহাস। প্রতাপের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় আরোপিত নিয়মের সাহায্য নিয়েই ক্ষমতানিয়ামকদের কালো মুকুট সরিয়ে দেয়। এছাড়া জ্ঞানতত্ত্ব, অস্তিত্বতত্ত্ব, মানবিকী বিদ্যার বহুত্বজ্ঞাপক তত্ত্ব এবং প্রতিবেদনতত্ত্ব সম্পর্কে ফুকোর মৌলিক ও বিপুল অবদান রয়েছে। এই সবই আকরণোত্তর পরিসরের ব্যাখ্যাকে আরও বিচিত্রগামী, জটিল ও আগ্রহোদ্দীপক করে তুলেছে। এখানে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। 'মানুষ' নামক অস্তিত্বের জন্যে ফুকো যে নিয়ত বর্ধিষ্ণু চিন্তা ও অনুভূতির পরিসর তৈরি করে গেছেন, শুধুমাত্র একারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকরণোত্তরবাদে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর্ট বেরম্যান লিখেছেন (১৯৮৮ ১৮১), ফুকোর সিদ্ধান্তগুলি স্বভাবে আকরণোত্তরবাদী কেননা, 'they lend, by their own route, support to the critique of early structuralism, calling into question the possibility of objective knowledge and of an independent subject for whom knowledge is an acquisition.' ফুকোর নিজস্ব শব্দবন্ধে নতুন পর্যায়ে জ্ঞান 'residence in a new space' (১৯৭০ ২১৭) নিয়ে নিতে পারে আর, ফলে মানুষের প্রতিবেদন ক্রমশ রূপ থেকে রূপান্তরে যাত্রা করে। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে মানুষের ভাষা, মানুষের সত্তা, সামাজিক মনস্তত্ত্ব। সত্যকে জানার একটি প্রধান শর্ত এই যে, তাতে প্রতিনিয়ত অন্তর্ঘাত করে যেতে হবে। সংঘাত যত বাড়ে, মানুষের পরিসরও তত বেড়ে যায়। আকরণোত্তর চেতনার এই অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষের ভাষাকে, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তার আন্তঃসম্পর্ককে অহরহ বদলে দিচ্ছে। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে, ভাষার নির্মিতিতে, চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় শুধু যে উপস্থাপিত হচ্ছে একান্তিক সন্দর্ভ—এমন নয়। ফুকো বলেছেন 'deeper discourse' (তদেব ৪৭) এর উপস্থিতির কথা, তিনি লক্ষ করেছেন কীভাবে চিহ্নায়কেরা 'linked together and arranged in space reconstitute the very order of the universe.' (তদেব ৩৮)

বস্তুত আকরণোত্তরবাদী সাহিত্যতত্ত্বের অন্বিষ্টও তা-ই : মানববিশ্বের যুক্তিশৃঙ্খলাকে পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্গঠিত করে দেওয়া যাতে মানুষ নিজের সম্ভাবনাকে আরও ভালোভাবে জানতে ও জানাতে পারে।

পাঁচ

কোনো কোনো ভাষ্যকার মনে করেন, আকরণোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন প্রবণতা সূত্রাকারে প্রচ্ছন্ন ছিল আকরণবাদের মধ্যেই। তার মানে, আকরণোত্তরবাদ নতুন কিছু নয়; এ আসলে আকরণবাদী ভাবনার যুক্তিসম্মত পরিণতি বা সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়িত প্রকাশ। কিন্তু একথার প্রতিবাদ করেন যাঁরা, তাঁদের মতে, আকরণোত্তর পর্যায়ে আকরণবাদী ভাবনার 'বৈজ্ঞানিক প্রকল্প' শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আকরণবাদ চিহ্নপ্রধান জগৎকে আবিষ্কার করে এবং তার ওপর বৌদ্ধিক আধিপত্য কায়েম করতে চায়। এদিক দিয়ে আকরণোত্তরবাদ খানিকটা কালাপাহাড়ের ভূমিকা নেয়; কেননা এধরনের দাবিকে নস্যাৎ করে জগতের ছদ্মগাম্ভীর্যে ব্যঙ্গ পরিহাসের কার্নিভাল দিয়ে অন্তর্ঘাত করতে চায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিয়ে বলা যেতে পারে, এ যেন, 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে। ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।' সত্যিই আকরণোত্তর ভাবনা যে আকরণবাদকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করে তা কার্যত হয়ে দাঁড়ায় আত্মব্যঙ্গ। হয়তো এছাড়া নির্মোক ভেদ করার অন্য উপায় ছিল না। জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য বিকশিত হচ্ছে যেসব চিহ্নায়িতের আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে, আকরণোত্তর ভাবনা তাতে অস্থিরতা ও সংগ্রামের সূত্র আবিষ্কার করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঞ্চরমান স্তর থেকে স্তরান্তরে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া যেভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে, তাতে নিশ্চয়তা বলে কিছু নেই।

মানুষ সবচেয়ে রহস্যময় প্রাণী, তাই তার তাৎপর্য সন্ধান বা সংকেত গ্রহণ বারবার পূর্বনির্ধারিত আকল্প থেকে স্বাধীন হয়ে উঠতে চায়। সোস্যুর চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত বর্গকে একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ বলে ভেবেছেন। আবার তিনি এও লক্ষ করেছেন যে, এই দুইয়ের সম্পর্ক সর্বদা অনিবার্যও নয়। কোনো কোনো ভাষায় একই চিহ্নায়কের মধ্য দিয়ে দুটি চিহ্নায়িত প্রকাশিত হতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ যেন ভিন্ন দুটি আয়তনে বিন্যস্ত; তা থেকে একদিকে গড়ে উঠছে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও চিহ্নায়িতের দুনিয়া আর অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও চিহ্নায়কের পরম্পরা। সোস্যুর বলেন, ভাষায় বিভিন্ন চিহ্নায়িতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে পার্থক্যের প্রতীতি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, চিহ্নায়িত তার স্বভাবের তাগিদে আপন চিহ্নায়ককে খুঁজে বেড়ায় এবং দুইয়ের দ্বিরালাপে গড়ে ওঠে একটি ইতিবাচক একক।

আকরণোত্তরবাদী চিন্তা চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার প্রকাশ দেখতে পায়। ভাষার দুটি সঞ্চরমান স্তরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে সম্পর্ক তৈরি হয় যদিও, পরমুহূর্তে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের তাগিদে এই সেতু ভেঙে যায়। এ নিয়ে আকরণোত্তরবাদী ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট কূটতর্ক রয়েছে। আমরা শুধু লক্ষ করব, এই পর্যায়ে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া নিরন্তর প্রবহমান। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যত নতুন প্রেক্ষিত তৈরি হচ্ছে, চিহ্নায়কেরা সেই প্রেক্ষিত অনুযায়ী নিজেদের বর্ণ ও চরিত্র পাল্টে নিচ্ছে। নানা গোত্রের চিহ্নায়কদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ফলে বারবার গড়ে উঠছে নতুন সম্বন্ধ ও পরম্পরা এবং স্রোত ও প্রতিস্রোতের জটিল বিন্যাসে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে স্থিতিশীল চিহ্নায়িতের প্রতি বিশ্বাস। মূল কথা হল ভাষার প্রয়োগ অর্থাৎ বাচন ও প্রতিবাচন। এক কথায় একে বলতে পারি প্রতিবেদন বা সন্দর্ভ। মানবিক চিন্তার প্রতিটি বয়নে রয়েছে অনিবার্য সামাজিক প্রেক্ষিত ও অনুষঙ্গ। এখানেই মিখায়েল বাখতিনের যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নানাবিধ উচ্চারণের সন্নিবেশে বহুস্বরসঙ্গতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে যে মানবিক প্রতিবেদন তা মূলত এক যুদ্ধক্ষেত্র যেন। প্রতিটি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে সামাজিক পরিসরে অর্থাৎ দ্বিবাচনিকতার মধ্য দিয়ে শব্দ পৌঁছাচ্ছে অর্থে। ফলে অনিবার্যভাবে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাৎপর্য গড়ে উঠছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের মধ্যে সম্পর্ক সর্বদা দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংঘর্ষের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ভাষাকে সামাজিক জীবন যাপনের অভিব্যক্তি করে তোলে। যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তত বেশি অন্তর্বয়ন দেখা দেয় উপলব্ধিতে এবং ঠিক সেই মাত্রায় সমৃদ্ধতর হয় প্রতিবেদন।

আকরণোত্তর চেতনা এই প্রতিবেদন ভাবনার সূত্রে আখ্যান সম্পর্কিত নতুন বিশ্লেষণী পাঠে পৌঁছে গেছে। আখ্যানের মধ্যে সোচ্চার ও নিরুচ্চার উপস্থিতির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিবাচনিকতা ব্যাখ্যার সূত্রে শুধু যে উপন্যাসের তাৎপর্য বদলে গেছে, তা-ই নয়, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও সংস্কৃতি-তত্ত্বের সন্দর্ভও পুরোপুরি নতুন হয়ে উঠেছে। বিষয় ও বিষয়ীর সম্পর্কে তির্যক প্রতিঘাত ইদানীং হয়ে উঠেছে স্বীকৃত কৃৎকৌশল। ফলে বিষয় ও বিষয়ী আর পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুটি বর্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। কিংবা শুধুমাত্র জ্ঞাতা বিষয়ীকে সার্বভৌম অস্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। বরং তা হয়ে উঠেছে নিয়তক্রিয়াত্মক অর্থাৎ সর্বদা ঘটমান। এই সূত্রে চেতনাও সর্বদা সঞ্চরমান এবং মানবিক প্রতিবেদন নিত্যজায়মান এক প্রক্রিয়া মাত্র। আকরণোত্তরবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিবেদন কখনও একরৈখিক নয়; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিস্রোতের সম্ভাবনা তাতে কখনও ইশারায় আর কখনও স্পষ্ট স্বরন্যাসে আপন উপস্থিতি ঘোষণা করে। অন্তর্বয়ন প্রায়ই হয়ে ওঠে অন্তর্ঘাতের আয়ুধ। আসলে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রবণতা আত্মস্থ করতে করতে ভাববিশ্ব যখন বিবর্তিত হয়, তাতে রৈখিকতা থাকে না, বহু ছেদ ও বিরতি, উল্লম্ফন ও বিপ্রতীপতা থাকে। প্রতিবেদনে কখনও ছায়া আর কখনও শিখর, কখনও উপত্যকা তাই এত স্বাভাবিক। রামান সেলডেন ও পিটার হিডোওসোন একে বলেছেন 'discontinuous movement from one discursive formation for paradigm to another.' (১৯৯৯ ১২৯)। এমন ঘটে কেননা, প্রতাপের আধিপত্য যে-সমস্ত প্রান্তিকায়িত বর্গের কণ্ঠস্বরকে অবদমিত করে রেখেছিল, নতুন প্রতিবেদন তাদের পুনরুদ্ধার করে অপ্রাতিষ্ঠানিক উচ্চারণকে তুলে আনছে পাদপ্রদীপের আলোয়। এক্ষেত্রে মিশেল ফুকো আকরণোত্তর চেতনার দিগন্ত বিস্তার ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করেছেন।

ফুকো দেখিয়েছেন, প্রায়ই বিজ্ঞানের অজুহাতে আধিপত্যবাদী বর্গ এমনভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে যাকে প্রাগুক্ত 'Discursive formation' প্রতাপের যুক্তি-শৃঙ্খলার অনুগামী হয়ে পড়ে। তাঁর মতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে প্রতাপ ও আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্যে। যারা উন্মাদ, রুগ্ন, অপরাধী, দরিদ্র, গণিকা ও প্রথাবিচ্যুত—তাদের দূরীকৃত অপর হিসেবে ঠেলে দেওয়া হয় প্রান্তিকায়িত অন্ধকারে, প্রাতিষ্ঠানিক খাঁচার ছায়াচ্ছন্নতায়। আমাদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের সেইসব সংখ্যায় পরিণত-হওয়া খনিশ্রমিকদের কথা যাদের যক্ষপুরীর সীমাহীন উগ্র লোভ ছিবড়ে করে এনেছিল। দাম্ভিক শক্তির 'এঁটো'দের দেখিয়ে বলেছে অধ্যাপক, এইসব কিম্ভুতেরা হল লেলিহ আগুনের ছাই। ফুকোর নজর পড়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সভ্যতার সেইসব ভস্মস্তূপের প্রতি। তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিবেদন সর্বদা প্রতাপের কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শাসন ও শৃঙ্খলা বিধানের মাধ্যম হিসেবে তা সক্রিয় থাকে। কতখানি কী প্রকাশ করা সম্ভব, প্রতিবেদন তা ঠিক করে দেয়, তার মানে, কার্যত তা সত্যের উৎপাদক এবং নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে কে বা কারা বাচনের যথার্থ সূত্রধার হতে পারে এবং অন্য সব উচ্চারণকে পেছনে ফেলে দাবি জানাতে পারে মান্যতার—তাও প্রতিবেদন ঠিক করে দেয়। আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান এত ব্যতিক্রমহীন ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়েছে যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আধিপত্যবাদের ছায়ায় বিদ্যাচর্চাও পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছে। বিষয় ও আঙ্গিকের গ্রাহ্যতা পর্যন্ত সর্বতোভাবে প্রতাপের মুখাপেক্ষী এখন।

ফুকোর এই বক্তব্যে অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক নৈরাশ্যবাদী প্রবণতা লক্ষ করেছেন। বিশেষভাবে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরা জোর দিয়েছেন প্রতিবেদনের ভাবাদর্শগত ভিত্তির ওপর। প্রাধান্যপ্রবণ সন্দর্ভে অন্তর্ঘাত করার জন্যে এবং প্রতিরোধের প্রয়োজনে ঐ নৈরাশ্যবাদী ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে হবে—এই হল তাঁদের বক্তব্য। তাঁরা নিশ্চিত যে ভাবাদর্শগত অনুষঙ্গ ও প্রেক্ষিত যদি পরিশীলিত হয়, তাহলে মানবিক প্রতিবেদনগুলি পাবে তাদের মুক্তির পথ ও পাথেয়। এখানে আমাদের মনোযোগ দাবি করেন লুই আলত্যুসের। তাঁর বিশ্বখ্যাত নিবন্ধ 'Ideology and Ideological State Apparatuses' (১৯৮৯) প্রতিবেদনতত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর প্রধান বক্তব্য এই যে, ভাবাদর্শ রাষ্ট্রীয় পীড়নের যুগপৎ আয়ুধ এবং অভিব্যক্তি। নিপীড়নের অন্যান্য প্রচলিত কৃৎকৌশলের মতো ভাবাদর্শও সর্বদা আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতাপকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্যে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুত ভাবাদর্শও শাসকের চাতুর্যে গড়ে ওঠে; জাগতিক প্রয়োজনের মাপে তার বর্ণ ও চরিত্র বদলায়। প্রচলিত সামাজিক কাঠামোয় আমাদের অবস্থান ও ভূমিকা কী, ভাবাদর্শ তা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু প্রতাপ যেহেতু হস্তক্ষেপ করে, অস্তিত্বের যথার্থ রূপ প্রায়ই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। আমরা তা-ই দেখি এবং ভাবি যা আমাদের দেখানো এবং ভাবানো হয়। ফলে আমাদের প্রতিবেদনে যে-ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তাতে বাস্তব হয়ে যায় প্রান্তিকায়িত অপর এবং মূল সূত্রধার হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদী বর্গ। তাতে এই দাঁড়াল যে, প্রতিবেদনে সত্যের শৌর্যদীপ্ত ভাস্কর্য ব্যক্ত হওয়ার বদলে চাতুর্য-রচিত মিথ্যার স্থাপত্য প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির অবস্থান এবং কাঠামোর সঙ্গে তার সম্পর্ক যদি মিথ্যা ভাবাদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহলে কল্পিত বাস্তবতার বিভ্রমে প্রতিবেদন পথভ্রান্ত হতে বাধ্য।

এভাবে আধিপত্য ও অবদমনের আকল্পকে যুক্ত করে আলত্যুসের প্রতিবেদনতত্ত্বে রাজনৈতিক মাত্রার অনিবার্যতা প্রমাণ করেছেন। ভাবাদর্শ ও প্রতিবেদন যেহেতু তাঁর কাছে অন্যোন্যসম্পৃক্ত, আকরণোত্তর পরিসর আরও বেশি জীবনের স্পন্দনে ঋদ্ধ হওয়ার অবকাশ পাচ্ছে। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্যে আলত্যুসের যে মনোবিকলনবাদের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তা জাক লাকাঁর কাছ থেকে পাওয়া। লাকাঁ বিষয়ী বা জ্ঞাতা সম্পর্কিত মানবতাবাদী ধারণাকে প্রশ্নে বিদ্ধ করেছিলেন। আকরণোত্তরবাদী যে স্বাধীন পরিসরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, লাকাঁর অস্থিতিশীল বিষয়ী চৈতন্য তাতে আরও রহস্য, আরও গভীরতা যুক্ত করেছে। তুলনামূলকভাবে অবশ্য আলত্যুসেরের বিষয়ী এবং তার সংগঠন খানিকটা স্থির। লাকাঁ বিষয়ীকে স্থায়ীভাবে অস্থির সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা কিনা অহং-এর সচেতন অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষার অবচেতন প্রকাশের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। স্বভাবত এতে প্রতিবেদনের মধ্যেও তৈরি হয় অজস্র কৌণিকতা এবং বিচিত্র আততি। সমালোচক কলিন ম্যাককাবে প্রতিবেদন সম্পর্কিত নিবন্ধে (১৯৮১) লাকাঁর সূত্র অনুযায়ী সন্দর্ভে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কার্যকরী হস্তক্ষেপ করার কথা বলেছেন। এছাড়া মিশেল পেশো খানিকটা বিস্তারিতভাবে বিষয়ীর অবস্থান অনুযায়ী ভাবাদর্শপ্রাণিত প্রতিবেদনের উপস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এভাবে দেখা যায়, আকরণোত্তরবাদী পর্যায়ে অন্যোন্য-প্রভাবিত চিন্তার বিচিত্রগামী বিচ্ছুরণ ভাববিশ্বকে ক্রমশ প্রসারিত করে চলেছে।

ছয়

রোলাঁ বার্তের অবদান আকরণোত্তর চেতনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একথা আগেও লিখেছি। ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকে তাঁর চিন্তা যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এক জীবনে জন্মান্তর হয়ে যাওয়ার মতো অনন্য। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, আগ্রহোদ্দীপক ও দুঃসাহসী রচনাসম্ভার বিশ্বসমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বয়ে এনেছে নতুন-নতুন কালান্তরের বার্তা। বিশ্লেষণের প্রথম পর্যায়ে বার্ত সাহিত্যকে বস্তুবিশ্বের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ঘোষণা বলে মনে করতেন, স্বতন্ত্র কোনো তাৎপর্যের অস্তিত্ব তিনি মানতে চাননি। 'Elements of Semiology' বইটি যখন লিখছেন বার্ত, তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানবিক সংস্কৃতির যাবতীয় চিহ্নায়ন পদ্ধতিকে আকরণবাদী কৃৎকৌশল দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য আকরণবাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে তাঁর মনেও যে যথেষ্ট সংশয় ঐ পর্বেও ছিল, তার ইঙ্গিত পাই ঐ রচনায়। প্রতিবেদনের বিষয় প্রকাশক ভাষার অন্তরালেও যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নিয়ন্তা পরাভাষার আদল, এ সম্পর্কে বার্ত সচেতন ছিলেন তখনও। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারলেন, সাহিত্যিক প্রতিবেদনে পরাভাষাও বহির্বৃত ব্যক্ত ভাষার স্থান অধিকার করে নিতে পারে। আবার অন্য কোনো পরাভাষার সাহায্য নিয়েও এর তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা সম্ভব। বস্তুত সমালোচনার নিজস্ব ভাষাও তো পরাভাষার বিশিষ্ট এক ধরন। এভাবে ক্রমাগত এক পরাভাষা থেকে আরেক পরাভাষায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে তৈরি হতে পারে নিরবচ্ছিন্ন দ্যোতনার শৃঙ্খলা। এই দিক দিয়ে দেখলে এতে সমস্ত পরাভাষার মান্যতা খর্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে কূট তর্কে না-গিয়ে এইটুকু বলা যায়, আমরা যখন সমালোচক হিসেবে পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, আমাদের পড়া কখনও প্রতিবেদনের গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। এমনকি, পাঠক হিসেবে এমন কোনো অবস্থানও আমরা নিতে পারি না যা কিনা পরবর্তী প্রশ্নময় পাঠে অটুট থেকে যায়। সমালোচকের সন্দর্ভ সহ কোনো প্রতিবেদনই পুরোপুরি বাস্তবের যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবি নয়, এমন হয়ও না কখনও; বরং কল্পনার হস্তক্ষেপ ছাড়া এদের নির্মিতি রূপায়িত হয় না। ভিন্ন এক প্রসঙ্গে পিকাসো যেমন বলেছিলেন, মিথ্যার মধ্য দিয়ে তিনি সত্যে পৌঁছাতে চান—তেমনি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদনে সত্য সর্বদা কল্পনারঞ্জিত বাস্তবের অভিব্যক্তি। কিংবা, অভিব্যক্তিও নয় পুরোপুরি; বলা ভালো, ব্যঞ্জনাগর্ভ সঞ্চার।

বার্তের আকরণোত্তর ভাবনার চমৎকার প্রতিনিধি হল তাঁর বহুচর্চিত নিবন্ধ, 'The Death of the Author' (১৯৬৮)। লেখকই পাঠকৃতির উৎস—এই চিরাগত ও প্রশ্নাতীত-বলে-গৃহীত ধারণাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এখানে। লেখককে তিনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঠকৃতির তাৎপর্যের একমাত্র সূত্রধার ও উদ্ভাবক বলে ভাবেননি এবং বিশ্লেষণের জন্যে লেখকের কর্তৃত্ব একমাত্র মাননীয়, একথাও তিনি স্বীকার করেননি। সাম্প্রতিক আলোচকদের মতে বার্তের লেখক 'is stripped of all metaphysical status and reduced to a location (a crossroad), where language, that infinite storehouse of citations, repetitions, echoes and references, crosses and recrosses.' (প্রাগুক্ত ১৩২)। এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী লেখক আসলে কোনো জায়মান (ও সম্ভাবনাগর্ভ) সন্দর্ভের আদি-প্রস্তাবক মাত্র; পাঠক, আকরণোত্তর পরিসরে দাঁড়িয়ে, নৈঃশব্দ্যের পরিধিকে বিস্তৃততর করে প্রতিবেদনের শাব্দিক নির্মিতিকে সম্ভাব্য পরিণতির উপকূলরেখায় নিয়ে যান। যে-কোনো বিন্দু থেকে পাঠক স্বাধীনভাবে পাঠকৃতিতে প্রবেশ করতে পারেন, একই ভাবে নির্গমনের পথও তাঁর খোলা। তাই বিশুদ্ধতম পাঠ বলে কিছু নেই, সব স্বাধীন ও কল্পনাঋদ্ধ পাঠই শুদ্ধ পাঠ। এই অভিনব বক্তব্য কার্যত ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি বহুশ্রুত মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত : 'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ। /যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে।' অবশ্য ভারতীয় আলঙ্কারিক সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী পাঠককেও বিপুল মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু সেকথা এখানে নয়। শুধুমাত্র এইটুকু বলছি যে, দ্বিতীয় বিধাতা হিসেবে বন্দিত লেখক-সত্তার অবসান ভারতীয় চিত্ত মেনে নিতে পারে না কখনও। লেখকের মৃত্যু এবং পাঠকের জন্মকে যে-অবিচ্ছেদ্য কার্যকারণসূত্রে গেঁথেছেন প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক, তারও মূল কারণ নিহিত রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গভীরে। যাই হোক, আকরণবাদী চিন্তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল লেখকের মৃত্যু; কেননা এর মূল কথা হল, ব্যক্তির উচ্চারণ (parole) হল নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির (langue) ফসল। বার্ত তাতে যে নতুন মাত্রা যোগ করলেন তা হল, চিহ্নায়িতকে বেশি মান্যতা না দিয়ে পাঠকৃতির চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে পাঠকেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো মুক্ত করতে পারেন অথবা রুদ্ধ করে দিতে পারেন। চিহ্নায়িতের সঙ্গে চিহ্নায়কের লুকোচুরি খেলায় পাঠকও যে যোগ দিচ্ছেন, এই তাঁর আনন্দ এবং এই তাঁর পুরস্কার। লেখকের মূল অভিপ্রায় যা-ই থাকুক না কেন, পাঠক অনায়াসে তা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং পাঠকৃতিকে পুরোপুরি নতুন তাৎপর্য-প্রকরণের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারেন। এই যুগান্তকারী বক্তব্য আকরণোত্তর চেতনার সবচেয়ে বিশিষ্ট দিক প্রতীচ্যের ভৌগোলিক গণ্ডি পেরিয়ে দিক্‌নির্দেশ করছে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনাকেও। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের আখ্যানের আকরণোত্তর পাঠ সামাজিক ও নান্দনিক প্রতিবেদনের মধ্যে আবিষ্কার করছে যেন অনাবিষ্কৃত এক বিপুল মহাদেশকে।

'The Pleasure of the Text' (১৯৭৫) বইতে বার্ত পাঠকের তীব্রনিবিড় উল্লাসকে গভীরতর বিশ্লেষণের বিষয় করে তুলেছেন। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাঁর একটি বিশেষ তাৎপর্যবহ মন্তব্য শুধু উল্লেখ করছি: 'It is very rhythm of what is read and what is not read that creates the pleasure of the great narratives.' অর্থাৎ কথিত বাণীর চেয়ে অকথিত বাণীর মর্যাদা পাঠকৃতিতে বেশি; পাঠক যতটুকু পড়েন তার চেয়ে ঢের বেশি বড়ো পরিসর রয়ে যায় অপঠিত অংশে। আর, এই দুইয়ের দ্বিবাচনিকতায় গড়ে ওঠে প্রতিবেদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্যাস, তাৎপর্যের ছন্দ। বাংলা সাহিত্য থেকেও এ বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত আহরণ করা যেতে পারে। এছাড়া বার্তের 'S/Z' (১৯৭০) বইটি আকরণোত্তর পাঠের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। যে-সমস্ত আকরণবাদী আখ্যানতত্ত্ববিদ কোনো একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় দুনিয়ার তাবৎ কাহিনিকে বিন্যস্ত করতে চান, তাঁদের প্রয়াসের ব্যর্থতার প্রতি তর্জনি সংকেত করে বার্তের প্রতিবেদন শুরু হয়েছে। যেহেতু প্রতিটি পাঠকৃতি আলাদা এবং পার্থক্যের প্রতীতি তার মৌল বৈশিষ্ট্য, নির্দিষ্ট আকরণ আবিষ্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই পার্থক্য অবশ্য আরোপিত কোনো অনন্যতা নয়, পাঠকৃতির নিজস্ব বয়ানের ফলশ্রুতি। মানুষের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে কত অজস্র সন্দর্ভ তৈরি হয়েছে পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে আমরা এই অন্তহীন প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হই। তবু একটি সার্থক পাঠকৃতি যখন নতুনভাবে রূপ পেয়ে যায়, তাকে আমরা পৃথক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। যদি কোনো কারণে প্রত্যাশা পূরণ না হয়, বিস্মৃতির কুয়াশা তাকে ঢেকে দেয়। মনে রাখা প্রয়োজন, সব পাঠকৃতি সমান অর্থবহ হয় না; বয়নের সামাজিক ও নান্দনিক রুদ্ধতা পাঠকের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাকে অনেকটা সীমিত করে দেয়। আবার কিছু কিছু পাঠকৃতি এমন থাকে যা পাঠককে তাৎপর্য সৃষ্টি করতে প্রেরণা দেয়। আসলে সার্থক পাঠকের পশ্চাৎপটে থাকে দীর্ঘকালীন পাঠ-অভিজ্ঞতা; ফলে তেমন পাঠক নিছক একক সত্তা নন, তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে বহুস্বরিক প্রতিবেদনের পরম্পরা। আভাঁগার্দ ধারার সাহিত্যিক সন্দর্ভে অবশ্য পাঠকের স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি। আকরণোত্তর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠকৃতি প্রধানত দু'ধরনের হয়ে থাকে প্রথম ধরনের সন্দর্ভ পাঠককে একটি পূর্বনির্ধারিত তাৎপর্যের গ্রহীতামাত্র করে রাখে, আর, দ্বিতীয় ধরনে পাঠক নিজেই হয়ে ওঠে অর্থের নির্মাতা ও সূত্রধার। প্রথম ধরনের পাঠকৃতি হল 'Readerly' (lisible) এবং দ্বিতীয় ধরনটি 'writerly' (Scriptible)। তার মানে, প্রথম ধরনের উৎপত্তি হয়েছে নিছক পড়ার জন্যে অর্থাৎ পাঠক সেখানে ভোক্তামাত্র এবং দ্বিতীয়টি লেখার জন্যে অর্থাৎ পাঠকের দ্বারা কার্যত পুনর্লিখিত বা পুনরুৎপাদিত হওয়ার প্রয়োজনে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, দ্বিতীয় ধরনের পাঠকৃতি রয়েছে কেবল তত্ত্বে কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এতক্ষণ যাকে আকরণোত্তর পরিসর বলেছি, একমাত্র তারই প্রেরণায় প্রয়োগেও তা সম্ভব। এ যে শুধু তর্কের খাতিরে বলা নয়, তার প্রমাণ ইদানীং সমালোচনা সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

তবে অবক্ষয়িত আধুনিকতাবাদের সন্দর্ভে এই পরিসর খুঁজে লাভ নেই। উপনিবেশোত্তর চেতনা, নারীচেতনা এবং আধুনিকোত্তর চেতনা যেখানে অনেকার্থদ্যোতনা ও বহুস্বরসঙ্গতির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে, সেখানে আকরণোত্তর পরিসর খুঁজে পাচ্ছেন সতর্ক ও সংবেদনশীল পাঠক। বার্ত বলেছেন 'This ideal text is a galaxy of signifiers, not a structure of signifieds; it has no beginning We gain access to it by several entrances none of which can be authoritatively declared to be the main one; the codes it mobilizes extend as far as the eye can reach.' পাঠকৃতির বহু প্রবেশদ্বারের মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নেওয়া যায়, এমনকী একাধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে সবই কোনো একটি সামাজিক ও নান্দনিক ভাবাদর্শকে ইতিবাচক বা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেতিবাচকভাবে পোষকতা করবে। প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদী বা প্রকরণবাদী কিংবা আকরণবাদী বা মনোবিকলনবাদী—যে-পদ্ধতি পাঠকৃতিতে প্রয়োগ করা হোক না কেন, পাঠকৃতির অনন্ত স্বরন্যাসের মধ্যে একটি বা দুটি মাত্র সক্রিয় করে তোলা সম্ভব। তাদের মধ্যে আপাত-ঐক্য না থাকলেও অনৈক্যের মধ্য দিয়ে সমগ্রের সংহতি গড়ে উঠতে পারে, গড়ে ওঠেও।

বার্তের মতো জাক লাকাঁ, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, গিলে ডেলিউজ, ফেলিক্স গুয়াত্তারি প্রমুখ তাত্ত্বিকও ভিন্ন ভিন্ন পথে আকরণোত্তর পরিসরে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। চেতনা, অবচেতনা, স্বপ্ন, প্রকল্পনা, প্রত্নকথা, আদিকল্প, প্রতীক, চিত্রকল্প, রূপক ইত্যাদি বিষয়ে চিরাগত ধারণাগুলি এঁরা পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্নির্মাণ করেছেন। মুখ্যত আকরণোত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য ও শিল্প আলোচনার বেশ কিছু পুরোনো পদ্ধতি আমূল সংস্কার করেছেন প্রাগুক্ত তাত্ত্বিকেরা। আখ্যানতত্ত্ব-লোকসংস্কৃতি-ইতিহাস-ভাষাতত্ত্ব-নারীচেতনাবাদ সমস্তই আন্তঃসমীক্ষা এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিপুল বিবর্তনশীল আবহে যুক্ত। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আকরণোত্তর পর্যায় নিয়ত সঞ্চরমান এবং প্রসারণশীল। তার লক্ষ্য, মানুষের জীবন-মনন-অনুভূতির সমবায়ী পাঠকৃতি রচনা। এ কাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী সত্তা। বিষয় নির্মাণ করছে বিষয়ীকে আর বিষয়ী খুঁজে নিচ্ছে তার জগৎ। এই প্রক্রিয়ার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। সমাজ গড়ে উঠছে ব্যক্তির মধ্যে আবার ব্যক্তি অনবরত ভাঙছে তার নিজস্ব ও সামাজিক চৈতন্যকে। ভাষা রূপ নিচ্ছে আকাঙ্ক্ষার সূত্রে আবার আকাঙ্ক্ষা সত্তাবান হচ্ছে ভাষায়। একে অপরের প্রতিবেদনে হস্তক্ষেপ করছে বলেই অস্তিত্ব হয়ে উঠছে সক্রিয় সংগঠন। কেননা পরস্পর পরস্পরকে বদলে নিচ্ছে বলে জীবন ও জগৎ কখনও একমাত্রিক হচ্ছে না, চলিষ্ণুতার প্রেরণায় ছুটে চলেছে এক তাৎপর্য থেকে অন্য তাৎপর্যের দিকে। আকরণোত্তর চেতনার সবচেয়ে বড়ো জোর এই গতি ও বিবর্তনে, সম্ভাবনা থেকে প্রয়োগে রূপান্তরিত হওয়ার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায়। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠেন মিখায়েল বাখতিন; তাঁর ভাববিশ্ব আকরণোত্তরবাদী বীক্ষণের দর্পণে নতুন তাৎপর্য পেয়ে যায় যেন। সত্তা ও অপরতার সমান্তরাল সম্পর্কের দর্শন আমাদের কাছে এমন এক আশ্চর্য কৃৎকৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যার প্রভাব আকরণোত্তরবাদী সাহিত্যতত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয় শুধু, আমাদের ব্যক্তিজীবন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন তাতে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। চিন্তা-চেতনার নানা স্তরে যত প্রতিস্রোতের তুমুল বিভঙ্গ তৈরি হচ্ছে, আকরণোত্তর পরিসর সমৃদ্ধতর হচ্ছে তত। বিচিত্র কৌণিকতা আর উচ্চাবচতার মধ্য দিয়ে মানবিক সম্ভাবনার পারাপারহীন শৌর্য ও সৌন্দর্য গড়ে তুলছে বহুস্বরসঙ্গতির নতুন-নতুন আধার ও আধেয়। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এখনও আকরণোত্তরবাদ সম্পর্কে ভরতবাক্য উচ্চারণের সময় আসেনি; গ্রহীতা হিসেবে নিজেদের সর্বদা প্রস্তুত রাখার জন্যে সতর্ক মনোযোগকে শাণিত করাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড়ো দায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিনির্মাণবাদ

বিনির্মাণবাদ আকরণোত্তর চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আয়ুধ হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম যদিও একে স্বতন্ত্র দর্শন বলে মান্যতা দিতে সকলে রাজি নন। জীবন ও জগতের অজস্র পাঠ যত রচিত হয়ে চলেছে, জটিলতা আর পরস্পর-সাপেক্ষতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনের তাৎপর্য বোঝার জন্যে সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তার পরিমাপ করা জরুরি। আর, ঠিক এখানেই, সামাজিক ও নান্দনিক অস্তিত্বের নির্মিতিবিজ্ঞানকে বোঝার জন্যে কার্যকরী হয়ে ওঠে বিনির্মাণের আকল্প। এ ব্যাপারে সর্বজনমান্য পথিকৃৎ হচ্ছেন জাক দেরিদা (১৯৬৬ সালে আমেরিকার জন্স্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাচক্রে তিনি 'Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences.' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। সর্বতোভাবে এই নিবন্ধটি ছিল যুগান্তকারী। কেননা এরই সূত্র ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ধরনের তাত্ত্বিক বয়ানের জন্ম হয়। প্লেটোর সময় থেকে পাশ্চাত্য দর্শন যেসব মৌলিক আধিভৌতিক ভিত্তিকে যথাপ্রাপ্ত ধারণার মর্যাদা দিয়ে এসেছে, বিনির্মাণবাদ তাদের সম্পর্কেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। দেরিদা বলেছেন, আকরণবাদী তত্ত্বের মধ্যেও আকরণের ধারণা কোনো-না-কোনো তাৎপর্যের কেন্দ্রকে সর্বদা পূর্বানুমান করে এসেছে। এই 'কেন্দ্র' আকরণের নিয়ন্তা কিন্তু নিজে কখনও আকরণবাদী বিশ্লেষণের আধেয় নয়। কেন্দ্রের আকরণ খুঁজতে চাই যদি, আমরা অবধারিতভাবে আরেক কেন্দ্রের নির্মিতিতে গিয়ে পৌঁছাব। তৈরি হবে অন্তহীন পরম্পরা। মানুষের চিন্তা কেন্দ্রহীন হয় না কখনও, হয় না আকরণশূন্যও। আবার যেহেতু প্রক্রিয়া চলমান, মুহূর্তের পরে মুহূর্ত, পরিসরের পরে পরিসর গড়ে তোলে অনন্ত কেন্দ্র, অনন্ত আকরণ। মানুষ কেন্দ্রকে আকাঙ্ক্ষা করে কারণ তাতে প্রতিটি সত্তার উপস্থিতি অনুভবগম্য হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আমাদের জীবনযাপনের কায়িক ও মানসিক অনুষঙ্গগুলি সর্বদা 'আমি' কেন্দ্রিক। আমি আছি তাই জগৎ আছে, আমি আছি নির্দিষ্ট সময়ের আকরণে, পরিসরের সানুপুঙ্খ বিস্তারে। সময় ও পরিসরে ব্যক্ত-হওয়া সমস্ত কাঠামোর মধ্যে অহং-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে মূল ঐক্য-সূত্র হিসেবে।

প্রতীচ্যের চিন্তাবিদেরা কেন্দ্রায়নের মৌল আকল্পকে নানা ধরনের পারিভাষিক পরিচয় দিয়েছেন সত্তা, নির্যাস, মুখ্য উপাদান, সত্য, প্রকরণ, সূচনাবিন্দু, উপসংহার-প্রতীতি, উদ্দেশ্য, চেতনা, মানবস্বরূপ, ঈশ্বর প্রভৃতি। এইসব পারিভাষিক প্রয়োগের বাইরে কোনো সম্ভাব্য ভাববিশ্বের কথা দেরিদা কিন্তু বলতে চাননি। কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না কোনো একটি নির্দিষ্ট ধারণার আকরণকে ভাঙতে গিয়ে যদি আবার ঐ ধারণার সঞ্চালক ভিত্তিতে বন্দী হয়ে যেতে হয়—তাহলে বিনির্মাণপন্থা হারিয়ে যাবে চোরাবালিতে। যেমন, ধরা যাক, চেতনার কেন্দ্রায়নপ্রবণ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে যদি অবচেতন্মর প্রতিস্রোত দিয়ে তার নিরবচ্ছিন্নতাকে ভেঙে দিতে চাই—কার্যত এক কেন্দ্রের বদলে অন্য আরেক কেন্দ্রের আশ্রয়ে চলে যাওয়ার বিপত্তি দেখা দেয়। চেতনা-অবচেতনার দ্বৈততাময় ভাববিশ্বকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে আমরা তাদের অনিবার্য দ্বিবাচনিকতায় প্রবেশ করি। সুতরাং শরীর/আত্মা, ভালো/মন্দ, আলো/অন্ধকার, গম্ভীর/লঘু জাতীয় দ্বিমেরুবিষম বিভাজন ঘটিয়ে দেয় যে-চিন্তাপদ্ধতি, তার প্রভাবে কোনো একটি মেরুকে কেন্দ্র এবং একতম অস্তিত্ব বলে মেনে নেওয়ার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয় আমাদের।

দেরিদা তাঁর বিশ্বখ্যাত বই 'Of Grammatology-তে কেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষাকে 'বাক্‌কেন্দ্রিকতা' ('logocentrism') বলেছেন। গ্রিক ভাষায় বাক্ হলো 'logos' এবং ব্যঞ্জনায় তাকে জ্ঞানও বলা যেতে পারে। ভারতীয় ঐতিহ্যে অনুরূপ ব্যাপারটি ঘটেছে 'বেদ'-এর ক্ষেত্রে। 'বেদ' কথাটির উৎস-ধাতু হলো 'বিদ্' যার অর্থ জ্ঞান। তার মানে 'বেদ' হল শব্দরাশি, জ্ঞান, মহাগ্রন্থ, সমস্ত ভাবনার আকর। 'logos' এর-ই মতো। ভারতীয় ঐতিহ্যে বাক্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, আবার স্বয়ং ঈশ্বর এবং শব্দপুঞ্জ। ইউরোপীয় সংস্কৃতির আদিপর্বে যদি দৃষ্টিপাত করি, দেখব, বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে বাক্ বা শব্দকে প্রভূত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জাগতিক বস্তু বা অস্তিত্বের উৎস হিসেবে অর্থাৎ সার্বিক উপস্থিতির রূপক বলে বর্ণনা করে হয়েছে বাক্‌কে 'In the beginning was the Word.' একটিমাত্র আদি কারণের 'কার্য' বা পরিণতি হলো গোটা জগৎ, এই মানববিশ্ব। আদিশব্দ সমস্ত পরবর্তী উচ্চারণের নিয়ন্তা। এই কথাগুলি অনিবার্যভাবে আমাদের ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতীয় বিশ্বাসেও নাদব্রহ্ম বা ওঙ্কার সমস্ত অস্তিত্বের উৎস ও নিয়ন্তা। বাক্‌রূপী ঈশ্বর অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান। তাঁর আলোয় সমস্ত আলোকিত, তাঁর গতিতে সমস্ত কিছু চলিষ্ণু 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। বেদ অপৌরুষেয়, স্বয়ংপ্রকাশ; বাণী আগে ব্যক্ত হয়েছে ত্রিকালদর্শীদের কাছে, বহুকাল পরে তা লিখিতরূপ পেয়েছে। তাই বাক্ বা বাচনিক উচ্চারণের গুরুত্ব 'লেখা'র চেয়ে অনেক বেশি। এই বিশ্বাস দেরিদারও; তাঁর উত্থাপিত 'বাক্‌কেন্দ্রিকতা' বা 'logocentrism' এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লেখার তুলনায় বাচনের শ্রেষ্ঠত্ব। একে তিনি বলেছেন 'phonocentrism' বা ধ্বনিকেন্দ্রিকতা। ভারতীয়দের কাছে যেমন 'বেদ' তেমনি ইউরোপীয়দের কাছে 'বাইবেল' বাক্‌কেন্দ্রিকতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাইবেলের লিখিত রূপ আজ আমাদের কাছে সুলভ হলেও ঈশ্বরের বাণী প্রাথমিকভাবে কথ্য। তাই মানববিশ্ব মানে কথনবিশ্ব। ভিন্ন ভিন্ন অনুপুঙ্খের সমবায়ে সমগ্রের প্রতীতি গড়ে উঠছে অহরহ। প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে চাই যদি, অংশ ও সমগ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্বয়সূত্র আগে স্পষ্ট করে নিতে হবে। আর, তা সম্ভব হতে পারে কেবল কথনবিশ্বের বিনির্মাণে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

অন্যত্র লিখেছি, মানুষের জগৎ আসলে চিহ্নায়কের পরম্পরায় গ্রথিত জগৎ। তার উপস্থিতি অমোঘ। তবু, অস্তিত্ব ও জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও ঐ উপস্থিতি খণ্ডিত হয়ে পড়ে, ঝাপ্‌সা হয়ে যায় প্রতীতি। নিঃসন্দেহে এই বিপ্রতীপতা বা খণ্ডায়নও তাৎপর্যশূন্য নয়। এমন ঘটে কেন, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। এখানে আপাতত দেরিদার বিখ্যাত আবিষ্কার 'পার্থক্যবোধ'-এর তত্ত্ব উল্লেখ করা যায়। ফরাসি ভাষায় যাকে 'difference' বলা হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে দ্ব্যর্থবোধকতা অর্থাৎ দুটি অর্থের টানাপোড়েন। একটি অর্থ হল, দ্বিমত পোষণ করা এবং দ্বিতীয়টি মুলতুবি রাখা। প্রথমটি হল পরিসর সংশ্লিষ্ট ধারণা; চিহ্ন উদ্ভূত হয় পার্থক্যবোধের পদ্ধতি থেকে। কেননা কোনো পদ্ধতি নিরেট নয়, জট-পাকানোও নয়; পরিসরের শৃঙ্খলাকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, তা আসলে পরস্পর ভিন্নতার সমাবেশ। অন্যদিকে, দ্বিতীয়টি সময়-সম্পৃক্ত, কেননা, যখন আমরা কোনো কিছু মুলতুবি রাখার কথা বলি, তার মানে দাঁড়ায়, কোনো উপস্থিতিকে একটি সময়পর্ব থেকে অন্য সময়পর্বে সঞ্চালিত করি। আমাদের প্রতীতির জগতে চিহ্নায়কেরা কখনও কখনও উপস্থিতির বোধকে নিরন্তর এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সরিয়ে দেয়। ফলে জগতের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে পার্থক্যের উপলব্ধিও হয়ে ওঠে অনবরত জায়মান এক প্রক্রিয়া। একটু আগে যে ধ্বনিকেন্দ্রিক চিন্তার কথা বলেছি অর্থাৎ যেখানে লিখনের চেয়ে বাচনের গুরুত্ব বেশি—তা ঐ পার্থক্যবোধকে উপেক্ষা করতে চায় এবং উচ্চারিত বাক্‌কে স্বত-উপস্থিত বলে মনে করে। এ বিষয়ে দেরিদার চিন্তাকে অনুসরণ করে দেখি যে বাচন তার নিয়ামক চিন্তা-উৎসের কাছাকাছি। আমরা যখন কাউকে কথা বলতে শুনি, এই কথা সুনির্দিষ্ট উপস্থিতির স্মারক বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু লেখাকে আমরা সেরকম মনে করি না।

বস্তুত ধ্বনিকেন্দ্রিকতা লিখনকে বাচনের অশুদ্ধ রূপ বলে মনে করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোনো বিখ্যাত অভিনেতা, বাগ্মী বা রাজনৈতিক নেতার কথার মধ্যে তাঁর উপস্থিতি তীব্রভাবে স্পন্দিত হয়, বাচনে বক্তার বিশিষ্ট অস্তিত্ব অনুভবগম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু লেখায় লেখক সর্বদা পূর্বধার্য কোনো পদ্ধতির অনুষঙ্গে ব্যক্ত হয়ে থাকেন। তাই কথার মতো মৌলিকতা লেখার মধ্যে দেখা যায় না এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশক না হয়ে তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদক। কথায় বক্তার উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু লেখায় লেখকের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। লেখাকে ইচ্ছেমতো পুনরাবৃত্ত করা যায়; ছাপাখানার দৌলতে বহুবার ছাপা হতে পারে, অনেক দূরবর্তী প্রজন্মের কাছেও পৌঁছে দেওয়া যায়। লেখার এই পুনরাবৃত্তি অনিবার্যভাবে বিশ্লেষণ ও পুনর্বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু কোনো কথার ক্ষেত্রে এমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি তা হয়ও, উচ্চারণ-মুহূর্তের মৌলিকতা ধ্বংস না-করে বিশ্লেষণ শুরু হবে না কখনও। যখনই প্রত্যক্ষ বাচন পরোক্ষ বাচনে রূপান্তরিত হল, সেই মুহূর্তে তা উদ্ভব-ক্ষণের সত্যতা থেকে দূরে সরে গেল এবং হয়ে উঠল নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ব। বাচনকে বিশ্লেষণের আধেয় করতে চাই যদি, তাকে আগে লিখিত রূপে পুনর্বিন্যস্ত করে নিতে হবে।

যন্ত্রগ্রাহকের সাহায্যে যদি সংরক্ষিত না করি, কোনো কথকের উচ্চারিত ধ্বনি চিরকালের মতো শূন্যে মিলিয়ে যাবে। তাদের কেউ কখনও ফিরিয়ে আনতে পারে না, তাই বাচন অনন্য এবং শূন্য। উৎস-চিন্তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অভিব্যক্ত এবং অপরিবর্তনীয় বলে পরবর্তী কোনো লিখন-মুহূর্তের মতো তাকে রূপান্তরিত করার কিছুমাত্র সুযোগ নেই। ফলে কথনবিশ্বে প্রতিটি মুহূর্ত অনন্তে পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু লিখনবিশ্বে বহতা কাল ও পরিসর বিধৃত হচ্ছে একক মুহূর্তের দর্পণে। দার্শনিকেরা এইজন্যে প্রায়ই লেখার চেয়ে বাচনকে সত্যের প্রতিবেদন গড়ে তোলার পক্ষে বেশি উপযোগী ভেবেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, লিখিত সন্দর্ভ মূল চিন্তাস্রোতকে অনেকটা বদলে দেয়, তাই কার্যত তা দার্শনিক সত্যের মান্যতাকে ধ্বস্ত করে। সত্য সর্বদা বিশুদ্ধ চিন্তার ওপর নির্ভরশীল, তাই লিখিত রূপান্তরে তা নির্মাণের উপকরণ দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। উপকরণ-বিন্যাস অনিবার্যভাবে বাহুল্যের দিকে ঝুঁকতে থাকে বলে চিন্তার শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা লিখিতরূপে শেষ পর্যন্ত অস্পষ্টতার মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে চলে যায়। এইজন্যে লেখা ও কথার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেরিদা এই দুইয়ের মধ্যে 'violent hierarchy'-এর দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছেন। কথাকে প্রধান এবং লেখাকে গৌণ ধরে নেওয়ার ফলে যে উঁচু-নিচু পর্যায়ক্রমটি ইউরোপীয় দার্শনিক পরম্পরায় তৈরি হয়েছে, তার মৌল অন্বিষ্ট হল, অস্তিত্বের উপস্থিতিকে জাগিয়ে রাখা। কিন্তু এই ক্রম যদি অনড়, অচল ও অমোঘ হত, তাহলে অবধারিতভাবে সত্যের প্রতীতিও খণ্ডিত হয়ে পড়ত। তাই উঁচু-নিচুর ধারণাটি যখন একটি আকরণে পরিণত হয়, তাকে অস্বীকার করার প্রবণতাও দেখা দেয়। বস্তুত একে ধ্বস্ত করে এবং বিপরীতমুখী করে তুলে পাথর ফুঁড়ে ঝরনাধারা বেরিয়ে পড়ার মতো আবির্ভূত হয় নতুন চিন্তা-প্রকরণ। তখন দৃষ্টির রৈখিকতাও ভেঙে যায়। আমরা লক্ষ করি, কীভাবে কথা এবং লেখা—এই উভয়ই কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অংশিদার। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একে উল্লেখ করেছি 'writerly' পাঠকৃতি হিসেবে। তখন উভয়ই এমন চিহ্নায়ক প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে যাদের মধ্যে অস্তিত্বের উপস্থিতি খানিকটা অস্পষ্ট। তাই একটু আগে যাকে উঁচু-নিচুর পর্যায়ক্রম বলেছি, তার অস্বীকৃতি সম্পূর্ণ করে নিতে হয় সামূহিক বিপর্যাসে, পরিকল্পিত বিপ্রতীপতায়। তখন কথাকে বর্ণনা করা যায় লেখারই এক বিশিষ্ট ধরন হিসেবে। দার্শনিক ধারণার ক্ষেত্রে এই যে মেরুবদল ঘটল, তা হল দেরিদা-উত্থাপিত বিনির্মাণের প্রথম ধাপ।

তিন

কথা/লেখা এই যুগ্মকের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা অস্থির ও পরিবর্তনশীল, তা বোঝানোর জন্যে দেরিদা 'পরিপূরক' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের মনে পড়ে, এর আগে রুশোর কাছে লেখা ছিল কথার নিছক সম্পূরক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাত্র; নিতান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কথায় যুক্ত হলে তাকে লেখা বলা হয়। কিন্তু দেরিদা ঠিক এভাবে বলেননি; মূল ফরাসি ভাষায় 'suppleer' শুধু পরিপূরক হওয়া বোঝায় না, অন্যের স্থান নেওয়া অর্থাৎ বিকল্প হয়ে ওঠাও বোঝায়। দেরিদা এভাবে বলতে চান যে, লেখা কথার পরিপূরক মাত্র নয় কেবল, বিকল্পও বটে। এর কারণ, বাচন সর্বদা লেখার মধ্যে পূর্বানুসৃত। বস্তুত দেরিদার সিদ্ধান্ত হল, সমস্ত মানবিক ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই পরিপূরকত্ব অর্থাৎ একই সঙ্গে সংযোজন ও বিকল্পায়ন; যেমন, আমরা যখন বলি যে সভ্যতার পূর্বসূরি হচ্ছে প্রকৃতি, সে-সময় প্রাগুক্ত 'violent hierarchy'-এর দৃষ্টান্ত পেয়ে যাই। প্রকৃতির শুদ্ধ উপস্থিতি সভ্যতার বীজ দ্বারা যখন সংক্রামিত হল, ঐ শুদ্ধতা আর বজায় থাকল না। তার মানে, একটি নতুন সম্পূরক উপাদান যুক্ত হয়ে যথাপ্রাপ্ত স্থিতাবস্থাকে আমূল পাল্টে দিল। কেউ কেউ অবশ্য একথা বলতে পারেন যে, কথা/লেখার যুগ্মকের মতো, প্রকৃতিও সর্বদা সভ্যতার দ্বারা সংক্রামিত। সেক্ষেত্রে মৌলিক প্রকৃতি বলে কিছু নেই, আমরা কল্পিত শুদ্ধতার কথা বলে আসলে এক প্রত্নকথাকে মান্যতা দিতে চাই। মঙ্গল/অমঙ্গল কিংবা পাপ/পুণ্য অথবা ভাল/মন্দ-এর এ-জাতীয় সংযোজন/বিকল্পায়ন প্রক্রিয়া আমরা বিশ্বসাহিত্যের নানা পাঠকৃতিতে আবিষ্কার করতে পারি। তাতে দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্ব সমর্থিত হয়।

মোদ্দা কথা হলো পাঠের সূচনায় পাঠক লক্ষ করেন উঁচু-নিচুর পর্যায়টিকে; পরবর্তী ধাপে পাঠক এই পর্যায়ের মধ্যে মেরুবদল ঘটাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং চূড়ান্ত পর্বে নতুন কোনো বর্গীকরণ প্রতিহত করার জন্যে বিকল্পায়নের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন। বিনির্মাণবাদী পাঠে যথাপ্রাপ্ত সন্দর্ভকে এক ধরনের পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে আমূল রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এক মেরু অন্য মেরুর স্থান নেওয়াতে এবং নানা ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প প্রকট হওয়াতে যথাপ্রাপ্ত পরিসর পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে। বিপ্রতীপতা ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গ্রন্থনার পুরোনো যুক্তি-শৃঙ্খলা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাঠকৃতি তখন কার্যত টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। এ সম্পর্কে দুজন প্রাজ্ঞ সমালোচক মন্তব্য করেছেন 'Deconstruction can begin when we locate the moment when a text transgresses the laws it appears to set up for itself' (সেল্‌ডেন ও হ্বিড্ডোওসোন ১৯৯৩ ১৪৭)। নিজের জন্যে তৈরি-করা নিয়মকে যখন নিজেই ভেঙে ফেলতে চায় পাঠকৃতি, তখন প্রতিটি প্রতিবেদন কার্যত এক রণক্ষেত্রের দ্যোতনা নিয়ে আসে।

এইজন্যে বিনির্মাণবাদের মতো ক্রিয়াত্মক তত্ত্ব নিঃসন্দেহে বিরল। শুধু যে আখ্যানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য এমন নয়, কবিতার বয়ান বিশ্লেষণের পক্ষেও তা বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হতে পারে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু বিনির্মাণবাদী পাঠ ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে, যা সমালোচনাত্মক সন্দর্ভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পালাবদলের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। উপন্যাস, ছোটগল্প ও কবিতার ক্ষেত্রে সার্থক বিনির্মাণবাদী পাঠ উপস্থাপিত করেছেন কোনো কোনো সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক। বস্তুত একালে আরও উদ্যম যুক্ত হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনঃপঠিত ও পুনর্লিখিত হবে। সংযোজন/

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিকল্পায়ন সম্পর্কে যে বক্তব্য একটু আগে উপস্থাপিত হয়েছে, তার সার্থক প্রয়োগে বাঙালির বিবর্তনপ্রবণ সাংস্কৃতিক পাঠকৃতিতে পুরোপুরি নতুন চিহ্নায়ক পরম্পরা উদ্ঘাটিত হবে।

দেরিদার নিবন্ধ 'Signature Event Context' অনুসরণ করে আমরা লেখার তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হই। প্রথমত কোনো লিখিত চিহ্নকে তার উত্থাপক বিষয়ীর অনুপস্থিতিতেও পুনরাবৃত্ত করা যায়। সাধারণত সুনির্দিষ্ট একটি প্রসঙ্গ এবং গ্রহীতার উপস্থিতিতে ঐ চিহ্ন নির্দিষ্ট রূপ অর্জন করে। কিন্তু প্রাগুক্ত বিষয়ী এবং ঐ প্রসঙ্গ গ্রহীতার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবেও চিহ্নকে ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয়ত লিখিত চিহ্ন সাধারণত একটি প্রকৃত প্রসঙ্গ এবং লেখকের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু পরবর্তী কোনো সুযোগে পুরোপুরি ভিন্ন প্রসঙ্গে এবং লেখকের অভিপ্রায়ের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবে, পাঠক তাকে পাঠ করতে পারেন। এভাবে দেখা যায়, কোনো এক নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের চিহ্নপরম্পরাকে অন্য আরেক প্রতিবেদনে ভিন্ন অনুষঙ্গে উপস্থাপিত করা যায়। তৃতীয়ত লিখিত চিহ্নকে দু-ভাবে পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এক, কোনো একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন-পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে তাকে অন্য কোনো কালের পরিধিতে যুক্ত করা যায়। এই তিনটি সূত্র অনুযায়ী লেখাকে কথা থেকে আলাদা করে চেনা যায়। একটা প্রশ্ন অবশ্য দাঁড়িয়ে যায় এখানে। যদি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নায়কদের ইচ্ছেমতো পুনরাবৃত্ত করা যায়, তাহলে তাদের মান্যতা থাকে কী করে? কেননা আমরা তো ইতিমধ্যে জেনেছি, তাৎপর্য সব সময় প্রসঙ্গ-নির্ভর। সেক্ষেত্রে লেখা কি অনেকটা দায়িত্বশূন্য হয়ে যাচ্ছে না? কূট প্রশ্ন বলে একে এড়িয়ে যাওয়া চলে না, কেননা, সামাজিক ও নান্দনিক ভাবাদর্শের অন্বয়-অনন্বয় কিংবা প্রাসঙ্গিকতা-অনিবার্যতা সংক্রান্ত সমস্যাও সমাধান দাবি করছে। উঁচু-নিচু অবস্থানের পর্যায়ক্রমকে বিনির্মাণ করি যখন, কোন্ ধরনের চিহ্নায়ক পুনরাবৃত্ত হবে আর কোনগুলি স্থির থাকবে—তা ঠিক করে নিতে হয় মেরুবদলের পরে। তখন কথার অন্তরালে অন্য কথা, রূপের অন্তরালে অন্যরূপ, সম্পর্কের অন্তরালে অন্য সম্পর্ক চোখে পড়ে। আসলে দৃষ্টিও সেই স্বেচ্ছাবৃত বিপর্যাসের পরে পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে। যা এতদিন ছিল অন্ধকারে রুদ্ধ, সেখানে দেখা দেয় আলোর ঝল্‌কানি, আলো কিন্তু চোখ ধাঁধায় না, দেখার দিগন্তকে বাড়িয়ে দেয়। পুরোনো পাঠ থেকে ঝলসে ওঠে আশ্চর্য নতুন, এমন কি অভাবনীয়, পাঠকৃতির রৌদ্রবলয়। বিনির্মাণ পাঠকৃতিকে নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত থাকতে দেয় না, তাকে করে তোলে সক্রিয়, প্রাণবান, জগৎ-জীবনের স্পন্দন সম্পর্কে চির-উৎসুক। প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক তাই কাব্যিকতার ছোঁয়া এনে উচ্চারণ করেন 'Text is a performance'। এই শিল্পিত উপস্থাপনা হতেই পারে না যতক্ষণ দেরিদা-কথিত চিহ্নায়িকের পর্যায়ক্রম অন্য প্রেক্ষিতে পুনরাবৃত্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হচ্ছে। একেই রোলাবার্ত বলেছেন 'always already written'। তার মানে, যা আছে তা আগেই প্রতিবেদনের গভীরে সম্ভাবনা হিসেবে নিহিত ছিল। এই চির-উপস্থিতকে বাঙ্ময় করে তুলতে হয় সমস্ত অনুপস্থিতির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে। তখনই পুরোনো তটরেখা জুড়ে দেখা দেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবীন তাৎপর্যের জলোচ্ছ্বাস। চূড়ান্তভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় লিখনবিশ্ব। বলা বাহুল্য, এই রূপান্তরে সংযোজন-বিকল্পায়নের বিনির্মাণবাদী প্রক্রিয়া খুব সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বিনির্মাণ পন্থার বিপুল প্রভাবে সমসাময়িক বেশ কিছু প্রধান বৌদ্ধিক ঐতিহ্য নিজেদের কৃৎকৌশল ও আধেয় সম্পর্কে মৌলিক পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। সম্ভবত এরই ফলে আপাতদৃষ্টিতে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। যেমন, মার্ক্সবাদের সাম্প্রতিক আলোচকেরা বিনির্মাণবাদের সঙ্গে দার্শনিক সাযুজ্য খুঁজে পাচ্ছেন। আসলে মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছু এখন আর অসম্ভব নয়। একদিকে ভেঙে যাচ্ছে সমস্ত রৈখিকতা, অন্যদিকে মুছে যাচ্ছে আরোপিত ঐক্যবোধ। এসময়ের দাবি হচ্ছে, দৃষ্টির বহুত্ব এবং অনেকার্থদ্যোতনার প্রেরণা। শৃঙ্খলা আর আকরণের কাছে নির্বিচার আনুগত্য নয় আর, এখন কাম্য উদার ও মুক্ত বিশ্লেষণী সমালোচনার পাঠ, একাত্ম হওয়ার পরিচয়সূত্র নয়, পার্থক্যের প্রতীতি। আর, সবার ওপরে, ভাবকল্প ও চিন্তাপ্রণালীর সার্বভৌমত্ব ও সমগ্রায়ন সম্পর্কে সংশয়। শুদ্ধতার নামে অনড়তা নয়, গতির মূল্যে নিরীক্ষা অর্জন কাম্য এখন। এইসব কিছু সম্ভব হয়েছে বিনির্মাণের মনন ও আবেগে। তাই সময়ের প্রেরণায় মাইকেল রিয়ান তাঁর বহু আলোচিত 'Marxism and Deconstruction' (১৯৮২) বইটি লিখে আমাদের জন্যে চিন্তাসূত্র উপহার দিয়েছেন। এভাবে বিভিন্ন প্রচলিত দর্শনপ্রস্থানে বিনির্মাণবাদ এনে দিয়েছে নতুন তরঙ্গাভিঘাত। চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে গেছে, সম্ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত মুক্ত হওয়াতে সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকেরা কার্যত হয়ে উঠেছেন অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক। ইউরোপের দেশে দেশে যেমন প্রসারিত হয়েছে নতুন চিন্তাবলয়, তেমনি আমেরিকায়ও তার বিপুল প্রভাব দেখা গেছে। 'নব্য সমালোচক'দের প্রকরণবাদ দীর্ঘকাল ধরে যে তাত্ত্বিক শৃঙ্খলের অভ্যস্ততা এনে দিয়েছিল, তাকে ভেঙে ফেলার জন্যে চেষ্টা করছিলেন মার্কিন চিন্তাবিদেরা। নথ্রপফ্রাইয়ের প্রত্নকথা সমালোচনা, লুকাচের হেগেলীয় মার্ক্সবাদ, ফরাসি আকরণবাদ— বিভিন্ন সময় বিপ্রতীপ ভাবনার আয়ুধ হয়ে উঠেছে। তাতে প্রাগুক্ত শৃঙ্খলটি খানিকটা শিথিল হলেও ঈপ্সিত মুক্তি আসেনি। বিনির্মাণবাদ যখন দেরিদার প্রাগুক্ত বিখ্যাত নিবন্ধ পাঠের সূত্রে আমেরিকার তত্ত্বজগতে উপস্থিত হল, এল সেই কাঙ্ক্ষিত পর্বান্তরের মুহূর্ত।

চার

জে. হিলিস মিলের, পল দ্য ম্যান, জিওফ্রে হার্টম্যান এবং হ্যারল্ড ব্লুম—মূলত এই চারজন সমালোচককে আমেরিকায় বিনির্মাণবাদের মুখ্য পরিপোষক বলা হয়ে থাকে। দেরিদার বিখ্যাত নিবন্ধ যখন আমেরিকার বিদ্বৎ-সমাজে অভূতপূর্ব আলোড়ন তৈরি করে, সেসময় তাঁরা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। মূলত তাঁদের চেষ্টায় বিনির্মাণবাদ একটি প্রণালীবদ্ধ তাত্ত্বিক আন্দোলনের রূপ নেয়। পরে অবশ্য তাঁদের কেউ কেউ ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যত্র চলে যান। কিন্তু বিনির্মাণবাদের সঙ্গে ইয়েল-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমালোচকদের নাম ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে প্রাগুক্ত চারজন তাত্ত্বিকদের মধ্যে অভিন্ন চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল বস্তুত অন্য যে-কোনো ধারার মতো এদের মধ্যেও পারস্পরিক পার্থক্য অনেকখানি। তবু কিছু কিছু সাধারণ প্রত্যয়, দৃষ্টিভঙ্গি, সমালোচনার অন্তর্বস্তু যেহেতু তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়েছে এবং 'Deconstruction and Criticism' (১৯৭৯) নামক প্রবন্ধ সংকলনে একে অপরের উল্লেখ করেছেন বারবার এবং বক্তব্য থেকেও ঐক্যসূত্র প্রমাণিত হচ্ছে— তাঁদের দার্শনিক প্রস্থানভূমি যে অভিন্ন, এতে সংশয়ের কারণ নেই কোনো। তবে এঁরা প্রত্যেকে সাহিত্যসমালোচক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি ১৯৬৬ সালের আগেই অর্জন করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ঐ বছর দেরিদার বিখ্যাত বক্তৃতা আলোড়ন তৈরি করার আগেই তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এমনও নয় যে দেরিদার ভাবশিষ্য হওয়ার জন্যে তাঁরা নিজেদের মানসিক প্রবণতাগুলি আমূল পালটে নিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে ১৯৬৬ এর পূর্ববর্তী রচনাগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ বছরটি তাঁদের চিন্তাজগতে জলবিভাজনরেখার কাজ করেছিল, এইমাত্র।

মিলের-ম্যান-হার্টম্যান-ব্লুম যে একইভাবে দেরিদার প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়েছেন, এমনও নয়। ব্লুম তো বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেরিদাকে অস্বীকারও করতে চেয়েছেন। আমেরিকায় এই মনীষীর প্রভাব এমনভাবে বিদ্বৎবর্গকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল, যে চিন্তা-চেতনার নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার পক্ষে একান্তিক স্বীকৃতিও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যাই হোক, ইউরোপে যেভাবে ফরাসি বিদ্বানদের মধ্যে আকরণোত্তরবাদ একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে, আমেরিকায় সেভাবে বিনির্মাণবাদ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। বরং বলা যায়, নব্য সমালোচকদের মধ্যে সাহিত্যতাত্ত্বিকদের আন্দোলন একটি প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করেছিল, আর, ঐ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ইউরোপ থেকে পাওয়া আকরণবাদী চিন্তাকে তাঁরা নিজস্ব ধরনে প্রসারিত করেছেন। এতে চিন্তাপ্রকরণের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে; আবার, তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধন ও পরিমার্জন ঘটানোর ফলে আকরণোত্তর চেতনার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ বিনির্মাণবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁদের আরেকটি বড়ো কৃতিত্ব এই যে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মীমাংসায় পৌঁছাতে গিয়ে প্রাগুক্ত সমালোচকেরা নিছক সাহিত্যতত্ত্বের জমিতে নিজেদের আবদ্ধ রাখেননি। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের চিন্তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছেন, দেরিদা শুধু তাঁদের দৃষ্টিকে নব্য চেতনাপ্রস্থানের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। ফলে তত্ত্ববিশ্ব প্রসারিত হয়েছে আরও; পথিকেরা প্রচলিত পথের বাইরে পা বাড়িয়েছেন কিন্তু এই নব্য পরিক্রমায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরম্পরা নিবিড়তরভাবে আত্তীকৃত হয়েছে। দৃষ্টির সীমানা সরে গেছে আরও দূরে, সম্ভাবনার অকর্ষিত ক্ষেত্রে তাঁরা উদ্যম গ্রহণের প্রেরণা পেয়েছেন।

বিনির্মাণ নামক পারিভাষিক শব্দটিকে কী দৃষ্টিতে দেখছেন পল দ্য ম্যানের মতো যশস্বী সমালোচক, এটি বোঝার জন্যে তাঁর একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি 'Literature as well as criticism – the difference between them being delusive is condemned (or privileged) to be for ever the most rigorous

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

and consequently the most unreliable language in terms of which man names and transforms himself.' (১৯৭৯ ১৯)। এই ভাবনার সূত্রে বুঝতে পারি, জীবনের প্রতিবেদনকে সংক্রামিত ও রূপান্তরিত করার দায় বহন করে সংবেদনশীল মানুষ। আবার সাহিত্যিক পাঠকৃতি এবং সমালোচকের সন্দর্ভ গড়ে ওঠে নানা ধরনের কূটাভাসের মোকাবিলা করতে করতে, এই ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে।সাহিত্য ও সমালোচনার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে নিছক 'আপাত ধারণা' বা 'বিভ্রম' বলে নস্যাৎ করে দিই যদি, প্রাথমিক বিচারে কজন তা গ্রাহ্য মনে করবেন? দ্য ম্যান যাকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ ভাবছেন, একই সঙ্গে তা আবার সবচেয়ে অবিশ্বস্ত হয় কী করে? এই দুই প্রবণতার অসম মিলনে যে-পরাভাষা উদ্ভূত হচ্ছে, তা কীভাবে মানববিশ্বের পরিচায়ক হতে পারে কিংবা রূপান্তরিত করতে পারে মানুষের মতো জটিল অস্তিত্বকে? সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে আরো গ্রন্থিল করে না তো এধরনের কূটাভাস? চিন্তার স্বাভাবিক প্রবণতাকে অস্বীকার করে প্রতিবেদনের সংযোগক্ষমতাকে খর্ব করছে না তো! অস্তিত্বের মর্মমূলকে আলোড়িত করে যে-সংশয়বাদ তা কি তাহলে এ সময়ের সেই অসুখ যার উপশম নেই! যত না কেন এর আওতা থেকে বেরোতে চাই, ফিরে ফিরে আসতে হয় তার বলয়ে। এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের চৈতন্যের সব আকরণ এবং ধারাবাহিকতা ভেঙে দিচ্ছে— একথা যেমন লক্ষ করেছিলেন দার্শনিকেরা, তেমনি সাহিত্যতাত্ত্বিকেরাও এবিষয়ে অবহিত হয়ে উঠছিলেন। আর, শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ভিন্ন গোত্রের এক তাত্ত্বিক প্রকরণ গড়ে তুলেছেন। একে দেওয়া হয়েছে বিনির্মাণের অভিধা। বিখ্যাত তত্ত্ববিদ ক্রিস্টোফার নোরিস লিখেছেন, 'Deconstruction is a constant reminder of the etymological link between 'crisis' and 'criticism' (১৯৮৩ এগারো-বারো)। আপাতদৃষ্টিতে যাকে উদ্ভট মনে হয়, তারই সীমান্ত ছুঁয়ে যেন পাঠকৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণের সাম্প্রতিক প্রক্রিয়া কালান্তরের বার্তা নিয়ে এসেছে। জীবন যেহেতু পূর্বধার্য উপসংহার অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় না কখনও, বিনির্মাণ সমস্ত অনন্বয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। যা-কিছু আবরণের আড়ালে, তাদের অনাবৃত করতে চায় বলে ভাষা, অভিজ্ঞতা বা মানবিক সংযোগের সমস্ত স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে সংশয়বিদ্ধ করে বিনির্মাণের কাজ শুরু হয়। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ্য হয়ে ওঠে। বিনির্মাণ মানবিক চিন্তা ও মননের এমন একটি প্রক্রিয়া যাকে রৈখিক ধারাবাহিকতায় প্রয়োগ করা যায় না। যায় না কারণ কোনো ধরনের অভ্যস্ততা বিনির্মাণপন্থায় অসম্ভব; তেমন সম্ভাবনা (বা আশঙ্কা) দেখা দিলে নিজেরই বিরুদ্ধে শুরু হতে চায় তার দ্রোহ।

স্বভাবত সমালোচকদের মধ্যে বিনির্মাণের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ একে বিদ্যাচর্চার জগতে ক্ষণিকের ফানুস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, কেউ বা একে জ্ঞানের গম্ভীর জগতে অনাবশ্যক উৎপাত বলে নিন্দা করেছেন। সন্ত্রাসবাদীরা যেমন অকারণ হিংস্রতায় সমাজের চলমান ধারায় ধ্বংসের আবর্ত তৈরি করে, তেমনি বিনির্মাণপন্থাও সাহিত্যিক ভাবনার সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলাকে ধ্বস্ত করে নৈরাজ্য কায়েম করতে চায়। এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়। কেননা, সাহিত্য সমালোচনার চিরাগত মূল্য-কাঠামো এবং ভাবকল্পকে সক্রিয়ভাবে আঘাত করছে যে 'কালাপাহাড়ি' প্রবণতা, তার সম্পর্কে স্বস্তি বোধ না করার-ই কথা। ভাষাকে, চেতনাকে, আকরণকে আক্রমণ করে আসলে তাদের যে বাঁচাতে চাইছে বিনির্মাণবাদ অবসাদের কৃষ্ণবিবর থেকে, এই উপলব্ধি খুব কম লোকের হয়েছিল। এর কারণ যদি খুঁজি, দেখব, সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে বহু তর্ক, কলহ ও মতের অমিল থাকলেও কিছু কিছু যথাপ্রাপ্ত বিধি ও চিন্তার আকরণ সম্পর্কে অনুচ্চারিত মতৈক্যও ছিল। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিকোণগত যত বৈষম্যই থাক, এ ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন। (কিংবা তর্কাতীত বলে এ নিয়ে কথা বলারও তেমন কোনো তাগিদ বোধ করেননি) যে, সাহিত্যিক পাঠকৃতি মাত্রেই তাৎপর্যগর্ভ এবং সাহিত্য সমালোচনার কাজ হল ঐ তাৎপর্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে তোলা। কিন্তু বিনির্মাণ যখন 'সাহিত্য' এবং 'সমালোচনা' নামক দুটি চিরাগত বর্গের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষ্মণের রেখাটিকে প্রত্যাহ্বান জানাল, বোদ্ধারা হতচকিত হয়ে পড়লেন। সমালোচনা বিশেষ ধরনের জ্ঞান এবং তা সাহিত্যিক পাঠকৃতির সমকক্ষ হওয়ার স্পর্ধা দেখায় না কখনও — সহজবোধ্য মনস্তাত্ত্বিক কারণে এই বক্তব্য বিনা প্রশ্নে গৃহীত হয়ে এসেছে। কিন্তু বিনির্মাণবাদীদের কাছে সমালোচকের সন্দর্ভ কখনও জল-অচল নয়; বরং তা দার্শনিক প্রতিবেদনের মতো নানা বিশিষ্ট লিখন-প্রক্রিয়া অর্থাৎ সাহিত্যিকের পাঠকৃতি নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সৃষ্টি বলে উচ্চবর্গ সন্দর্ভ হিসেবে একমাত্র বন্দনীয়, এমন নয়। সমালোচকের প্রতিবেদনও সমানভাবে মাননীয় টেক্সট্ (পাঠকৃতি), কঠোর নিয়মবিন্যাস আর নিয়ত চলিষ্ণুতার মধ্যে যা আশ্চর্য সেতু গড়ে দিতে পারে।

পাঁচ

বিনির্মাণবাদ যেহেতু কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব মেনে নেয় না, অন্বিষ্ট পাঠকৃতিকে তা স্বচ্ছন্দে ভাঙতে পারে। আসলে নিরন্তর অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তার সজীবতা ও অভিনবত্বকে। অন্যভাবে বলা যায়, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তা প্রতিমুহূর্তে আবাহন করে নির্মাণকে। ফলে পাঠকৃতির মধ্যে অলক্ষ্যে জেগে থাকে আরও অনেক পাঠকৃতির সম্ভাবনা। তার আরম্ভ নেই, নেই সমাপ্তিও। প্রতিটি পাঠ বয়ে আনে যেন আগামী আরেক পাঠের বার্তা। দেরিদার যুগান্তকারী বই 'Of Grammatology'-এর পৃথিবীখ্যাত বিশাল মুখবন্ধে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভোক লিখেছিলেন : 'the structure preface–text becomes open at both ends. The text has no stable identity, stable origin each act of reading 'the text' is a preface to the next.' (১৯৭৭ বারো)। একমাত্র এভাবেই সংবেদনশীল পাঠক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চক্রব্যূহ থেকে, সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য শেকল ভেঙে, নির্গমপথটি আবিষ্কার করে নিতে পারেন। আর, গড়ে নিতে পারেন তাঁর নিজস্ব পাঠকৃতি। যথাপ্রাপ্ত প্রতিবেদনে বারবার হস্তক্ষেপ না করে এবং ক্রমাগত তাকে বদলে না নিয়ে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একাজে তিনি সিদ্ধ হতে পারেন না। পাঠককে মনে রাখতে হয় শুধু দেরিদার প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণটি 'There is nothing outside the text' (১৯৭৬ ১৬৩)। পাঠকৃতির বাইরে যদি কিছুই না থাকে, তার মানে, জগতের ছায়ামাত্র নয় প্রতিবেদন। এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কিংবা সর্বদা অসম্পূর্ণ জগৎ। অন্যভাবে বলা যায়, পাঠকৃতিতে সব কিছু আছে—জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, বিষয়ী এবং বিষয়, এমন কি, হওয়া এবং না হওয়া। সেক্ষেত্রে বিনির্মাণ হয়ে ওঠে আসলে পরা-নির্মাণ। কার্য এবং কারণ, বহির্বৃত এবং অন্তর্বৃত, উপস্থিত এবং অনুপস্থিত, জগৎ এবং সত্তা—পুরোনো ধরনের দ্বৈততায় নয়, নবীন দ্বিবাচনিকতায় পাঠকৃতিতে অনবরত অন্বিত ও অনন্বিত হতে থাকে। বিনির্মাণ যায় সম্ভাব্য নির্মিতির দিকে আবার নির্মাণ পথ তৈরি করে দেয় বিনির্মাণের জন্যে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের গণ্ডির বাইরে, বিলীয়মান দিগন্তের ধূসরতায় পাঠক থাকেন অপেক্ষমান।

এতদিন যাদের পাঠকৃতি বলে জেনেছি, তাদের পূর্বধার্য সীমানা রয়েছে, সূচনাবিন্দু এবং উপসংহার আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যায়। কোথায় কেন্দ্র, কতটা বিস্তৃত পরিধি এবং কীভাবে আরোহী পথে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে অবরোহী পথে আবার সমস্ত আবেগ নিঃশেষিত হচ্ছে—এই সবই স্পষ্ট। সাহিত্যের সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐক্যবোধ মেনে নিয়েই লেখক-পাঠক-সমালোচক নিজেদের 'স্বাধীন' এলাকায় দৃঢ় স্থিতি পেয়েছেন। কিন্তু দেরিদা বললেন এমন পাঠকৃতির কথা যা সমস্ত পূর্বধার্য সীমান্ত এবং চিন্তার বিভাজনকে মুছে ফেলে গড়ে ওঠে 'by a sort of overrun'! ফলে এতে কোনো একক লেখকের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়; সমবায়ী পাঠ-উদ্যমের অভিব্যক্তি হিসেবে এই নতুন ও জায়মান অস্তিত্বটি হয়ে ওঠে সাধারণভাবে পাঠসত্তা বা 'textuality' এর নিদর্শন। এবিষয়ে বিনির্মাণবাদীদের কাছে আদর্শ হল পাঠকৃতির অন্তঃশায়ী বিবিধ পার্থক্যবোধের অন্তর্বয়ন 'a differential network, a fabric of traces referring endlessly to something other than itself, to other differential traces'! পাঠসত্তা যে গড়ে উঠছে নিরন্তর প্রবহমান অপরসত্তাদের অভিঘাতে, একথা যখন তলিয়ে ভাবি, অজস্র অনুপস্থিতের আততি অনুভব করি উপস্থিতের উন্মোচনে। নানা ধরনের সামাজিক ও নান্দনিক প্রশ্ন উঠে আসছে মুহুর্মুহু; যতটুকু দৃশ্যমান, শুধুমাত্র সেই পরিধিতে সমাধান পেয়ে যাব—এমন হতে পারে না। বিনির্মাণ আমাদের অদৃশ্য অস্তিত্বের অমোঘ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

তাই, আর যা-ই হোক, বিনির্মাণ একক পথগামী নয় কখনও; একই সঙ্গে তা ভাষ্যকারদের স্বস্তি এবং অস্বস্তির কারণ। স্বস্তি, কেননা, এই পথে তাঁদের স্বাধীনতা অবিসম্বাদী; আবার অস্বস্তিও, যেহেতু তাঁরা উপনিষদের ঋষির ভঙ্গিতে কখনও বলতে পারেন না 'বেদাহমেতম্'! তাঁরা সত্যের বহুমুখী ও বহুস্বরিক প্রতিবেদনে আরেকটি বিকল্পের প্রস্তাবক মাত্র। এই প্রসঙ্গে আমরা স্বয়ং দেরিদার কাছ থেকে পাওয়া সহজ একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি যা তিনি কথাচ্ছলে লুসিয়েন গোল্ডম্যানকে জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে 'Simply a question of being alert to the implications, to the historical sedimentation of the language which

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

we use.' [The structuralist controversy 271]। এই সহজ কথাটির মধ্যে অনেক গভীর চিন্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আমাদের কবি জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে' যাওয়ার কথা। বহু ব্যবহারে জীর্ণ ভাষা একসময় তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে; তখন ভাষাকে নতুন জীবন দেওয়ার স্বার্থে ভাষার পুরোনো খিলগুলো খুলে দিতে হয়, ভেঙে ফেলতে হয় নড়বড়ে পাটাতনটি।

তাছাড়া আমরা যখন ব্যবহার-লব্ধ সমগ্রকে দেখি, তাকে বিমূর্তায়িত ও আদর্শায়িত করে নিই; ভুলে যাই, ব্যবহার-বিধির বস্তুনিষ্ঠ অনুপুঙ্খগুলি ক্রমান্বয়ে তাকে গড়ে তুলেছে। বিনির্মাণ আমাদের সচেতনতা ফিরিয়ে দেয়, সাংগঠনিক পর্যায়গুলি যখন নতুন করে চিনি, নিজেদের দৃষ্টিকোণকে পুনর্গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করি। হয়তো এইজন্যে দেরিদা একে 'দর্শনের অন্তর্গত আত্মসমালোচনা বা স্বতোবীক্ষণ' (১৯৭৬ ৬৪) বলতে চেয়েছেন। বিভিন্ন অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ কীভাবে সমগ্রের প্রতীতিতে যুক্ত থাকে, তা লক্ষ করে এবং তাকে শুধুমাত্র 'যথাপ্রাপ্ত' বলে সন্তুষ্ট থাকে না বিনির্মাণবাদী। সংযোজন-সংশোধন-পরিবর্তন-বিকল্পায়নের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় কত বিচিত্র প্রতিবেদন গড়ে উঠছে মানুষের আর প্রতিটি মুহূর্তেই সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাসের ভাঙাগড়ায় শানিত হচ্ছে সম্ভাবনা—এই উপলব্ধিতে অন্তর্দীপ্ত বিনির্মাণ পন্থা। এই তার সমালোচনা, এই তার প্রস্তাবনা এবং এই তো তার পাঠকৃতি। স্বভাবত বিনির্মাণ নিরপেক্ষ নয় কখনও, যথাপ্রাপ্ত স্থিতিতে হস্তক্ষেপ করাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্যে দেরিদা Positions (১৯৮১ ৯৩) বইতে স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিনির্মাণ হস্তক্ষেপ করে সমস্ত ধরনের নিরেট কাঠামোয়, বস্তুকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে, চিহ্নায়ক-নির্ভর উপস্থাপনায়। সাধারণ বিশ্লেষণ বা সমালোচনার প্রথাসিদ্ধ পথ ধরে চলে না বিনির্মাণবাদ। আর, সবশেষে, 'deconstruction is deconstruction of dogmatic critique.' (তদেব)।

কেউ কেউ বলেন, দেরিদার বিনির্মাণবাদ হল—ভাষার দর্শনকে তার নিজেরই বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করার কৃৎকৌশল। এবিষয়ে প্রতীচ্যের তাত্ত্বিকেরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এখানে তা আর উত্থাপন করছি না। শুধু এইটুকু বলব, বিনির্মাণবাদ এক আশ্চর্য চিন্তাধারা যা সর্বদা পরিপূরক বক্তব্যকে নির্দ্বিধায় আমন্ত্রণ জানায়। ফলে একদিকে যেমন একে প্রাকরণিক গণ্ডিতে বাঁধা যায় না, তেমনি নৈরাজ্যের চোরাগোপ্তা আক্রমণ সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হয়। তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ বক্তব্য পেশ করেছেন কেভিন হার্ট (১৯৮৯ ১১৭)। তাঁর মতে, 'Deconstruction is not a methodology, it can only be defined by the practices done in its name.'! খুব সত্যি কথা এমন প্রয়োগনির্ভর তত্ত্ব কমই আছে যাকে প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন করে তোলা যায়। ফলে এর মধ্যে কোনো ধরনের রক্ষণশীলতা নেই; বরং তার গতি ও ঔদার্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনেক সময় অনেকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন না। সাহিত্য হোক কিংবা দর্শন, প্রত্যেকেরই অন্বিষ্ট সত্তার নির্যাস আর অস্তিত্বের অমৌল উপাদানকে মৌল উপাদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া। বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রতিবেদনের মধ্যে যা ঐ নির্যাসের উপলব্ধি এবং অন্বিষ্ট চিহ্নিত করার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী—তাকে গ্রহণ করতে চায় জিজ্ঞাসু মন। সত্যভ্রম থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে মানুষ চায় তাৎপর্য সন্ধান ও ব্যাখ্যার শুদ্ধতম পথে যেতে। কেননা, শুদ্ধ পথ ছাড়া শুদ্ধ পাঠ অসম্ভব। বিনির্মাণ যেহেতু একসঙ্গে পথ তৈরি করে এবং পথ চিনিয়েও দেয়— একথা কি বলা যাবে, 'এ পথে আলো জ্বেলে, এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে?' যদি প্রশ্ন ঠিকমতো তুলে ধরা যায়, তাহলে ক্রিয়াত্মক পদ্ধতির ভেতর থেকে মীমাংসার সম্ভাবনা উঠে আসতে পারে এই হল অন্তর্বৃত প্রত্যয়।

ছয়

চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশ্লেষণের প্রাকরণিক উপযোগিতা সম্পর্কেও প্রচুর দ্বন্দ্ব ও মতভেদ রয়েছে। দেরিদা জীবনভাষ্যের দুটি প্রচলিত ধরন লক্ষ করেছেন, একদিকে রুশোর আকল্প এবং অন্যদিকে নীৎশের আকল্প (Writing and Difference ১৯৭৮ ২৯৩)। প্রথম ধরনের ভাষা বিষাদপ্রবণ, স্মৃতিপীড়িত, নঞর্থক এবং অনুপস্থিত উৎসের অসম্ভব বা হারানো উপস্থিতি খোঁজার দিকে তার প্রবণতা এবং দ্বিতীয় ধরনের ভাষা ইতিবাচক, উল্লাসমুখর ও চিহ্নায়িত জগতের লীলাচ্ছন্দ আর হয়ে ওঠার প্রতি সমর্থন জানানো তার লক্ষ্য। জগৎ ও জীবনকে আকরণে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করার প্রবণতাকে অস্বীকার করে বিনির্মাণবাদ; দেরিদার শব্দবন্ধ অনুযায়ী, ঐ প্রবণতার উল্টো পিঠে রয়েছে 'free play'। কেন্দ্র নেই তাতে, রয়েছে শুধু পরিধির মুক্ত বিস্তার। বিখ্যাত সমালোচক ওয়েন বুথ দেরিদার বক্তব্য মানতে পারেননি। তাঁর মতে 'free play' সুপরিকল্পিত উন্মাদনা ('methodical craziness') ছাড়া আর কিছু নয়। এতে পাঠকৃতি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বুথ তিনটে বিশেষণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন 'endless, treacherous and terrifying' (১৯৭৯ ২১৬)। ডেনিস ডোনোঘ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, লীলা ও প্রতাপের মধ্যে সংযোগ-সূত্র যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, বিনির্মাণ সমস্ত মানবিক প্রয়াসকে মূলগতভাবে তাৎপর্যরিক্ত করে দিতে পারে (১৯৮১ ১৬৫-১৬৬)। এই বিতর্কে বহু আলোচক অংশ নিয়েছেন। এ বিষয়ে স্বয়ং দেরিদা যা বলেছেন, তা এরকম 'There are thus two interpretations of interpretation, of structure, of sign, of play. The one seeks to decipher, dreams of deciphering a truth or an origin which escapes play and the order of the sign, and which leaves the necessity of interpretation as an exile. The other which is no longer turned toward the origin, affirms play and tries to pass beyond man and humanism, the name of man being the name of that being who, throughout the history of metaphysics or ontology, theology, in other words, throughout his entire history has dreamed of full presence, the reassuring foundation, the origin and the end of play.' (প্রাগুক্ত ১৯৭৮ ২৯২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই বহুচর্চিত অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচকদের মধ্যে বিতন্ডার অন্ত নেই। দেরিদা যাদের 'দু'ধরনের ভাষ্যের ভাষ্য' বলেছেন, পারস্পরিক পার্থক্য অনবরত প্রসারিত করে যাওয়া ছাড়া এদের উপায় নেই আর! স্বভাবত একে অপরের সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থানে থাকছে; অন্যোন্যসম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ নেই কোনো। তবু এখানেই দেরিদার অনন্যতা যে, তিনি এই দুইয়ের মধ্যে বাছাই করার অবকাশ দেখছেন না। বরং মুক্ত বিস্তারের দর্শন ব্যক্ত হচ্ছে এই আশ্চর্য উচ্চারণে 'We must first try to conceive of the common ground, and the difference of this irreducible difference' (তদেব ২৯৩)। তাঁর চিন্তা ও বীক্ষণের এই দ্বিবাচনিক চরিত্র যদি অনুধাবন করি, বিনির্মাণের গভীরতর সংবেদনশীল স্বভাব স্পষ্ট হবে আমাদের কাছে। এই যে যুক্তি-বিস্তারের কথা লিখেছি, অন্য চোখেও সেদিকে তাকানো যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো একের পর এক স্তর পেরোতে পেরোতে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বস্তুহীন শূন্যতায় পৌছাই যদি—সত্যের বোধ ও কি বিপুল নেতির মধ্যে হারিয়ে যাবে না! কোনো বস্তুর উপস্থিতি যখন প্রত্যক্ষতা থেকে অপসারিত হয়ে যায়, তা কি প্রাসঙ্গিক সত্যকেও সরিয়ে দেয় নাকি সত্যের সম্ভাবনাও অনুপস্থিতির ছদ্মবেশ গ্রহণ করে? প্রশ্নটা জটিল কিন্তু দার্শনিকেরা এ ব্যাপারে অনেক ভেবেছেন। বস্তুত ঋগ্বেদের প্রাজ্ঞ কবিও উচ্চারণ করেছিলেন, অসৎ অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের জন্মকথা। অনস্তিত্ব যখন নিজের সঙ্গে কোনো পরিপূরককে যুক্ত করে, তৈরি হয় অস্তিত্বের অবয়ব, আসলে অবভাস। তত্ত্ববস্তু তাই না ও হ্যাঁ-এর দ্বিবাচনিকতার ফসল; নির্মোকের পরে নির্মোক মুক্ত হয়ে অবয়বগত অবভাসের পর্যায় দেখা দেয়। তাই অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর দ্বিবাচনিক সম্পর্ক সর্বদা স্বতঃসিদ্ধ। বিনির্মাণ ঐ সম্পর্ককে চিনিয়ে দেয়, সত্যে নিহিত উপস্থিত ও অনুপস্থিতের ক্রিয়াত্মক ভূমিকা এবং সংযোজন-বিকল্পায়নের প্রক্রিয়াকে বুঝতে পারি কেবল বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে। এই বিনির্মাণ নিজেই যেহেতু অস্তিত্বের ভাষ্য, তার আবার ভাষ্য তৈরি করি যখন—স্বভাবত তা কখনও একরকম হবে না। নানা বিকল্পের মধ্যে কে কোনটা গ্রহণ করবে, তা ভাষ্যকারের অবস্থান, আসলে অবস্থানগত পার্থক্যের ওপর, নির্ভর করছে। দেরিদার মুখ্য ভাববীজ 'পার্থক্য-প্রতীতি' বা 'difference' (যা সময় ও পরিসরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) তাই 'turns out to be that which at once structures and destructures all positions.' (কেভিন হার্ট ১৯৮৯ ১২২)।

বিনির্মাণপন্থা প্রমাণ করে যে, আমরা যদি কোনো উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দ্বিবাচনিক সম্পর্ক থেকে গ্রহণযোগ্য ভাষ্য গড়ে তুলতে পারি—তাহলে তাতে পাঠকৃতির অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। না বললেও চলে যে, চিহ্নায়কের প্রস্থনা দিয়ে গড়ে ওঠে অস্তিত্বের ঐ প্রতিবেদন। তার মানে, বিনির্মাণ করতে পারি শুধু সম্ভাবনার— যা কিনা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে!' মা সন্তানকে যেমন সৃষ্টি করে ইচ্ছে থেকে, তেমনি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অর্থাৎ অনুপস্থিতি থেকে জেগে ওঠে সম্ভাব্য প্রতিবেদনের রূপরেখা। এ বিষয়ে সমর্থন সংগ্রহ করতে পারি দেরিদার 'Dissemination' থেকে 'The disappearance of truth as presence, the withdrawal of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

present origin of presence, is the condition of all (manifestation of) truth. Nontruth is the truth, Nonpresence is presence It appears in its essence, as the possibility of its own most proper non-truth, of its pseudo-truth reflected in the icon, the phantasm, or the simulacrum. What is not what it is, identical and identical to itself unique, unless it adds to itself the possibility of being repeated as such. And its identity is hollowed out by that addition, withdraws itself in the supplement that presents it.' (১৯৮১ ১৭৮)।

এই বক্তব্য থেকে জরুরি একটি কথা জানা যাচ্ছে। সত্য যেমন আছে, আছে তেমনি সত্যভ্রম, আছে ছদ্মসত্য। যখন প্রতিমা গড়ি, কায়ার সঙ্গে ছায়ার সহচারিতা লক্ষ করি—সে-মুহূর্তে সত্যভ্রমে প্রতীয়মান সত্য নিজেকে প্রসারিত করে। যা আছে বলে মনে হয় প্রতিমায়, আসলে তো তা নেই। যাকে খুঁজি ছায়ায়, প্রতিফলনে—সে থাকে তার আওতার বাইরে। বিনির্মাণ আমাদের সত্য আর সত্যভ্রমের অদৃশ্য কিন্তু অমোঘ সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত করে তোলে। পথ ভাবে আমি দেব, মূর্তি ভাবে আমি, রবীন্দ্রনাথের এই পদ্য-পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে। বুঝতে পারি, যা অবভাস তা আসলে তত্ত্ববস্তুতে নিহিত সম্ভাবনা! অনন্যকে বিভাজিত করার কৌশল, জলে যেমন প্রতিফলিত হয় চাঁদ, একই সঙ্গে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত, হ্যাঁ এবং না। চিহ্নায়ক যদি বয়নে সার্থকভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে, ঈপ্সিত তাৎপর্য স্পষ্ট হবে এবং বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় পাঠকৃতির অনেকান্তিক সম্ভাবনাও বারবার পুনরাবৃত্ত হবে। এক অর্থ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাব্য অর্থের উপকূলে। কেননা, বিনির্মাণবাদ আমাদের এই পাঠ দিচ্ছে যে, মানবিক প্রতিবেদনে তাৎপর্যের কোনো উপসংহার নেই। কেউ বলতে পারেন না যে, নির্দিষ্ট এক বিন্দুতে নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে সব সম্ভাবনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবকাশ। সাধারণত ভাষ্যকারদের মধ্যে একটা প্রবণতা অবশ্য দেখা যায় যে, চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেওয়া হয়ে যাচ্ছে; এরপর যা হবে তা চর্বিতচর্বণ শুধু। কিন্তু এই ঔদ্ধত্য কোনো যথার্থ বিনির্মাণবাদী দেখাতে পারেন না কখনও। বস্তুত এযুগের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো এইজন্যে ভাষ্য ও বিশ্লেষণকে খুব সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তাঁর মতে, বিশ্লেষণ বা ভাষ্য উত্থাপন করা মানে হল 'to admit by definition an excess of the signified over the signifier, a necessary unformulated remainder of thought that language has left in the shade–a remainder that is the very essence of that thought, driven outside its secret–but to comment also presupposes that this unspoken element slumbers within speech (parole), and that, by a super abundance proper to the signifier, one may in questioning it, give voice to a content that was not explicitly signified.' (The Birth of the Clinic 1975 XVI).

প্রতিটি একক বাচনে (প্যারলে) অকথিত ও অকর্ষিত বাণী যেহেতু সুপ্তিমগ্ন থাকে, চিহ্নায়ক অনন্ত সম্ভাবনায় পূর্ণ। যখনই বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বলা ও না-বলা কথার সেতু গড়ে উঠছে, চিহ্নায়কের পরিসর বিস্তৃততর হচ্ছে আরও। অনাবিষ্কৃত অন্তর্বস্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যখন চিহ্নায়ক পরম্পরার অভ্যস্ত সম্বন্ধকে প্রশ্নে ও প্রতিপ্রশ্নে বিদ্ধ করছি। ভাষার মধ্যে চিন্তার কিছু কিছু পরিসর সব সময় অধরা রয়ে যায়; যতখানি আলোকিত করছিল, তার মধ্যে কিন্তু সমস্ত রহস্য শেষ হয়ে যায়নি। বিনির্মাণ দৃষ্টি ফেরায় সেই বাঙ্ময় ছায়ার দিকে; অনেক প্রচ্ছন্ন অথচ সমৃদ্ধ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে তখন। লেখার অন্তরালে থাকে আরেক লেখা, পাঠের অন্তরালে আরেক পাঠ। একে বলতে পারি প্রত্নলেখ আর প্রত্নপাঠ। বিনির্মাণ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিতের মধ্যে পার্থক্য-প্রতীতিকে স্পষ্ট করে দিয়ে সাহিত্যিক ও দার্শনিক, এককথায় মানবিক, প্রতিবেদনের যাত্রা থেকে সমাপ্তিরেখা মুছে দিয়েছে যেন। তাই যাঁরা বলেন, বিনির্মাণ মূলত পাঠকৃতি সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক ক্রিয়া এবং যাঁরা বলেন, বিনির্মাণ আসলে পরাদার্শনিক তত্ত্ব— তাঁদের মধ্যে বিরোধ নেই কোনো। দু'পক্ষই ঠিক কথা বলেন। আমরা আজ যখন কোনো পাঠকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করি কিংবা যখন পাঠকৃতি বিশ্লেষণের তত্ত্ব বিষয়ে কথা বলি—দু'দিক দিয়ে পৌঁছাই অখণ্ড কিন্তু আপাত-বিভাজ্য সত্যের উপকূলে। খুব সহজ ভাষায় দেরিদা বলেছেন তাই, আমাদের জন্যে সব সময়ে রয়েছে 'Two texts, two hands, two visions, two ways of listening. Together simultaneously and separately.' (Margins of Philosophy 1982 65)।

সাত

এই নিবন্ধের অন্যত্র আমেরিকার চারজন বিনির্মাণবাদীর কথা বলা হয়েছিল। তাঁদের আলাদা দৃষ্টিকোণ ও অবদানের গুরুত্ব নিয়ে খুব বেশি আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাঁদের সম্পর্কে এইটুকু শুধু বলছি যে, কূটাভাস-পূর্ণ বৌদ্ধিক জগতেও সত্যবোধের জন্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়নি কখনও। বরং তাঁরা যেন অপ্রাপনীয়ের জন্যে, গ্রিক প্রত্নকথার সিসিফাসের মতো, দুর্দম আকাঙ্ক্ষায় বারবার পথ থেকে পথান্তরে ছুটে গেছেন। আধুনিকোত্তর কালের অজস্র স্ববিরোধিতা ও গোলকধাঁধা যখন সংকটের দহনবৃত্তকে বাড়িয়ে যাচ্ছিল—হিলিস মিলের, দ্য ম্যান, হার্টম্যান ও ব্লুম সে-সময়ে দ্বিধাদীর্ণ জগতের মধ্যেও নিজেদের সন্ধান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁদের দ্বন্দ্বদীর্ণ আবহে সত্য প্রথমেই প্রতিপন্ন হচ্ছিল বিভ্রম হিসেবে কিন্তু তাঁরা প্রতিবেদনের তাৎপর্য সন্ধান থেকে ক্ষান্ত হননি। নীৎশের জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ দ্য ম্যানের মতো চিন্তাবিদকে যে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে সংশয় নেই কোনো। 'সত্য কী' এ সম্পর্কে নীৎশের স্পষ্ট উচ্চারণ 'Truths are illusions whose illusionary nature has been forgotten' যে মূলত সমকালীন সংকটের আবহে তাত্ত্বিকদের কাছে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। 'Allegories of Reading' (১৯৭৯) বইতে দ্য ম্যান ঐ বক্তব্যের সূত্র ধরে নিজের চিন্তাকে যে গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সমস্ত সত্য যদি কল্পনাসৃষ্ট কথান্যাসের রকমফের, স্বভাবত প্রতিবেদন ও পাঠকৃতির তাৎপর্যও বদলে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাধ্য। সমস্ত বিনির্মাণবাদী সন্দর্ভের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দ্য ম্যান তাই জটিলতার বয়নকে নির্দেশ করেছেন 'the deconstruction states the fallacy of reference in a necessarily referrential mode.' (১৯৭৯ ১২৫)

প্রাগুরু বইয়ের আগে অবশ্য দ্য ম্যানের বিনির্মাণবাদী ভাবনার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল বহু আলোচিত 'Blindness and Insight' (১৯৭১) বইতে। দেরিদার কাছে সুস্পষ্ট ঋণ সত্ত্বেও দ্য ম্যান নিজস্ব চিন্তার আকাশ যে খুঁজে নিচ্ছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে তত্ত্ববয়নের প্রয়োজনে তাঁর পারিভাষিক শব্দাবলী বিকাশের চেষ্টায়। বস্তুত শুধুমাত্র ভাষ্যকার কিংবা ব্যাখ্যাতা-সমালোচক হিসেবে যিনি সীমাবদ্ধ থাকতে চান না, আত্মপ্রকাশ করতে চান স্বতন্ত্র ও স্বাধীন তাত্ত্বিকের ভূমিকায়—তাঁকে এই জরুরি কাজটি না-করে উপায় নেই কোনো। দ্য ম্যানও করেছিলেন এবং করতে গিয়ে অনভ্যস্ত পাঠকের সাময়িক অস্বস্তির কারণ হয়েছিলেন, তা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু নতুন তত্ত্ববয়ন মানে নতুন পরিভাষা; চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিকতা ভেঙে দিয়ে যেন শিবের জটাজাল ভেদ করে ভাগীরথীর প্রবাহ মুক্ত করে দেওয়া। তাই দ্য ম্যান প্রাগুক্ত বইতে অন্ধতা ও অন্তর্দৃষ্টিকে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করলেন; একই সঙ্গে এই দুইয়ের দ্বিবাচনিকতা ও কূটাভাস ব্যক্ত হল তাতে। তাঁর মতে, সমালোচকেরা ঈপ্সিত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন কেবল কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্ধতার বিনিময়ে। এমনও দেখা যায়, তাঁরা এমন কোনো পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন বা তত্ত্বের বনিয়াদ তৈরি করছেন যা হয়তো তাঁদের যত্নরচিত অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বেমানান, এমন কি, বিপরীতও। দ্য ম্যান বিশেষভাবে লুকাচ, ব্লাঁশো ও পোলের কথা বলেছেন যাঁরা নাকি আসলে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন বক্তব্যে পৌঁছেছিলেন। প্রাগুক্ত কূটাভাসের জন্যেই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল এই পার্থক্য। প্রসঙ্গত কবিতার ভাষা বিশ্লেষণে এই অন্ধতা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বিবাচনিকতা লক্ষ করেছেন দ্য ম্যান। তাঁর মতে এরকম ঘটে কারণ সমালোচকেরা অবচেতনভাবে এক ধরনের ঐক্যবোধ থেকে অন্য ধরনের ঐক্যবোধে পৌঁছে যান। তিনি আমেরিকার নব্য সমালোচকদের কথা বলেছেন যাঁরা ঐ ঐক্যবোধ পাঠকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করেন না, করেন বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার মধ্যে। পাঠকৃতির প্রতিটি উপাদানকে সমগ্রের বিন্যাসে এবং সমগ্রকে সমস্ত উপাদানের সংযোগে অর্জিত ঐক্যবোধে তাঁরা দেখতে চান। দ্য ম্যান মনে করেন, এঁরা বিশ্লেষণী ক্রিয়ার বৃত্তকে পাঠকৃতির ঐক্য বলে মনে করেন; তাই তাঁদের প্রতিবেদনে এক ধরনের অন্ধতা প্রকাশ পায়। বিনির্মাণপন্থার দায়িত্ব হল এই কূটাভাসের প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করে তোলা।

দ্য ম্যান তাঁর আলোচনায় দর্শন ও সাহিত্যের প্রতিবেদনে পাঠকৃতির হয়ে-ওঠা জনিত সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে দেরিদার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। একটি বিশিষ্ট লিখনপ্রণালী হিসেবে দর্শন কতটা গ্রহণযোগ্য এবং দার্শনিকদের কাছে সাহিত্য কীভাবে প্রতিভাত হয়, এ বিষয়ে কূট তর্কের অভাব নেই। বিনির্মাণপন্থার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ও দর্শনের কোনো নতুন পর্যায়ক্রম গড়ে তোলা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে দেরিদার বক্তব্য স্পষ্টতই প্রাগুক্ত পর্যায়ক্রম গঠনের বিরোধী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রতিক আলোচনায়, বিশেষভাবে তাত্ত্বিক সন্দর্ভে, দর্শন এমনভাবে সাহিত্যিক প্রতিবেদনের মধ্যে অন্তর্দীপ্তি সঞ্চার করেছে যে, বিনির্মাণের দায় বেড়ে গেছে অনেকখানি। দ্য ম্যান তাঁর প্রাগুক্ত দুটি বইতে বিনির্মাণের নিজস্ব প্রয়োগ করে পাঠ-বিশ্লেষণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর আরো একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য হল, পাঠ সর্বদা অবধারিতভাবে ভ্রান্তপাঠ, কেননা সমালোচনাত্মক প্রতিবেদন ও সাহিত্যিক পাঠকৃতির মধ্যে অনবরত অন্তর্ঘাত করছে পূর্বধার্য কিছু কিছু ভাবকল্প। সাহিত্যস্রষ্টা যেমন এক দিক দিয়ে বাস্তবকে কম বেশি রূপকায়িত করছেন, তেমনি অন্য দিক দিয়ে ধীমান তাত্ত্বিকও যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতি থেকে তাৎপর্য্য সূত্র খুঁজতে গিয়ে কোনো-না-কোনো রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় নিচ্ছেন। দু'পক্ষই এক ধরনের চিহ্নায়ক থেকে অন্য আরেক ধরনের চিহ্নায়কে পৌঁছে যাচ্ছেন। দ্য ম্যান মনে করেন, কিছু কিছু ভ্রান্ত পাঠ ঠিক এবং কিছু কিছু ভুল। প্রতিটি ভাষায় বাচন তৈরি হয় এভাবে বিশিষ্ট ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। এই ভ্রান্ত পাঠ যত বেশি স্বীকৃত হয়, তত প্রতিবেদন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যথাপ্রাপ্ত জগৎ থেকে পাঠকৃতি এবং পাঠকৃতি থেকে আলোচকের সন্দর্ভে পৌঁছানোর জন্যে বারবার দেরিদা-কথিত আলাদা হওয়া ও স্থগিত রাখার অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় আমাদের। একমাত্র বিনির্মাণ চিনিয়ে দিতে পারে ঐ প্রক্রিয়াকে, ভ্রান্ত পাঠ গড়ে ওঠার পর্যায়গুলিকে।

একথা তাই স্পষ্ট যে, সার্থক সাহিত্যিক পাঠকৃতি নিশ্চিতভাবে আত্মবিনির্মাণের আকর। দ্য ম্যানের সূত্রে জেনেছি আমরা, 'Literary text simultaneously asserts and denies the authority of its own rhetorical mode.' দ্য ম্যান ছাড়াও ভ্রান্ত পাঠ নিয়ে দিগ্‌দর্শক আলোচনা করেছেন হ্যারল্ড ব্লুম তাঁর 'A Map of Misreading' (১৯৭৫) বইতে। তিনি দেখিয়েছেন, সমস্ত সৃষ্টিশীল কবি তাঁদের পূর্বসূরিদের রচনাকে নিজস্ব সংবেদন অনুযায়ী ভ্রান্ত পাঠ করেছেন, বিনির্মিত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি শেলির 'Ode to the West Wind' এর কথা বলেছেন যা কিনা ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Immortality' নামক কবিতাকে অনেকটা বিনির্মাণ করে নিয়ে ভ্রান্ত পাঠ গড়ে তুলেছে নবীন সৃষ্টির স্বার্থে। পূর্বসূরিদের প্রতিবেদনে হস্তক্ষেপ না-করে কোনো উত্তরসূরি তাঁর ঈপ্সিত পরিসরে পৌঁছাতে পারেন না। ব্লুমের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা এই জরুরি উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হই 'No poem stands on its own, but always in relation to another. In order to write belatedly, poets must enter a psychic struggle, to create an imaginative space. This involves misreading their masters in order to produce a new interpretation.' (সেলডেন ও হিডোওসোন ১৯৯৩ ১৫৩)। এই বিনির্মাণবাদী দর্শনের আলোয় বুঝতে পারি, মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল মধুসূদনও বাল্মীকির রামায়ণের যুগোপযোগী 'ভ্রান্তপাঠ' উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বিনির্মাণে রচিত হয়েছিল উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় সৃষ্টিশীলতার নতুন ইতিহাস। বস্তুত এমন দৃষ্টান্ত আরো অজস্র দেওয়া যেতে পারে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন 'aggressive wrenching of predecessors, meaning' এর নিদর্শন প্রচুর রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

শুধু যে সাহিত্যিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিনির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ এমন নয়; ইতিহাসের সন্দর্ভ যখন গড়ে ওঠে, দেখি, বারবার প্রতিবেদন যেন তথ্যসমাবেশ থেকে সরে যেতে চাইছে চেতনার আকরণের দিকে। চেতনার রঙে রঞ্জিত করে বদলে নিতে চাইছে তথ্যকে; এই নিরন্তর হস্তক্ষেপ আর বিনির্মাণ ছাড়া ঐতিহাসিক প্রতিবেদন অসম্ভব। হেডেন হোয়াইট 'Tropics of Discourse' (১৯৭৮) বইতে ইতিহাস-রচনাতত্ত্বের নতুন ধারণা তুলে ধরেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য জিওফ্রে হার্টম্যানের বিশ্লেষণও   তিনি 'The Fate of Reading' (১৯৭৫) ও 'Criticism in the Wilderness' বইতে বিভিন্ন উৎস-জাত সন্দর্ভকে অন্তর্বয়ন হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর নিজস্ব তাত্ত্বিক প্রতিবেদন গড়ে তুলেছেন। তিনি চান, সমালোচকেরা আরো সৃজনশীল হয়ে উঠুন   চিন্তার প্রথাগত সীমান্তগুলি মুছে দিক সমালোচকের বয়ান। তাতে ধারাবাহিক অর্থ না-ই থাক, তাতে ক্ষতি নেই; স্ববিরোধিতা ও ভাবনার পরম্পরা বরং উন্মোচিত হতে থাক। লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তাই হার্টম্যান দ্বারা উদ্ধৃত দেরিদার 'Glas' এর অংশবিশেষ যেখানে আবার জাঁ জেনের 'The Thief's Journal'-এর কিছু বয়ান ব্যবহৃত হয়েছে অন্তর্বয়ন হিসেবে। হার্টম্যান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন   'Writing is always theft or bricolage of the logos.   Writing is an act of crossing the line of the text, of making it indeterminate.' আরেকজন বিখ্যাত বিনির্মাণবাদী তাত্ত্বিক, জে. হিলিস মিলের, সত্তর দশক থেকে উপন্যাসের পাঠ-বিশ্লেষণকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর 'Fiction and Repetition' (১৯৮২) বইটি আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বারবারা জনসন 'The Critical Difference' (১৯৮০) বইতে সাহিত্যিক পাঠকৃতি ও সমালোচনাত্মক সন্দর্ভের অসামান্য বিনির্মাণবাদী বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দু'ধরনের প্রতিবেদনকে 'a network of differences' বলে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। বার্তের বালজাক-আলোচনা বিনির্মাণ করে বারবারা অন্তর্দৃষ্টি ও অন্ধতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন যেন।

বিনির্মাণবাদ স্বভাবধর্মে রূপ থেকে রূপান্তরে, মাত্রা থেকে মাত্রান্তরে যাওয়ার পথ খুঁজে চলেছে অনবরত। নির্দিষ্ট পাথেয় নেই তার; এমনকি, পূর্বধার্য লক্ষ্যও নেই কোনো। পথ তৈরি করতে করতে পাথেয়ও আবিষ্কার করে চলেছে। আবার সেই পথও পাথেয়কে ফেলে আসছে পেছনে, পথের উপরে। বিনির্মাণ শুধু প্রশ্ন করে, উত্তরের আভাস দিয়েও অচিরে তাকে রূপান্তরিত করে প্রশ্নে। মানুষের প্রতিবেদনে সত্য যেভাবে বিম্বিত হয়, সেভাবেই তাকে মেনে নেয়। স্বভাবে সে অপৌত্তলিক, তাই তার প্রতিমা নেই কোথাও। নির্মাণ ও বিনির্মাণের চক্রকে অক্ষুণ্ণ রাখা ছাড়া এই পন্থার অন্য দায় নেই কোনো। তাই নির্দ্বিধায় তাত্ত্বিকতাকেও অস্বীকার করে বিনির্মাণবাদ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ

'পারাপারহীন এই কাব্যসংসারে কবি হচ্ছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি যেভাবে চান, তাঁর জগৎ সেভাবে গড়ে ওঠে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বদলেও যেতে পারে' ভারতীয় মনে অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই বিখ্যাত বক্তব্য দৃঢ়প্রোথিত। কবি অর্থাৎ স্রষ্টা সর্বেসর্বা, একথা আরো কতভাবে যে বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বলা হয়েছে 'কবি ক্রান্তদর্শী' 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' আমরা জেনেছি, তিনি লৌকিক জগতে থেকেও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বস্তুত স্বয়ং ঈশ্বর মহত্তম কবি; তিনি একাকী আনন্দিত হতে পারেন না বলে উদাররমণীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে নিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি তাঁরই প্রকাশ, তাই জগৎকে দেখিয়ে বিহ্বল মানুষ বলেছে 'পশ্য দেবস্য কাব্যম্'। সৃষ্টি করে ঈশ্বর আপন সৃষ্টিতে প্রবেশ করেছেন, তিনি রসস্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এ তো স্বাভাবিক যে, ঈশ্বরপ্রতিম কবি যা কিছু সৃষ্টি করবেন, তা হবে ব্রহ্মস্বাদসহোদর। অণু থেকে তিনি অণীয়ান, মহান থেকে তিনি মহীয়ান; তাই সৃষ্টি জুড়ে যেমন ঈশ্বর, নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা-সৃষ্ট সাহিত্যিক প্রতিবেদনেও তেমনি লেখক। তাঁর আলোয় সমস্ত যেহেতু আলোকিত, সমস্ত পরিসর স্রষ্টা দ্বারা পরিপূর্ণ; এইজন্যে পাঠককেও হতে হবে অসামান্য; যে-কোনো কেউ পাঠক হতে পারবে না। পাঠক হবেন সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী, বহু পরিশীলনে কৃতি। বলা হয়েছে, 'যেষাং কাব্যানুশীলন- অভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবন যোগ্যতা' সেই সহৃদয় ব্যক্তি ব্রহ্মস্বাদসহোদর কাব্যাস্বাদের মধুকর হতে পারেন। আর কেউ নয়। ঐতিহ্যের শাসনকে তিনি মেনে নেবেন বিনা প্রশ্নে; নিজস্ব পরিসর কী ও কেন, এই চিন্তা জাগবে না তাঁর মনে। কেননা সাহিত্য যখন টীকাটিপ্পণি ও নিয়মশাসিত—তিনি শুধু যথাপ্রাপ্তকে গ্রহণ করে দেখতে পারেন, তাতে কত ধরনের ভাষ্য সম্ভব! ক্রান্তদর্শী কবির শব্দপ্রয়োগে ভুল ধরতে পারেন হয়তো, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা বিকল্প কোনো পথে যেতে পারত কিনা— এ বিষয়ে কিছুমাত্র জল্পনা করার অধিকার তাঁর নেই। কিছু কিছু সূক্ষ্ম তর্ক সত্ত্বেও এই হলো মোটামুটিভাবে কাব্যসংসারে ভারতীয়দের স্থিতি।

আর, ঠিক এখানেই প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বের পাঠককেন্দ্রিক ভাবনার বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে। আকরণবাদ ও আকরণোত্তরবাদ পাঠকৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে বহু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করার ফলে প্রতিভাবান লেখকও বুদ্ধিমান পাঠকের সম্বন্ধ নতুন করে নির্ণীত হল। লেখক আর প্রতিবেদনের পক্ষে সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারলেন না! বরং ধীমান পাঠক হয়ে উঠলেন তাৎপর্যের নিয়ন্তা। ক্রমশ এই ধারণা জোরালো হতে লাগল যে পাঠকৃতির তাৎপর্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কখনও; পাঠকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সক্রিয় হস্তক্ষেপ কেবল তাকে পূর্ণ করে তোলে। যে-সমস্ত অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ দিয়ে, উপকরণ ও পরম্পরার সাহায্যে গ্রথিত হয় পাঠকৃতি, তাদের আপাত-রুদ্ধতা পেরিয়ে গিয়ে পাঠক আবিষ্কার করেন সম্ভাবনার পরিসর। তখন বুঝতে পারি, লেখক আসলে তাৎপর্য-প্রক্রিয়ার সূত্রধার মাত্র অর্থাৎ নির্মীয়মান প্রতিবেদনের আদিবয়ন উত্থাপন করাই তাঁর প্রধান দায়িত্ব; পাঠক ঐ আদিবয়নে হস্তক্ষেপ করে ধীরে ধীরে তাকে বিনির্মাণ করেন। আর, এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন নিয়ত বিস্তারপ্রবণ তাৎপর্যের জনয়িতা। বিখ্যাত তাত্ত্বিক হুলগ্যাঙ আইজের বলেছেন, প্রতিটি সাহিত্যিক পাঠকৃতি নিজের ভেতরে বেশ কিছু শূন্যায়তনকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেয়; পাঠকের প্রথম কাজ তাদের আবিষ্কার করা এবং প্রধান কর্তব্য শূন্যকে অর্থদ্যোতনা দিয়ে পূর্ণ করে তোলা। বয়নে কথিত অংশ চূড়ান্ত নয় কখনও; অকথিত বাণীর উদ্ভাসনে পূর্ণাঙ্গ হয় প্রতিবেদন। বিশেষভাবে সার্থক কবিতা সম্পর্কে একথা বেশি বলা হয়ে থাকে যে, দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে রয়েছে নৈঃশব্দ্যের সম্ভাবনাময় পরিসর; পড়া সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ ঐ নৈঃশব্দ্যকে বর্ণমালার মতো বুঝতে না পারছি। তাহলে, বিশ্লেষণ ও ভাষ্য মানে শূন্যকে ক্রমাগত পূর্ণ করে তোলা। এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্য দেখা দেয় পাঠকৃতি নিজেই কি উৎসুক পাঠকের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে নাকি পাঠক তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার কৃৎকৌশলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পাঠকৃতির ওপর স্বকপোলকল্পিত সমস্যা ও সমাধান আরোপ করে থাকেন? এইসব নান্দনিক ও প্রায়োগিক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে উদ্ভূত হয়েছে পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব বা পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ।

এই তত্ত্ব বিকশিত হওয়ার আগে এর প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন চিহ্নবিজ্ঞানীরা; যেমন, উমবের্তো একো তাঁর 'The Role of the Reader' (১৯৭৯) বইতে মন্তব্য করেছেন, কিছু কিছু পাঠকৃতি মুক্ত উপসংহারের নিদর্শন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি জেমস্ জয়েসের 'ফিনেগানস্ ওয়েক' এর কথা বলেছেন; সেখানে তাৎপর্য গড়ে ওঠে পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতায়। আবার, কিছু কিছু পাঠকৃতি রুদ্ধ উপসংহারের দৃষ্টান্ত; সেসব ক্ষেত্রে পাঠকের প্রতিক্রিয়া পূর্ব-নির্ধারিত। যেমন, গোয়েন্দা কাহিনি বা কমিক্স্; মুক্তপাঠ যেখানে সম্ভব সেখানে পঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকৃতির তাৎপর্য গড়ে উঠতে থাকে। পাঠক যত সংবেদনশীল, তত বেশি পাঠকৃতির দিগন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে। স্বভাবত পাঠকের যোগ্যতা এবং প্রস্তুতির প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। জীবনানন্দের প্রবাদপ্রতিম শব্দবন্ধকে সামান্য পাল্‌টে নিয়ে বলা যায়, 'সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক।' তাহলে, প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, পাঠক কে? কিংবা কাকে বলব সত্যিকারের পাঠক? কোনো লেখক যখন তাঁর প্রতিবেদন তৈরি করেন, সেসময় কোনো-এক সম্ভাব্য পাঠকসত্তার উদ্দেশে কি ধাবিত হয় না তার যাবতীয় উপকরণ ও কৃৎকৌশল। সাম্প্রতিক আখ্যানতত্ত্ববিদেরা এবিষয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন অবতারণা করছেন। তাঁদের মতে লেখকসত্তাও বহুধা-বিভাজিত; প্রতিবেদনের চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হচ্ছে লেখকের ভূমিকা। তেমনি আখ্যান সম্বোধিত হচ্ছে যাঁদের প্রতি, সেই গ্রহীতা এবং পাঠক অভিন্ন কিনা—এ নিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কূটতর্ক রয়েছে। লেখক তাঁর পাঠকৃতিতে কখনও উদ্দিষ্ট পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করেন; কখনও বা পরোক্ষ আভাসে এবং বয়নের বিশেষ ধরনে সম্ভাব্য পাঠকের অনুপস্থিত উপস্থিতি অনুভব করি। এই উদ্দিষ্ট ও সম্ভাব্য পাঠক এবং প্রকৃত পাঠক একই ব্যক্তি, এমন ভাবার কারণ নেই। এবিষয়ে গেরাল্ড প্রিন্স যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। আখ্যানের গ্রহীতা এবং প্রতিবেদনের গড়ে-ওঠার সময় লেখকের দ্বারা কল্পিত পাঠক এক নয়; তেমনি গ্রহীতা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আদর্শ পাঠক সমার্থক নয়। লেখকের প্রতিটি কৃৎকৌশলকে যিনি কররেখার মতো পাঠ করতে পারেন, সেই আদর্শ পাঠকের কাছে লেখক পৌঁছে দিতে চান তাঁর সন্দর্ভকে। কিন্তু তবুও লেখক ও পাঠকের মধ্যে চলতে থাকে বিচিত্র লুকোচুরি খেলা। এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় আক্রমণকারী ও আক্রান্তের। লেখক তাঁর বীক্ষা চাপিয়ে দিতে চান নানাভাবে আর পাঠক তাঁকে প্রতিরোধ করেন এবং যথাপ্রাপ্ত বয়নে অন্তর্ঘাত করে প্রতিবেদনের মধ্যে ভিন্ন পরিসর আবিষ্কার করে নিতে চান। ফলে দু'পক্ষের টানাপোড়েন কখনও কখনও উভয়কে যুযুধান করে তোলে। গ্রহীতা ও পাঠকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমস্ত তাত্ত্বিক যে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন, এমন নয়; এবিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ আমাদের যথেষ্ট উপকৃত করতে পারে। এখানে তার অবকাশ নেই। শুধুমাত্র কয়েকটি উদাহরণের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ভারতীয় সাহিত্যে গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর এবং পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতিতে অনুসৃত বয়নরীতি যদি লক্ষ করি, দেখব, বয়নের মধ্যেই উৎসুক গ্রহীতার মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হচ্ছে। সূত্রধার হয়েছেন কথক। ঐ গ্রহীতার মনোরঞ্জনকে উপলক্ষ করে বয়ন থেকে বয়নান্তরে পাঠকৃতিকে তিনি প্রসারিত করে গেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত আরব্য-উপন্যাসে কথকের চেয়েও গ্রহীতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একহাজার একটি রাত্রি ধরে কথক অর্থাৎ খলিফার নবপরিণীতা বধূ বয়নের জাদুতে গ্রহীতা-শ্রোতা খলিফাকে মুগ্ধ ও নিবিষ্টচিত্ত করে রাখতে সক্ষম হয়েছে, এটা নিশ্চয় কম কৃতিত্ব নয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে, গ্রহীতা-শ্রোতার নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করার ওপর কথকের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে—কথাবয়ন দারুণ প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায়। একটু আগে আখ্যানতত্ত্ববিদ গেরাল্ড প্রিন্সের কথা বলেছি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, বিভিন্ন আখ্যান আলাদা আলাদা ভাবে নিজস্ব পাঠক বা শ্রোতা তৈরি করে নিতে পারে। আগেই লিখেছি, এদের সঙ্গে প্রকৃত পাঠকের সম্পর্ক থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। আখ্যান-বয়নের লক্ষ্য কেউ না কেউ থাকেই; প্রশ্ন এই, সেই উদ্দিষ্ট সত্তা এবং পাঠক অভিন্ন কিনা।

পাঠকসত্তা, পাঠকের ভূমিকা, সেই ভূমিকার তাৎপর্য এবং বিশেষভাবে যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতির গুরুত্ব আর বিচিত্র দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠকসত্তার অভিঘাতে ঐ পাঠকৃতির রূপান্তর তত্ত্ববিদদের সন্দর্ভ জুড়ে লক্ষ করি এত কিছুর কৌতূহলজনক উপস্থাপনা। গত কয়েক দশক ধরে আমাদের চিন্তাজগৎ যত স্রোত ও প্রতিস্রোতের বিভঙ্গে আলোড়িত হয়েছে, তাদের প্রতিটি অভিঘাত পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদের খাতে নিয়ে এসেছে নতুন জলোচ্ছ্বাসের বার্তা। শুধু যে নতুন ভাবনা ও নতুন দৃষ্টিকোণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাতে অর্জিত হয়েছে, এমন নয়। পাঠকৃতির অণুবিশ্বে পাঠকের ভূমিকা হয়ে উঠেছে সংকেত-গ্রাহকের, চলিষ্ণু অভিযাত্রীর। পড়া যে নিছক অধ্যবসায় নয় কেবল, সৃষ্টিশীল ও নবায়মান এক প্রক্রিয়া—ক্রমশ তা স্পষ্টতর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এভাবে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে আশ্চর্য সম্ভাবনার নিবিড় পথরেখা যা বর্তমানে সীমিত নয় কেবল, অতীতের কৃতিও তাতে পুরোপুরি নতুনভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে। বিশেষভাবে শ্রুতিসাহিত্য বা প্রাথমিক মহাকাব্যের ক্ষেত্রে ঐ প্রক্রিয়া ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। কেননা শ্রোতা-গ্রহীতা এবং কথকের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক যে মুক্ত পরিসরের দ্যোতনা স্বাভাবিকভাবে বয়ে আনে, তাকে আরো প্রসারিত আরো গভীর এবং আরো বিচিত্রগামী করে তোলে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ। ফলে কোনো বিশেষ সাহিত্য-মাধ্যমের বর্গগত চরিত্রও আমূল রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দুই

পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব, যাকে পাঠক-প্রতিক্রিয়ামূলক সমালোচনাতত্ত্বও বলা যেতে পারে, ভাববিশ্ব ও প্রত্যয়ের দিক দিয়ে একীভূত অভিন্ন অবস্থান নিতে পারেনি। এই অভিধা মূলত সেইসব সমালোচকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা ‘পাঠক’, ‘পাঠ-প্রক্রিয়া’, এবং ‘পাঠ-প্রতিক্রিয়া’র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিবিষ্ট রয়েছেন। ইঙ্গ-মার্কিন সমালোচনা ধারায় এই আন্দোলনের স্থান নব্য সমালোচনাবাদীদের ঠিক বিপরীতে। পাঠক-প্রতিক্রিয়াতত্ত্ববাদীদের মতে কোনো সাহিত্যিক পাঠকৃতির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব শুধুমাত্র যখন তার পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হচ্ছে। পাঠকৃতির তাৎপর্য ততক্ষণ কথার কথা মাত্র হয়ে থাকবে যতক্ষণ সংবেদনশীল পাঠকের মনে তা নিশ্চিত ঢেউ না তুলছে। দীর্ঘকাল ধরে ভিন্নভিন্ন ধারার তাত্ত্বিকেরা পাঠকের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্ন ভিন্ন পাঠকৃতির জন্যে ভিন্ন ধরনের পাঠ-ক্রিয়ার অনিবার্যতা, অর্থবোধের ক্ষেত্রে প্রকৃত পাঠক ও সম্ভাব্য পাঠকের দ্বন্দ্ব, পাঠকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাঠাভ্যাসের চিরাগত সংস্কার এবং পাঠকসত্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন। স্বভাবত বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থানের তাত্ত্বিকদের মধ্যে দেখা গেছে দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্য যা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধীও বটে। যেমন, ধরা যাক, নব্য সমালোচনাবাদ, আকরণবাদ, মনোবিকলনবাদ, প্রত্যক্ষচৈতন্যবাদ, বিনির্মাণবাদ প্রভৃতি পাঠক, পাঠভাষ্য ও পাঠকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব সংজ্ঞা দিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে, এখন আমরা প্রতিবেদন বিষয়ে পুরোপুরি নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারছি। ফলে পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব বা পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ আলাদা উল্লেখ ও ব্যাখ্যার দাবি রাখছে।

যখনই পাঠকসত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি, তা নৈর্ব্যক্তিক পাঠকৃতির গ্রন্থনাকে প্রথমে শিথিল করে দিয়ে পরে চূর্ণ করছে। পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব তাই সমালোচনা সাহিত্যের লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে আমূল বদলে দিচ্ছে। আর, তত্ত্বগত অবস্থানে যত পরিবর্তন হচ্ছে, সমালোচকদের নান্দনিক, সামাজিক ও নৈতিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিকোণেও দেখা দিচ্ছে অভূতপূর্ব রূপান্তর। লেখক-কথক যে-ধরনের বয়ন প্রস্তুত করবেন, পাঠক তা বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন—এমন আর হয় না, হবে না। কেননা, দু'পক্ষের বিশ্ববীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিমেরুবিষম হয়ে পড়ছে, যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতির চূড়ান্ত বিনির্মাণ করে পাঠক পুরোপুরি নতুন অণুবিশ্বের উদ্‌ভাসনকেও সম্ভব করতে পারছেন। এবার আমরা যদি এই চিন্তাধারার ক্রম-উত্থানকে ইতিহাসের ধারায় দেখতে চাই, তাহলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় স্বনামধন্য আই. এ. রিচার্ডস্-এর নাম। বিশের দশকে তিনি পাঠকের আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিরিশের দশকে উল্লেখযোগ্য ডি. ডব্লিউ. হার্ডিং ও লুই রোজেনব্লাট। পঞ্চাশের দশকে ওয়াকার গিবসন ছদ্ম-পাঠক সম্পর্কে আলোচনা করেন, এতে বোঝা যাচ্ছে, পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের সূতিকাগার হিসেবে প্রকরণবাদের ভূমিকা গৌণ নয়। অবশ্য গিবসনের তাত্ত্বিক বনিয়াদ মূলত প্রোথিত ছিল নব্যসমালোচনাবাদে। সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টত পাঠকৃতি-কেন্দ্রিক। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি সাহিত্যসৃষ্টি স্বকীয় মূল্যে ঋদ্ধ ও অনন্য। তাই পাঠকৃতির গ্রন্থনায় অর্থাৎ শব্দানুষঙ্গে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার তাৎপর্য। সমালোচনা প্রক্রিয়ায় বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো বয়নের সম্পূর্ণ অর্থদ্যোতনা উদ্‌ঘাটিত হওয়া কঠিন। গিবসনের মতে 'পাঠক'-এর প্রয়োজন, পাঠকৃতিতে নিহিত অনাবিষ্কৃত সম্পদ খুঁজে পাওয়ার জন্যে। তিনি যেহেতু 'ছদ্মপাঠক' কথাটি ব্যবহার করেছেন, এতে বোঝা যাচ্ছে, কোনো অর্থে তা 'প্রকৃত পাঠক'-এর গুরুত্ব পাচ্ছে না। যে-সমস্ত সীমান্ত পাঠকৃতির উদ্ভাবক ও গ্রহীতার মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে, তাদের ক্রমশ ভেঙে দেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি পদ্ধতির সূত্রপাত করছে ঐ ছদ্ম-পাঠক। প্রথম পদক্ষেপ আর চূড়ান্ত গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে অনেক অন্তর্বর্তী স্তর, এই পথটুকু পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে গিবসন কোনো একক পাঠকের ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁর ছদ্মপাঠকের কিন্তু শরীরী অস্তিত্ব নেই; তা পুরোপুরি পাঠকৃতিতে সংশ্লিষ্ট। বলা যায়, এটা আসলে নেহাত এক 'ভূমিকা' যা প্রতিবেদন সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত পাঠককে পালন করতে হয়। গিবসন ছদ্মপাঠককে পাঠকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ভালো বই তাকেই বলব যেখানে ছদ্মপাঠকের মধ্যে আমরা প্রিয় ও অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্বের ছায়া খুঁজে পাই। ঠিক উল্টোটা যখন ঘটে, আমরা বলি, খারাপ অর্থাৎ ব্যর্থ বই। কথক ও ছদ্মপাঠকের মধ্যে যে বাচন ও প্রতিবাচন আমরা আবিষ্কার করি, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং অন্তর্বৃত নাটকীয়তা প্রতিবেদনকে নতুন দ্যোতনায় যুক্ত করে। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পাঠক সম্পর্কিত ধারণাকে নতুন ধরনের পাঠকৃতি বিশ্লেষণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে গিবসন পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের লক্ষ্য ও প্রবণতাকে অনেকটা পূর্বানুমান করে নিয়েছিলেন।

পাঠকৃতি সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া কতরকমভাবে হতে পারে, তা বিভিন্ন পর্যায়ে সমালোচকদের ধারাবাহিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট তত্ত্বের আকার ও চরিত্র অর্জন করেছে। রিচার্ডস্-হার্ডিং-রোজেনব্লাট ছাড়া প্রথম পর্যায়ে মভ বডকিন ও কেনেথ বার্ক যখন আলোচনা করেছেন, সেসময় পাঠকের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল পাঠকৃতি এবং প্রতিবেদনের প্রেক্ষিত। কিন্তু ক্রমশ পাদ-প্রদীপের আলো কেন্দ্রীভূত হতে থাকে পাঠক এবং পাঠক্রিয়ার ওপর। বহু আলোচকের সমাবেশে এবং সমসাময়িক দার্শনিক ভাবনা ও সাহিত্যতত্ত্বে পুষ্ট হয়ে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে নেয়। আমেরিকায় এই মতবাদের পুষ্টিদাতা ছিলেন ডেভিড ব্লাইচ, স্টিফেন বুথ, ওয়েন বুথ, জোনাথন কুলের, পল দ্য ম্যান, জুডিথ ফেটার্লি, স্ট্যানলি ফিশ, নর্মান হল্যাণ্ড, সাইমন লেজার, জে. হিলিস মিলের, রিচার্ড পামার, মেরি লুই প্রাট, গেরাল্ড প্রিন্স, অ্যালেন পারভেস, মিশেল রিফাটেরে, ওয়াল্টার স্ল্যাটোফ, উইলিয়াম স্প্যানোস প্রমুখ। অবশ্য এই আলোচকদের অনেকেই মূলত নির্দিষ্ট চিন্তাপ্রস্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তুলনামূলকভাবে, ব্যাপকতর পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল গৌণ। তাই এদের অধিকাংশ আলোচ্য মতবাদের পরিপোষক মাত্র, প্রবক্তা নন। যেমন ওয়েন বুথ প্রকরণবাদের চিকাগো শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; দ্য ম্যান ও মিলের প্রথম অবভাসবাদের সঙ্গে এবং পরে বিনির্মাণবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। অন্যদিকে পামার ও স্প্যানোস তাৎপর্য নির্ণয়বাদে এবং প্রিন্স ও রিফাটেরে আকরণবাদে যুক্ত ছিলেন। কুলের আকরণবাদ থেকে সরে এসেছিলেন বিনির্মাণবাদের দিকে; আর, ফেটার্লি যুক্ত ছিলেন নারীচেতনাবাদে। এঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ সত্তর দশকের শেষে পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে, অন্যদের তুলনায়, ফিশ-হল্যাণ্ড-ব্লাইচ—এই তিনজনের গুরুত্ব বেশি।

যেহেতু একাধিক চিন্তাস্রোত এসে মিশেছে এই তত্ত্বপ্রস্থানে, এতে গ্রহীতা-পাঠকের অবস্থান এবং দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদের মধ্যে মুখ্য-গৌণ কিংবা বেশি-সত্য-কম-সত্য জাতীয় ভেদরেখা তৈরি করাটা কঠিন—বহুত্ববাদী সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিফলন যেহেতু তত্ত্বচিন্তায় অনিবার্য, পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদে সংশ্লেষণী প্রবণতা খুব স্পষ্ট। অনেকান্তিকতায় নিঃশ্বাস নেয় এই তত্ত্ব; তাই পাঠকৃতিকেন্দ্রিক সমালোচনা তার কাছে গ্রাহ্য হয়নি। কেননা পাঠকৃতির যথাপ্রাপ্ত অবস্থার মধ্যে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে চিন্তার বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই প্রকরণবাদের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে এই তত্ত্বপ্রস্থান পাঠকের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতি যেখানে অচল, অনড়, অপরিবর্তনীয়, পাঠকসত্তা সেখানে চলিষ্ণু, বিকাশমান এবং পরিবর্তন-উন্মুখ। পাঠকৃতির অন্তর্বৃত ঐক্য ও ধারাবাহিকতার বদলে অনন্বয় ও বিচ্ছেদ নান্দনিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই ভাবপ্রস্থানে। পাঠ-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক জ্ঞানতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতা এবং পাঠকের মধ্যে রয়েছে কত অজস্র স্তরভেদ—সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাত্ত্বিকেরা। সেইসঙ্গে অবশ্যই রয়েছে কূট নন্দনতাত্ত্বিক তর্ক এবং ইতিহাসের ভূমিকা সম্পর্কে নানা মতান্তর। পাঠকের অধিকার কতদূর ব্যাপ্ত, সেই প্রশ্ন তো আছেই। আছে ছদ্ম-পাঠক, প্রকৃত পাঠক, সম্ভাব্য পাঠক, বিদ্রোহী পাঠক, অন্তর্ঘাতক পাঠক, স্বতঃসিদ্ধ পাঠক ইত্যাদি শ্রেণীভেদও। স্বভাবত এই জাতীয় পাঠকবর্গের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় তাদের ক্রিয়াভূমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ পাঠকৃতি তাৎপর্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন হয়ে পড়ে। তা যদি না হত, একই পাঠকৃতি থেকে কালান্তরের পড়ুয়ারা ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে পৌঁছাতেন না। এইজন্যে শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট বা টেম্পেস্ট রোমান্টিকদের কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষে সেভাবে হয়নি এবং বিশ শতকের তিরিশ বা চল্লিশের দশকের পাঠক আর সত্তর বা আশির দশকের পাঠক পুরোপুরি আলাদা অর্থ খুঁজেছিল ঐ দুটি পাঠকৃতি থেকে। তেমনি নারীচেতনা বা উপনিবেশোত্তর চেতনা বা নিম্নবর্গীয় চেতনা নিষ্পন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইদানীং পুনঃপাঠের বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে, আমরা পাচ্ছি সাহিত্যিক প্রতিবেদনের নিত্য নূতন ভাষ্য।

এই তত্ত্বপ্রস্থানকে বোঝার জন্যে অবভাসবাদ নামক দার্শনিক মতবাদের সাহায্য অনেকটা কাজে লাগে। অর্থ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের কেন্দ্রীয় ভূমিকার ওপর এই মতবাদ গুরুত্ব আরোপ করে। এই ধারার চিন্তাবিদদের মধ্যে এডমাণ্ড হুজের্ল, মার্টিন হাইদেগার ও হ্যান্স-জর্জ গাদামারের সঙ্গে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। হুজের্ল জানিয়েছেন, দার্শনিক অন্বীক্ষার যথার্থ বিষয় হল মানব-চৈতন্যের অন্তর্বস্তু, বহিঃপৃথিবীর অনুপুঙ্খ নয়। আর, চেতনা মানে কোনো-না-কোনো অস্তিত্ব বা বস্তু। আমাদের চেতনা যা প্রতীতি তৈরি করে, প্রকৃতপক্ষে তা-ই বাস্তব ও সত্তাবান। শুধু তাই নয়, আমরা কোনো বস্তু বা অনুপুঙ্খ বা ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে আসলে তা-ই আবিষ্কার করি যা আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়। হোক না তা প্রতীয়মান, তবু কোনো বিশেষ মুহূর্তে সেই উপলব্ধি-ই সত্য এবং ঐ সত্যের আধেয় তার বস্তুগত আধারকে রঞ্জিত করে নেয়। মানবচৈতন্য এবং বস্তুবিশ্বের অন্তঃপ্রকৃতি উন্মোচনের দায়িত্ব অবভাসবাদ গ্রহণ করে। ব্যক্তি-মানুষের মনই সমস্ত অর্থের কেন্দ্র ও উৎস, এই ভাবনা রোমান্টিক যুগের পরে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। বিশ শতকে আবার নতুন পোশাকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে। সাহিত্যতত্ত্বে এর সরাসরি ও সরলীকৃত প্রভাব অবশ্য খুব জোরালো হয়ে ওঠেনি; সমালোচকের মনোভূমিতে বিশুদ্ধ আত্মগত প্রেরণাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বরং অবভাসবাদ থেকে বিচ্ছুরিত অনুরণনে এমন এক ধরনের সমালোচনা-ধারা পুষ্টিলাভ করেছে যাতে কোনো সাহিত্যিক পাঠকৃতির অন্তঃপ্রকৃতি সমালোচকের চেতনায় প্রতিফলিত হয়েই তাৎপর্য অর্জন করে। প্রতিবেদনের বিশ্লেষণী পাঠ থেকে লেখকের বিশ্ববীক্ষাও পুনর্নির্মিত হয়ে সত্যের নব নব রূপ উদ্ভাসিত করে। গ্রহীতার চেতনায় অর্জিত সমস্ত প্রতীতিই বাস্তব এবং সত্য বলে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের এই অন্তঃসার অবভাসবাদ দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হচ্ছে। আমেরিকার বিখ্যাত বিনির্মাণবাদী তাত্ত্বিক জে. হিলিস মিলেরের উপন্যাস-ভাষ্য অবভাসবাদের জেনেভা-শাখা অর্থাৎ জর্জ পৌলে ও জাঁ স্ট্যারোবিনস্কি প্রভৃতি সমালোচকদের গভীর প্রভাবের ফসল—একথা অনেকেই বলেছেন।

বিশ্লেষণী প্রক্রিয়া সম্ভব হতে পারে কারণ লেখকের চৈতন্যে প্রবেশ করার অধিকার পাঠকৃতিই পড়ুয়াকে দিয়ে থাকে। পৌলে লিখেছেন, লেখকের চেতনায় রঞ্জিত প্রতিবেদন তার উৎস-চেতনাকে আমাদের কাছে খুলে দেয়। অভিযাত্রী পাঠকদের স্বাগত জানায় আর গভীর অন্তঃস্থলে দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য করে। লেখক-চেতনায় যত ভাবনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুভূতি স্পন্দিত হয়, পড়ুয়াকে তার ছন্দে-লয়ে সম্পৃক্ত করে নেয়। বিষয়টা নিয়ে অবশ্য সূক্ষ্ম তর্ক কম হয়নি। দেরিদা এ ধরনের চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু এখানে এ-নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু অবভাসবাদী চিন্তাধারার মধ্যে নানা ধরনের উচ্চাবচতা লক্ষ করতে পারি। যেমন হুজের্লের কিছু কিছু বক্তব্য তাঁর শিষ্য হাইদেগার মানতে পারেননি। এই স্বাধীন পদচারণার স্পৃহায় তিনি যে নতুন ভাবনা-প্রস্থান গড়ে তুলছিলেন, তাতে পাঠককেন্দ্রিক তত্ত্বের রূপরেখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হাইদেগার বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, মানব-অস্তিত্বের গোত্রচিহ্ন হল যথাপ্রাপ্ত সত্তা। তার মানে, আমাদের চেতনা একই সঙ্গে জগতের বস্তুসন্নিবেশকে তুলে ধরে এবং তাদের দ্বারা ঐ জগতে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। জগতে চেতনার বিশেষ প্রকাশ ও অবস্থানের জন্যেই এমন ঘটে। যে-কাল ও পরিসর আমরা নিজেরা বেছে নিইনি, তা-ই যেন আমাদের গ্রাস করে নেয়। শুধু তা-ই নয়, জগৎ যেন আমাদের জড়িয়ে ধরে পাকে-পাকে; জাগতিক উপস্থিতি অমোঘ হয়ে ওঠে বারবার। আবার যেহেতু আমাদেরই চেতনা নির্মাণ করছে জগৎকে, এ আমাদের 'নিজস্ব' জগৎ। নিরাসক্ত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ কখনও গ্রহণ করা সম্ভব হয় না; কবির মতো বলতে পারি না, 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!' পর্বতশিখর থেকে উপত্যকার দিকে তাকানোর মতো জগৎ ও জীবনকে যে দেখে, তার সম্বল শুধু অলীক দৃষ্টি। আমাদের চাই দ্রষ্টা চক্ষু যা সত্তার স্বরূপকে চিনে নেয়। এভাবে আমরা আমাদের চেতনার অন্বিষ্টের সঙ্গেই অনিবার্যভাবে মিশে যাই। এই ভাবনার সূত্রে পাঠকের সঙ্গে পাঠকৃতির সম্পর্ক আমাদের মনে পড়ে; দার্শনিকের কাছে সাহিত্যতত্ত্ব অর্জন করে নেয় তার পথের দিশা ও পাথেয়। পরবর্তী ধাপে বুঝতে পারি, চিন্তা কখনও নির্দিষ্ট পরিসরের বাইরে হয় না; চিন্তার চাই দৃঢ় ভিত্তিভূমি। এইজন্যে চিন্তা সর্বদা ইতিহাস-নিষ্পন্ন, ইতিহাস তাকে যোগান দেয় আলো-হাওয়া-রোদ; এই ইতিহাস অবশ্য বহির্বৃত নয়, সামাজিকও নয়; তা হলো ব্যক্তিগত ও অন্তর্বৃত। এখানে হ্যান্স-জর্জ গাদামারের প্রাসঙ্গিকতা, তিনি 'Truth and Method' (১৯৭৫) বইতে হাইদেগারের প্রাগুক্ত ব্যাখ্যাকে সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। গাদামার এই অভিমত দিয়েছেন যে, কোনো সাহিত্যকর্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন হিসেবে জগতে 'আবির্ভূত' হয় না। বরং ভাষ্যকার-বিশ্লেষকের ঐতিহাসিক অবস্থানের ওপর তাৎপর্য নির্ভর করে। জার্মান তাত্ত্বিকদের 'রিজেপশন-অ্যাসথেটিক' যে গাদামারের ছায়ায় লালিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তিন

হ্যান্স রবার্ট হাউজ ছিলেন ঐ জার্মান তাত্ত্বিকদের অন্যতম প্রধান। পাঠককেন্দ্রিক সমালোচনাকে তিনি ঐতিহাসিক মাত্রায় সম্পৃক্ত করেছিলেন। তখন একদিকে রুশ প্রকরণবাদ ইতিহাসকে উপেক্ষা করছিল আর অন্যদিকে নানা ধরনের সামাজিক তত্ত্ব পাঠকৃতিকে তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছিল। এই দুই মেরুর মধ্যে হাউজ একটা আপসরফা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাইছিলেন যেন। ষাটের দশকের শেষে যখন ইউরোপীয় সমাজে অস্থিরতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল আর মানুষের অন্তর্জগতে শুরু হয়েছিল বিপুল পালাবদলের তরঙ্গাভিঘাত, প্রচলিত সাহিত্যবীক্ষা সম্পর্কে স্বভাবত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। দেখা যাচ্ছিল নতুন পথ ও পাথেয়ের জন্যে ব্যাকুলতা। হাউজ এবং তাঁর সহযাত্রীরা কালান্তরের বার্তা শুনতে পেয়েছিলেন এবং সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশ্ববীক্ষার এই গুরুতর পরিবর্তনের অনিবার্য অভিব্যক্তি সন্ধান করেছিলেন। কেননা সমালোচনার অভ্যস্ত পদ্ধতি পুরোপুরি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল এবং প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলায় সেসব কেবল মিথ্যার স্তূপকে পুঞ্জীভূত করে তুলছিল। বস্তুত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগের কাঠামো পরিবর্তন বা 'Paradigm shift' খুব জরুরি কেননা, তা না হলে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি কবেই রুদ্ধ হয়ে যেত। নিউটন থেকে আইনস্টাইন আর আইনস্টাইন থেকে হকিং কিংবা আর্কিমিডিস থেকে গ্যালিলিও আর গ্যালিলিও থেকে জোসুয়া লেডারবার্গ—কত অজস্রবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় চিন্তা-কাঠামো যে পরিবর্তিত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সুতরাং জীবন-সন্ধান প্রসূত সাহিত্য-সন্ধানেও যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের আকরণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কালের মাত্রাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে, এটাই প্রত্যাশিত। জীর্ণ পুরোনোর স্থান নেবে সজীব নবীন। সময়ের অনুশীলন থেকে অর্জিত নতুন অভিজ্ঞতা নতুন উপলব্ধি নতুন সমস্যা নতুন আকাঙ্ক্ষা মনোযোগ দাবি করবে—এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করবে সাহিত্যতত্ত্ব। হাউজ 'প্রত্যাশার দিগন্ত' শব্দবন্ধকে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, কোনো নির্দিষ্ট কালপর্বে পাঠকেরা যখন সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে বিচার করতে চান—তখন প্রত্যাশার দিগন্ত অনিবার্য ভাবে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হতে থাকে। তাঁর যুক্তিবিন্যাস অনুসরণ করে উনিশ শতকের বাংলা কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করা যেতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যে 'খাঁটি বাঙালি কবি'র লক্ষণ দেখতে পেয়ে তাঁর স্বাদেশিকতার প্রশংসা করেছিলেন, এইজন্যে সমকালীন প্রত্যাশার চরিত্রই দায়ী। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেহেতু প্রত্যাশার দিগন্ত আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছে, ঈশ্বর গুপ্তের বাঙালিত্ব মেনে নিয়েও তিনি 'খাঁটি কবি' কিনা—এই মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে। তেমনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক সময় মধুসূদনের চেয়ে বড়ো কবি বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বর্গের প্রথম উন্মেষের পর্বে তাঁর সীমাবদ্ধতাও পড়ুয়াদের জীবনের তালে-লয়ে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই একথা আর কেউ বলছেন না। আবার, এই শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবনানন্দ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-কটাক্ষ-উপহাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আজ তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত। এর কারণ, পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত ইতিমধ্যে, সামাজিক ইতিহাসের অনিবার্য প্রেরণায়, আমূল রূপান্তরিত ও প্রসারিত হয়ে গেছে।

পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত যে কখনও প্রসারিত আর কখনও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, এর প্রধান কারণ সামাজিক ইতিহাসের চলিষ্ণুতা, দার্শনিক মননের পটপরিবর্তন, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের রূপান্তর। আবার সাহিত্যিক প্রতিবেদনের চরিত্রের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওপরও ঐ প্রত্যাশার দিগন্ত অনেকটা নির্ভর করে। যেমন, মহাকাব্যের পাঠক আর গীতিকাব্যের পাঠক একই প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিবেদনের মুখোমুখি হন না কিংবা গীতিকবিতার পাঠক আর উপন্যাসের পাঠক একই অঞ্চলে অবস্থান করেন না; একটু তলিয়ে ভাবলে বুঝতে পারি, যেসব পাঠক পাঠকৃতি রচনার সমসাময়িক, তাঁদের কাছে রচনার মূল্য ও তাৎপর্য একভাবে প্রতিভাত হয়। তাঁদের প্রত্যাশার দিগন্ত একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু তখনও পাঠকৃতির নিহিতার্থ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। পরবর্তী পাঠকদের মধ্যে প্রত্যাশার দিগন্ত যত পরিবর্তিত হয়, প্রতিবেদনের তাৎপর্য তত বেশি পূর্ণতা লাভ করে। হাউজের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোনো সাহিত্য-কর্মকে সার্বভৌম বলে একমাত্রিক ভাবে গ্রহণ করা ভুল। কেননা তাতে পাঠকৃতির তাৎপর্য চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমন মনে করাও সঙ্গত নয় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে বিশেষ কোনো পাঠকৃতি সমস্ত পাঠকের কাছে একই ভাবে উন্মুক্ত হবে। প্রতিটি পর্বে প্রতিটি পাঠকের কাছে সাহিত্যের প্রতিবেদন একই চেহারা দেখায় না কখনও। একবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোনো কল্পিত সময়াতীত নির্যাস প্রকাশ পায় না প্রতিবেদনে। এতে অবশ্য একটা সমস্যা থেকে যায়। নির্দিষ্ট এক সময়বিন্দুতে অবস্থান করে আমরা কখনও কোনো সাহিত্যকর্মের চূড়ান্ত মূল্য বা তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারি না। এই চেষ্টা যদি কেউ করেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকেই উপেক্ষা করবেন।

সাম্প্রতিক কোনো রচনা এক ধরনের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে দেয়, আবার পূর্বজদের কোনো প্রতিবেদন ভিন্ন মাত্রার প্রত্যাশার দিগন্ত সৃষ্টি করে। যখন আমরা পুনঃপাঠ করি, আমাদের সামনে অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকেন ঐ প্রতিবেদনের প্রথম পাঠকেরা। যদি কয়েক প্রজন্ম ইতিমধ্যে পেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাদের সম্মিলিত পাঠ-অভিজ্ঞতা আমাদের চোখের সামনে পর্দা ফেলে দিতে পারে। এমন কি, সাম্প্রতিক নান্দনিক চেতনাও স্বাধীন পাঠের অন্তরায় হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। এমন তো হতেই পারে যে প্রথম পর্যায়ের পাঠকেরা তত চক্ষুষ্মান ছিলেন না; আজ যে-রচনার মধ্যে যুগান্তকারী তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছি দ্রষ্টা চক্ষুর সহায়তায় এবং অবশ্যই সামাজিক ইতিহাসের আমূল রূপান্তরের প্রভাবে—তা আগে পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে। যেমন, সফোক্লিসের 'রাজা অয়দিপাউস' বা শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' ও 'টেমপেস্ট' নাট্যকারের সমকালীন পাঠকেরা নির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করেছিলেন এবং তৃপ্তও হয়েছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু পরবর্তী বিভিন্ন যুগে যেভাবে ভিন্ন-ভিন্ন তাৎপর্যে এরা পুনঃপঠিত হয়েছে, তার কোনো হদিশ আদি-পাঠকদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তার মানে, তাঁরা পাঠকৃতির সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করতে পারেননি। অস্তিত্ববাদীর হ্যামলেট আর রোমান্টিকদের হ্যামলেট কিংবা উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদীর টেমপেস্ট আর ধ্রুপদীদের টেমপেস্ট অথবা এলিজাবেথীয় যুগের রাজা অয়দিপাউস এবং আধুনিকোত্তর কালের রাজা অয়দিপাউস কখনও অভিন্ন নয়। পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত যে এভাবে আমূল রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, এর কারণ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতীত ও বর্তমানের দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত সমস্ত মানবিক প্রতিবেদন। যখন কোনো কালোত্তর পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, জীবন-জগৎ-সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন জাগে মনে। তবে এইসব প্রশ্ন সর্বদা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিশ শতকের তিরিশ বা চল্লিশ শতকের পাঠক স্বভাবত যে-ধরনের জিজ্ঞাসা পেশ করেছিলেন, ষাট বা সত্তর দশকের পড়ুয়া নিশ্চয় তার বদলে পুরোপুরি অন্য প্রশ্নমালার প্রেরণা অনুভব করেছেন। আবার একুশ শতকের শুরুতে পুনঃপাঠ থেকে জন্ম নিচ্ছে স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা। সেইসঙ্গে পড়ুয়ারা সেইসব প্রশ্নও আবিষ্কার করতে চাইছেন, আপন ইতিহাসের সঙ্গে দ্বিবাচনিকতায়, প্রতিবেদন নিজেই যাদের উত্তর খুঁজেছিল। আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষাকে সর্বদা চিনতে পারি অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাসে; তেমনি বর্তমান যতই ক্ষণজীবী হোক, কেবলমাত্র তারই দর্পণে প্রতিফলিত করে বুঝতে পারি অতীতকেও। এইজন্যে পাঠকৃতির নির্যাস আবিষ্কার করার প্রক্রিয়া শেষ হয় না কখনও। কোনো ভাষ্য বা বিশ্লেষণ পুনঃপাঠের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ করতে পারে না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের বিবর্তন মনে রেখেই পড়ুয়াকে নিজের কাজে ব্রতী হতে হয়। বিগত কালের প্রতিবেদনে সচেতন পাঠক যখন মানস ভ্রমণ করেন, তখন প্রতিটি মুহূর্তেই বর্তমান তাঁর সঙ্গে থাকে, পথ ও পাথেয় সম্পর্কে নিরন্তর সতর্ক করে দেয়। জার্মান তাত্ত্বিকদের মধ্যে হুল্‌ফগ্যাঙ্গ আইজের আরেকটি স্মরণীয় নাম। তাঁর চিন্তাধারা বিশেষ ভাবে গাদামার ও রোমান ইনগার্ডেন-এর নান্দনিক ভাবনা দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। হাউজের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই যে তিনি পাঠকৃতি ও পাঠককে প্রেক্ষিত ও ইতিহাসের আওতা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর তত্ত্ববিশ্ব প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে 'The Act of Reading A Theory of Aesthetic Response' (১৯৭৮) বইতে। তাঁর অভিমত হল, জীবন থেকে অর্জিত নীতি, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত পাঠক কোনো পাঠকৃতিকে সম্ভাবনাময় আকরণের স্তর থেকে অর্থাৎ বিমূর্ত থেকে মূর্ত রূপে নিয়ে আসেন। পাঠকৃতির মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে নিজস্ব প্রতাপের বলয় যার সাহায্যে তা পাঠকের পাঠ-অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু স্বাধীন পাঠকসত্তা সর্বদা ঐ নিয়ন্ত্রণের প্রবণতাকে অস্বীকার করতে চায়। ফলে দেখা দেয় দুইয়ের টানাপোড়েন। পাঠক তাঁর নিজস্ব অবস্থান ও উপলব্ধির সূত্রে মূর্তায়নের প্রক্রিয়াকে গতি ও চরিত্র দিয়ে থাকেন। পাঠ-অভিজ্ঞতাকে তিনি পাঠ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিশীলিত করে তোলেন। নিজের প্রত্যাশাকে তিনি অনবরত পরিমার্জন করতে থাকেন বলে পাঠকৃতির তাৎপর্যও ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে। আসল কথা হচ্ছে পাঠ-ক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা আর পাঠকৃতির সঙ্গে পাঠকের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক। আইজের বলেছেন, পাঠকৃতিকে অন্য যে-কোনো বিষয়ের মতো ব্যাখ্যা করা সমালোচকের দায়িত্ব নয়, পাঠকের মনে প্রতিবেদন কীভাবে কত ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তা পরিমাপ করাই তাঁর মুখ্য কাজ। সমস্ত সম্ভাব্য পাঠ প্রচ্ছন্ন থাকে পাঠকৃতির গভীরে। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল, তিনি দু'ধরনের পাঠক সম্পর্কে তাত্ত্বিক বয়ান পেশ করেছেন প্রতীত পাঠক এবং প্রকৃত পাঠক। প্রথম বর্গের পাঠককে পাঠকৃতি নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করে; প্রতিবেদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গভীরে তার সঞ্চরমান ছায়া আমাদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পড়তে প্ররোচিত করে। এই প্রতীত পাঠক আসলে, আইজেরের মতে, 'a network of response-inviting structures'! দ্বিতীয় বর্গের পাঠক অর্থাৎ প্রকৃত পাঠক পড়তে পড়তে নিজস্ব মানসিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ প্রতিক্রিয়া কিছু ভাবকল্পের রূপ ধরে আসে। কোনো সংশয় নেই যে অর্জিত অভিজ্ঞতার সূত্রে পাঠক তাঁর নিজস্ব ভাবকল্পকে নির্মাণ করেন। যেমন, কোনো নারীচেতনাবাদী যখন মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী' গল্পটি পড়েন, তিনি পাঠকৃতি থেকে ভিন্ন ধরনের তাৎপর্য নিঙড়ে নেন। কিন্তু পুরুষতন্ত্রে অভ্যস্ত পাঠক আবেগ ও অনুভূতির দিক থেকে সেই মাত্রায় কখনো পৌঁছাতে পারবেন না। উপন্যাসের সত্য নানা বেশে, কখনও কখনও ছদ্মবেশেও, পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। দৈনন্দিন বাস্তবে বিভিন্ন অনুপুঙ্খ যেভাবে বিন্যস্ত হয়ে থাকে, উপন্যাসে হুবহু সেরকম পাই না। কারণ উপন্যাসের ভাষা কল্পনা ও সংবেদনার সাহায্যে তাদের পুনর্নির্মিত করে নেয়। পাঠক যা পান তা আসলে বস্তুপুঞ্জের ছায়া, নিজস্ব পাঠে তিনি তাই ছায়ার ছায়া গড়ে তোলেন। যত তিনি পাঠকৃতির অন্দরমহলে প্রবেশ করেন, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যেতে যেতে তাঁকে নিজস্ব ভাবকল্পের পুনর্বিন্যাস করার জন্যে তৈরি থাকতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁর প্রত্যাশার দিগন্তকে তিনি বারবার পুনর্গঠিত করেন। আমাদের প্রত্যেকের সত্তাই তো স্মৃতি-গ্রথিত। সতর্ক পাঠক স্মৃতির এই গ্রন্থনাকে অনবরত বদলে নেন বিশেষত যখন উপন্যাসের কোনো কুশীলবের অবস্থান ও দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তাঁর অনন্বয় দেখা দেয়। পড়তে পড়তে আমরা যা অর্জন করি, তা হল, বিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও বীক্ষণবিন্দুর বিন্যাস। এমন নয় যে, প্রতিবেদনের গ্রন্থনার প্রতিটি বিন্দুতে ও প্রতিটি স্তরে স্থির ও পূর্ণ তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বস্তুত এ ধরনের আংশিক দৃষ্টি সত্যভ্রম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না; সমগ্রের প্রতীতি ছাড়া পাঠ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না কখনও। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিয়া চরিত্রটি, কেবলমাত্র আংশিক বীক্ষণের জন্যে, কোনো কোনো পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। পাঠকৃতি থেকে যদিও নানা ধরনের প্রত্যাশা বিচ্ছুরিত হতে থাকে, পাঠকের প্রস্তুতি ও প্রবণতা অনুযায়ী এদের নির্দিষ্ট কিছু অংশমাত্র গৃহীত হয়। শুধু তা-ই নয়, ঐসব প্রত্যাশাও অনবরত পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত হয়ে প্রমাণ করে যে, পাঠকৃতি মূলত সম্ভাবনার উৎস ও আশ্রয়।

উপন্যাসের অণুবিশ্বে জীবনবীক্ষণের একাধিক প্রবণতা ব্যক্ত হয়ে থাকে মূলত বিভিন্ন কুশীলবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের মধ্য দিয়ে। একই সময়ে থেকেও অনেক পরিসরের দ্যোতনা বয়ে আনে বলে তাদের পারস্পরিক কৌণিকতা বাস্তবতার ধারণাকেই শেষ পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ করে। পাঠক কীভাবে তাকে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর বিশ্ববীক্ষার ওপর। পাঠকৃতিতে উপসংহারের মধ্যে আপাত-সমাপ্তি থাকলেও প্রতিবেদনে অসম্পূর্ণতার আভাস থেকে যায়; গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জনার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখে পাঠক তাকে সম্ভাব্য সমাপ্তির দিকে নিয়ে যান। 'সম্ভাব্য'—কেননা, শেষ কথা বলে যেমন কিছু নেই তেমনি পাঠকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সক্রিয়তাও ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং পরিসরে ভিন্নপথগামী হয়। ফলে পর্ব থেকে পর্বান্তরে পাঠকৃতি থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে নানা ধরনের নানা মাপের তাৎপর্য। একটু আগে যে কুশীলবদের কথা লিখেছি, তাদের মধ্যে যেহেতু একাধিক বিশ্ববীক্ষার প্রতিফলন ঘটে, প্রতিবেদনের গভীরে দ্বিবাচনিকতার আবহ প্রবল হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে যে- বীক্ষণটি প্রবলতম, কেউ কেউ ভুলভাবে তাকে লেখকের কণ্ঠস্বর বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বহুশ্রুত মন্তব্যটি চমৎকার দিগ্‌দর্শক কবির মন রামের সঙ্গে রাম হয়, রাবণের সঙ্গে রাবণ! বিভিন্ন উচ্চারণের সংঘর্ষ লক্ষ করতে করতে সতর্ক পাঠক কোনো সরলীকৃত সিদ্ধান্তে না-পৌঁছে আবিষ্কার করতে চান বরং দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার নির্যাসকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', তারাশংকরের 'গণদেবতা', বিভূতিভূষণের 'অনুবর্ত্তন', মানিকের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', অমিয়ভূষণের 'চাঁদবেনে', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন', কমলকুমারের 'খেলার প্রতিভা', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করতে পারি। এইসব পাঠকৃতিতে বহুস্বর সন্নিবেশ থেকে লেখকের নিজস্ব উচ্চারণকে চিনে নিতে পারি কেবলমাত্র দ্বিবাচনিকতায়, অন্য কোনোভাবে নয়। পাঠক মূলত আবিষ্কারক এবং ভাষ্যকার; তাঁর আবিষ্কার এবং ভাষ্যকে তিনি পুনর্নির্মিত প্রতিবেদনে সম্পৃক্ত করে নেন। এতে পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী শূন্যায়তন পূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুত আইজেরের তত্ত্বে শূন্য পরিসর পূর্ণ করে তোলা-র এই ক্ষমতা পাঠকের সংবেদনশীলতার প্রধান চিহ্নায়ক হিসেবে বিবৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এইসব 'শূন্য' কিন্তু পাঠকৃতির অপূর্ণতা দুর্বলতার প্রমাণ নয় বরং ঠিক তার উল্টো। আসলে জীবনের আকরণের চেয়ে পাঠকৃতির আকরণ বেশি সুবিন্যস্ত; শূন্যতা তাই রিক্ততার পরিচায়ক নয়, প্রসারণশীল সম্ভাবনার প্রমাণ। জীবনানন্দের কবিতার পাঠককে বারবার প্রাগুক্ত ক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়; তাই তাঁর রচনা পুনঃপাঠ করে প্রতিটি প্রজন্ম আবিষ্কার করে নিচ্ছে কবিতায় বিধৃত জীবনের নতুন নতুন ভাষ্য। এইজন্যে আইজের বলেছেন, নিবিড় পাঠ আমাদের সুযোগ দেয় 'to formulate the unformulated'। এই সূত্র ধরে কবিতার পাঠকৃতিতে প্রচ্ছন্ন হিরণ্ময় নৈঃশব্দ্যকে খনন করেন সুবেদী পাঠক; দুটি পঙ্‌ক্তির, এমন কি দুটি শব্দের, অন্তর্বর্তী অকথিত বাণীর পরিসরকে বাঙ্ময় করে তোলেন তিনি।

কেউ কেউ অবশ্য সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, আইজেরের তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠক কি তাহলে স্বেচ্ছাচারী? অর্থাৎ পাঠকৃতির শূন্যায়তনকে পূর্ণ করার নামে তিনি কি যা খুশি তা-ই করার অধিকার পেয়ে যান। নাকি পাঠকের সমস্ত সক্রিয়তার উৎস হিসেবে পাঠকৃতি কী অলক্ষ্যে তাঁর ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে? আমাদের মনে হয়, সাহিত্য-প্রকরণ এবং পাঠক্রিয়া—এই দুইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে পাঠকের নিয়ত বিবর্তনশীল পাঠ-অভিজ্ঞতা। পাঠকৃতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববীক্ষার পরস্পরবিরোধিতা ও সংঘর্ষ দেখা দেওয়ায় কিংবা ভিন্ন ভিন্নভাবে ঐসব দৃষ্টিকোণের মধ্যবর্তী শূন্যায়তনকে পূর্ণ করার ফলে পাঠক হয়ে পড়েন অণুবিশ্বের সঞ্চালক। প্রতিবেদনকে তিনি নিজস্ব চেতনায় আত্তীকৃত করে নিয়ে তাকে আপন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেন। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠকৃতি যদিও পাঠকের পাঠ-ক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে কিছু কিছু শর্ত আরোপ করে, শেষ পর্যন্ত পাঠক-সত্তার সার্বভৌমত্ব বিশ্লেষণী পাঠের কৃৎকৌশল ও পরিণতির নিয়ন্তা হয়ে ওঠে।

চার

মার্কিন সমালোচক স্ট্যান্‌লি ফিশ-এর অবদান পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যক্তিগত পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে তিনি পাঠকৃতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন, তা 'Self-consuming Artifacts' (১৯৭২) এবং 'Is there a text in this class?' (১৯৮০) বই দুটিতে চমৎকার বিবৃত হয়েছে। তিনি নিবিড় পাঠের প্রয়োজনে যে পাঠক-কেন্দ্রিক প্রেক্ষিত গড়ে তুলেছিলেন, তা 'affective stylistics' নামে পরিচিত। আইজেরের মতো ফিশও বিশ্বাস করতেন, পাঠক যখন প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে তাৎপর্য সন্ধানে যাত্রা করেন, তাঁকে বারবার আপন প্রত্যাশাকে বদলে নিতে হয়। তবে ফিশ এই রূপান্তরের প্রবণতাকে বাক্য-মধ্যবর্তী শব্দ-সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, পাঠকের মনে প্রথম মৌলিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় শব্দের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস এবং পদান্বয়ের কুশলী ব্যতিক্রম দিয়ে। সুতরাং মনোযোগ সেদিকে কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেহেতু অনন্য, মুহূর্ত-পরম্পরায় ধারাবাহিকতা থাকে না কেবল, যতি আর বিচ্ছেদও থাকে। তাই প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিটি শব্দ অদ্বিতীয়। শব্দসম্বন্ধের অবিরাম পুনর্নবায়নকে যদি সঠিক অর্থে বুঝতে চাই, প্রয়োগের প্রতিটি স্তরে পাঠকের প্রত্যাশা এবং ভাষ্যকে নতুন হয়ে উঠতে হবে। তার মানে, পূর্বধার্য বর্গায়তনকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করলে পাঠক্রিয়া সত্যচ্যুত হবে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'the meaning is the total movement of reading' (১৯৯৩ ৫৮)। ফিশ যেভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন, তাতে একথা স্পষ্ট যে, তিনি মূলত কুশলী পাঠকদের ('informed reader') কথাই বিবেচনা করেছেন। এমন পাঠক, যাঁর ভাষাতত্ত্বে এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক ঐতিহ্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক জোনাথন কুলের মনে করেন, ফিশের তাত্ত্বিক অবস্থানে দুটি গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত, পাঠ-ক্রিয়ার প্রচলিত ধরন সম্পর্কে ফিশ কোনো তত্ত্বসমৃদ্ধ বয়ান তুলে ধরেননি এবং নিবিড় পাঠের মুহূর্তে, পাঠক কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকেন—এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। দ্বিতীয়ত, সাময়িক ক্রম অনুযায়ী শব্দানুষঙ্গ সহ বাক্যের নিবিড় পাঠ শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া পাঠক সত্যিই এত টুকরো টুকরো করে ও পর্যায়ক্রমিক ভাবে বাক্যের অনুসরণ করেন—এই ভাবনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়; এমনও নয় যে প্রতিটি বাক্যে বা প্রতিটি ভাব পর্যায়ে কোনো-না-কোনো বিস্ময় পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কিছু কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর যথার্থতা থাকলেও অধিকাংশ প্রতিবেদনে পাঠ-অভিজ্ঞতা কখনও এধরনের যান্ত্রিকতায় আশ্রয় নেয় না। এছাড়া ফিশ 'ভাষ্যপ্রবণ সংঘ' ('Interpretative

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

communities')-এর ধারণা উত্থাপন করেছেন। তার মানে, পাঠক যখন কোনো ভাবকল্প বা পূর্বানুমান বা নিবিড় পাঠের বিশিষ্ট কৃৎকৌশল গ্রহণ করেন—সে-সময় ধরে নিতে হবে, এটা নিছক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, এর পেছনে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বর্গের অনুমোদন রয়েছে। ঐ বর্গের নান্দনিক অবস্থান সমগ্র পাঠপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বিশ্লেষণের এই সামাজিকীকরণের ফলে অন্য একটা সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের পাঠকৃতি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাকে বেশি গুরুত্ব দেব নাকি পাঠক-বিষয়ক জিজ্ঞাসাকে এই ধরনের সংশয় অবান্তর হয়ে পড়ে। অনিবার্য ভাবে বিষয়বিষয়ীর দ্বন্দ্ব শূন্যে মিলিয়ে যায়। তাছাড়া তাৎপর্য নির্ণয়ের সমগ্র প্রক্রিয়াকে ভাষ্যপ্রবণ সংঘের পূর্বাগত বিধিবিন্যাসের অনুগত করার ফলে নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা প্রথাবিরোধী বিশ্লেষণের সম্ভাবনা—সমস্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এধরনের নিয়ন্ত্রণবাদ সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রে কখনও কার্যকরী হয় না। তাই ফিশ যা-ই বলুন, পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদ তত্ত্বগত ভাবে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গৌণ।

ফরাসি চিহ্নবিজ্ঞানী মিশেল রিফাটেরে তাঁর 'Semiotics of Poetry' (১৯৭৮) বইতে কবিতার ভাষা ও নিবিড় পাঠ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। রুশ প্রকরণবাদী ভাবনার সঙ্গে তাঁর খানিকটা আত্মীয়তা রয়েছে। প্রচলিত সাধারণ ভাষাকে তিনি ব্যবহার-উপযোগী এবং কোনো-না-কোনো ভাবে বাস্তব-সম্পৃক্ত বলে বর্ণনা করেছেন; অন্যদিকে কাব্যভাষা, তাঁর মতে, বার্তা পৌঁছে দেয় এবং মূলত তা অন্যনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ভাষা যিনি সার্থক ভাবে পড়তে পারেন, তাঁকে সংকেত-পাঠক বলা যেতে পারে। তাই রিফাটেরে এধরনের বিশিষ্ট পাঠকদের ('super-reader') যোগ্যতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভাষার নির্মোকে এঁদের 'দ্রষ্টাচক্ষু' সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্তর্ভেদী শক্তিতে পৌঁছে যায় ভাষার নির্যাসে। রিফাটেরে লিখেছেন, কবিতা নিছক বিবৃতির সমাবেশ নয়; কেবলমাত্র কিছু তথ্য উপস্থাপনা করে তার কাজ ফুরিয়ে যায় না। কবিতার ভাষা আসলে পরাভাষা; তাকে বলা যায় চিহ্নায়কের পরম্পরা বা সংকেতের গ্রন্থনা। পাঠকের প্রতিক্রিয়া সত্যিসত্যি শুরু হয়, যখন তথ্যের বদলে চিহ্নায়কের ওপর আলো এসে পড়ে। প্রচলিত ব্যাকরণ বা বিন্যাসরীতি থেকে সরে গিয়ে কবিতার ভাষা কীভাবে তথাকথিত বাস্তব থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং প্রত্যক্ষতার বদলে পরোক্ষ বাচনের মধ্য দিয়ে দ্যোতনার বলয় তৈরি করে—এসব নিবিষ্টভাবে লক্ষ করাই হল বিশিষ্ট পাঠকের প্রধানতম দায়িত্ব। প্রচলিত ভাষার সঙ্গে পার্থক্য ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিক সম্পর্কে গ্রথিত কবিতার ভাষা প্রতিমহূর্তে পাঠককে আবিষ্কারকে রূপান্তরিত করে। জীবনানন্দের কবিতা এর বিশিষ্টতম দৃষ্টান্ত। পাঠকের যদি ঈপ্সিত 'সাহিত্যিক যোগ্যতা' না থাকে, তাহলে কবিতার পাঠকৃতিতে মুহুর্মুহু ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘনের নিহিতার্থ কখনও বুঝতে পারবেন না। ভাষার অভ্যাস ভেঙে দিয়ে কীভাবে কবি কাব্যভাষার বনিয়াদ তৈরি করছেন এবং বাড়িয়ে দিচ্ছেন ভাষার আয়ুষ্কাল, সংবেদনশীল পাঠক তা অনুভব করেন। ভাষার প্রাথমিক স্তরে বিধিবিন্যাস আর অভ্যাসের প্রাধান্য; যত গভীরতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্তরে পৌঁছাই, ততই শিথিল হতে থাকে নিয়মের শৃঙ্খল। নৈঃশব্দ্যের এই পরিসরে অস্তিত্বের নির্যাস অপেক্ষা করে থাকে সুবেদী সংকেত-পাঠকের জন্যে।

বিশ্লেষণী পাঠের জন্যে পড়ুয়ারা যেহেতু নানা ধরনের কৃৎকৌশল ব্যবহার করে থাকেন, একই পাঠকৃতির বহু ভাষ্য হওয়া সম্ভব। বস্তুত যত পাঠক, তত পাঠ। এইজন্যে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভেবেছেন, সর্বজনগ্রাহ্য পাঠ-তত্ত্ব গড়ে তোলা কি আদৌ সম্ভব! জোনাথন কুলের বলেছেন যে, বিশ্লেষণের এই বৈচিত্র্য এবং আরো ভাষ্যের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করার দায় বহন করে পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদ। অনেক সময় দেখা যায়, একই ধরনের বিশ্লেষণী বিধি অনুসরণ করেও পড়ুয়ারা তাৎপর্য সম্পর্কে পরস্পর-ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কথাপ্রসঙ্গে জোনাথন নব্যসমালোচনাবাদের মৌল প্রত্যয় অর্থাৎ ঐক্যবোধের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, এই ধারার পাঠকেরা একই পাঠকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনে ব্যাখ্যা করে ঐক্যপ্রতীতিতে পৌঁছেছেন। আবার ঐক্যের আকল্পও অনেক সময় পরস্পর-ভিন্ন হয়ে থাকে; ফলে ভাষ্যে দেখা যায় বিচিত্র উচ্চাবচতা। এখানে প্রাগুক্ত 'সাহিত্যিক যোগ্যতার' প্রাসঙ্গিকতা বড়ো হয়ে ওঠে। লেখক এবং পাঠক—দুপক্ষেই এর গুরুত্ব রয়েছে; তবে কালে-কালান্তরে পড়ুয়াদের জন্যে পাঠক্রিয়া যেহেতু নতুন নতুন প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে, পাঠকের সমস্যা শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি ও নানা মাত্রাযুক্ত হয়ে পড়ে। কুলেরের বক্তব্যও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে গেছে। তাঁর তাত্ত্বিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এই বইগুলিতে 'Structuralist Poetics' (১৯৭৫), 'The Pursuit of Signs' (১৯৮১), 'On Deconstruction' (১৯৮৩) এবং 'Framing the Sign' (১৯৮৮)।

মনস্তত্ত্ববিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদকে তাত্ত্বিক সমর্থন দিয়েছেন দুজন মার্কিন সমালোচক নর্মান হল্যান্ড ও ডেভিড ব্লাইচ। এঁদের বক্তব্য পাই মূলত যথাক্রমে '5 Readers Reading' (১৯৭৫) এবং 'Subjective Criticism' (১৯৭৮) বই দুটিতে। এঁরা পাঠক্রিয়াকে পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা মেটানোর উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হল্যান্ড মনে করেন, বয়স্ক মানুষমাত্রই এক ধরনের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত অন্তর্বস্তুকে ('Identity theme') সযত্নে লালন করে। একে বলা যেতে পারে প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য অহং-সংশ্লিষ্ট মনস্তত্ত্ব। শৈশবে প্রতিটি শিশু মায়ের কাছ থেকে 'প্রাথমিক পরিচয়' এর মৌল আকল্পটি অর্জন করে নেয়। সঙ্গীতের অন্তর্বস্তু যেমন নির্দিষ্ট অভিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আকল্পটি অক্ষুণ্ণ রেখেও নানা ধরনের বৈচিত্র্য নিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে—তেমনি মানুষও নিজস্ব অভিজ্ঞানকে নানাভাবে প্রকাশ করে। যখন আমরা কোনো পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, নিজেদের অভিজ্ঞানের প্রেরণা অনুযায়ী তাকে বদলে নিই, তাৎপর্য আরোপ করি। হল্যান্ডের মতে আমরা সাহিত্যিক প্রতিবেদনকে ব্যবহার করি 'to symbolize and finally replicate ourselves'। পড়া মানে তাই পুনর্বিন্যাস; আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জীবন যে-সমস্ত গভীর গোপন বাসনায় আন্দোলিত এবং বিপুল আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়—তাদের মোকাবিলা করার জন্যে, নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, রণকৌশল আবিষ্কার করতে চাই পাঠকৃতিতে। পাঠকের সহজাত আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা মজবুত হওয়ার পরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিবেদনে তিনি প্রবেশাধিকার পান। হল্যান্ডের মতে গোয়েন্দা কাহিনির পাঠকেরা নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক দৌর্বল্যকে আড়াল করার সুযোগ পায়। এছাড়া তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, পাঠকৃতির মধ্যে ঐক্যসংস্থাপক অন্তর্বস্তু ও আকরণ আবিষ্কার করে পাঠকেরা তার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। পাঠকৃতির ঐক্য এবং পাঠকের আত্ম-অভিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক খুবই প্রণিধানযোগ্য বিষয়। এভাবেই পাঠকেরা প্রতিবেদনকে বাহির থেকে সত্তার গভীরে আত্তীকৃত করে নেন।

অন্যদিকে ব্লাইচ নৈর্ব্যক্তিক প্রকল্প থেকে আত্মগত প্রকল্পে সমালোচনাতত্ত্বের বিবর্তনকে কাম্য বলে মনে করেছেন। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-দর্শনের প্রবক্তারা, বিশেষভাবে টি. এস. কুহন, নৈর্ব্যক্তিক তথ্যের জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। এমন কি, বিজ্ঞানেও পর্যবেক্ষকের মানসিক আকরণ বস্তুগত তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। কীভাবে দেখছি, তার ওপর 'কী দেখছি' নির্ভরই করে না শুধু, বদলেও যায়। আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবাদ-প্রতিম উচ্চারণ 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুণী উঠলো রাঙা হয়ে!' ব্লাইচ বলেছেন, জ্ঞানের বিকাশ জাতীয় প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন আমরা বিজ্ঞানের বিপরীতে কুসংস্কারকে স্থাপন করি, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের কথা বলি না কেবল, চিন্তার মূল আকল্পের মধ্যে গুরুতর পরিবর্তনের কথাও বলি। কোনো জাতির গভীর একান্ত প্রয়োজনে যখন পুরোনো বিশ্বাস ও সংস্কার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, নতুন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জন্ম হয়। পাঠক ও পাঠকৃতির সম্পর্ক বিষয়েও এই কথাটি প্রযোজ্য। পুরোনো ও অভ্যস্ত পথে যখন অর্থ-প্রতীতি হয় না, পাঠক নতুন পথ ও পাথেয় সন্ধান করেন। পড়ুয়ার অবস্থান ক্রমাগত নৈর্ব্যক্তিক থেকে আত্মগত পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রতিটি উচ্চারণের পেছনে থাকে কোনো-না-কোনো অভিপ্রায়। আর, প্রতিটি উচ্চারণের নতুন বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া মানে তাৎপর্যের নতুন প্রতিষ্ঠা। পাঠক তাঁর আত্মোপলব্ধির সূত্রে উত্তীর্ণ হন বিশ্বগত উপলব্ধিতে। কোনো পাঠকৃতির প্রতি পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া এবং ঐ পাঠকৃতিতে পাঠকের দ্বারা সংযোজিত তাৎপর্যের মধ্যে ব্লাইচ পার্থক্যের সূত্র খুঁজেছিলেন। একটু আগে যে-কথা লিখেছি, সেই সূত্রে বলা যায়, পাঠকের তাৎপর্য-সন্ধান নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের ভিন্ন একটি ধরন মাত্র, তবে তা অবশ্যই পাঠকের আত্মগত প্রতিক্রিয়া থেকে বিকশিত হয়েছে। সুতরাং পাঠক আকরণবাদী, মনোবিকলনবাদী, নারীচেতনাবাদী, উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী, মার্ক্সবাদী প্রভৃতি যে-ধরনের অবস্থান থেকেই বিশ্লেষণ করুন না কেন, কোনো নির্দিষ্ট পাঠকৃতির নিবিড় অধ্যয়ন মূলত পাঠকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিক্রিয়াকেই প্রকাশ করবে। তাই কোনো প্রতিক্রিয়াই নির্দিষ্ট অবস্থান ছাড়া অসম্ভব। ভাবাদর্শকে মানি বা না মানি, কোনো ভাষাই নির্দিষ্ট চিন্তাপ্রকরণ এবং আত্মগত প্রেরণার যুগপৎ উপস্থিতি ছাড়া অসম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, এই দুইয়ের সম্পর্ক স্বভাবে দ্বিবাচনিক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছে, এর প্রধান কারণ, তার সংশ্লেষণ প্রবণতা এবং স্থিতিস্থাপকতা। সমসাময়িক সমস্ত প্রধান নান্দনিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে রসদ সংগ্রহ করে এই চিন্তাপ্রস্থান লেখকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিরাগত প্রভুত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পাঠক্রিয়াকে চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক করে তুলেছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, পাঠকসত্তা বলতে আমরা কি 'আদর্শায়িত নির্মিতি' বুঝি? নাকি পাঠক সত্যিই এক ঐতিহাসিক ও স্বতন্ত্র মনোভঙ্গি-বিশিষ্ট অস্তিত্ব! লেখক-সত্তার সঙ্গে সহাবস্থান করে নাকি লেখক-সত্তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা? তত্ত্বগত ও ভাবাদর্শগত বিচিত্র অবস্থানের ফলে পাঠকসত্তাও কত বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হচ্ছে, সেকথা আগেই লিখেছি। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের প্রভাবে পাঠকৃতি যখন নতুন নতুন তাৎপর্যের ধারক হয়ে উঠছে, পাঠকসত্তাকেও তৈরি থাকতে হচ্ছে সঠিক মোকাবিলার জন্যে। বহুস্বর সন্নিবেশ থেকে বেছে নিতে হচ্ছে দ্বিবাচনিকতার প্রধান আশ্রয়কে, মূল তাৎপর্যে পৌছানোর পথ আর এক নয়, অনেক। তাই বিভিন্ন তাত্ত্বিকের কাছে ধরা পড়ে পাঠকসত্তারও নানা বিভঙ্গ। যেমন ছদ্মপাঠক (গিবসন), প্রতীত পাঠক (বুথ, আইজের), আকল্পিত পাঠক (একো), পরাপাঠক (রিফাটেরে), চিহ্নায়িত পাঠক (ব্রুকরোজ), আখ্যান-গ্রহীতা (প্রিন্স), আদর্শ পাঠক (কুলের), প্রকৃত পাঠক (হাউজ), অভিজ্ঞ পাঠক (ফিশ) ইত্যাদি। এইজন্যে সুলেমান ও ক্রোসন্যান লিখেছেন, পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ নির্দিষ্ট কোনো বহুচর্চিত পথ অনুসরণ করে না; বরং অসংখ্য চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ও অজস্র পথ থেকে পথান্তরে গিয়ে বারবার নিজের গন্তব্য বদলে নেয়। তাই এই মতবাদে দেখা যায়— 'plurality of voices and approaches, of the theoretical and methodological heterogeneity, and of the ideological divergences' (ফ্রয়েণ্ড ১৯৮৭ ৬)।

পাঠক যেহেতু একই সঙ্গে অভিযাত্রী, আবিষ্কারক এবং ভাষ্যকার, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির উদ্ভাসনে নির্ভর করতে হয়। পাঠকই শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক কেননা 'দ্রষ্টা চক্ষু' তাঁর অধিগত। এখানে আমাদের মনে পড়ে, ইংরেজি 'theory' (তত্ত্ব) শব্দের উৎস হল সেই গ্রিক ক্রিয়ামূল যার অর্থ 'কিছু একটা দেখা'। এই একই ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে 'থিয়েটার' শব্দটিও যার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। যিনি দ্রষ্টা তিনিই তাত্ত্বিক, একই কারণে তিনি অন্তর্নাট্যের উন্মোচনে সক্রিয় অংশীদার। ফলে পাঠক, তত্ত্ববিদ হিসেবে কোনো দাবি না জানিয়েও, পাঠকৃতির তাৎপর্য আবিষ্কার করতে করতে আশ্চর্য নতুন প্রতিবেদনের তাত্ত্বিক বনিয়াদ তৈরি করে নেন। পাঠকের আবিষ্কার-সম্ভাবনা ফুরিয়ে যায় না কখনও; তাই পাঠকৃতি থেকে নতুন নতুন তাৎপর্য এবং তাৎপর্যের তত্ত্ব বিচ্ছুরিত হতে থাকে। পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ পুরোপুরি প্রয়োগ-নির্ভর বলে প্রয়োগের দিগন্ত-বিস্তার মানে তত্ত্বেরও বিস্ফোরণ। পাঠকৃতি তাই এই প্রয়োগিক বিকাশের শক্তিতে অনন্ত এবং তার গ্রহীতাও অনন্ত। ফ্রয়েণ্ড লিখেছেন 'Our

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

texts are an unending library whose circumference is inaccessible.' (তদেব ১৭)। যতদিন সমালোচনা ছিল পাঠকৃতিকেন্দ্রিক, প্রতিবেদনের মধ্যে পাঠক কার্যত অবদমিত ও উপেক্ষিত ছিলেন। বিশেষত ভারতবর্ষের মতো বর্ণবর্গলিঙ্গ বিভাজিত সমাজে আধিপত্যবাদীদের নিরঙ্কুশ প্রতাপ পাঠকৃতিতে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে যারা নিপীড়িত, পাঠকৃতিতেও তারা ধারাবাহিক ভাবে প্রান্তিকায়িত। নিয়ন্তা শক্তির ভাবাদর্শে রঞ্জিত বলে প্রতিবেদনে সোচ্চার হয়েছে কেবল সুবিধাভোগী মানুষেরা। জীবনে যাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, পাঠকৃতিতেও তারা নিরুচ্চার থেকে গেছে। পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছে, নিরুচ্চারবর্গকে দিতে চেয়েছে প্রকাশের মর্যাদা। তাই পাঠকৃতির বদলে পাঠকের গুরুত্ব বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করে। এই মতবাদ পাঠকের আত্ম-আবিষ্কারকে মর্যাদা দেয় না শুধু, সেই সঙ্গে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক ন্যায়ও প্রতিষ্ঠা করে। পাঠকের সামনে এখন অপেক্ষা করছে যেন অনাবিষ্কৃত মহাদেশের বিপুল পরিসর। সাহিত্যের সত্য উপলব্ধির জন্যে পাঠককে কখনও কখনও প্রচলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, নান্দনিক ও দার্শনিক বিধিবিন্যাসকে প্রত্যাহ্বান জানাতে হয়। লেখকের বিশ্ববীক্ষাকেও বিনা প্রশ্নে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। এক কথায়, যথাপ্রাপ্ত অনুপুঙ্খগুলিকে সতর্ক ভাবে পরীক্ষা না-করে পাঠক ইদানীং তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না।

যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতির ভাষ্যকার হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়; প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করে সাময়িক ও চিরকালীন উপলব্ধির দ্বিবাচনিক সম্পর্ক নির্ণয় করাই বরং তাঁর প্রধান দায়। পাঠকৃতি এবং ভাষ্যকারের দ্বিরালাপ যেহেতু অন্তহীন, পাঠক্রিয়া কাল থেকে কালান্তরে অব্যাহত থাকে। একবাচনিক প্রতিবেদনের আধিপত্য পাঠক কখনও মেনে নেন না। অনবরত বিনির্মাণ করতে করতে প্রতিবেদনের সমস্ত সম্ভাবনাকে তিনি নিঙড়ে নিতে চান। তবু বারবার তাঁকে আবিষ্কার করতে হয় যে, শব্দের আড়ালে নৈঃশব্দ্যের মতো পঠিত বয়নের আড়ালে রয়ে গেছে অপঠিত পরাবয়নের পরিসর। যত তিনি তা আবিষ্কার করেন, ততই পাঠকৃতি প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। এমন হয় হলেই পাঠকের ভূমিকা কখনও ফুরিয়ে যায় না, লেখকের আদি-পাঠ থেকে ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হতে থাকে নতুন তাৎপর্যের বলয়। ফলে পাঠককেও ক্রমাগত যাত্রাপথ বাড়িয়ে যেতে হয়; এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ঘটে পাঠক্রিয়ার উত্তরণ। লেখকের প্রভুত্ব প্রত্যাখ্যান করে পাঠক তৈরি করে নেন তার স্বাধীন চারণভূমি। এতে পাঠকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লেখকের ভূমিকা কতদূর গৌণ হয়ে পড়ে এবং তা কতটা গ্রাহ্য—এই নিয়ে চুলচেরা বিতর্কের শেষ নেই। আমাদের শুধু লক্ষ করতে হয় কীভাবে তাৎপর্য 'উৎপাদন'-এর প্রক্রিয়ায় কুশলী পাঠক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এতে পাঠকৃতির সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব বা পার্থক্য কতখানি স্বীকার্য, এই প্রশ্নও দেখা দেয়। কোনো আততি দেখা যাচ্ছে কিনা এবং নৈর্ব্যক্তিক ও আত্মগত অবস্থানের ব্যবধান তত্ত্বগত ভাবে কতটা বজায় থাকছে—এই জিজ্ঞাসাও স্বাভাবিক। অনিবার্য হয়ে ওঠে এই প্রশ্ন সাহিত্যিক তথ্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বা লেখকের বয়ান এবং বিশ্লেষণী ক্রিয়া বা পাঠকের নির্মিতি এই দুইয়ের মধ্যে জলবিভাজন রেখা তৈরি করব কীভাবে? আসলে, তৈরি করতে হয় না কিছুই; প্রায়োগিক ক্ষেত্রে স্বতশ্চল ভাবে ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এইজন্যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের দাবি অনুযায়ী বিশ্লেষণী পাঠ বারবার নবায়িত হয়ে ওঠে।

ছয়

সচেতন পাঠক হিসেবে যখন পড়ি, আসলে আমরা তখন লিখি, বা বলা ভালো, পুনর্লিখন করি। লেখকের পরিসরকে সর্বগ্রাসী বলে মানি না কিছুতেই, পড়ুয়ার পরিসরকে নিরন্তর প্রসারিত করে চলি। কেননা তাৎপর্যে পৌঁছাতে হবে আমাদের; একক পাঠে এই প্রক্রিয়া শেষ হয় না বলে পুনঃপাঠের পরম্পরা চলতে থাকে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। এবিষয়ে জোনাথন কুলেরের একটি মন্তব্য খুব প্রাসঙ্গিক 'For the reader the work is not partially created but, on the one hand, already complete and inexhaustible–one can read and reread without ever grasping completely what has already been made–and on the other hand, still to be created in the process of reading, without which it is only black marks on paper.' (১৯৮২ ৭৬)। আবার, পাঠকৃতি যেহেতু কোনো-না-কোনো নির্মিতি প্রকরণের ফসল, লেখকের বয়নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে ঐ বিধিবিন্যাসের প্রতি বিদ্রোহ-প্রয়াসও। অর্থাৎ প্রাকরণিক রীতির প্রতি সমর্থন নয় কেবল, অসমর্থনও ব্যক্ত হয় পাঠকৃতিতে। এই অন্তর্গূঢ় দ্বিবাচনিকতা প্রতিবেদনে এবং সূত্রধার লেখকসত্তায় রৈখিকতা ভেঙে দেয়। স্বভাবত পড়ুয়ার পাঠক্রিয়াকেও এর মোকাবিলায় তৈরি থাকতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। পড়ুয়াকে মনে রাখতে হয় ভাষার অজস্র অন্তর্বৃত গ্রন্থিলতার কথাও। সরাসরি কোনো মীমাংসা যখন হয় না, তাঁকে পরখ করে দেখতে হয়, পাঠকৃতির গভীর থেকে প্রতিরোধ জেগে উঠছে কিনা। সেক্ষেত্রে তাঁকে পাঠক্রিয়ার নতুন নতুন কৃৎকৌশল ভেবে নিতে হয়। বিনির্মাণবাদী জিজ্ঞাসু হিসেবে পাঠক জানেন, প্রতিরোধ অতিক্রম না-করে প্রার্থিত সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। পাঠকৃতির নানাস্তরে নানা ধরনের দ্বৈততা অটুট থেকে যায়। এলিজাবেথ ফ্রয়েণ্ড মন্তব্য করেছেন 'the irreducible dichotomy of text and reader, object and subject, simply refuses to go away' (১৯৮৭ ১৫৪)। এছাড়া রয়েছে পাঠ-প্রকল্প এবং প্রকৃত পাঠ-অভিজ্ঞতার অপরিহার্য দ্বিবাচনিকতা। এভাবে যদি দেখি, মনে হয়, পাঠক আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ংবৃত সৈনিক। কখনও কখনও জীবনসত্য ও নান্দনিক সত্যের যুগলবন্দিকে অখন্ড পূর্ণতায় বোঝার জন্যে তাঁকে যেতে হয় নিজেরই বিপ্রতীপে অর্থাৎ আপন বিশ্বাস-স্বভাব-বাস্তবতা ইত্যাদিকে মুছতে মুছতে গড়ে নিতে হয় অজ্ঞাতপূর্ব পাঠকসত্তার আদল। বিশেষত যখন পুনঃপাঠ করি, যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতির নিয়ন্ত্রণী বলয়কে অস্বীকার করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রতি জিজ্ঞাসু মনোভাব নিয়ে, এমন কি প্রত্যাহ্বান জানিয়ে, তাৎপর্যের সন্ধানে এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাই। অনেক শূন্যায়তনকে যেমন পাঠকের পরিসরে রূপান্তরিত করি, তেমনি লেখকের অণুবিশ্বকেও কখনও পুরোপুরি আর কখনও আংশিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে নিই। বিখ্যাত দার্শনিক ও তাৎপর্যতত্ত্ববিদ পল রিকো লিখেছেন, পাঠকৃতি হলো সেই অনন্য পরিসর যেখানে জগৎ জন্ম নেয়। প্রশ্ন হলো, কার জগৎ? ঈশ্বরের মতো লেখকও যদি সৃষ্টি করে তাঁর সৃষ্টিতে প্রবেশ করে থাকেন—তাহলে লেখকের সর্বগ্রাসী পরিসরের কাছে পাঠকের কোনো পরিসর কোথাও থাকবে না। রিকো বলেন, পাঠকৃতির তাৎপর্য নিহিত থাকে বয়নে; প্রতিবেদনের অন্তরালে তা থাকে না (১৯৮১ ১৪১)। আমরা মনস্তাত্ত্বিক কোনো অভিপ্রায় অর্জন করি না, অধিকার করি অণুবিশ্বকে। এই অণুবিশ্ব, তাঁর মতে, প্রস্তাবিত এক জগৎ যার হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে নিজস্বতম আর্তিতে গড়ে তোলেন পাঠক এবং তারপর তিনি সেই জগতের বাসিন্দা হয়ে যান। এভাবে পাঠক খুঁজে পান তাঁর ঈপ্সিত পরিসর। রিকো জানিয়েছেন—'To understand a text is to follow its movement from sense to reference, from what it says, to what it talks about.' (তদেব ২১৮)। এই অনুসৃতির মধ্য দিয়ে পাঠক ক্রমশ লেখকের আগ্রাসী পরিসরকে ঝাপসা হয়ে যেতে দেখেন এবং উত্তীর্ণ হন আপন সার্বভৌম পরিসরে। রোলাঁ বার্তের বহুচর্চিত নিবন্ধ 'The death of the author' এ (১৯৮৮ ১৬৭-১৭১) দেখানো হয়েছে, কীভাবে লেখক-সত্তার অবলুপ্তি পাঠকসত্তার জন্ম সূচিত করে। কোনো রচনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় তখনই যখন সংবেদনশীল পাঠকের মনে তার সোচ্চার ও নিরুচ্চার উপস্থিতি সমগ্রতায় প্রতিফলিত হয়। লেখকসত্তার একাধিপত্য যতক্ষণ বজায় থাকছে, ততক্ষণ তা সম্ভব হচ্ছে না। এমন কী, লিখন-ক্রিয়ার প্রকৃত সূচনার জন্যেও লেখকসত্তার প্রতাপের অবসান আবশ্যিক প্রাক্‌শর্ত 'the author enters into his own death, writing begins'। বার্ত লিখেছেন, এর কারণ হল 'writing is that neutral, composite, oblique space where our subject slips away'। তাঁর মতে, আখ্যান-বিন্যাসের ওপর লেখকের প্রভুত্বকে সাধারণত প্রশংসা করা হয় কিন্তু নির্মাণ-প্রতিভাকে নয়। লেখকসত্তা আসলে ইতিহাসের সৃষ্টি; লেখকের ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা বুঝি সর্বপ্লাবী এক অস্তিত্ব। সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে তাঁর উপস্থিতি নিরঙ্কুশ। তাই সাহিত্যের ভাবমূর্তি ব্যাখ্যা করলে দেখি, লেখকসত্তার পীড়ন আমাদের কাছে স্বাভাবিক বিবেচিত হয়। লেখকের ব্যক্তি-জীবন, পছন্দ-অপছন্দ, আবেগ-মনন, সাফল্য-ব্যর্থতায় সমালোচকদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। আমাদের অজ্ঞাতসারেই একাকার হয়ে যায় পাঠকৃতি ও লেখকসত্তা। যদিও আমরা বলে থাকি, 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে' —সেকথা কিন্তু সাহিত্য পাঠের সময় সাধারণত মনে থাকে না। লেখকের নিজস্ব উচ্চারণই ঈপ্সিত হয়ে ওঠে, ভুলে যাই, তা একবাচনিক এবং কোনো একক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর; পাঠকৃতিতে ব্যক্ত অণুবিশ্বের সামূহিক উচ্চারণ নয়। ভুলে যাই, প্রতিবেদনে কোনো আরোপিত উচ্চারণ চাই না; চাই বহুস্বরসঙ্গতির সূত্র এবং স্বর ও স্বরান্তরের দ্বিবাচনিকতা। তাই পাঠকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা তার সূত্র সন্ধান করি সূত্রধাররূপী লেখকসত্তায়। আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন জুড়ে থাকে উৎপাদকের ভাবমূর্তি। উৎপাদক হয়ে ওঠে উৎপীড়কের অন্য নাম।

কিন্তু চিন্তার এই অচলায়তন ভেঙে চেতনার গঙ্গাকে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা সৃষ্টিশীল মনই করেছে। তাই বিখ্যাত প্রতীকবাদী ফরাসি কবি স্টিফেন মালার্মে কোনো একক ব্যক্তিকে ভাষার দখলদার বলে মানতে পারেননি। তাঁর কাছে লেখকের ব্যক্তিত্ব গৌণ, আত্মপ্রকাশক ও জগৎপ্রকাশক ভাষাই মুখ্য। ভাষা কথনবিশ্বের সঞ্চালক, লেখক উপলক্ষ মাত্র। এলিয়ট যাকে বলেন 'continuous extinction of personality', সেভাবে ব্যক্তিকে মুছতে মুছতে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে ভাষার অনন্ত পরিসর। শেষ পর্যন্ত পাঠকৃতি এমন এক মাত্রায় পৌছায় যেখানে ভাষা জেগে থাকে শুধু। ভাষার সক্রিয়তায় ও কৃৎকৌশলে ব্যক্তি যখন অবদমিত হয়ে যায়, পাঠকসত্তা গরীয়ান হয়ে ওঠে। ভাষা সত্তাকে আশ্রয় করে, ব্যক্তিকে নয়। লেখকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দিয়ে পাঠকৃতির সঙ্গে পাঠকের মোকাবিলা, বলা ভালো, দ্বিবাচনিক সম্পর্ক শুরু হয়। তাছাড়া আজকের বহুস্বরিক পৃথিবীতে লেখকের একক উপস্থিতি গ্রাহ্য নয় আর। একটি বয়নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে কত অন্তর্বয়ন, কত কালান্তরের বার্তা। তাই পাঠককেও ইদানীং সতর্ক ও সজাগ থাকতে হচ্ছে যাতে বহুত্ববাদী জগতের নানা ধরনের টানাপোড়েনকে যথার্থ তাৎপর্যে বুঝতে পারেন নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে। বার্ত লিখেছেন, পাঠকের উপলব্ধিতে পাঠকৃতি হল 'a multidimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn form the innumerable centres of culture.' পাঠক জানেন তাই, তিনি উপলব্ধির অনুবাদ প্রক্রিয়ার সমঝদার; কেননা মৌলিক পাঠ বলে যাকে মনে করি, তাও বহু পূর্ববর্তী পাঠের সমবেত ও রূপান্তরিত প্রকাশ। তিনি ছায়ার ছায়াকে পর্যবেক্ষণ করছেন মাত্র। হেগেলের প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণেও জেনেছি, 'আমাদের নির্যাস হলো আমরা কী ছিলাম' [Wesen ist was gewesen ist]। সমস্ত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সারাৎসার নিয়ে গড়ে উঠছে যে-পাঠকৃতি, তার মুখোমুখি হতে গিয়ে পাঠককে তাই সবচেয়ে আগে লেখকসত্তাকে মনোযোগের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিতে হয়। এবং তারপর, পাঠক বুঝতে পারেন, পাঠকৃতির মধ্যে তবুও অবশিষ্ট থেকে যায় সীমাবদ্ধতার আশঙ্কা। লেখকের যে-সমস্ত চিহ্নায়িত প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে প্রতিবেদনের বিভিন্ন স্তরে, তাদের পুরোপুরি নির্মূল করার জন্যে পাঠককে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণের অভ্যাস ত্যাগ করে বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় মগ্ন হতে হয়।

বার্তের চমৎকার মন্তব্য এরকম 'In the multiplicity of writing, everything is to be disentangled, nothing deciphered; the structure can be followed, 'run' (like the thread of a stocking) at every point and at every level but there is nothing beneath. The space of writing is to be ranged over, not pierced; writing ceaselessly posits meaning ceaselessly to evaporate it.' এই যে লিখনবিশ্বের পরিসরকে বিনির্মাণ করার কথা বলা হলো, এখানেই পাঠকের যাবতীয় প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি মুহূর্তে তাৎপর্য প্রস্তাবিত হচ্ছে যেন সমুদ্রসৈকতে পদচিহ্ন রেখায়িত হওয়ার মতো; আবার পরমুহূর্তেই নতুন তাৎপর্যের অভিঘাত তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। ঠিক যেমন অবিশ্রাম ঊর্মিমালা সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞান মুছে দেয়। যত পাঠক স্বর থেকে স্বরান্তরে পৌঁছান, বয়নের পরিসর তাঁর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তাই তিনি সেই বিপুল সম্ভাবনাময় পরিসরের প্রতীক এবং সূত্রধার বলে বিবেচিত হতে পারেন যাতে লিখনবিশ্বের সমস্ত অতীত সমস্ত বর্তমান সমস্ত ভবিষ্যৎ নিবিড় ঐক্যে এবং দ্বিবাচনিকতায় স্পন্দিত হয়। হারিয়ে যায় না কিছুই, সমস্ত ফিরে আসে নীড়ে। বস্তুত পাঠকের দ্বারা নির্মীয়মান পাঠকৃতিতে উৎস বড়ো নয়, গন্তব্যের সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনার দিকে নিয়ত যাত্রাই বড়ো। পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের শক্তি এখানে, লাবণ্যও এখানে। তাই এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে ক্রমাগত বয়ে যেতে যেতে এই চিন্তাধারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও বিচিত্রগামী হয়ে চলেছে। ব্যাখ্যা আর পাঠকের লক্ষ্য নয়; পাঠক এখন চাইছেন 'to conceive, to imagine, to live the plurality of the text, the opening of its significance.' (বার্ত ১৯৮৮ ১৭৩)। ভরতবাক্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারি জীবনানন্দের দ্যোতনাময় কিছু উচ্চারণ যা হয়তো চিহ্নায়ক পরম্পরায় পাঠকের অধ্যবসায়কেও বাঙ্ময় করছে

'আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল,
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল;
আর নব—
নব নব মানবের তরে
কেবলি অপেক্ষাতুর হয়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া;

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণ গান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?

চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ন হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।'

(সময়ের কাছে)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুবাদতত্ত্ব

১৯৭৬ সালে ফ্রান্সের লুভঁতে ইউরোপের বেশ কিছু খ্যাতনামা পণ্ডিত সাহিত্য ও অনুবাদ সম্পর্কিত একটি আলোচনাচক্রে মিলিত হন। তাঁদের নিবন্ধ-সংকলন সম্পাদনা করে আঁদ্রে লেফেভেরে তাতে ছোট্ট পরিশিষ্ট যোগ করেন; তিনি এই দাবি পেশ করেন যে অনুবাদ এখন আর নিছক অধ্যবসায়ী ও বিচ্ছিন্ন কোনো লিখনপ্রয়াস নয়; বিদ্যাচর্চার নবীনতম শাখা হিসেবে তা পৃথক মর্যাদার অধিকারী। তিনি প্রস্তাব করেন, এই শাখার নাম হোক অনুবাদ অধ্যয়ন বা Translation studies! অনুবাদ রচনা ও অনুবাদের উপযোগিতা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্নের মীমাংসা করাই এই নতুন তাত্ত্বিক বিন্যাসের লক্ষ্য। প্রাগুক্ত সংকলনটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে প্রতীচ্যের ভাববিশ্বে নতুন আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হয়। অনুবাদ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারে কিনা, মৌলিকতার দাবি তার কতখানি গ্রাহ্য—এসব প্রশ্ন তো আছেই। এছাড়া ভেবে দেখতে হয়, অনুবাদ কি তুলনামূলক সাহিত্যের অন্যতম গৌণ শাখা নাকি তাকে স্বনির্ভর চিন্তাপ্রস্থান হিসেবে গ্রহণ করা যায়! গত তিন দশকের নিরন্তর চর্চায় অনুবাদসাহিত্য ও অনুবাদতত্ত্ব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে নিয়েছে। বেশ কিছু ভালো বই প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে গবেষণা; বহু অগ্রণী পত্রপত্রিকা অনুবাদ-চর্চার নানা দিক নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। বলা যায়, পাশার দান এখন পুরোপুরি উল্টে গেছে। আকরণোত্তরবাদ, বিনির্মাণবাদ এবং উপনিবেশোত্তর চেতনায় সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে অনুবাদতত্ত্ব এত ব্যাপক পরিসর পেয়ে গেছে যে ইদানীং তাত্ত্বিকেরা বলছেন, তুলনামূলক সাহিত্য আসলে অনুবাদ অধ্যয়ন ধারার অন্যতম শাখা মাত্র।

সাম্প্রতিক অনুবাদতত্ত্ব যেভাবে বিকশিত হচ্ছে তা স্পষ্টত ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দর্শন ও নৃতত্ত্ব অর্থাৎ মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন স্তর ও উপকরণের চমৎকার সংশ্লেষণের ফসল। এছাড়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামাজিক পরিসর এবং বিশ্ববীক্ষা যেহেতু পরস্পর-ভিন্ন, এই দুই জগতের অনুবাদ-ভাবনাও অনেকটা আলাদা। ইউরোপে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বিনিময় যতটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ, একই দেশের অধিবাসী হয়েও ভারতীয়রা ভাষাগত বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন। ইউরোপে বিদ্বজ্জনেরা অনিবার্য ভাবে বহুভাষিক কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতিবেশীর ভাষা সম্পর্কে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয়েও পণ্ডিত বলে গণ্য হওয়া যায়। সার্থক অনুবাদ যেহেতু স্বভাবত বহুভাষিক, ইউরোপে অনুবাদসাহিত্য এবং অনুবাদতত্ত্ব দ্রুত বিকশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহুধাবিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজে অনুবাদ কিন্তু সেভাবে প্রত্যাশিত ভূমিকা নিতে পারেনি। ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর সমাজে অনুবাদ অধ্যয়ন কী ধরনের তাৎপর্য অর্জন করতে পারে এবং ঠিক কী কী সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে—এ বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। আপাতত এইটুকু উল্লেখ যথেষ্ট যে সাহিত্যের প্রাকরণিক বিন্যাস এবং ভাবনার ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুবাদচর্চার অবদান অনেকখানি। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কিছু কিছু বিশিষ্ট চিন্তাকেন্দ্র আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য; অনুবাদতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তেমন ভাবকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে তেল আভিভ নগরের অনুবাদতাত্ত্বিকদের কথা বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ইটামার ইভান জোহর এবং গিডিয়ন টৌরি, এঁরা সাহিত্যের বহু পদ্ধতিগত চরিত্রের ধারণাকে বিকশিত করেছেন। এই ধারণাটি সত্তরের দশকে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল, তবে প্রাগুক্ত দুজন তাত্ত্বিকের বড়ো কৃতিত্ব এই যে, একে তাঁরা বিশিষ্ট তত্ত্ব হিসেবে আরো পরিণতি দিয়েছেন। এর সাহায্যে আমরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারি কীভাবে কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিসরে এবং নির্দিষ্ট কালপর্বে অনূদিত পাঠকৃতি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মূল সাহিত্য-প্রেক্ষিতে ক্রমশ আত্তীকৃত হয়ে যায়। ইভান জোহর নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তুলনামূলকভাবে দুর্বল, নিরাপত্তাশূন্য, প্রান্তিকায়িত ও ক্রমজায়মান সাংস্কৃতিক আবহে অনুবাদের প্রবণতা অনেক বেশি। তার মানে, অনুবাদচর্চায় অনুবাদের সমাজতত্ত্ব নির্ণয় একটি প্রাথমিক দায়িত্ব। দেখা যায় যে স্থিতিশীল, দৃঢ় ও কেন্দ্রীকরণ প্রবণ সমাজে অনুবাদ তত বেশি গুরুত্ব পায় না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে গবেষক বিচিত্র উৎসজাত পাঠকৃতির নিবিড় অনুশীলন করেছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কতটা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভাবে অনুবাদের বিষয় ও শৈলীকে প্রভাবিত করে, তার একটা ধারণা পাওয়ার জন্যে তাঁর অনুশীলন ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। রেনেসাঁস পর্বে বিপুল ল্যাটিন ঐতিহ্যের অবনমন ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ, আঠারো শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে নতুন নতুন জাতিসত্তার উত্থান, বিশ শতকের ইউরোপে মহাকাব্যের প্রতি আগ্রহ কমে গিয়ে রোমান্সের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে উপনিবেশোত্তর চেতনায় ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন। এই তালিকার বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে ইভান-জোহরের দক্ষতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিচ্ছে। মোট কথা এই যে, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস স্পষ্ট তর্জনি সংকেত করছে, অনুবাদের কাছে তাদের কতটা বিপুল ঋণ রয়েছে। সুতরাং অনুবাদতাত্ত্বিক সেই প্রক্রিয়ার নিবিড় অধ্যয়ন করতে চান যার মধ্য দিয়ে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে পাঠকৃতি রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অনুবাদচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, প্রথাগতভাবে ভালো-মন্দ মূল্যায়ন এতে একেবারে জরুরি নয়; এমন কী, প্রকরণবাদী বিশ্লেষণও খুব একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুরুত্ব পায় না। পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুবাদে অনুবাদকে মূলত পুনর্লিখন বলে বিবেচনা করা হয়। এখানে দুটি পারিভাষিক শব্দ মনোযোগ দাবি করে। এক. উৎস-পাঠ (Source text) অর্থাৎ যে-ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে সেই ভাষার যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতি এবং দুই. উদ্দিষ্ট পাঠ (Target text) অর্থাৎ যে-ভাষায় অনূদিত হচ্ছে সেই ভাষার অর্জিতব্য পাঠকৃতি। অনুবাদ আসলে বিশেষ ধরনের সক্রিয় পাঠ যার লক্ষ্য ভাষার রূপান্তর। এই রূপান্তর ঘটে পুনর্লিখনের মধ্য দিয়ে। তাই উৎস-পাঠ যেভাবে পড়ুয়ার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, উদ্দিষ্ট পাঠও তেমনি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। স্বভাবত সাংস্কৃতিক স্তর ও অনুষঙ্গের ভিন্নতায় দু'ধরনের গ্রহণে পার্থক্য রয়েছে; রূপান্তরের উপলব্ধিকে সমালোচনা, সম্পাদনা বা অন্য আরো পুনর্লিখনের মতো পরিকল্পিত চাতুর্য বা প্রণালীবদ্ধ অন্তর্ঘাতের অবকাশও রয়েছে। এবিষয়ে থিও হেরম্যান্‌স সম্পাদিত 'The Manipulation of literature' (১৯৮৫) নামক নিবন্ধ সংকলনের কথা উল্লেখ করা যায়। নামকরণে নিহিত ইঙ্গিত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাবন্ধিক অনুবাদকে এক ধরনের 'manipulatory process' বলতে চেয়েছেন। এই বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। এই বিতর্কের গভীরে না-গিয়েও একথা নিশ্চয় বলা যায়, একুশ শতকের শূন্য দশক পেরিয়ে এসে আমাদের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে উদ্দিষ্ট ভাষার বিপুল সাহিত্য-পরিসরে অনুবাদের প্রতিক্রিয়া বহুমুখী। এইজন্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ দিয়ে অনুবাদতত্ত্বের ক্রমবর্ধমান পরিসরকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে এইসব দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস এবং দেশে-বিদেশে তার প্রভাবের পরিমাপ করাটা জরুরি। অনুবাদকেরা বিভিন্ন সময় তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন এবং অনুবাদতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা এবিষয়ে যত বিশ্লেষণ করেছেন, তার পরিচয় নিশ্চয় নেওয়া যেতে পারে। কোনো একজন অনুবাদকের কৃতিত্ব কিংবা তাঁর সাফল্য বা ব্যর্থতা বিচার করার জন্যে নয়, অনুবাদ-প্রক্রিয়ার তাৎপর্য এবং বৃহত্তর সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের গুরুত্ব নির্ণয় করার জন্যে এই কাজে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

যেমন, রেনেসাঁসের পর্বে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ অনুবাদকেরা যেসব রূপকল্প অনুবাদ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন, থিও হেরম্যানস্ তাদের মধ্যে অনুবাদের সঞ্চালক ভাবাদর্শ খুঁজে পেয়েছেন। সে-সময় অনুবাদককে মূল লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণকারী বলা হয়েছে। কিংবা বলা হয়েছে, অনুবাদক মূল লেখকের পোশাক ঋণ হিসেবে নিয়ে থাকেন অথবা তিনি গ্রহের মতো উৎস-নক্ষত্রের আলোয় উদ্‌ভাসিত। কখনো বা বলা হয়েছে, অনুবাদক রত্নকোষে রত্ন সন্ধান করেন। আঠারো শতকে দেখতে পাই, অনুবাদের প্রধান রূপকল্প হলো দর্পণ বা চিত্র কিংবা, প্রকৃত সত্তার বিপ্রতীপে উত্থাপিত কৃত্রিম বা নির্মিত অস্তিত্ব। আবার উনিশ শতকে সম্পত্তি ও শ্রেণী-সম্পর্ক হয়ে উঠেছে রূপকল্পের নির্ধারক। অন্যদিকে বিশ শতকের আশি-র দশকে যদি বিশেষভাবে মহিলা তাত্ত্বিকদের দিকে তাকাই, দেখব, তাঁদের আলোচনায় রয়েছে নারীচেতনার অভিব্যক্তি। তাই তাঁরা যৌন সম্পর্ক ও বিবাহ সংশ্লিষ্ট পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। মোট কথা হল এই যে, নতুন নতুন সাহিত্যতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যত রূপান্তরের সূচনা হয়েছে—অনুবাদতত্ত্বেও দেখা গেছে বাঁক ফেরার পালা। শুধু তা-ই নয়, উপনিবেশোত্তর চেতনা ক্রমশ দৃঢ়মূল হওয়ার ফলে সাহিত্য আলোচনায় যেমন ইউরো-কেন্দ্রিকতা প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হচ্ছে, তেমনি অনুবাদ-অধ্যয়নেও অতিরিক্ত ইউরোপ-নির্ভরতা অটুট থাকছে না। ভারতবর্ষে, মধ্যপ্রাচ্যে, দূরপ্রাচ্যে, লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায় অনুবাদতত্ত্ব ইদানীং দ্রুত আলাদা গন্ধবর্ণস্বাদ নিয়ে বিকশিত হচ্ছে। সাহিত্য-গবেষণায় যেমন ইউরোকেন্দ্রিকতা এবং সংশ্লিষ্ট ভাবপরম্পরা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন প্রবণতার শাখা-প্রশাখা, তেমনি অনুবাদচর্চার ক্ষেত্রেও অভিনব দিগন্ত বিস্তার হয়ে চলেছে।

আজকের অনুবাদ-ভাবনায় প্রাধান্য পাচ্ছে ভাবাদর্শগত ভিত্তি ও ভাষাগত উপকরণ; ফলে উপনিবেশোত্তর প্রতিবেদনের সঙ্গে অনুবাদ চর্চার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত আমরা ব্রেজিলের অনুবাদকদের কথা বলতে পারি, যাঁরা পুরোপুরি নতুন এক রূপকল্প তুলে ধরেছেন। তাঁদের কাছে অনুবাদকের যে-ভাবমূর্তি রয়েছে; তা হল নরমাংসভোজী আদিম মানুষের। অনুবাদক আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎস-পাঠ গ্রাস করে নেন বলেই সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই রূপকল্পকে অনুবাদের প্রস্তাবিত বিকল্প প্রেক্ষিত সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়। আবার আফ্রিকার অন্যতম পুরোধা সাহিত্যিক সোয়িন্‌কা তাঁর পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, ইউরোপীয় মূল্যচেতনা ও দৃষ্টিকোণ মূলত ঔপনিবেশিক প্রতাপের অভিব্যক্তি। এর সর্বগ্রাসী প্রভাবে শাসিত বর্গের পাঠক অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে এবং নিজস্ব প্রেক্ষিত ও ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্য করতে শেখে। উপনিবেশবাদ যেহেতু দৃষ্টিকে আবিল ও বিভ্রান্ত করে দেয়, ভিন্ন চোখে জগৎকে দেখার জন্যে শাসিত বর্গকে অর্জন করতে হয় প্রত্যাখ্যান, প্রতিরোধ ও প্রত্যাহ্বানের শক্তি। অনুবাদক যখন উৎস-পাঠ হিসেবে কোনো পাঠকৃতিকে গ্রহণ করেন এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে তাকে রূপান্তরিত করতে চান, ঐ রূপান্তরের ভাবাদর্শগত তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁকে সচেতন থাকতেই হয়। একটু আগে অনুবাদকের রূপকল্প হিসেবে নরমাংসভোজী আদিম মানুষের কথা উল্লেখ করেছি। এর তাৎপর্য কিন্তু উপনিবেশবাদী ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সভ্যতা ও বর্বরতার চিরাভ্যস্ত বৈপরীত্যকে আমরা শুধু যে অলঙ্ঘ্যনীয় ভাবি, তা-ই নয়; অনড় বর্গ হিসেবে এরা স্বতঃসিদ্ধও। তাই এই দুটি ধারণার বিপ্রতীপতা বা সম্ভাব্য স্ববিরোধিতা সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না কখনও। সোয়িন্‌কা আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন অতিকথার মধ্যে লক্ষ করেছেন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপের জাতিগত দম্ভ; প্রাগুক্ত রূপকল্পের তাৎপর্যকেও এই প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। সেদিক দিয়ে অনুবাদ-ক্রিয়া উৎস-পাঠের মূল্যচেতনাকে আমূল পরিবর্তন করে নেয় এবং উদ্দিষ্ট-পাঠে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সার্বিক বিদ্রোহ ও পুনর্নির্মাণের বার্তাকে স্পষ্ট করে তোলে। ঔপনিবেশিক শক্তির ভালো-মন্দ কিংবা নন্দন—কোনো কিছুকে যথাপ্রাপ্ত বলে মেনে নেন না এই পরিসর-সন্ধানী অনুবাদক।

উনিশ শতকে অনুবাদ সম্পর্কিত প্রথাগত ধারণার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল প্রভু-ভৃত্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কের ছায়া। তখন কেউ কেউ ভাবতেন, অনুবাদক কার্যত মূল রচনায় দখলদারি কায়েম করে তাকে আরো একটু 'উন্নত' ও 'সভ্য' করে তোলেন। ফিট্‌জেরাল্ডের কাছে পারসিক রচনা, বিশেষত ওমরখৈয়ামের রুবাই, তেমনি প্রতিভাত হয়েছিল। আবার, আরেকটি দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী অনুবাদক যেন স্তুতিকারের ভূমিকা নিয়ে উৎস-পাঠের প্রতি বিনীত অর্ঘ্য নিবেদন করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতালীয় রচনা সম্পর্কে রোজেটির মনোভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে পারি। এখানে আমাদের মনে পড়ে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অনুরূপ বক্তব্য; সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কিছু রচনা সম্পর্কে তাঁদের উচ্ছ্বাস প্রায় দুই শতক ধরে উপনিবেশ-গ্রস্ত ভারতবাসীর আহত অহংকে অনেকখানি প্রলেপ জুগিয়ে গেছে। অন্যদিক দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে বাঙালি গ্রহীতারাও প্রবলভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। মিলটন-শেক্সপীয়ার-শেলি- কীটস প্রমুখ সম্পর্কে তাঁদের বিপুল উৎসাহ অনুবাদ এবং অনুবাদকল্প রচনার ভরা জোয়ার তৈরি করেছিল। এই সবই আজ ইতিহাস। সাহিত্যের এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়েছিল সমুদ্রগামী জলোচ্ছ্বাস। ভারতীয় প্রত্নকথার সাহায্য নিয়ে বলা যায়, অনুবাদক যেন ভগীরথ, মহাদেবের জটাজাল ভেদ করে মর্ত্যে গঙ্গার জীবনদায়ী ধারা নিয়ে আসার মতো উনিশ শতকের বাঙালি অনুবাদকেরাও ইউরোপীয় সাহিত্যচেতনার সঞ্জীবনী স্রোত তখনকার পিপাসার্ত বাংলা সাহিত্যের খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যে খুব বেশি সচেতন ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পরিণতি কতটা দীর্ঘস্থায়ী সুফল এনে দিয়েছিল, সেই আলোচনা এখানে নয়। কিংবা প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ভারতীয় সাহিত্যচর্চা এবং অনুবাদ-প্রয়াস ঐ প্রক্রিয়ার বিপ্রতীপে কোনো ঐতিহাসিক কূটাভাস বা দ্বিবাচনিকতা তৈরি করেছিল কিনা, তার খুঁটিনাটি বিচারও করছি না।

আপাতত আমরা বরং জাক দেরিদা উত্থাপিত অনুবাদ সম্পর্কিত ধারণার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। তাঁর মতে, অনুবাদ-প্রক্রিয়া 'মৌলিক' পাঠকৃতি সৃষ্টি করে। স্পষ্টতই এই বক্তব্য প্রথাগত ধারণার পুরোপুরি বিপরীত কেননা মৌলিক ও অনুবাদ রচনা আমাদের কাছে পরস্পর-বিপরীত। উৎসপাঠ থেকে আমরা পৌঁছাই উদ্দিষ্ট পাঠে অর্থাৎ সত্য থেকে সত্যের ছায়ায়—এই হলো সাধারণ ধারণা। দেরিদার অনুবাদ-বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে এর আগে অনুবাদ-কেন্দ্রিক প্রতিবেদন কিছুতেই নিজস্ব বৃত্ত ভেঙে বেরোতে পারছিল না। অথচ পাশাপাশি সাহিত্যতত্ত্বে দেখা যাচ্ছিল বিপুল ব্যাপকতা, সূক্ষ্মতা ও গভীরতার ইঙ্গিত। অবশ্য দেরিদার সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়ার সম্ভাবনা কম, অন্তত তাঁর উপস্থাপনা বা রূপকল্প সম্পর্কে আপত্তি উঠতে পারে। কেননা তিনি যৌনক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুবাদ-প্রক্রিয়া আসলে সতীচ্ছদ ছিন্ন করার সঙ্গে তুলনীয়; উৎস-পাঠের গভীরে অনুবাদ প্রবেশ করে উচ্ছ্রিত পুরুষাঙ্গের মতো এবং তার একান্ত গোপনকে আলোড়িত করে। স্বভাবত এই রূপকল্প অনেকের কাছে অনাবশ্যকভাবে কুরুচিকর মনে হতে পারে। যা-ই হোক, একটি কথা স্পষ্ট। দেরিদার নিবন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে অনুবাদ চর্চায়ও আকরণোত্তর প্রবণতার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচনা হয়ে গেছে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আপাতত এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যতত্ত্বে যেমন মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন সীমান্ত ক্রমশ ঝাপসা ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তেমনি অনুবাদতত্ত্বেও একই প্রক্রিয়া জোরালো হয়ে উঠছে। নারীচেতনা, আকরণোত্তর ভাবনা, উপনিবেশোত্তর চেতনা কিংবা সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব—এই সবই অনুবাদ প্রক্রিয়াকে নানা শাখায় বিকশিত হতে সাহায্য করছে।

আগেই লিখেছি, অনুবাদ এক ধরনের বিশিষ্ট পুনর্লিখন বা পুনর্নির্মাণ। এর প্রভাবে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা লুপ্ত হয়ে যায় এবং একটি কেন্দ্র থেকে আলো ও উত্তাপ বিচ্ছুরিত হয়ে দূরবর্তী পরিধিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রখ্যাত অনুবাদ-তাত্ত্বিক লেফেভেরেও 'প্রভাব' এর বদলে 'বিচ্ছুরণ'-কে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে প্রয়োগ করতে বেশি আগ্রহী। অনুবাদ মানে প্রতিবিম্ব নয় কেবল অর্থাৎ উৎস-পাঠের নিছক অনুকরণ বলে একে মনে করা যায় না। অনুবাদকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত অনুকৃত সত্তা না বলে যখন বিচ্ছুরিত পুনঃপাঠ বলি, তখন বিচ্ছুরণ হয়ে ওঠে পর্যবেক্ষণের এবং পরিবর্তনের সূচক। তাই কোনো পাঠকৃতি যখন সময় ও পরিসরের ব্যবধান পেরিয়ে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হয়, গড়ে ওঠে পুরোপুরি নতুন জগৎ। বাংলা সাহিত্য থেকে যদি দৃষ্টান্ত আহরণ করি, দেখব, মধ্যযুগে একই কারণে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ভিন্ন পরিবেশ, যুগরুচি ও বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী কৃত্তিবাসের রামপাঁচালীতে এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে আমূল পুনর্লিখিত হয়ে গেছে। রাম, সীতা, রাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, এমনকি অযোধ্যা এবং লঙ্কাও নামে মাত্র এক—আসলে সম্পূর্ণ নতুন সত্তার অধিকারী। উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বাঙালির বিচিত্র ভাবদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে রামায়ণী ঐতিহ্যের পুনর্বিন্যাস করলেন, প্রাগুক্ত বিচ্ছুরণের তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সার্থক অনুবাদ আসলে চেতনার পুনর্বিন্যাস; তা যদি না হত, হোমার-দান্তে-শেক্সপীয়র-সফোক্লিস-ওভিড-গ্যয়ঠে কিংবা বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস প্রভৃতির রচনা যুগে যুগে এত ভিন্ন তাৎপর্যে গৃহীত হত না। এইভাবে অনুবাদচর্চা এবং অনুবাদতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিশ্লেষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ইতিহাস যেহেতু একরৈখিক নয়, অনুবাদতত্ত্বের তাৎপর্য এখন ক্রমশ অনেকান্তিক বলে গৃহীত হচ্ছে এবং নানা শাখা-প্রশাখায় প্রলম্বিত অনুবাদ-চেতনা গবেষকদের নতুন নতুন পথ সন্ধানে আগ্রহী করে তুলছে।

দুই

মরিশ ব্লাশোঁর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্যোতনাময় মন্তব্য এরকম 'The translator is a writer whose singular originality lies in the fact that he seems to make no claim to any!' লক্ষণীয় ভাবে ব্লাশোঁ অনুবাদককে নিছক অনুগামী বা অনুকারক বলছেন না, 'লেখক' এর অভিধা ব্যবহার করে জানাচ্ছেন যে অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিঃশব্দে, বিনা ঘোষণায়, বিপুল আত্মপ্রত্যয়ে নিজস্ব মৌলিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য সাম্প্রতিক পণ্যায়নের পর্যায়ে কোনো অনুবাদক যখন নান্দনিক প্রেরণাকে গৌণ করে দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেন, সেসময় অনুবাদ কর্ম উৎপাদনের যুক্তিশৃঙ্খলার অধীন হয়ে পড়ে। স্বভাবত এ ধরনের কাজে কোনো গভীর সংবেদনা বা তত্ত্বভাবনা আশা করে লাভ নেই। তবু ইতিহাসের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব এই ধরনের অনুবাদকেরা পালন করেন। তাঁদের ঐ প্রেরণাশূন্য কাজ অনুবাদতত্ত্বের বিকাশমান ধারায় অপরতার আবশ্যিক দর্পণকে তুলে ধরে। অর্থাৎ তাঁদের দর্পণে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি অনুবাদ-ক্রিয়ার গূঢ় রহস্য এবং বুঝতে পারি, কাকে বলা যায় সার্থক আর কাকে ব্যর্থ! অনুবাদকেরা নিজেদের কাজের তাৎপর্য নিজেরা ব্যাখ্যা করবেন বা সার্থকতা নির্ণয় করবেন—একথা কিন্তু বলা হচ্ছে না। তাঁদের কাজের মধ্য থেকেই ভাষ্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। তাই বলা যেতে পারে, অনুবাদক যখন সার্থকতা অর্জন করেন, তাঁর মধ্যে কৃৎকুশলতা ও দার্শনিকতার বিরল সমন্বয় ঘটে। সাম্প্রতিক কালে চিন্তা যখন ক্রমশ গ্রন্থিলতর হয়ে উঠছে, অনুবাদ প্রক্রিয়ার মধ্যেও ঘটে যাচ্ছে স্বর থেকে স্বরান্তর। বিখ্যাত অনুবাদতাত্ত্বিক লরেন্স ভেনুটি বলেন, 'The Contemporary translator is a paradoxical hybrid, at once dilettante and artisan.' (১৯৯২ ১)। অনুবাদ যেহেতু একটি ক্রিয়াত্মক শব্দ, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তার উপযোগী তাত্ত্বিক সন্দর্ভ অর্থাৎ, উল্টো করে বললে, অনুবাদতত্ত্ব মাত্রই অনুবাদকের প্রয়োগনৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর যে-পরিমাণে বদলে যায়, ঠিক সেই অনুপাতে উৎস-পাঠ থেকে উদ্দিষ্ট-পাঠে রূপান্তরের পথ ও পাথেয় ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে। সার্থক অনুবাদক মূলত দক্ষ ভাষা-দার্শনিক। বিভিন্ন ভাষার স্থাপত্যে কীভাবে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে দ্বিবাচনিক সম্পর্কে যুক্ত, এ-বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন। ভাষার বাহির থেকে ভাষার অন্দরে তিনি বিচরণ করেন এবং তাঁর দ্রষ্টাচক্ষুতে বহু গোপন সম্ভাবনার কক্ষ ও অলিন্দ উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

তবু মূল পাঠকৃতি মৌলিক ও শাশ্বত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে; অন্যদিকে অনুবাদ যুগের প্রয়োজনে ও যুগরুচিতে নির্মিত হয় বলে তাতে শুধু ক্ষণকালের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। এ সম্পর্কে ভেনুটির অবিস্মরণীয় মন্তব্য হলো 'The original is eternal, the translation dates. The original is an unchanging monument of the human imagination (genius), transcending the linguistic, cultural, and social changes, of which the translation is a determinate effect' (তদেব : ৩)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উৎস-পাঠের তুলনায় উদ্দিষ্ট-পাঠ অনেক বেশি সীমাবদ্ধ কেননা মূল পাঠকৃতির প্রণেতা যে-স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে লেখার পরিসর জুড়ে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন, অনুবাদক কখনও সেই স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারেন না। তাছাড়া উৎস-পাঠ যেভাবে মূল লেখকের আত্ম-অভিব্যক্তির নিদর্শন, উদ্দিষ্ট পাঠ মূলত অনুকৃতি হওয়াতে অনুবাদকের ব্যক্তিত্ব বা অভিপ্রায়ের প্রকাশ হতে পারে না। এই ভাবনা থেকে বলা হয় যে অনুবাদ আসলে অনুকরণের অনুকরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিংবা ছায়ার ছায়া অর্থাৎ পুরোপুরি অন্যনির্ভর ছদ্মপাঠ মাত্র। এদিক দিয়ে অনুবাদ হলো 'an image without resemblance.' (তদেব)।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁরা অনুবাদ-প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ করেন মূল পাঠকৃতির সম্প্রসারণ অর্থাৎ উৎস-পাঠের গভীরে নিহিত সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ। ফলে অনুবাদকের আপাত-অস্বাচ্ছন্দ্য ও আপাত-স্বাধীনতাহীনতা কোনো সংকট তৈরি করতে পারে না। যেহেতু সূক্ষ্ম ও ব্যাপক সংবেদনশীলতা দিয়ে অনুবাদক মূল পাঠকৃতির গণ্ডিকে পেরিয়ে যান, সুতরাং উৎস-পাঠের মৌলিকতা মেনে নিয়েও অনুবাদ খুঁজে পায় তার নিজস্ব মৌলিকতা। অনুবাদের মৌলিকতা অর্জন ঘটে আত্ম-অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে প্রাগুক্ত সমালোচক বলেছেন 'The originality of translation rather lies in self-effacement, a vanishing act, and it is on this basis that translators prefer to be praised.' (তদেব ৪)।

কোনো অনূদিত পাঠ তখনই সার্থক বলে বিবেচিত হয় যখন কোনো পাঠক তাকে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পড়ে যেতে পারেন অর্থাৎ যা পড়লে আমাদের কখনও মনে হয় না যে কোনো অনূদিত রচনা পড়ছি। মনে হয় যে এই পাঠই মৌলিক। তার মানে, সমালোচক যাকে 'Vanishing act' বলেছেন, এই পাঠে সেই প্রক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর সত্ত্বেও মূল রচনার অভিঘাত উদ্দিষ্ট পাঠে পৌঁছেছে। এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায়। উৎস পাঠের স্রষ্টা লেখকের উপস্থিতি কি মুছে যাচ্ছে? অথবা অনুবাদক নিজেকে পুরোপুরি আড়ালে নিয়ে যাচ্ছেন? কোনটা আমাদের কাছে ঈপ্সিত? যেহেতু প্রতাপ ও জ্ঞানের কৃৎকৌশল ও যুক্তিশৃঙ্খলা প্রত্যেকের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিসরে সম্পৃক্ত থাকার ফলে অনুবাদের মধ্যে কত ধরনের কৌণিকতা ও উচ্চাবচতা তৈরি হতে পারে? বিশেষত আমরা যারা উপনিবেশোত্তর পরিস্থিতিতে সংলগ্ন রয়েছি, প্রাগুক্ত প্রতাপ ও জ্ঞানের যুক্তিশৃঙ্খলা ও কৃৎকৌশল আমাদের অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি ভিন্নগোত্রীয় হতে বাধ্য। এ বিষয়ে কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু প্রতিবেদন রচিত হয়েছে। অনুবাদক উৎস-পাঠে হস্তক্ষেপ করবেন কিনা, যদি করেন তাহলে তা কতখানি গ্রাহ্য এবং তাতে ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রতিফলিত হয়—এইসব খুঁটিনাটি আলোচনার বিষয় এখন। অনুবাদক যখন এক ভাষার পাঠকৃতিকে অন্য ভাষার পাঠকৃতিতে পুনর্নির্মাণ করেন, তিনি আসলে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্নায়কগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করেন। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত জীবন-ভাবনা কীভাবে উৎস-পাঠ থেকে উদ্দিষ্ট পাঠে, সময় ও পরিসরগত ব্যবধানের ফলে, আলাদা হয়ে যায়—অনুবাদ সেদিকে তর্জনি সংকেত করে। অতএব অনুবাদ-প্রক্রিয়ার প্রধান উপজীব্য হলো স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্যের উপলব্ধি, একথা বলা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক অপরতার বোধ অনুবাদকের মৌল প্রেরণা। পার্থক্য এবং সমান্তরালতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াকে তিনি যত গভীরে গিয়ে অনুধাবন করবেন, তত বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠবে তাঁর নির্মিতি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

আকরণোত্তরবাদ, মনোবিকলনবাদ, নারীচেতনাবাদ এবং মার্ক্সবাদী তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সাম্প্রতিক ধারা-উপধারার সমবেত প্রভাবে অনুবাদতত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ব্যাপক পুনঃপাঠের আয়োজন। ভাষাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ একে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিশেষত আকরণোত্তরবাদী ভাষ্যকারদের কল্যাণে অনুবাদতত্ত্ব আমূল পালটে যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে জাক দেরিদা ও পল দ্য ম্যান অগ্রগণ্য। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের বিখ্যাত নিবন্ধ 'The Task of the translation'-এর সূত্রে 'মৌলিক' এবং 'অনুবাদ' এই দুটি শব্দ থেকে নতুন নতুন তাৎপর্য নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে। কাকে বলব মৌলিকতা এবং কাকে বলব লেখক-সত্তা, এ বিষয়ে আশ্চর্য বিশ্লেষণ তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কোনো রচনা এ কারণে 'মৌলিক' হয় না যে, এর মধ্যে লেখকের নিজস্ব তাৎপর্য সুচারুভাবে ব্যক্ত হচ্ছে; বরং পরবর্তী প্রজন্মদের কাছেও যে তার প্রাসঙ্গিকতা থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা হচ্ছে— এইজন্যেই তাকে দিচ্ছি মৌলিকতার ন্যায্য পদবি। আর, এই বিশ্বাসের জোরে তা হয়ে উঠছে অনুবাদযোগ্য; এভাবে ঐ রচনার আয়ুষ্কাল প্রসারিত হচ্ছে এবং তা নতুন জীবন পেয়ে যাচ্ছে। বেঞ্জামিনের প্রবাদপ্রতিম শব্দবন্ধে, মৌলিক পাঠকৃতি চিরকাল 'after life' অর্জন করে নেয়। প্রাগুক্ত নিবন্ধে তিনি আরো বলেছেন 'translations that are more than transmissions of subject matter come into being when in the course of its survival a work has reached the age of its fame. The life of the originals attains in them to its ever-renewed latest and most abundant flowering' (১৯৮৯ ৭২)। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, অনুবাদের মধ্যে উৎস-পাঠের দীর্ঘায়িত জীবন প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যভাবে যদি বলি, অনুবাদের জন্ম হচ্ছে যে-প্রতিবেদনের কল্যাণে শেষ পর্যন্ত তাকেই সে পুষ্টি দিচ্ছে, প্রসারিত করছে তার জীবনের সীমানা। সুতরাং অনুবাদ কি মৌলিক রচনার খ্যাতির প্রমাণ নাকি কালাতীত হওয়ার বিশ্বস্ত ও উদার মাধ্যম! আরো একটু এগিয়ে বলা যায়, সার্থক অনুবাদক প্রকৃতপক্ষে নতুন চেতনার স্থাপত্যকে ভিত্তি করে উৎস-পাঠের নবীন জন্মের হোতা। অনুবাদকে আশ্রয় করে ঐ পাঠ তখন অর্জন করে গতি ও সংবেদনা, নতুন ভাবে তা লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে। এখানে দেরিদার চমৎকার মন্তব্য স্মরণ করতে পারি 'The translation will truly be a movement in the growth of the original which will complete itself in enlarging itself.' (১৯৮০ ১৮৮)। তাহলে, এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যে-মৌলিক রচনা বলা যায় তাকেই যা ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে পারে। বিপুল কালের নিরবধি বিস্তারে কিছু কিছু পাঠকৃতি যে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ আহরণ করতে পারি। হোমারের ইলিয়াড, সোফোক্লিসের রাজা অয়দিপৌস বা আন্তিগোনে, শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ, মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট, দান্তের ডিভাইনা কমেদিয়া, গায়ঠের ফাউস্ট, বাল্মীকির রামায়ণ, কালিদাসের মেঘদূত বা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী বা ডাকঘর বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চণ্ডালিকা, বোদলেয়ার বা রিলকে বা এলিয়টের কবিতা তালিকা আরো অনেক বাড়ানো যায়। যে-সংস্কৃতিতে প্রথম পাঠকৃতির জন্ম হয়েছিল, তার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব আজ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে যোজন-যোজন। তবু কালে-কালান্তরে অনুবাদকেরা তাঁদের অন্তহীন বিকাশের পটে ছোট্ট একটি পর্যায়কে প্রাণবান করে তুলেছেন। ঐসব উৎস-পাঠ যত নিজেদের প্রসারিত করছে, তত পূর্ণ হয়ে উঠছে। বেঞ্জামিন 'শুদ্ধ ভাষা'র সপক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে অনুবাদকের দায়িত্ব হলো তাঁর নিজের ভাষায় সেই ঈপ্সিত শুদ্ধ ভাষার নিরর্গল বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করা, যা অনেক সময় বাচনিক অভ্যাসের বন্দীশালায় রুদ্ধ থাকে। অনুবাদক তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠে যখন কোনো রচনার পুনর্নির্মাণ করেন, একই সঙ্গে তিনি হয়ে ওঠেন ভাষারও মুক্তিদাতা এবং ভাষার শুদ্ধতর ও গভীরতর দ্যোতনার স্থপতি। দেরিদা ও দ্য ম্যানের বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখি যে তাঁরা বেঞ্জামিনের ঐ শুদ্ধভাষার তত্ত্বকে আকরণোত্তরবাদী ভাষাভাবনা অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। দেরিদা একে বলতে চাইছেন সমস্ত ভাষার মৌল নির্যাসরূপে উপস্থিত পরাভাষা 'It is the being language of the language' (প্রাগুক্ত : ২০১)। আবার দ্য ম্যান জানিয়েছেন, সমস্ত ভাষার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ব্যতিক্রমের স্থায়ী প্রবণতা এবং ভাষার জীবনকে ঘিরে রয়েছে দীর্ঘায়ত জীবনের অবভাস। তাঁর মতে, প্রতিটি অনূদিত পাঠকৃতিকে দার্শনিক ও রূপকমূল্য দেওয়া যেতে পারে। তিনি অনুবাদের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন 'transcendental errancy of langue' এর নিদর্শন। এই ব্যাপারটা অবশ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট। বস্তুত কোনো বিশেষ কালপর্বে কেন কিছু কিছু বিশিষ্ট প্রতিবেদন অনুবাদকের কাছে বেশি আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়, তাও নিগূঢ় সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পাঠকৃতির বয়ন গড়ে ওঠে জীবন থেকে পাওয়া অজস্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির তন্তু দিয়ে। স্বভাবত এতে থাকে বিচিত্র টানাপোড়েন, অসংখ্য অন্তর্বয়ন এবং বহুস্বরিকতা। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, অনুবাদতত্ত্ব মানে এই নয় যে কীভাবে অনুবাদ করা হবে তার চুলচেরা ব্যাখ্যা কিংবা অনুবাদকদের তারতম্য বিচার করার উপায়। বিশেষত আকরণোত্তরবাদের প্রভাবে অনুবাদতত্ত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা কীভাবে অনুবাদ পড়ি, সেই পদ্ধতির বিশ্লেষণ। পাশাপাশি একতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই পাঠ আসলে বহুমুখী ও বহুস্তরান্বিত কেননা অনুবাদ সমাজ-সংস্কৃতি- ইতিহাসের নানামাত্রিক রূপান্তর এবং সম্ভাবনাকে চিনিয়ে দেয়। উৎস-পাঠের সক্রিয় পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে উদ্দিষ্ট পাঠে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনুবাদক অনবরত পাঠকের জন্যে এই সূত্র রেখে যান, পাঠকৃতির সমস্ত অংশ অনুবাদ করা যায় না। অনেক ছায়াঞ্চলও রয়েছে এর মধ্যে যা কেউ কখনও রূপান্তরিত করতে পারে না। তা অনুবাদের ঊর্ধ্বে। মূল ভাষার আওতার বাইরে নিয়ে আসতে চাইলে শুধু যে সূক্ষ্মতা ও চমৎকারিত্ব ধ্বস্ত হয়ে যায়, তা-ই নয়; প্রকৃত চেতনা বা উপলব্ধির স্পন্দনও মিলিয়ে যায় শূন্যে। কবিতার পাঠকৃতি এর চমৎকার নিদর্শন; যত ভালো কবিতা, তার মধ্যে অনুবাদ-অসাধ্য পরিসর তত বেশি। এমন কি, গল্প এবং উপন্যাসের প্রতিবেদনেও কখনও কখনও এ ধরনের অংশ চোখে পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের সংবেদনশীলতা একমাত্র ভরসা। উৎস-পাঠ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও উদ্দিষ্ট-পাঠের ভাষা-সংস্কৃতি-ভাবাদর্শ পরীক্ষা করে আমরা তুলনামূলক বিচারে বুঝতে পারি, উভয়ের মধ্যে কীভাবে প্রবহমানতা ও ছেদের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভাবাদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস কোনো বিশেষ কাল-পর্বে অনুবাদের ধারা, কৃৎকৌশল ও চরিত্রের নির্ণায়ক হয়ে থাকে। এইজন্যে ভেনুটি লিখেছেন 'The translator is the agent of a cultural practice that is conducted under continuous self-monitoring and often with active consultation of cultural source and resources... The translation is located in intertextual and ideological configuration.' (তদেব ১১)।

এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে ইউরোপীয় অনুবাদ-প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায়। সেইসঙ্গে উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অনুবাদ-সম্পর্কিত বিপুল উৎসাহের উত্থানে ও অবসানে, দীপায়ন-উন্মুখ বাংলায় প্রতীচ্যের সাহিত্য-পাঠ ও রূপান্তরের স্পৃহায় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, অনুবাদকদের বিভিন্ন মন্তব্যে। ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতায় শেষ পর্যন্ত অনুবাদকের কাজ রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে যায়। বিশেষভাবে উনিশ শতকের বাংলায় ঔপনিবেশিক প্রতীচ্যের তাচ্ছিল্য, করুণা, আগ্রাসন ও প্রতাপ-বিচ্ছুরণ থেকে অনুবাদ প্রক্রিয়াকে কিছুতেই আলাদা করা চলে না। অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রত্যুত্তরে শুরুতে ছিল মুগ্ধ আত্মসমর্পণ, পরে সতর্ক পদক্ষেপ এবং শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন ও বিদ্রোহ। তাত্ত্বিকেরা লক্ষ করেছেন, অনুবাদকের অবচেতনা পাঠকৃতি-নির্ভর এবং পাঠকৃতিতে নিষ্পন্ন। 'Borderlines' নামক নিবন্ধে দেরিদা দেখিয়েছেন, প্রতিবেদনের গভীর অন্তর্বয়নগত সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা চমৎকার ধরা পড়ে। অনুবাদক সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদ অস্বীকার করে প্রতাপের ভাষা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকেন। সেক্ষেত্রে অনুবাদ হয়ে ওঠে বিশেষ ধরনের আয়ুধ যার সাহায্যে আরোপিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাসে অর্থাৎ উঁচুনিচুর প্রথাগত ধারণায় অন্তর্ঘাত করা যায়। তখন অনুবাদকে আমরা গ্রহণ করতে পারি রূপান্তরের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে। আকরণোত্তরবাদী পাঠকৃতি-তত্ত্ব অনুযায়ী 'a text can stand in a relationship of transference to another text' (তদেব ১৪৭); তবে এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি অনুবাদকের অবস্থানগত উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। এই চিন্তাপ্রস্থানের অভিঘাতে অনুবাদকের দার্শনিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাৎপর্যের প্রতীতিকে যেহেতু 'differential plurality' বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, চিহ্নায়িত থেকে অনুবাদকের মনোযোগ সরে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে চিহ্নায়ক পরম্পরার প্রতি। মূল রচনার পুনর্লিখন এর ফলে হয়ে উঠছে তার সম্প্রসারণ। এই উপলব্ধিকে চমৎকার ভাবে সূত্রায়িত করেছেন প্রখ্যাত তাত্ত্বিক মরিস ব্লাঁশো। 'Translating' নামক নিবন্ধে (১৯৬৭) তিনি মন্তব্য করেছেন 'Translation is the sheer play of difference it constantly makes allusion to difference, dissimulates difference, but by occasionally revealing and after accentuating it, translation becomes the very life of this difference.' সমস্ত রচনাই কি অনুবাদকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে হবে হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ, কেননা ভাষা-চেতনার সমস্ত অভিব্যক্তি গ্রহীতার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। তাকে ইচ্ছেমতো ভেঙেচুরে নিজের করে নেয় মানুষ; বস্তুত আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় এই ভাঙা-গড়া সংযোগ-বর্জন অবধারিত। রূপান্তরিত না-করে কোনো কিছু গৃহীত হয় না, হতে পারে না। তাই যোগাযোগ মানে বিশেষ ধরনের অনুবাদ। তার মানে, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আত্মীয়তা গড়ে তোলা। আবার এর উত্তর না, কারণ, ভাষার মধ্যে শুধু ব্যক্ত উপাদান থাকে না, অব্যক্তও থাকে। শুধু রোদ নয়, চাই ছায়া এবং কুয়াশা। তা না হলে ভাষার পৃথিবী সম্পূর্ণ হয় না। শব্দকে ঘিরে থাকে নৈঃশব্দ্যের বলয়। শব্দকে অনুবাদ বা রূপান্তরিত করতে পারি; কিন্তু যা কথিত হয় না, সঞ্চারিত হয় কেবল—সেই অনুভবগম্যকে অনুবাদ করব কীভাবে! তা হ'লে অনুবাদের সংজ্ঞা কী হতে পারে, এই নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী কোনো মূল পাঠের আঙ্গিক, অন্তর্বস্তু ও তাৎপর্যকে যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করে অনুবাদ। তার মানে, উৎস-পাঠের প্রতি আনুগত্য হিন্দুদের 'সতীত্ব' বিষয়ক ধারণার নামান্তর হয়ে পড়ে। এখানে আমাদের বহুপরিচিত সেই প্রবাদের কথা মনে আসে, যার মধ্যে হয়তো অনেকেই পিতৃতান্ত্রিক স্থূলতার ছায়া খুঁজে পাবেন অনুবাদ হলো সুন্দরী নারীর মতো যার সৌন্দর্য ও অসতীত্ব পরস্পর-সম্পৃক্ত অর্থাৎ অনুবাদ যদি মূলের অনুগামী হয়, তাতে নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষিত হয় না; আবার অনুবাদ যখন সার্থক সে-সময় মূল পাঠ থেকে তা যথেষ্ট স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। উৎস-পাঠের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি কখনও অনুবাদের পদবি পেতে পারে না। প্রসঙ্গত জন জনস্টোনের একটি চমৎকার মন্তব্য স্মরণ করতে পারি 'In translation a text does become a vehicle for the becoming of language.' (১৯৯২ ৪২)। তাহলে ভাষার হয়ে ওঠায় আর ভাষার বিস্তারে সক্রিয় সহযোগিতা করে অনুবাদ, কারো কারো মতে, এটাই তার প্রধান দায়িত্ব। আবার কেউ এমনও বলেন, তত্ত্বগত ভাবে অনুবাদ অসম্ভব কেননা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বহির্বৃত কাঠামো কিংবা অন্তর্বস্তুর রূপরেখা মাত্র অনূদিত হতে পারে; চিন্তার নীরবতা বা বিষয়ের নির্যাস একটি নির্দিষ্ট ভাষায় সুনির্দিষ্ট মাত্রায় প্রকাশিত হতে পারে। অন্য ভাষা মানে অন্য সত্তা অন্য প্রকরণ। ঐ সারবত্তা বা নির্যাস অনুবাদের অতীত।

চার

অতএব শুধুমাত্র রূপান্তর ঘটিয়ে দেওয়া অনুবাদকের কাজ, তা কিন্তু নয়। অনুবাদের ফলে উৎস-পাঠ এবং উদ্দিষ্ট পাঠ অর্থাৎ দাতা ও গ্রহীতা ভাষার মধ্যে সার্বিক যে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে—তা লক্ষ করাই অনুবাদতত্ত্বের দায়। তাহলে, একথা বলা যায়, ভাষার চলিষ্ণুতা প্রমাণিত হয় অনুবাদে। যদি আমরা বলি, মূল ভাষার যথাযথ অনুকরণ হলো অনুবাদ—সেক্ষেত্রে চলিষ্ণুতার বদলে আমরা কার্যত ভাষাকে নিগড়ে বেঁধে ফেলি। বরং অনুবাদ সমস্ত ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন মৌলিক আত্মীয়তার সম্পর্ককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্ত করে। এই সম্পর্ক তো কেবল সাদৃশ্যের বোধ দিয়ে হয় না; বৈসাদৃশ্যের সূত্র সন্ধান করে বা আপাত-বৈপরীত্যের অন্তর্বর্তী দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করেও হয়। আসল কথা হলো, বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অর্থবহ বিনিময়ে সেতু গড়ে উঠছে কিনা! এই বিনিময়ের অভিব্যক্তিকে বেঞ্জামিন 'central reciprocal relationship between languages' বলেছেন। ভাষা বাক্‌প্রকরণ নয় শুধু, ভাষা-দর্শন। প্রতিটি ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাকরণিক ও দার্শনিক অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য, এই অভিপ্রায় স্বভাবে মানবিক। বেঞ্জামিন বলেছেন, কোনো ভাষা এককভাবে মানবিক অভিপ্রায়ের সমগ্রতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। বিভিন্ন ভাষার অন্তর্বর্তী অভিপ্রায় পরস্পর সম্পূরক; এদের সামগ্রিকতার মধ্য দিয়ে আমরা মানবচৈতন্যের সম্পূর্ণ প্রবণতাকে বুঝতে পারি। নানা ভাষার পরস্পর-ভিন্ন চিহ্নায়কের সমবেত গ্রন্থনা থেকে ব্যক্ত হয় গভীরতর মানবসত্য; একক ভাষার সীমানাকে পেরিয়ে তার অবস্থান। সার্থক অনুবাদ ঐ অবস্থান সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে। সেখানে শুদ্ধ ভাষার নিঃসপত্ন অধিকার; মালার্মে একে 'Supreme language'-এর এলাকা বলে চিহ্নিত করেছেন 'the tensionless and even silent depository of the ultimate truth which all thought strives for.'। সত্যিই তাই। 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু, তোমার পানে'—এই অমেয় রাবীন্দ্রিক উচ্চারণে স্পন্দিত হচ্ছে যে পরাভাষা ও পরম উপলব্ধি, নৈঃশব্দ্যের সেই স্তরে পৌঁছাতে চায় সার্থক বিনিময়। অনুবাদ মানে স্রোতের উপর থেকে নিচে যাওয়া নয়, ফিরে আসাও। একতরফা গ্রহণ নয়, ফিরিয়ে দেওয়াও। উদ্দিষ্ট পাঠ উদ্ভাসিত করে উৎস-রচনাকে; তাই একে বলছি বিনিময়। আর, ঐ বিনিময়ের পক্ষে যা-কিছু প্রতিবন্ধক—তাদের চূর্ণ করে এগিয়ে যাওয়া অনুবাদকের বড়ো দায়। উৎস-পাঠের কাঠামো বা অর্থকে প্রতিধ্বনিত না-করে তার চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অনুপুঙ্খকে অনুবাদক গভীর মমতায় পুনর্নির্মাণ করবেন। এতে উৎস-পাঠ এবং উদ্দিষ্ট পাঠ—উভয়ই শুদ্ধ ভাষার অংশীদার হয়ে উঠবে। অনুবাদ হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ অর্থাৎ তা মূল রচনাকে আবৃত করবে না, বরং আরো স্পষ্ট করে তুলবে। উৎস-পাঠের বিচ্ছুরিত আলোকে প্রতিহত করবেন না অনুবাদক; বরং গ্রহীতা-মাধ্যমকে এমনভাবে বিন্যস্ত করবেন যাতে প্রতিফলিত আলোর প্রত্যাবর্তিত স্পর্শে ঐ উৎস-পাঠ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

যদিও রূপকের মতো মনে হতে পারে এই কথাগুলি, তবু এতে ইচ্ছাপূরণের কথা নেই কোনো, নেই অনুবাদতাত্ত্বিকদের প্রকল্পনা। প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই অনুভবের সত্যে পৌঁছেছে সাম্প্রতিক অনুবাদ-চর্চা। এই বক্তব্যের সমর্থন পাই রুডল্‌ফ পান্‌হ্বিস্‌ এর মন্তব্যে; তাঁর মতে, অনুবাদক অন্য কোনো ভাষার প্রতিবেদনকে তাঁর নিজের ভাষায় আত্মসাৎ করেন না। বরং ঐ উৎস-পাঠ দিয়ে গভীরভাবে বিদ্ধ হতে দেন; এই অন্তর্নিবিষ্ট প্রতিক্রিয়ায় তাঁর নিজস্ব ভাষাচেতনা প্রসারিত ও গভীরতর হয়, এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রুডল্‌ফের এই সুবেদী মন্তব্যের সূত্রে আরো বলা যায়, বিশুদ্ধ ভাষাচেতনার চিৎপ্রকর্ষে পৌঁছানোর জন্যে অনুবাদক সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীর ভেঙে নিজের ভাষা ও প্রতিবেদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সীমারেখাকে বাড়িয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে এজরা পাউন্ডের বিশ্লেষণাত্মক অনুবাদ বা 'interpretative translation' এর কথা। তাঁর কাছে অনুবাদ ছিল আপন ভাষাকে পুনর্নবায়নের চমৎকার পদ্ধতি। তিনি জানিয়েছিলেন, অনুবাদ তাঁর কাছে সর্বদাই কোনো নতুন চেতনা সঞ্চারিত করার সুযোগ এনে দেয়। তার মানে অনুবাদ আসলে সম্ভাবনার পুনর্নির্মাণ। একটু আগে আমরা ব্লাঁশো এবং বেঞ্জামিনের বক্তব্য আলোচনা করেছি। তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছেন, বিভিন্ন ভাষার অন্তর্বর্তী পার্থক্যবোধের মধ্যে অনুবাদের জন্ম এবং তার সার্থকতা। অনুবাদের মধ্য দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যদিও ঐ পার্থক্য অপসারিত হয়ে সংযোগের সেতু গড়ে ওঠে, সূক্ষ্মভাবে অনুবাদ কখনও পার্থক্যের প্রতীতিকে অস্বীকার করে না। বরং, বলা ভালো, অনুবাদ আসলে পার্থক্যের মধ্যেই নিঃশ্বাস নেয়। অনুবাদ যত বেশি স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশক হয় এবং তার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, তত বেশি তা মূল্যবান হয়ে ওঠে।

স্বভাবত দীর্ঘকাল ধরে অনুবাদের চরিত্র ও গুরুত্ব নিয়ে ইউরোপে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। যেমন থিয়োডার স্যাভোরি (১৯৫৭) অনুবাদকে বলেছেন শিল্পকলা, এরিক য়্যাকোবসন (১৯৫৮) বলেছেন কৃৎকৌশল এবং ইউজিন নিডা (১৯৬৪) বলেছেন, বিজ্ঞান। আবার হস্টফ্রেন্‌ৎস (১৯৬১) অনুবাদকে শিল্পকলা বলেও আরো কিছু যুক্ত করেছেন 'translation is neither a creative art nor an imitative art, but stands somewhere between the two.' (১৯৬১ ৭৬)। অনুবাদ শিল্পকলা না কৃৎকৌশল না বিজ্ঞান—এই নিয়ে বহু বিতর্ক হলেও এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। পরিভাষাগত সংশয় নিরসনের চেষ্টা অবশ্য অ্যান্টন পোপোভিচ তাঁর 'Dictionary for the literary translation' (১৯৭৬) বইতে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের শুরুতেই অনুবাদতত্ত্বের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হতে শুরু করে যখন ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সাহিত্য সমালোচনায় প্রাধান্য পেতে থাকে। ইউরোপীয় সাহিত্যচিন্তায় ক্রমশ যত ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাদের সম্মিলিত প্রভাব আত্মসাৎ করে অনুবাদতত্ত্বও হয়েছে বিচিত্রগামী। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বিনিময় পর্যবেক্ষণ করে হল্যান্ডের তাত্ত্বিক লেভি জানিয়েছেন, 'a translation is not a monistic composition but an interpenetration and conglomerate of two structures.. On the one hand, there are the semantic content and the formal contour of the original, on the other hand, the entire system of aesthetic features bound up with the language of the translation' (১৯৭০ ১০৯)। অনুবাদক নিজের কাজের সূত্রে অর্জিত উপলব্ধি থেকে জানেন যে পৃথিবীর কোনো দুটি ভাষাই এতটা সাদৃশ্যযুক্ত হয় না যে তাদের একটি অভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার অভিব্যক্তি বলা যাবে। ভাষায় প্রতিফলিত সমাজ, সংস্কৃতি এবং বিশ্ববীক্ষা পরস্পর-ভিন্ন। আবার এখানে বলতে হয় সেই দুরপনেয় পার্থক্যবোধের কথা। একই দেশের দুটি ভিন্ন ভাষার মধ্যে যখন বিনিময় হয়, তার চরিত্র এক ধরনের; আবার বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালের ভাষা যখন অনুবাদের সূত্রে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, সেসময় তার চরিত্র হয় আরেক ধরনের। এইজন্যে ফরাসি বা জার্মান বা রুশ ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ যে-তাৎপর্য বয়ে আনে, সেইসব ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ একই তাৎপর্য নিয়ে আসে না। তেমনি সংস্কৃত থেকে বাংলা আর তামিল-তেলুগু-হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ একই দ্যোতনা নিয়ে আসতে পারে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, ইউরোপীয় মহাদেশে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বিনিময় যতটা সহজ, স্বচ্ছন্দ ও অবারিত, নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় সেই অনুপাতে আজ স্বচ্ছন্দ নয়। ইউরোপীয় অনুবাদতত্ত্ব উৎসপাঠ থেকে উদ্দিষ্ট পাঠে পৌঁছানোর নানা পদ্ধতি নির্দেশ করেছে এবং সেই সূত্রে বিভিন্নভাবে অনুবাদের বর্গীকরণও করেছে। এখানে সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না-করেও অনুবাদ-ভাবনার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তুলে ধরছি।

১. ঘটনা পরম্পরা বা বর্ণনীয় পরিস্থিতি বা পাঠকের প্রতি বার্তা যেখানে সুস্পষ্ট, সাধারণ অনুবাদ সেখানে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সার্থক অনুবাদ এ ধরনের পূর্বধার্য আয়তনকে অবলীলায় এড়িয়ে গিয়ে কন্টকাকীর্ণ পথে পুষ্পিত হয়ে ওঠে।

২. উৎস-পাঠ থেকে উদ্দিষ্ট পাঠে উত্তীর্ণ হতে গেলে ভাষাকে আংশিকভাবে আশ্রয় করা যায় না, তাকে সমগ্রতায় গ্রহণ করতে হয়। ফলে প্রগাঢ় আত্মগত বার্তা কিংবা সর্বজনীন পরিস্থিতি—সমস্ত কিছুকে অনুবাদ সমান স্বাচ্ছন্দ্যে আয়ত্তে আনতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে স্থিতিস্থাপকতা।

৩. অনুবাদ প্রক্রিয়া কখনও সমাপ্ত হয় না, কেননা কাল থেকে কালান্তরে এক গ্রহীতা থেকে অন্য গ্রহীতার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পাঠকৃতি বারবার রূপান্তরিত হয়ে যায়। নতুন তাৎপর্য যত আবিষ্কৃত হতে থাকে, অনুবাদ প্রক্রিয়ায় তত শৈলীগত ও আকরণগত পরিবর্তনের তাগিদ দেখা দেয়। তাই অনুবাদ পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয় না কখনও।

৪. অনুবাদ যতখানি নির্মাণ ততখানি সৃষ্টি। প্রায়োগিক কৃৎকৌশল নিশ্চয় জরুরি প্রাক্‌শর্ত, তবু কল্পনা ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা সার্থক অনুবাদের পক্ষে আবশ্যিক।

৫. অনুবাদতত্ত্বে আগাগোড়া ঔচিত্যবোধ ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে। তবু এই দুইয়ের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক অনুবাদকে নিয়ে যায় মাত্রা থেকে মাত্রান্তরে।

৬. অনুবাদ বিজ্ঞান না সৃষ্টিশীল শিল্প, এ নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন, অনুবাদে দুটোই সমন্বিত হয় বলে চূড়ান্ত বিচারে এর প্রয়োগ নিয়ত বিবর্তনপ্রবণ। পাঠকৃতির প্রেরণাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না, তেমনি অনুবাদের প্রয়োগগত বর্গীকরণ করাও অসম্ভব।

৭. অনুবাদক একই সঙ্গে গ্রহীতা এবং নির্মাতা; পাঠকৃতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সূত্রধার ও ব্যাখ্যাতা, সূচনাবিন্দু ও সমাপ্তিবিন্দু।

৮. সমস্ত পাঠকৃতি যেহেতু কোনো-না-কোনো সাহিত্য-প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই প্রকরণ আবার অন্য নান্দনিক আকরণ থেকে উদ্ভূত ও তাদের দ্বারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশীলিত—অনুবাদের মধ্য দিয়ে এমন প্রতিবেদন তৈরি হয় যা প্রকৃতপক্ষে অনুবাদের অনুবাদ। তার মানে, প্রতিটি পাঠকৃতি অন্য সন্দর্ভের রূপান্তর এবং এভাবে রূপান্তর পরম্পরার মধ্যে অনুবাদের তাৎপর্য নিহিত থাকে।

পাঁচ

বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক অক্টাভিও পাজের প্রাসঙ্গিক সংবেদনশীল আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন 'Every text is unique and, at the same time, it is the translation of another text. No text is entirely original because language itself, in its essence, is already a translation firstly, of the non-verbal world and secondly, since every sign and every phrase is the translation of another sign and another phrase. However this argument can be turned around without losing any of its validity; all texts are original because every translation is distinctive. Every translation, upto a certain point, is an invention and as such it constitutes a unique text.' (১৯৭১ ৯)। সুতরাং অনুবাদ নিছক অনুকরণ নাকি স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টি—এই বিতর্কের প্রয়োজন নেই কোনো। যতক্ষণ ছোট্ট গণ্ডিতে বাঁধা থাকছি এবং দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখছি—সংশয় কেবল ততক্ষণ; কেননা প্রতিটি পাঠকৃতি অনন্য আবার একই সঙ্গে অন্য পাঠকৃতির অনুবাদ বা রূপান্তরিত পাঠ। কোনো পাঠকৃতি পুরোপুরি মৌলিক হতে পারে না, ভাষা-চেতনার মতো প্রতিবেদনের নির্যাসও অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির অনুবাদ। বিপুল ও গভীর নৈঃশব্দ্য রূপান্তরিত হচ্ছে বাচনে; তেমনি প্রতিটি চিহ্নায়ক ও বাক্য অন্য কোনো চিহ্নায়ক ও বাক্যের রূপান্তর। আবার পুরোপুরি উল্টো মেরু থেকে যখন দেখছি, সমস্ত পাঠকৃতিকে মৌলিক বলে বুঝতে পারছি। কারণ, প্রতিটি অনুবাদই তো অনন্য এবং অন্তত নির্দিষ্ট একটি বিন্দু পর্যন্ত, সমস্ত সার্থক অনুবাদই আবিষ্কার। এইজন্যে অনুবাদের নির্মিতি অদ্বিতীয় পাঠকৃতি হিসেবে নিঃসন্দেহে গৃহীত হতে পারে।

অনুবাদতত্ত্বের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে জর্জ স্টাইনের 'After Rabel' (১৯৭৫) বইতে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য বই হলো সুসান বাজ্‌নেট ম্যাকগুইরে লিখিত 'Translation Studies' (পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯১), আঁদ্রে লেফেভেরে লিখিত 'Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame' (১৯৯২), লরেন্স ভেনুটি সম্পাদিত 'Rethinking Translation' (১৯৯২), এডুইন গেন্‌ৎসলের লিখিত 'Contemporary Translation Theories' (১৯৯৩), তেজস্বিনী নিরঞ্জনার 'Siting Translation' (ভারতীয় সংস্করণ ১৯৯৫) ইত্যাদি। কয়েক শতক ধরে পৃথিবী জুড়ে অনুবাদ প্রচলিত থাকলেও বিশ শতকের শেষ চারটি দশকে বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বের উদ্‌ভাসনে অনুবাদতত্ত্বের দিগন্ত যেভাবে প্রসারিত হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। নানা কোণ ও নানা উচ্চতা থেকে আলো এসে পড়ছে বলে উদ্দিষ্ট পাঠের শিখরে ওঠার জন্যে অজস্র পথ তৈরি হয়ে চলেছে। বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বপ্রস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছে অনুবাদ। ভিন্ন ভিন্ন সময় ও সমাজ ভিন্ন চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া তৈরি করে; অনুবাদ তারই সঙ্গে নিজেকে সমন্বিত করে বারবার নতুন হয়ে উঠছে। এরকম হতে পারছে কারণ মানবচৈতন্যের সমস্ত স্তর ও উপকরণকে ছুঁয়ে যাচ্ছে অনুবাদ, প্রমাণিত হচ্ছে, ভাষার অজস্র বিভঙ্গের মধ্যে অনুরণিত হয়ে চলেছে অখন্ড মানবচেতনার প্রকাশ। গ্লিন নর্টন এবিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন 'Every translation was bound, by fate to be a new performance, an undulating instant in the cultural and linguistic tide that was the unity of human consciousness.' (১৯৮৪ ৩৩৬)।

সাধারণভাবে আকরণোত্তরবাদ এবং বিশেষভাবে বিনির্মাণবাদ অনুবাদতত্ত্বকে পুরোপুরি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিশিষ্ট বিনির্মাণবাদী তাত্ত্বিক পল দ্য ম্যান বলেছেন যে, অনুবাদ মূল রচনাকে নতুন চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে এবং তাকে দেয় অজ্ঞাতপূর্ব চলিষ্ণুতা ও অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর মতে, সার্থক অনুবাদ একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতার যোগফল। অন্যভাবে বলা যায়, সোচ্চার ও নিরুচ্চার, ভাষা ও পরাভাষা সার্থক অনুবাদের মধ্যে দ্বিবাচনিক সম্পর্কে অন্বিত। ঠিক এরকম কথা যে দেরিদাও ভেবেছিলেন, তা আমরা একটু আগে দেখেছি। কোনো পাঠকৃতিকে জীবন্ত বলতে পারি যদি তার আয়ুষ্কাল প্রসারিত হয়; আর, এটা হতে পারে যখন রূপান্তরযোগ্য ও রূপান্তরের অতীত উপাদান যুগপৎ অনুবাদ প্রক্রিয়ায় সত্য হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুযায়ী বোধের মধ্যে যে-বিবর্তন ঘটে, অনুবাদক সেই আবহে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। অতীত থেকে বর্তমানে আর বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে তখন পাড়ি দিতে পারে উদ্দিষ্ট-পাঠ। অনুবাদক কোন পথে সার্থকতায় পৌছাবেন, তা পূর্ব-নির্ধারিত নয়। কারণ বয়ন ও অন্তর্বয়নের টানাপোড়েন অনুযায়ী এবং প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী অনুবাদক তাঁর পদ্ধতি আবিষ্কার করে নেন।

অনুবাদের মধ্য দিয়ে উদ্দিষ্ট-পাঠ থেকে আমরা যে-প্রতিবেদনে পৌঁছাই, বয়নের প্রকরণ অনুযায়ী তাতে নানা স্তর ও নানা বিভঙ্গ থাকে এবং সেইসব স্তর ও বিভঙ্গের মধ্যেও অনবরত রূপান্তর ঘটতে থাকে। মৌলিক রচনার তুলনায় যদি কোনো কিছুকে নতুন বলে মনে হয় অথবা উৎস-পাঠের তুলনায় কিছু কিছু অনুপুঙ্খ অনুপস্থিত থেকে যায়—তাহলে আমরা বুঝতে পারি, অনুবাদ স্বতন্ত্রপথগামী হয়েছে। এতে অনুবাদের কোনো ক্রটি বা অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না, তাতে আসলে পার্থক্যবোধের প্রতীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুবাদের নন্দন মূলত নির্ভর করছে মূলানুগত্য ও স্বাতন্ত্র্যের দ্বিবাচনিকতায়। এই প্রক্রিয়া গ্রহীতার সমালোচনাত্মক ভাষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সব শেষে বলা যায়, ইউরোপীয় তাত্ত্বিকদের সন্ধান নিরন্তর বিচিত্রপথগামী হওয়ার ফলে অনুবাদতত্ত্ব এখন স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর। নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অনুবাদ-চিন্তার বহুমাত্রিকতা লক্ষ করে তাকে ইদানীং 'Polysystem theory'র দর্পণে আলোচনা করা হচ্ছে। এর ঢেউ এসে পড়েছে বাংলা সাহিত্যেও; নানা দিকে নানা সম্ভাবনা সাম্প্রতিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। সব মিলিয়ে, অনুবাদতত্ত্ব এই মুহূর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্বস্তুকে নিত্য নতুন উদ্যমে পুনরাবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করছে। অনুবাদের ধরন সম্পর্কে রুশ অনুবাদ-তাত্ত্বিক ভিলেন কোমিস্‌সারোভ সার্থক অনুবাদের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক অনড়তাকে ক্ষতিকর বলে মনে করেছেন। তার মানে অবশ্য এই নয় যে অনুবাদের মুক্ত পরিসরে বিধিবিন্যাসের কোনো স্থান নেই। নান্দনিক এবং প্রায়োগিক দিক দিয়ে কিছু কিছু ন্যূনতম শর্ত না-মেনে উপায় নেই কারো। মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে। তা যদি না হত, 'সার্থক' ও 'অসার্থক' কিংবা 'ভালো' ও 'খারাপ' অনুবাদ বলে কিছু থাকত না। তবে ঔচিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুবাদের বিচার না করাই সমীচীন। কেননা, কী করা উচিত এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত হতে বাধ্য এবং নির্দেশাত্মক সূত্রের কোনো শেষ নেই। আক্ষরিক অনুবাদের যান্ত্রিকতা পরিহার করতে গিয়ে যাঁরা 'মুক্ত' অনুবাদের কথা বলেছেন, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াস আবার কখনও কখনও উৎস-পাঠের গুরুত্বকে লাঘব করে দেয়। সুতরাং অনুবাদকের কাজটা সহজ নয় খুব; ভারতীয় সংস্কারে যাকে অসিধারা ব্রত বলে, অনেকটা যেন তারই মতো। পর্যাপ্ততা ও সঙ্গতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোধ নিতান্ত আবশ্যিক। সবচেয়ে বড় কথা, মূলানুগত্যকে যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করলে চলবে না। উৎস-পাঠের চরিত্রই আসলে অনুবাদের ধরন ও প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা। আগেই লিখেছি, অনুবাদক যতটা স্রষ্টা ততটাই কৃৎকুশলী। বস্তুত উৎস-পাঠের সঠিক মোকাবিলা করার জন্যে সবচেয়ে আগে অনুবাদক যা করেন, তা হলো কৌশল নির্ণয়। সাহিত্যবর্গ, সাহিত্যশৈলী, ভাষাব্যবহার, সমকালীন সাহিত্যচিন্তা, নান্দনিক ঐতিহ্য এবং রূপান্তরের সাংগঠনিক বিন্যাস এইসব কিছু সম্পর্কে অবহিত না-হয়ে কোনো অনুবাদক সার্থকতা অর্জন করতে পারেন না। আজকের চিন্তাজগতের আততিতে পরিশীলিত অনুবাদতত্ত্ব এখনও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই এ সম্পর্কে শেষ কথা বলা যাবে না। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, অনুবাদ যুগপৎ আত্মিক ও প্রায়োগিক ক্রিয়া এবং অনুবাদক মূলত পাঠকৃতির ভাষ্যকার। মার্গারিটা ব্র্যান্ডেস যে বলেছেন, 'Translation seems to be a phantom changing its contents and its inherent properties' (১৯৯৩ ৭৭), এর যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় নেই কোনো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে এর ফলে রূপান্তরপ্রবণ এই জগতের উপযোগী অনুবাদ প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতা ও তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্যে পাঠক হিসেবে আমাদেরও তীক্ষ্ণ সতর্কতা গ্রহণ করে পরিশীলিত হতে হচ্ছে সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায়।৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নারীচেতনাবাদ

'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' এভাবে পুরুষ বন্দনা করেছে নারী-প্রতিমাকে। এই ভেবে তৃপ্তি পেয়েছে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তাহারে রচনা।' চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে 'রচনা' শব্দটিতে। যার তিলোত্তমা মূর্তি গড়ছে পুরুষ, কে সে? সে কি বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নাকি এই 'রচনা' আসলে আত্মরতির প্রয়োজনে। নিজেকে তৃপ্ত করতে চাই বলে ব্যক্তি-নারীর উপর চাপিয়ে দিই নারীপ্রতিমার মোহিনীমূর্তি? খররৌদ্রের বাস্তবে দেখতে চাই না বলে কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিই, স্নিগ্ধতা আর লাবণ্যের অতিরেক তৈরি করি। এতে নারীব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো হয় নাকি সুকৌশলে তার কল্পিত অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্য দেখানো হয়, এই খটকা থেকে যায়। আমাদের ভাষা যেহেতু চেতনার চিহ্নায়ক, 'নারী' এবং তার প্রতিশব্দের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার ইঙ্গিত। নারী মানে যে পুষ্টিদান করে, স্ত্রী মানে যে বেষ্টন করে থাকে। তাই 'পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ' বলে কালিদাস যত প্রশংসাই করুন, স্ত্রীজাতি লতাধর্মী। স্বভাবত পুরুষবৃক্ষকে স্ত্রীলতা জড়িয়ে থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। অন্যদিকে 'রমণী' মানে রমণীয়া বা রমণযোগ্যা; স্পষ্টত এতে ইঙ্গিত রয়েছে ভোগ্য বস্তু হিসেবে নারীর উপস্থিতি সমাজে বিনা প্রশ্নে গৃহীত। 'বনিতা' 'যোষিৎ' 'অবলা' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেও পুরুষের চোখে নারীকে দেখার আভাস পাচ্ছি। বস্তুত রামায়ণে লঙ্কাযুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরে স্বামী সমাগমে উন্মুখ সীতাকে রাম অকল্পনীয় অপমান করতে দ্বিধা বোধ করেননি। সেসময় তাঁর ব্যবহৃত একটি শব্দ খুব দিগ্‌দর্শক' 'নোৎসহে পরিভোগায়' অর্থাৎ 'তোমাকে ভোগ করতে আমার আর উৎসাহ নেই'। আসলে প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রকারেরা সবাই ছিলেন পুরুষ। তাঁদের জগৎ পুরুষের জগৎ, তাঁদের সংস্কৃতি পুরুষের সংস্কৃতি। পুরুষসর্বস্ব পরিসরে নারীর কোনো ভূমিকা কোথাও ছিল না; নারীকে বংশরক্ষা অর্থাৎ পুরুষসন্তান উৎপাদনের উপায় হিসেবে দেখা হত কেবল। লক্ষণীয় ভাবে সংস্কৃত ভাষায় 'ভৃত্য' এবং 'ভার্যা' একই ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন অর্থাৎ 'ভৃ' ধাতু মানে ভরণ-পোষণ করা। সুতরাং পত্নী বলে কোনো মর্যাদা তার প্রাপ্য নয়; ভরণ-পোষণের বিনিময়ে তার সেবা পাওয়াই পুরুষের লক্ষ্য। নারীকে স্বভাবত অশুচি, অমঙ্গলের উৎস, বিশ্বাসের অযোগ্য, নরকের দ্বার ইত্যাদি বলা হত। নারী ঊনমানব অর্থাৎ পুরোপুরি মানুষ নয়, অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব হিসেবেই বিবেচিত হত। ইচ্ছেমতো তাকে ব্যবহার করা যায় বা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়, এমনকি, মেরে ফেললেও খুব একটা অসুবিধে হয় না। সূত্রসাহিত্যে বিধান দেওয়া হয়েছে, কালো পাখি বা সাপ বা বেজি বা শূদ্র বা নারীকে হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্ত সমান।

এমন নয় যে প্রতীচ্যে অবস্থাটা অন্যরকম। অ্যারিস্টটলের মতো মনীষীও ভেবেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছু কিছু আবশ্যিক গুণাবলী নেই বলেই নারীকে নারী থাকতে হয়, পুরুষের কাম্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারে না। সন্ত টমাস অ্যাকুইনাস বলেছিলেন, নারী হল অসম্পূর্ণ পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন এবং সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যদিকে নারী বুদ্ধির ক্ষেত্রে হীন, ধীরিক্ত এবং নিষ্ক্রিয়। আমাদের মনে পড়ে কমলাকান্তের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তির্যক উক্তি 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না।' অতএব শব্দ-ব্যবহারেও লিঙ্গ-প্রতাপের অভিব্যক্তি। সমাজবিধিতে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে এই দ্বৈততা 'বর' মানে শ্রেষ্ঠ, বরণীয় এবং 'বধূ' যাকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়, দিতে হয় ভরণ-পোষণ। কন্যাকে দান করতে হয় তৈজসপত্রের মতো। মূল দৃষ্টিভঙ্গি হল : নারী কন্যা হিসেবে পিতার অধীন, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর এবং বুড়ো বয়সে ছেলের। মেয়েদের স্বাধীনতার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য—নারীর অবস্থান মূলত এক। মাতৃতন্ত্রের উপর পিতৃতন্ত্রের আধিপত্য স্বতঃসিদ্ধ। অ্যাস্‌কাইলাসের ত্রয়ী নাটক ওরেস্টাইয়াতে দেবী এথেনা অ্যাপোলোর এই বক্তব্য মেনে নিয়েছেন যে, মায়ের দাবি সন্তানের ওপর নিতান্ত গৌণ। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে পিতৃতন্ত্র চিরকাল আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। আর, নারীর ভাষা শরীর চেতনা নারীর জগৎ পুরোপুরি পুরুষের ছায়ায় আচ্ছন্ন বলে নারী শেকলকে কখনও শেকল বলে অনুভব করেনি। বরং শেকলের বন্দনা করেছে নানা ভঙ্গিতে নানা রূপকে। মনুষ্যত্বের চেয়ে এমন এক কল্পিত নারীত্ব বড়ো হয়ে উঠেছে যার আদল পিতৃতন্ত্র তৈরি করেছে নিজের প্রয়োজনে।

তবু যেখানে পীড়ন, সেখানেই প্রতিবাদ। এইজন্যে সমাজের গভীরে নারীর ক্ষোভ যন্ত্রণা প্রতিরোধ ভাষাহীন অন্ধকার ভেদ করে ক্রমশ উচ্চারণের আলোয় জেগে উঠেছে। ফলে দেখা গেছে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, চাতুর্য ও নিপীড়নের বিচিত্র বিন্যাস। ধাপে ধাপে প্রতিবাদিনী নারী বিরূপ বিশ্বে নিজের অবস্থান খুঁজে নিতে চেয়েছেন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে পুরুষের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কৃৎকৌশল গড়ে নিয়েছে। আজ আমরা 'নারীচেতনাবাদ' বলতে যা বুঝি, তার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। তবে মোটামুটি ভাবে উনিশ শতকের শেষ দশকে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞান সন্ধান বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করতে শুরু করে। নিজেকে পুরুষের নর্মসঙ্গিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ না করে এবং বিশেষত যৌন পুত্তলিকা হিসেবে সাধারণ পরিচয়কে মেনে নিতে অস্বীকার করে নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল দৃষ্টিকোণকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে। আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার সে নিজেই পেতে চেয়েছে। দেবী বলে কখনও বন্দনা করুক পুরুষ আর কখনও পরিচারিকা মনে করে অবহেলা করুক—এই দুইয়ের কোনোটাই চায়নি। আর, চেয়েছে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বিখ্যাত বইয়ের কথা মনে রেখে বলা যায়, নারীর কাম্য 'a room of her own'। কেননা নিজের শরীর এবং মনও তার নিজস্ব নয় যেন; পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও খেয়াল অনুযায়ী নিজেকে সাজানো-ই একমাত্র কাজ। দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে নারীর নিজস্ব পরিসর সন্ধান প্রবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। নারীচেতনাবাদ ছড়িয়ে পড়েছে আজ দেশে-দেশান্তরে। সাহিত্যচিন্তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তার অভিব্যক্তিও এখন বিচিত্রপথগামী। প্রতীচ্যের তাত্ত্বিকেরা বিশ শতকের শেষ পাঁচটি দশকে নারীচেতনাবাদকে গভীরতর ও ব্যাপকতর মাত্রায় নিয়ে যেতে পেরেছেন। লৈঙ্গিক পীড়নের প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়; আর, নারীর যাবতীয় শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক অভিব্যক্তি দাবি করছে। ফলে ইদানীং নারীচেতনাবাদের কোনো বিশেষ একটি রূপ প্রচলিত নয়; বহুস্বরিকতা তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। মোদ্দা কথা হলো, নারীচেতনাবাদ এক নয়, অনেক। সাংস্কৃতিক রাজনীতির আবহে তার বহুমাত্রিকতা প্রতিনিয়ত পরিশীলিত হচ্ছে।

বিখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক সিমোন দ্য বোভোয়ার দ্যুতিময় মন্তব্য মনে পড়ে : 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে'। শিশুকাল থেকেই নারীর জগৎ নিষেধ ও ধমক দিয়ে ঠাসা; পুরুষ যা করতে পারে স্বচ্ছন্দে, সে যে তা করতে পারে না—তাকে প্রতিপদে সমাজ জানিয়ে দেয়। নিজের যৌন-অভিজ্ঞানকে সে ভয় ও সংকোচ করতে শেখে; পুরুষের প্রকাশ্যতার বিপ্রতীপে নিজেকে সে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে শেখে। সেইসঙ্গে শেখে দ্বিধাগ্রস্ত ও অকারণ হীনমন্যতার শিকার হতে। বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে শেখে পিতৃতান্ত্রিক বিধিনিয়ম ও সংস্কারকে, এক কথায়, সমস্ত যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে। তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক প্রতিবেদনের অচঞ্চল ধারাবাহিকতায় বিক্ষোভ তৈরি করে এবং যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে নারীচেতনাবাদের প্রাথমিক পর্যায় গড়ে উঠেছিল। নারী সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রের গড়ে-তোলা কিছু কিছু অনড় ধারণা, সংজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করার জরুরি প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছিল। সেই সঙ্গে সংশয় তৈরি হলো বিভিন্ন তত্ত্বের উপযোগিতা সম্পর্কেও, কেননা নারীচেতনা তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল আধিপত্যপ্রবণ মানসিকতার উদ্ধত, কখনও কখনও বিকৃত, অভিব্যক্তি। নারীচেতনা বিকাশের প্রত্ন-পর্যায়েও একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, নারীর পরিসর অন্তত ততক্ষণ ঈপ্সিত তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ সাহিত্যের মূল স্রোত বলে গৃহীত ও মান্যতাপ্রাপ্ত পুরুষস্রোত থেকে স্বতন্ত্র ধারায় তা ব্যক্ত হচ্ছে না। তার মানে, নারীর পক্ষে আবশ্যিক হলো নারীচেতনা নিষ্পন্ন সন্দর্ভ, নন্দন এবং জীবনসত্য। প্রাগুক্ত প্রত্ন-পর্যায়ে এইসব সম্ভাবনার বীজাধান হয়েছিল, তবে অঙ্কুরোদ্‌গম হওয়ার পর থেকে পত্রে পুষ্পে বিকশিত হওয়া পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দশক পেরিয়ে গেছে। সাহিত্যিক প্রতিবেদন যেহেতু পুরুষের নির্মিতি, তার পক্ষে পুরুষসর্বস্ব হওয়াই স্বাভাবিক, নারীচেতনাবাদী তাই অনিবার্যভাবে অন্তর্ঘাতের কৃৎকৌশল রপ্ত করে নেন। পুনঃপাঠের সাহায্যে চিরাভ্যস্ত পাঠকৃতি থেকে অবদমিত ও প্রান্তিকায়িত নারীসত্তার আর্তি ও যন্ত্রণা, স্বপ্নভঙ্গ ও পরাজয়, দহন ও অবলুপ্তি আবিষ্কার করেন। লিঙ্গবাদী সমাজে নারী যেহেতু নারী বলে অপাঙ্‌ক্তেয় ও নিরুদ্ধকণ্ঠ, ঐ সমাজের সাহিত্যিক প্রতিবেদনেও নারীর উচ্চারণ নিষ্পিষ্ট হতে বাধ্য। কত ভিন্ন ধরনে এই সত্য পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তা পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব নিয়েছে নারীচেতনাবাদী সমালোচনাতত্ত্ব। পুরুষকেন্দ্রিকতার দুর্মর অভ্যাসকে প্রতিহত ও পরাভূত করে সাহিত্যপাঠের নারীকেন্দ্রিক প্রেক্ষিত প্রতিস্থাপন করার জন্যে তত্ত্ব উৎসুক। যেহেতু প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলির মধ্যে পিতৃতন্ত্রের স্পষ্ট বা অলক্ষ্যগোচর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেরণা লক্ষ করেছেন নারীচেতনাবাদীরা, তাঁদের চিন্তাপ্রস্থানে তাঁরা সমস্ত রুদ্ধতাকে এড়াতে চেয়েছেন। এইজন্যে এই চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য অনেকান্তিকতা; নানা ধরনের তত্ত্বচিন্তা এতে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে চলেছে এবং তাদের মধ্যে সীমান্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাসে আধিপত্য-মনস্কতা এবং সত্যের একমাত্রিকতা প্রবল হয়ে ওঠে চিন্তাজগতে, এই হলো নারীচেতনাবাদের প্রাথমিক প্রত্যয়। যেহেতু দেরিদা এবং বার্ত প্রাগুক্ত অভ্যাসের বিরোধিতা করে মুক্ত উপসংহারে বিশ্বাসী বিনির্মাণবাদ ও আকরণোত্তরবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন, নারীচেতনাবাদী প্রতিবেদন এই দুই চিন্তাগুরুর সঙ্গে যথেষ্ট আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে।

আবার নানা ধরনের তত্ত্বচিন্তার মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বহুত্ববাদী প্রবণতা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি পারস্পরিক বিতর্কেরও অভাব নেই। তাছাড়া তাত্ত্বিক বদ্ধতার বদলে তাত্ত্বিক মুক্তির পক্ষপাতী হয়েও কখনও কখনও নারীচেতনাবাদী তাঁর মৌলিক চরিত্র অর্থাৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবনভাবনার প্রতি দায়বদ্ধতা ভুলে যাচ্ছেন। এতে দু'দিক দিয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক, সার্বিক নারীজনতার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অমনোযোগ ও ফলে চিন্তার শৈথিল্য; এবং দুই, চিন্তাপ্রস্থানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে ঔদাসীন্য ও নেতিবাচক নিরপেক্ষতা দেখা দিতে পারে। সুতরাং তত্ত্বের লৈঙ্গিক চরিত্রের জন্যে নারীচেতনাবাদীর সংশয় সত্ত্বেও টেরি ঈগলটনের একটি মন্তব্য এ ব্যাপারে খুবই প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে : তত্ত্বকে অনেকে খুব দুরূহ মনে করেন, অন্তত উপন্যাস পড়ার চেয়ে তা অনেক কম উপভোগ্য ও কম প্রয়োজনীয়—এ সম্পর্কে মোটামুটি সবাই একমত। কেউ কেউ তত্ত্বকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে চান এই বলে যে নারীচেতনাবাদের পক্ষে তা হলো— 'suspiciously male way of relating to the world.' (১৯৯৪ : দশ)। তবু 'an engagement with theory is unavoidable; there is no nontheoretical space for women to inhabit. However abstract and intractable theory may seem at times. It is an essential aspect of our liberation.' (তদেব)। এই মন্তব্যের গুরুত্ব অসামান্য। সত্যিই নারীর জন্যে অ-তাত্ত্বিক কোনো পরিসর নেই। আপাতদৃষ্টিতে যাকে বিমূর্ত ও দুর্গম বলে মনে হচ্ছে, নারীচেতনার সার্বিক মুক্তির জন্যে তারই একান্ত প্রয়োজন। এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো বলা যায় যে নারীচেতনাও নিষ্পন্ন হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে। নারী-অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলাদা কিছু কিছু অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছে; কিন্তু সেইসঙ্গে ভাবাদর্শগত অবস্থানের তারতম্য দিয়েও পরিশীলিত হচ্ছে নারীচেতনা। একথা আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি, তত্ত্বের বাইরে স্বাধীন কোনো অবস্থানই সম্ভব নয়। যেমন মার্ক্সবাদ, মনোবিকলনবাদ, আকরণোত্তরবাদ, আধুনিকোত্তরবাদ, উপনিবেশোত্তরচেতনাবাদ ইত্যাদি আজকের প্রেক্ষিতে যে নতুন তরঙ্গ তৈরি করে চলেছে, কোনো সংবেদনশীল নারী তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। তত্ত্ব-নিরপেক্ষ হওয়া মানে জীবন-নিরপেক্ষ হয়ে ওঠা এবং ফলে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার চোরাবালিতে ডুবে যাওয়া। গভীর অর্থে এও আসলে রাজনৈতিক পরিণতি যে-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে নারীচেতনাবাদ।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

একটু আগে নারীচেতনার মধ্যে যে বহুমুখিনতার স্ফুরণ লক্ষ করেছি, তা একদিকে যেমন সংবেদনশীল নারীর সৃষ্টিশীলতা ও নমনীয়তাকে পুষ্টি দেয়, অন্যদিকে তেমনি অসতর্ক নারীর পক্ষে লক্ষ্যহীনতার কারণও হয়ে উঠতে পারে। আরও একটি বিপদের কথাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। অনেক বিকল্পের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে গিয়ে নারীচেতনাবাদী নিশ্চয়ই নিজস্ব মানসিক প্রবণতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেবেন কিন্তু সুদৃঢ় অবস্থান ও ভাবাদর্শগত প্রেক্ষিত সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা না থাকলে গন্তব্যহীন যাত্রায় প্ররোচিত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত গায়ত্রী স্পিভক চক্রবর্তী যাকে বলেছেন 'masculinist establishment' বা পুরুষবাদী প্রতিষ্ঠান, এর বহুমুখী চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়াও অসম্ভব নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিতর্ক-জল্পনা-বিনিময়-সন্ধান-সমালোচনা-পাল্টা সমালোচনা-স্ববিরোধিতা- দ্বন্দ্ব ইত্যাদির অন্তহীন প্রবাহ থেকে কাকে বলব লক্ষ্য এবং কাকে উপলক্ষ : এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ নয়। তবে একথাও ঠিক যে নারীচেতনাবাদের শক্তি তার চলিষ্ণুতায়, স্থিতিস্থাপকতায়। রামান সেলডেন ও পিটার হ্বিডোওসোন বলেছেন, এই চিন্তাপ্রস্থান 'constantly and innovatively in flux – challenging, subverting and expanding not only other (male) theories but its own positions and agenda!' (১৯৯৩ : ২০৫) ফলে এতে কোনো একক মহাসন্দর্ভ নেই; রয়েছে ক্রমাগত বিবর্তনশীল অজস্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ যাদের উৎস সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসর। সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বিবাচনিকতা অর্থাৎ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য ও উপলক্ষ সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন নারীচেতনাবাদী। নারীমুক্তির তাৎপর্য শুধু যৌন সম্পর্কের অনুষঙ্গে দেখি যদি, সামাজিক বিভাজনের অন্যান্য দিকগুলি কীভাবে লৈঙ্গিক পরিচয়ের সঙ্গে বিচিত্র কৌণিকতায় যুক্ত হচ্ছে—তা আমাদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে। এটা কাঙ্ক্ষিত নয় নিশ্চয়। আধুনিকোত্তর পর্যায়ে নারীচেতনার জটিল বিভঙ্গ নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে ইদানীং। তরঙ্গ মিলিয়ে যাচ্ছে, তরঙ্গ উঠছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে লক্ষ করলে এই নিরন্তর তরঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে গভীরতা আর ব্যাপ্তির উত্তরোত্তর বিস্তারকেও বুঝতে পারব।

নারীচেতনাবাদী সমালোচনাতত্ত্বে এই 'তরঙ্গ' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ। তবে কাদের রচনাকে প্রথম আর কাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। একটু আগে যাকে বলেছি প্রত্ন-পর্যায়, তাকে বলা যেতে পারে প্রথম তরঙ্গ। তখন পিতৃতন্ত্রের পরাক্রমের বিরুদ্ধে অন্তেবাসী নারীর পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণাই ছিল প্রধান। লিঙ্গগত ভিন্নতা কীভাবে সত্যবোধের ক্ষেত্রেও তারতম্য এনে দেয়, এই পর্যায়ে তা ক্রমশ লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রথম তরঙ্গ যেহেতু প্রাথমিক পদক্ষেপের পর্ব, তুলনামূলক ভাবে তা সবচেয়ে দীর্ঘায়ত। নতুন চেতনার উন্মেষ অনেক আগে হয়ে গেলেও মোটামুটি ভাবে উনিশ শতকে তা মনোযোগের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। স্বভাবত দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে এর পেছনে। নারীর

 দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাগরিক অধিকার সহ সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে মর্যাদার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার পালা চলে এই পর্বে। নারীর জীবনের বস্তুভিত্তি ও লৈঙ্গিক চিহ্নায়ন কীভাবে পরস্পরবিরোধী, এই পর্যায়ের চিন্তাবিদেরা ক্রমশ সে-বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠেন। জ্ঞান ও প্রতাপের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কীভাবে নারীর অবস্থানকেও নিয়ন্ত্রণ করছে, সেদিকে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক কালে দেরিদা যাকে 'পার্থক্য-প্রতীতি' বলে দার্শনিক ভিত্তি দিয়েছেন, তার দূরবর্তী পূর্বাভাস ঐ পর্বের রচনাতেও লক্ষ করা যায়। নিপীড়িত নারী কীভাবে নিপীড়ক পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে নিজের পার্থক্য সূচিত করছে এবং সেইসঙ্গে প্রমাণ করতে চাইছে যে লিঙ্গবোধ আসলে সামাজিক নির্মিতি—তা আমাদের সতর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ সময় অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক প্রতিবেদন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রথম তরঙ্গের আলোচকেরা দক্ষতার সঙ্গেই করে গেছেন। দ্বিতীয় তরঙ্গের দু-জন প্রধান তাত্ত্বিক ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং সিমোন দ্য বোভোয়া। এ ছাড়াও এই পর্বে আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নারীচেতনাবাদী রয়েছেন : অলিভ শ্রাইনের, এলিজাবেথ রবিনস, ডরোথি রিচার্ডসন, ক্যাথরিন ম্যানস্‌ফিল্ড, রেবেকা ওয়েস্ট, রে স্ট্রাচে, ভেরা ব্রিটেইন, উইনি ফ্রেড হোল্টবি প্রমুখ। উল্‌ফকে মেরি ঈগলটন 'সাম্প্রতিক বিতর্কের আদি মাতা' বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা পরবর্তী নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিকেরা যে-সমস্ত বিষয়কে বিশ্লেষণী বিস্তার দিয়েছেন, তাদের অনেকগুলি তাঁর চিন্তা-প্রত্যয়ে আলোকিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের বিতর্ক-বলয়। অন্যদিকে বোভোয়ার অসামান্য বই 'The Second Sex' (১৯৪৯) আজও নারীচেতনাবাদীর অবশ্যপাঠ্য। এই বই দিয়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের সমাপ্তি সূচিত হয়েছিল, একথা বলা যেতে পারে। তাই উল্‌ফ এবং বোভোয়া—দুজনেই জিজ্ঞাসুর গভীর মনোযোগ দাবি করেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ মূলত সৃষ্টিশীল লেখিকা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরবর্তী নারীচেতনাবাদী সমালোচকেরা তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই হলো 'A Room of One's Own' (১৯২৯) এবং 'Three Guineas' (১৯৩৮)। পুরুষের তুলনায় নারীর বাস্তব পরিস্থিতি কতটা ভিন্ন, মূলত সেদিকে উল্‌ফ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাগুক্ত প্রথম বইতে তিনি নারীর সাহিত্যকর্মের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আর, দ্বিতীয় বইতে দেখিয়েছেন, কীভাবে বিভিন্ন জীবিকা পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মূলত জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে দাবি জানিয়েছেন উল্‌ফ। সেইসঙ্গে এও বলেছেন, পুরুষতন্ত্রের সহজ শিকার হওয়ার জন্যে নারীর দায়িত্বও কম নয়। গার্হস্থ্য এবং জীবিকায় তারা অনেকক্ষেত্রে শিকারীর সঙ্গে সহযোগিতা করে। পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিমা তাদের কাছে প্রতিফলিত করার জন্যে নারী দর্পণের ভূমিকা নেয়। উল্‌ফের মতে নারীর প্রতি সমস্ত অবিচারের উৎস পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা। পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাজন যেহেতু লৈঙ্গিক পরিচয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বহু সহস্রাব্দের অভ্যাসে শৃঙ্খল নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে। নারীচেতনাবাদের বিকাশে উল্‌ফের মুখ্য অবদান হলো এই সচেতনতা যে, লিঙ্গগত অভিজ্ঞান আসলে সামাজিক নির্মিতি। সমাজ যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অচলায়তনে পরিণত হয়, লৈঙ্গিক পরিচয়ও স্থবিরতার আকর হয়ে ওঠে। তাই সমাজ-বিকাশের ঐকান্তিক প্রয়োজনে ঐ নির্মিতিকে প্রত্যাহ্বান জানাতে হয়, রূপান্তরিত করে নিতে হয়। পাশাপাশি লেখিকাদের অনন্য সমস্যাবলীকেও নিরন্তর পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, নারীর সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার পথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সর্বদা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এছাড়া নারীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং বৃত্তবন্দী হওয়াতে সার্বিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপরতা কিছুতেই কাটতে চায় না। তাই 'আত্মোপলব্ধি' শব্দটি পুরুষের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে, আর উল্টোদিকে, নারীর জন্যে থাকে শুধু 'আত্ম-বিনাশ'।

পরবর্তী তাত্ত্বিকেরা উল্‌ফের ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাচেতনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। লৈঙ্গিক পরিচয়ের প্রাথমিকতা অর্থাৎ যৌনতার অনুষঙ্গ কাটিয়ে ওঠার জন্যে নারীকে কী নিদারুণ আত্মসংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, উল্‌ফের জীবন ও চিন্তাধারা তার প্রমাণ দিচ্ছে। বারবার উন্মাদ-পীড়ার আক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা—নিরুপায় দহন এবং নিষ্ক্রমণহীন পরিক্রমার ইঙ্গিত দেয়। পিতৃতন্ত্রের সর্বব্যাপী পীড়ন থেকে নারীসত্তা অব্যাহতি পায় না সহজে, এমন কি বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও হারিয়ে যায় চোরাবালিতে—এই বার্তাও পাচ্ছি সত্তার অবলুপ্তি থেকে। কয়েক দশক পরে প্রখ্যাত কবি সিল্‌ভিয়া প্লাথের যে-করুণ পরিণতি হয়েছিল, সেকথাও মনে পড়ে আমাদের। এলেন শোআল্‌টের মনে করেছেন, পুরুষ ও নারীর যৌনতাবোধের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব চলতে থাকে—তা থেকে উল্‌ফ নিজেকে নিষ্ক্রিয় দূরত্বে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তোরিল মোই জীবন ও পাঠকৃতিতে উল্‌ফের কৃৎকৌশল সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, পুরুষবর্গ ও নারীবর্গের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য-সূত্র খুঁজতে উল্‌ফের আগ্রহ ছিল না; বরং তিনি স্থির লৈঙ্গিক পরিচয়গুলিকে পুরোপুরি নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে অতি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ ভেঙে দিয়ে তিনি লিঙ্গভেদ সম্পর্কিত মৌল ধারণাকেই বিনির্মাণ করেছেন। জুলিয়া ক্রিস্তেভা যেমন নারীচেতনাবাদের সঙ্গে আভাঁ গার্দ রচনাধারার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন, সম্ভবত তারই প্রাথমিক পূর্বাভাস ফুটে উঠেছিল উল্‌ফের লেখায়। মোই আরো বলেছেন যে উল্‌ফ সেই সূচনাপর্বেও কোনো সংকীর্ণ নারীচেতনার পক্ষপাতী ছিলেন না। নারীর রচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য তাকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। এভাবে লাকাঁ ও ক্রিস্তেভা উত্থাপিত মনোবিকলনবাদী তত্ত্ব এবং বিশেষভাবে নারীর নিজস্ব পাঠকৃতি বিষয়ক তত্ত্বের পূর্বগামী ছায়াও আমরা উল্‌ফের মধ্যে লক্ষ করতে পারি।

উল্‌ফের কিছু কিছু নিবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এদের মধ্যেও আবার 'Professions for Women' আলাদা মনোযোগ দাবি করে। এতে তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ফলে প্রবন্ধটি যেমন মনোজ্ঞ তেমনি আন্তরিক হয়েছে। উল্‌ফ লিখেছেন, উনিশ শতকের অধিকাংশ লিখিয়েদের মতো তিনিও নারীত্বের চিরাগত ভাবাদর্শের নিগড়ে বন্দি। এখানে তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় চেতনার সঙ্গে আশ্চর্য সাযুজ্য খুঁজে পাই। গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠার সাধনায় নারীত্বের চরম সিদ্ধি—এই ধারণা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজও ভারতীয়দের যৌথ নিশ্চেতনায় অত্যন্ত প্রবল। উল্‌ফ এই নারী-আদিকল্পকে প্রতীচ্য মানসেও লক্ষ করেছেন : 'the Angel in the Home'। এই ভাবাদর্শ নারীকে সহানুভূতিপ্রবণ, নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগপরায়ণ ও বিশুদ্ধ অর্থাৎ প্রতিমা হিসেবে দেখতে চায়। এইসব আদর্শের বোঝা বইতে বইতে নারী-ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যাচ্ছে কিনা সর্বগ্রাসী বিমূর্ততার আড়ালে, এই প্রশ্ন কারো মনে জাগেনি। এই পরিস্থিতিতে কোনো নারী যদি লেখিকা হতে চায়, লেখার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় ও পরিসর তৈরি করতে গেলে তাকে নানা কৌশল ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া 'নারী রহস্যময়ী' এই ওড়নার আড়ালে রয়ে যায় তার নিভৃত আবেগ, একান্ত গোপন অনুভূতি। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধানিষেধ অস্বীকার করে নারী তার শারীরিক অস্তিত্বের বিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশ করতে পারে না। সব সত্য উচ্চারণের অধিকার তার নেই। অবশ্য উল্‌ফ এ বিষয়ে খুব বেশি কথা বলেননি। তাঁর মতে, নারীর রচনা এ কারণে আলাদা নয় যে পুরুষের তুলনায় নারী মনস্তাত্ত্বিক ভাবে পৃথক, সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে দুস্তর পার্থক্যই নারীর পাঠকৃতিকে আলাদা করে দিচ্ছে। নারীর বন্দিত্বকে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণনা করার উপযোগী ভাষাপ্রকরণ আবিষ্কার করাই প্রথম কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন। যেদিন নারী পুরুষের সঙ্গে চূড়ান্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জন করবে, সেদিন তার সৃষ্টিপ্রতিভা বিকশিত হওয়ার পথে আর কোনো অন্তরায় থাকবে না।

সিমোন দ্য বোভোয়া নারীচেতনাবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে আরেকটি পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ভাবুক জাঁ পল সার্ত্রকে। নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বোভোয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি যেমন নিরলস কর্মী ও উদ্যোক্তা, তেমনি নারীচেতনাবাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদকে দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে নিরন্তর লেখা ও পত্রিকা প্রকাশনার কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কারো কারো মতে, বোভোয়া নারীচেতনাবাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের মধ্যবর্তী সংযোগসূত্র। একদিকে তিনি নারীসত্তার বস্তুগত ভিত্তি সন্ধান করেছেন, অন্যদিকে নারী ও পুরুষের লৈঙ্গিক ভিন্নতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ওপরও আলোকপাত করেছেন। জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পুরুষশক্তি কীভাবে নারীকে প্রান্তিকায়িত করে রাখে, বোভোয়া তা বিশ্লেষণ করেছেন। বস্তুত নারীচেতনাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলির উৎস তাঁর অসামান্য বইতে খুঁজে পাওয়া যায়।

বহু শতক, সম্ভবত কয়েক সহস্রাব্দ, ধরে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী পুরুষ নিজের আদলে মনুষ্যত্বের ধ্যানধারণা গড়ে তুলেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, 'মানুষ' বা 'মানবতা' সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বলা হয়েছে পুরুষ মানুষেরই কথা। সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও নারী রয়ে গেছে দূরীকৃত অপর হিসেবে। তাদের আলাদা কোনো ইতিহাস নেই, স্বাভাবিক কোনো সংজ্ঞা-পরিচয় নেই। যেন পুরুষের কথা বললেই নারী স্বয়ংকৃত ভাবে সংজ্ঞা ও বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইজন্যে দেখা যায়, কোনো পুরুষ আত্মপরিচয় দেওয়ার জন্যে কখনও বলবে না, 'আমি পুরুষ' কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নারীকে শুরুতেই জানাতে হয়, 'আমি নারী'। অর্থাৎ লৈঙ্গিক অপরতা দিয়ে তার অভিজ্ঞানের সূত্রপাত। অন্য সমস্ত পরিচয় আসে লৈঙ্গিকভাবে চিহ্নায়িত হওয়ার পরে। প্রবহমান অভিজ্ঞতার সূত্রে বলা যায়, পুরুষের তুলনায় নিজেকে খানিকটা 'হীনতর অপর' বলে অভ্যস্ত নারী আপন গৌণতা ও স্বাধীনতার অভাবকে যথাপ্রাপ্ত বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অপরসত্তা হিসেবে নারীর অবস্থান যেন প্রশ্নাতীত।

পুরুষকেন্দ্রিকতার দাপটে নারীর না আছে কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস, না আছে স্বাভাবিক সংহতি। সমাজের অন্য সমস্ত নিপীড়িত বর্গের মতো নারী সহজে কোনো সংঘ গড়তে পারে না। তার কারণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতা লৈঙ্গিক পীড়নের সত্যকেও ঝাপসা করে দেয়। পুরুষের প্রাধান্যকে প্রত্যাহ্বান জানানোর মতো ভাবাদর্শগত ভিত্তি নারীর কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। এইজন্যে যুগ যুগ ধরে পুরুষের প্রাধান্য এবং নারীর অবদমন স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত হয়ে এসেছে এবং নারীর মনেও ইতিহাসের নতুন পাঠ তৈরির জন্যে কোনো বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। নারীর তুলনামূলক হীনতা প্রকৃতি-নির্দিষ্ট বলে সবাই মেনে নিয়েছে। সাম্য ও স্বাধিকারের প্রশ্ন উঠলেও তা সমবেদনা-প্রবণ পুরুষের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে এবং নারীসত্তার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো প্রকৃত প্রতিবেদন গড়ে ওঠেনি। বোভোয়ার কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি যৌনতা ও লিঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন। বিশেষত কোনো ধরনের যথাপ্রাপ্ত জৈবিক অবস্থানের নিয়ন্ত্রণ' অস্বীকার করে সামাজিক ও নৈসর্গিক উপকরণের মিথস্ক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রবাদ-প্রতিম মন্তব্য 'One is not born, but rather becomes, a woman. it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunuch, which is described as feminine. On the intervention of someone else, can establish an individual as an other.' (১৯৯৮ [১৯৪৯] ২৯৫)। বোভোয়ার বিশ্লেষণ অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি, জৈবিক পরিচয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়া আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী হিসেবে নির্মিত হওয়ার মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান লক্ষ করেছেন। পিতৃতন্ত্রের যাবতীয় কৃৎকৌশল ধ্বস্ত হয়ে যায় যদি নারী তাকে ঘিরে-থাকা পিঞ্জরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। শুধুমাত্র জৈবিক কারণে নারী পুরুষ থেকে আলাদা—এ ধরনের প্রচলিত ভাবনার মধ্যে বোভোয়া খুঁজে পেয়েছেন অমর্যাদা এবং সেইজন্যে নারীসত্তাকে তা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তেমনি নারীচেতনার মুক্তি কতকগুলি সামাজিক বিধির পুনর্বিন্যাসে সম্ভবপর—এও তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নারীচেতনাবাদ পরবর্তী পরিণততর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বোভোয়ার অসামান্য অবদানের কথা বেটি ফ্রীডান ও শুলামিথ ফায়ারস্টোন যথাক্রমে 'The feminine mystique' (১৯৬৩) ও 'The dialectic of sex' (১৯৭০) বইতে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

এই দুটি বই দিয়ে নারীচেতনাবাদের তৃতীয় তরঙ্গ শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ষাটের দশকের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত বর্গভুক্ত নারী যখন গার্হস্থ্য জীবনের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার ফলে নানা ধরনের নৈরাশ্য ও রিক্ততাবোধের মুখোমুখি হচ্ছিল, সে-সময়ে ফ্রীডান নতুন কিছু ভাবনার সূত্রায়ন করেন। এছাড়া তিনি আমেরিকায় NOW নামক নারীদের জাতীয় সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত যে-সমস্ত উদারনৈতিক আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে, তাদের প্রভাবে নারীচেতনাবাদও ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে। এ সময় নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং যৌন পার্থক্যের ওপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপিত হয়। যে-লৈঙ্গিক পরিচয় নারীর যৌন লাঞ্ছনার কারণ ছিল, ধীরে ধীরে তা-ই হয়ে ওঠে স্বাধীন অস্তিত্ব উদ্‌যাপনের আকর। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও রাজনৈতিক প্রতীতিকে সমন্বিত করার চেষ্টাও এই পর্যায়ে শুরু হয়। মূলত পাঁচটি বিষয়ের ওপর নারীচেতনাবাদীদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল : জৈব পরিচয়, অভিজ্ঞতা, প্রতিবেদন, অবচেতন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সমালোচকদের মতে এই পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পরবর্তী চিন্তাধারা বহুধা বিকশিত হয়ে ওঠে। দেখা দেয় নানা ধরনের বিতর্ক ও নারীচেতনাবাদের শাখাপ্রশাখা। কোনো কোনো বিষয়কে পিতৃতন্ত্রের পক্ষপাতী জনেরাও কাজে লাগাতে চেয়েছেন। যেমন জৈবিক চিহ্নায়নকে যাঁরা মৌলিক বলে মনে করেছেন, তাঁদের কাছে সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রশ্নটি তুলনামূলকভাবে গৌণ। কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে এধরনের চিহ্নায়ন প্রহারের যষ্ঠি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কেননা নারীকে 'সুনির্দিষ্ট' অবস্থানে দৃঢ়প্রোথিত করে রাখার পক্ষে এর চেয়ে ভালো অজুহাত আর কী হতে পারে! বহুপরিচিত ল্যাটিন প্রবচন 'টোটা মুলিয়ের রন উটেরো' অর্থাৎ 'নারী নিছক গর্ভাশয় ছাড়া আর কিছু নয়' এই দৃষ্টিকোণের ফসল। নারীর বিশিষ্ট শরীর-সংস্থানই যদি নারীর ভবিতব্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তার যৌন ভূমিকার অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এ বিষয়ে স্বভাবত তর্ক ও প্রতিপ্রশ্নের অভাব নেই। বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ নারীর জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে হীনতার বদলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন। আবার কেউ বা জীবনে ও শিল্প-সাহিত্যে ইতিবাচক নারীকেন্দ্রিক মূল্যবোধের উৎস হিসেবে নারীর বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত সত্তর দশক থেকে এই প্রবণতার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছে কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা ঔপন্যাসিকের রচনায়। এমন কিছু শারীরিক অভিজ্ঞতা নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জন করে যাকে অতি বড়ো সংবেদনশীল পুরুষও কখনও সেই মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারবে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী চিরকাল পার্থক্য ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিক সম্পর্কে বিধৃত অপর অস্তিত্ব। তাই নারীর অভিজ্ঞতা মানে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ভিন্ন গোত্রের অনুভূতি ও আবেগ; যে-চোখে পুরুষ জগৎ ও জীবনকে দেখে সেভাবে নারী দেখে না। কোনটা প্রধান আর কোনটা অপ্রধান কিংবা কাকে বলা যাবে গুরু আর কাকে লঘু—এ বিষয়ে নারীর ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও উপলব্ধি পুরুষের চেয়ে ভিন্নপথগামী। ১৯৭৭ সালে এলেন শোয়ালটের তাঁর 'A Literature of their own' বইতে এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। নারীর রচনায় যৌন অভিজ্ঞানের ভিন্নতা কীভাবে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন।

সাম্প্রতিক আলোচনায় 'প্রতিবেদন' এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গুরুত্ব খুব বেশি। নারীচেতনাবাদী আলোচকেরাও এবিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী। ডেল্ স্পেন্ডারের 'Man Made Language' (১৯৮০) বইতে এই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, ভাষা এবং প্রতিবেদন পুরুষতন্ত্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় পুরুষের একান্তিক চাপে নারীর নিজস্ব বোধ নিষ্পেষিত হচ্ছে। নারীর ভাষা ও প্রতিবেদন সেজন্যে ঈপ্সিত মাত্রায় পৌছাতে পারে না কখনও। ফুকোর বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়ে এখানে। তিনি বলেছেন, প্রতিবেদককে যে নিয়ন্ত্রণ করে তার-ই ওপর সত্য নির্ভরশীল। অর্থাৎ সত্য যেন লোককথার সেই তোতাপাখি—যখন যার হাতে থাকে, তখন সে তারই হয়ে যায়। সমাজ ও সংস্কৃতির উপর যে বর্গের প্রতাপ কায়েম থাকে, প্রতিবেদন রঞ্জিত হয় তারই আলোয় এবং তৈরিও হয় তারই মাপে। সত্য বাঁধা পড়ে ঐখানে। স্বভাবত প্রতিবেদনের উপর পুরুষ তন্ত্রের দখলদারি যখন নিরঙ্কুশ, সত্য লৈঙ্গিকভাবে চিহ্নায়িত হয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষের একান্তিক সত্য খাঁচার নামান্তর, নারী-সত্তার সন্দর্ভ তাতে বন্দী হয়ে পড়ে। সুতরাং নারীচেতনাবাদীর বড়ো দায়ও তৈরি হয়ে যায় এখানে। ভাষা ও প্রতিবেদনের উপর পুরুষতন্ত্রের একাধিপত্যকে প্রত্যাহ্বান না-জানিয়ে নারী-অস্তিত্বের পরিসর তৈরি হতে পারে না কখনও। কিংবা প্রত্যাহ্বান নয় কেবল, সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে নারীচেতনাবাদ এবং তারপর বিকল্প ভাষায় বিকল্প প্রতিবেদনে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সত্য উপস্থাপিত করে। এভাবে নারীর সুনির্দিষ্ট সন্দর্ভ গড়ে উঠছে পুরুষতন্ত্রের নিপীড়ন উপেক্ষা করে।

তবু পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ সহজে হাল ছেড়ে দেয় না। এখনও এমন লেখকের অভাব নেই। (এমন কি এদের মধ্যে কয়েকজন লেখিকাও রয়েছেন) যাঁরা নারীর ভাষার মধ্যে দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা লক্ষ করে তাকে তুলনামূলক ভাবে নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। তুচ্ছতা, চাপল্য, আবেগ-প্রবণতা, যুক্তিহীনতা ইত্যাদিকে নারীর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখিয়েছেন এঁরা। পুরুষের উচ্চারণ যেহেতু স্পষ্টতর ও দীপ্ততর, নারীকে তার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্যে ক্রমোন্নয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারীচেতনাবাদীরা এ ধরনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ উদ্ভূত শক্তিশালী পুরুষ ও অবলা নারীর আদিকল্প। নারীচেতনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমস্ত পূর্বাগত ধ্যানধারণার অভ্যস্ত পিঞ্জরকে ভেঙে দিয়ে আর, এই ক্রমিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে নারীর স্বতন্ত্র জীবনানুধ্যান, স্বাধীন প্রতিবেদন।

জাক লাকাঁ ও জুলিয়া ক্রিস্তেভার মনোবিকলনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে অবচেতনার প্রেক্ষণ-বিন্দু। পুরুষের আধিপত্যবাদী সন্দর্ভকে প্রত্যাখ্যান করার তাগিদে কোনো কোনো নারীচেতনাবাদী জৈবিক সংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বিচারে নারীসত্তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে কেবলমাত্র প্রতিবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। পুরুষতন্ত্র যেখানে সমস্ত তাৎপর্যকে গন্ডিবদ্ধ করে দিতে চায়, প্রকৃত নারীচেতনা সেখানে কোনো সীমাকে স্বীকার করে না, উপসংহারের রুদ্ধতার বদলে বেশি গুরুত্ব দেয় সক্রিয়তা ও বহমানতাকে। নারীর যৌনবৃত্তিকে যাঁরা পুরুষের ছায়া থেকে সরিয়ে আনতে চান, তাঁরা এর মধ্যে দেখতে পান সৃষ্টিশীল অন্তর্ঘাতের তাগিদ এবং বহুত্ববাদী বিস্তারের প্রবণতা। এক কথায় বলা যায়, পুরুষের আরোপিত সংজ্ঞার মধ্যে নারী-চৈতন্য নিজেকে আর নিবদ্ধ রাখতে চায় না।

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যখন দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বিভিন্ন লৌকিক চিন্তায়নের সামঞ্জস্য ও সংঘাতের চরিত্র অনবরত বদলে যেতে বাধ্য। স্বভাবত সাহিত্যে ও সাহিত্যতত্ত্বে এই পরিবর্তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে। নানা স্তরে বিভঙ্গে গড়ে উঠছে নারীচেতনাবাদী তত্ত্ববিশ্ব। তৃতীয় তরঙ্গ থেকেও বিচ্ছুরিত হয়েছে আরো অনেক প্রবণতা ও অভিঘাত। অজস্র চিন্তাধারার মধ্যে যত না অন্বয়, তার ঢের ঢের বেশি রয়েছে অনন্বয়। তাই জুলিয়েট মিচেল, কেট মিলেট, আদ্রিয়েনা রীচ, এলেন শোয়াল্টের, হেলেন সিক্সো, লুসি ইরিগেরে, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, তোরিল মোই, মেরি ঈগলটন প্রমুখ নারীচেতনাবাদী চিন্তাস্রোতে অজস্র আবর্ত তৈরি করেও পরস্পরের সহযাত্রী নন। তাঁদের প্রতিবেদনের কেন্দ্রবিন্দুও পরস্পর-ভিন্ন। সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য, প্রকরণ এবং নির্যাস—সমস্ত দিক দিয়েই এরা বিচিত্রপথগামী। সব মিলিয়ে, নারীর নিজস্ব প্রতিবেদন সম্পর্কিত ধারণা ইদানীং বিসঙ্গতির মধ্য দিয়েই সঙ্গতি খুঁজে চলেছে। ইউরোপে এর সূত্রপাত ও প্রাথমিক বিকাশ হলেও বর্ণ-বর্গ-জাতিগত লাঞ্ছনার শিকার তৃতীয়বিশ্বে নারীচৈতন্য কতটা নতুন তাৎপর্যে গৃহীত ও পুনর্গৃহীত হচ্ছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গায়ত্রী স্পিভক চক্রবর্তীর রচনায়।

চার

একদিকে আকরণোত্তরবাদ এবং অন্যদিকে উপনিবেশোত্তর চেতনা কিংবা একদিকে আধুনিকোত্তরবাদ এবং অন্যদিকে বিনির্মাণবাদ নারীচৈতন্যের অভিব্যক্তিতে নতুন-নতুন সূক্ষ্মতা ও কৌণিকতা যুক্ত করছে। মিথষ্ক্রিয়া ও অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীচেতনাবাদী সাহিত্য-সমালোচনাও উত্তীর্ণ হচ্ছে অজ্ঞাতপূর্ব উচ্চতায়। কেট মিলেটের 'Sexual Politics' (১৯৬৯) বইটি সাংস্কৃতিক রাজনীতি সম্পর্কে উদ্ভাসনী আলোকপাত করার পরে নারীর ভাবমূর্তি নামক অলীক নির্মিতি যেমন স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তেমনি সামাজিক প্রতাপের কৃৎকৌশলও উলঙ্গ হয়ে যায়। লৈঙ্গিক অভিজ্ঞান আর যৌন পরিচয় যে তুল্যমূল্য নয় এবং নারীর সাহিত্যিক উপস্থাপনায় যে এই পার্থক্যের উপলব্ধি অনুপস্থিত থাকে—একথা মিলেটের প্রতিবেদন থেকে আমরা বুঝতে পারি। সমাজ কীভাবে ব্যক্তি-নারীর উপর নারীত্বের আঙ্‌রাখাটি চাপিয়ে দেয় এবং সাহিত্যের যাবতীয় মূল্যবোধ ও পরম্পরা এই চতুর পিতৃতান্ত্রিক নির্মিতির উপরই গড়ে ওঠে—নারীচেতনাবাদী পাঠ আমাদের সে-বিষয়ে অবহিত করে তোলে। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ এবং ঐতিহ্যানুষঙ্গ গড়ে উঠেছে পুরুষের প্রয়োজনে; নারীর অবস্থান মূলত ঐ প্রয়োজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেটানোর জন্যে পরিকল্পিত। লেখক যখন তাঁর কল্পিত পাঠকদের সম্বোধন করেন, তাঁর সামনে থাকে শুধু পুরুষ পাঠকেরা, নারীর অনুপস্থিতি সেখানে তীব্রভাবে প্রকট। এই সর্বগ্রাসী পুরুষের জগতে কোনো মহিলা পড়ুয়া নিজের পরিসর খোঁজার কথা ভাবতে পারেন না। বস্তুত পুরুষ-সর্বস্ব জগতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত ভাবতেই তিনি অভ্যস্ত বলে অন্য কোনো সম্ভাব্যতাও তাঁর মনে আসে না। বাংলা উপন্যাস থেকে এই বক্তব্যের সমর্থনে অজস্র দৃষ্টান্ত আহরণ করা যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবীর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন অনুসরণ করে পিতৃতন্ত্র দ্বারা পরাভূত ও অধিকৃত নারীর জগৎহীনতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। কল্পনাপ্রতিভা দিয়ে যথাপ্রাপ্ত ভাববিশ্বে তাঁরা অন্তর্ঘাত বা হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। আবার, উল্টোদিক দিয়ে এও সত্য যে, বাস্তব জগতের লৈঙ্গিক রাজনীতি নারীর উপর যে-নিপীড়ন চাপিয়ে দেয়—লৈঙ্গিক অবস্থানের জন্যে সমস্ত পুরুষ লেখক তাঁদের ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে এই নির্মমতার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন তা কিন্তু নয়। এমন যদি হত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-মানিক-সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আবু ইসহাক প্রমুখ লেখকের প্রতিবেদনে নারীসত্তা পুরোপুরি নিরাকৃত হতে যেত। পিতৃতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে রেখেছিল, একথা নিশ্চয় কেউ বলবেন না। বরং লৈঙ্গিক রাজনীতির আসল চেহারা উন্মোচনে এই লেখকদের অবদান অনেকখানি, এতে সন্দেহ নেই কোনো। সুতরাং কোরা কাপলান যেমন বলেছেন, এঁরা ভাবাদর্শকে পিতৃতান্ত্রিক কৃৎকৌশল হিসেবে ব্যবহার করেননি যাকে বলা যায় 'The universal penile club which men of all classes use to beat women with' সাহিত্যে নারী যখন প্রতিমায়িত হয়, সেই বিমূর্তায়িত উপস্থাপনার আড়ালে পড়ে যায় নারীর বাস্তব অস্তিত্ব। মধুর মিথ্যার অলংকরণে নারীর নিজস্ব সত্য যেহেতু ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, উপন্যাসের প্রচলিত প্রকরণ সম্পর্কেও নারীচেতনাবাদীরা যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছেন। দাবি জানিয়েছেন নিজস্ব পরিসরের জন্যে এবং সেই সূত্রে নিজস্ব প্রকরণ, নন্দন, অন্তর্বস্তু আর আকরণের জন্যেও। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের পাশাপাশি লৈঙ্গিক পীড়নকে যাঁরা সমান প্রাথমিক মনে করেন, তাঁরা দেখিয়েছেন শ্রেণীগত নির্যাতনের মতো পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুর অত্যাচারও নারীকে সইতে হয় বলে তার মুক্তির সংগ্রাম একান্তিক নয়। এই প্রক্রিয়া খুব জটিল কেননা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে, নারী হয়ে জন্মানোর সুবাদে, সমাজের বিপুল অংশকে বিপুল অন্ধকার মহাদেশ এবং তার দ্বারা আরোপিত দৃশ্য-অদৃশ্য অজস্র শেকল ভেঙে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্যে কঠিন সাধনা করতে হয়েছে। প্রতিটি গার্হস্থ্যে, কালে-কালান্তরে, নারীকে যুদ্ধ করতে দেখি কেবলমাত্র আপন অস্তিত্ব প্রকাশ ও সংরক্ষণের আর্তিতে। পুরুষ-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থায়, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায়, রাষ্ট্রসংস্থানে নারী চিরকাল দূরীকৃত অপর। নারীকে বন্দিনী করে দেখা হয়েছে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া কিছু পরিচয়ের খাঁচায় এবং সেই বন্দীদশার সরব প্রশস্তিতে। যৌনপুত্তলিকা হিসেবে পুরুষের মনোরঞ্জন করে এবং পুরুষ-সন্তান উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রজন্মের ধারাকে অব্যাহত রেখে নারীজন্মের চরম সার্থকতা—একথা প্রচার করা হয়েছে তারস্বরে। নারীর চেতনা যেহেতু পিতৃতন্ত্র দ্বারা অধিকৃত, জায়া ও জননী হিসেবে যোগ্যতমা হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওঠার জন্যে নারীও সচেষ্ট থেকেছে। ভারতীয় সমাজে যেমন বর্গ ও বর্ণগত বিভাজন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নিয়ন্তা, তেমনি পিতৃতন্ত্রও অসংখ্য শাস্ত্র ও লোকাচারের নিগড়ে নারীর আকাশ-বাতাস-আলো-জলকে রুদ্ধ করে রেখেছে। সমস্ত বর্গের সমস্ত বর্ণের নারী ঊনমানব অর্থাৎ মানবেতর প্রাণী বলে অপমানের শিকার হয়েছে। শিক্ষার অধিকার যদিও গত এক শতক ধরে অর্জন করেছে, সামাজিক নিগ্রহ থেকে আজও পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়নি নারী। এই প্রেক্ষিতে মার্ক্সীয় সমালোচনা পদ্ধতি নারীচেতনাবাদে নতুন দিশার সন্ধান দিতে পারে। বস্তুত ষাট ও সত্তর দশকে ইংল্যান্ডের নারীচেতনাবাদী ভাবনায় এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করি। বর্গ-বর্ণ-লিঙ্গগত পীড়নের জটিল আধেয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো-কোনো তাত্ত্বিক মার্ক্সীয় শ্রেণী-দ্বন্দ্বের আলোচনা পদ্ধতিকে প্রসারিত করেছেন। পরিবারে নারীর শ্রম এবং শ্রম-জনিত অভিজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে শ্রমও লৈঙ্গিকভাবে নির্ধারিত। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্দর্ভ পুরুষের ছায়ায় লালিত বলে লৈঙ্গিক শ্রম-বিভাজন যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। তাই মার্ক্সীয় বীক্ষণে অনুপ্রাণিত নারীচেতনাবাদীর প্রাথমিক দায় হল, লৈঙ্গিক অবস্থান ও অর্থনীতির জটিল সম্পর্ক-বিন্যাসটি বুঝে নেওয়া। নারীর নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে, বিশেষত বৃত্তিজীবী নারী যে ঘরে-বাইরে লৈঙ্গিক শ্রম-বিভাজনের ফলে নিপীড়িত—এ বিষয়ে মনোযোগ না-দিয়ে, জীবন ও সাহিত্যের যথার্থ প্রতিবেদন রচনা অসম্ভব। শীলা রোবোথামের 'Hidden from History' and 'Women's Consciousness, Man's world' বই দুটি, জুলিয়েট মিচেলের 'Women The Largest Revolution' নামক নিবন্ধ মার্ক্সীয় নারীচেতনাবাদের প্রাথমিক সন্ধানের ফসল। পরে মিশেল বারেট 'Women's Oppression Today Problems in Marxist Feminist Analysis' (১৯৯০) বইতে আলোচনার এই ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

লক্ষণীয় ভাবে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বস্তুতান্ত্রিক বক্তব্য বারেটের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। তিনিও জানিয়েছেন, যে-ধরনের বস্তুগত ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীর সাহিত্যসৃষ্টি গড়ে ওঠে—তা বাস্তব কারণেই পরস্পর-ভিন্ন। এই ভিন্নতার বোধ তাদের রচনার অন্তর্বস্তু ও প্রকরণকে নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করে। তাই লৈঙ্গিক চিহ্নায়নকে ইতিহাসের তরঙ্গায়িত প্রবাহ থেকে কখনও আলাদা করা যায় না। সাংস্কৃতিক পরিসরে বহিরঙ্গ পরিবর্তন ঘটাতে পারলে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত হবে, এমন ভাবার কারণ নেই। ইতিহাসের আমূল রূপান্তর যতক্ষণ না হচ্ছে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বন্দীশালা থেকে নারীর মুক্তি হতে পারে না। ফলে নারীর নিজস্ব পাঠকৃতিও অপেক্ষিত থেকে যায়। বারেট আরো বলেছেন, লৈঙ্গিক ভাবাদর্শ পুরুষ ও নারীর রচনা-পাঠের ধরনকে অনেকখানি প্রভাবিত করে এবং সেইসঙ্গে উৎকর্ষ নির্ণয়ের বিধিকেও প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর অন্য অভিমত এই যে নারীচেতনাবাদী সমালোচকের মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যিক পাঠকৃতির মধ্যে কল্পনার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই অতিনির্দিষ্ট তাৎপর্য তাতে না-খোঁজাই ভালো। একই কারণে এমন মনে করা ঠিক হবে না যে সমস্ত লেখকই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিতৃতন্ত্র ও যৌন নিপীড়নের প্রতিভূ এবং লেখিকামাত্রেই লৈঙ্গিক পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনী। লৈঙ্গিক অবস্থানের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক তাৎপর্য বুঝে নেওয়াটা নারীচেতনাবাদীর জরুরি কৃত্য। সেলডেন ও হ্বিডোওসোন এ সম্পর্কে বলেছেন, 'Texts have no fixed meanings : interpretations depend on the situation and ideology of the reader' (১৯৯৩ ২১৮)। বারেটের পরে জুডিথ নিউটন, ডেবোরা রোজেনফেল্ট, সান্দ্রা গিলবার্ট, সুসান গুবার, কোরা কাপলান প্রমুখ সমালোচিকাদের চেষ্টায় বস্তুবাদী নারীচেতনা আরো বিকশিত হয়েছে। তবে তাঁদের সন্দর্ভে পরস্পরবিরোধিতা এত বেশি যে লুই আলত্যুসের এবং পিয়ের মাশেরের তত্ত্ববিশ্বে নিঃশ্বাস নিয়েও মার্ক্সীয় নারীচেতনাবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। একদিকে ইঙ্গমার্কিন এবং অন্যদিকে ফরাসি নারীচেতনাবাদের দাপটে প্রাগুক্ত ধারা খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

পাঁচ

তোরিল মোইয়ের বহুপঠিত 'Sexual/Textual Politics' (১৯৮৫) বইতে প্রাগুক্ত দুটি চিন্তাধারার বিতর্ক সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ রয়েছে। ইঙ্গমার্কিন ধারার আলোচনা তত্ত্ব বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে উদাসীন এবং স্বভাববাদী; অন্যদিকে ফরাসি ধারা তত্ত্বগত ভাবে আত্মসচেতন ও পরিশীলিত। তবু তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং মিথস্ক্রিয়ারও অভাব নেই। এই দুটি ধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে সাম্প্রতিক নারীচেতনাবাদের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে না। ইঙ্গ-মার্কিন ধারায় সাহিত্যে নারীর ভাবমূর্তি বিশ্লেষণের ধারাবাহিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ক্রমশ এই প্রবণতা নারীসত্তাসন্ধানী বিকল্প ঐতিহ্যকে গরীয়ান করে তোলে। সাহিত্যে পুরুষস্রোতের প্রাধান্য অস্বীকার করে কীভাবে নারীর নিজস্ব উচ্চারণ জোরালো হয়ে উঠছে এবং নারী সম্পর্কে পুরুষের চিরাচরিত রুদ্ধ আদিকল্পগুলি প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে—এ বিষয়ে আলোকপাত করেন সুসান কর্নিলিয়ন, এলেন মোয়ের্স, মেরী জোকোরাস প্রমুখ লেখিকারা। তবে, আগেই বলেছি, এ ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হল এলেন শোয়াল্টের রচিত 'A Literature of their Own' (১৯৭৭)। নারীর ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে তাঁর তাত্ত্বিক প্রতিবেদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষত নারীচেতনাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব এবং তার প্রায়োগিক উপযোগিতা বিকাশের ক্ষেত্রে এই বই-এর অবদান যুগান্তকারী বললে অত্যুক্তি হয় না।

ফরাসিধারার স্থপতি হিসেবে জুলিয়া ক্রিস্তেভা, হেলেন সিক্সো ও লুসি ইরিগেরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধারার উপর বোভোয়ার প্রভাব অনেকখানি। পুরুষের দূরীকৃত অপরসত্তা হিসেবে নারীর অবস্থান শ্রেণী ও জাতিগত ভিন্নতার ফলে কত জটিল হয়ে উঠেছে, এই ধারার প্রতিবেদনে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। সমকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে মনোবিকলনবাদী জাক লাকাঁ এই ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। জুলিয়েট মিচেল-এর বইতে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারী-অস্তিত্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিফলিত পার্থক্যবোধ সম্পর্কে ফরাসি নারীচেতনাবাদীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ধারার মধ্যেও রয়েছে দৃষ্টিকোণগত ভিন্নতা এবং সেই ভিন্নতা জনিত কৌণিকতা। দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও বিসঙ্গতি রয়েছে বলে নারীচৈতন্য সম্পর্কে প্রত্যেকের ভাষ্য আলাদা। নারী-সত্তার প্রকৃত তাৎপর্য কী এবং সেই তাৎপর্য অর্জনের জন্যে কত ধরনের রুদ্ধতার অবসান ঘটাতে হয়—এ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা চিন্তাবিদেরা করেছেন। বাচন ও প্রতীক কীভাবে নারীর শারীরিক অভিজ্ঞতার সূত্রে পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং অবচেতন ভাষার সংগঠনকে প্রভাবিত করে—এ বিষয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে 'Woman is the silence of which precedes discourse She is the other, which stands outside and threatens to disrupt the conscious order of speech.' (তদেব ২২৬)। হেলেন সিক্সোর 'The Laugh of the Medusa' (১৯৭৬)-কে কেউ কেউ নারীর নিজস্ব রচনার ইস্তাহার বলে বর্ণনা করেছেন। হেলেন সেখানে নারীসমাজকে আহ্বান করেছেন যেন তাঁরা তাঁদের শারীরিক অভিজ্ঞতাকে রচনায় রূপান্তরিত করেন। কেন না নারীর শরীরের ভাষা চিরকাল অশ্রুত থেকে গেছে এবং নারীর নিজস্ব কল্পনা-সৌন্দর্য থেকে গেছে অজ্ঞাত।

গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, তৃতীয় বিশ্বের নারীচেতনা এখন চতুর্থ তরঙ্গের জোরালো প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্য থেকে যেমন নারী চেতনার নতুন নন্দন ও সমাজতত্ত্ব উত্থাপিত হচ্ছে, তেমনি ব্যতিক্রমী যৌন আচরণ নির্ভর প্রতিবেদনও গড়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, এতে নতুন-নতুন বিতর্কের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে দেশে-দেশান্তরে। বহুধা-বিভাজিত ভারতীয় সমাজেও দেখা যাচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মহা-আখ্যান চূর্ণ করে ক্রমশ জেগে উঠছে নারীচেতনাবাদী সন্দর্ভ।

ছয়

বিশেষভাবে বাঙালির ভুবনে নারীচৈতন্যের ক্রমবিকাশ খুবই কৌতূহলজনক বৃত্তান্তের আকর। সতীদাহ-বিধবাবিবাহ-স্ত্রীশিক্ষা-বহুবিবাহ-সহবাসসম্মতি প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলনে কিন্তু পুরুষেরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষে এরই ফলশ্রুতিতে নারীপ্রতিমার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নারীসত্তার অঙ্কুর। ধীরে ধীরে নারী অর্জন করল তার উচ্চারণ, তার অবস্থান। অন্দরমহলের অন্ধকার থেকে কোলাহলমুখর সদরের আলোয় এসে দাঁড়াল। সহজ ছিল না সেই পথ, বহু ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। অবরোধে বন্দিনী বাঙালি নারী সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে যখন প্রখর রৌদ্রতাপে এসে দাঁড়াল, তাকে ঘিরে গড়ে-ওঠা পুরুষের মনোরঞ্জক রহস্যবলয় ধীরে ধীরে মুছে গেল। ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যখন সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে মঞ্চে উঠলেন, ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হল। কারণ তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি পুরুষের একান্তিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জগতে নারীসমাজের কণ্ঠস্বর তুলে ধরলেন। অ্যানি বেসান্ত এই যুগান্তকারী ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন 'A symbol that India's freedom would uplift India's Womanhood' সমাজসংস্কারের ঢেউ যদিও অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলছিল, নারীর বাস্তব পরিস্থিতিতে খুব একটা পরিবর্তন কিন্তু দেখা যায়নি। উনিশ ও বিশ শতকের সেই টালমাটাল দিনগুলিতে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫২-১৯৩২), সরলা দেবীচৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ উজ্জ্বল পথের দিশারি হয়েছিলেন। পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সমাজের মধ্যে বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। নারীর উপর পুরুষতন্ত্র যে নারীত্বের আদর্শ চাপিয়ে দেয়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি নারীশক্তির ওপর অগাধ আস্থা প্রকাশ করেছেন। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন 'সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ়সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।' আরো বহু সংগ্রামী নারীর কণ্ঠস্বর যুক্ত হয়েছে পরবর্তী দশকগুলিতে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে শামিল হয়েছেন অনেকেই। বেগম সুফিয়া কামাল থেকে জাহানারা ইমাম বা ইলা মিত্র পর্যন্ত নারীজাগৃতির নানা বিভঙ্গ লক্ষ করি। সব কিছু যে ইতিবাচক পথে চলেছে, এমনও নয়, নইলে একদিকে মালেকা বেগম এবং অন্যদিকে তসলিমা নাসরিনের মতো দুটি মেরু তৈরি হত না। আমরা যদি বাংলা সাহিত্যে নারীচেতনার অভিব্যক্তি সন্ধান করি, দেখব, উনিশ শতক থেকে নানা ধরনের পরস্পর-বিরোধিতা সত্ত্বেও ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে তার প্রসার ঘটছে। সাহিত্যে সর্বপ্লাবী পুরুষস্রোতের আধিপত্য যেমন নারীসত্তার বদলে নারীপ্রতিমার প্রতিষ্ঠাকে নিরঙ্কুশ করেছে, তেমনি প্রতিপ্রশ্নও উঠে এসেছে। সাহিত্যিক সন্দর্ভের পুনঃপাঠ বিভিন্ন বিকল্প সম্ভাবনার সঙ্গে প্রধানত নারীসত্তার উদ্ভাসনের সঙ্গে পীড়ন-প্রবণ পুরুষ-কেন্দ্রিক ভাবনার দ্বিবাচনিকতাকে স্পষ্ট করে তুলছে। নিরুপমা দেবীর পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, আশাপূর্ণা দেবী তার আদল গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ নারীর নিজস্ব পরিসর ও সন্দর্ভে পৌঁছাতে চেয়েছেন। আবার মহাশ্বেতা দেবী ও সেলিনা হোসেন আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। পাশাপাশি পুরুষ লেখকদের লৈঙ্গিক সমাজতত্ত্ব (ও রাজনীতি) কীভাবে বদলাতে বাধ্য হচ্ছে, তাও লক্ষণীয়। তবু, প্রতীচ্যের নারীচেতনা যত বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রতিভাত হচ্ছে, ঐতিহাসিক কারণে বাংলা সাহিত্যে এখনও তার প্রতিফলন পড়েনি। ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিকের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিভিন্ন পাঠকৃতিতে হয়তো ছায়া ফেলছে কিন্তু এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য আজও বিশ্লেষণের অপেক্ষায়। স্বভাবত প্রতিটি স্তরে আপাত-বিপ্রতীপের গভীর দ্বিবাচনিক সম্পর্ক নারীচেতনার অভিব্যক্তিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তার যথার্থ প্রতিবেদন অঙ্গুলিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া পাওয়া যায় না। ঔপনিবেশিক থেকে উপনিবেশোত্তর সমাজে বিবর্তিত হওয়ার ফলে নারীসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কতখানি জটিল, ব্যাপক ও কৌণিকতাময় হয়ে উঠেছে—এ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠছে নিতান্ত বিলম্বিত লয়ে। এঙ্গেল্‌স্‌-এর প্রবাদপ্রতিম উক্তি আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারের ভিত্তি হলো নারীর প্রকাশ্য অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোপন গার্হস্থ্য-দাসত্ব এবং বর্তমান সমাজ হলো এইসব ব্যক্তিগত পরিবারের সমষ্টি—ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে এখনও কেন প্রাসঙ্গিক, নারীচেতনাবাদীকে তা ভেবে দেখতে হচ্ছে। বিশেষত বাঙালির ভুবনে এখন শিখর-উপত্যকা-জলাভূমির বিচিত্র সহাবস্থান চলেছে। অব্যাহত রয়েছে উৎকেন্দ্রিক আধুনিকোত্তর ভাবনা ও শিকড়-সন্ধানী উত্তর আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব, প্রগতি ও মৌলবাদের আলো-ছায়াময় সংঘর্ষ।

এই পরিস্থিতিতে গায়ত্রী স্পিভক চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ আমাদের মনোযোগ দাবি করে। সাম্প্রতিক আকরণোত্তরবাদী ভাবনার সঙ্গে উপনিবেশোত্তর চেতনার সংশ্লেষণে গড়ে উঠেছে হোমি ভাবা এবং য়ান মহম্মদের তত্ত্ববিশ্বও। উপনিবেশবাদের পীড়নে কীভাবে ধ্বস্ত হতে হতে নিরুচ্চার হয়ে পড়ে অন্তেবাসীরা, এটা যেমন দেখিয়েছেন তাঁরা, তেমনি ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনকে মোকাবিলা করার পথও খুঁজেছেন। স্পিভক আরও একটু এগিয়ে উপনিবেশীকৃত নারীসত্তার বিপুলতর নৈঃশব্দ্যের পরিধির প্রতি তর্জনি সংকেত করেছেন। ভাবা অবশ্য উপনিবেশবাদের মহাসন্দর্ভ দ্বারা আক্রান্ত অন্তেবাসী জনেরও পরিসর আর কণ্ঠস্বর থাকা সম্ভব, একথা বলেছেন। কিন্তু গায়ত্রী মনে করেন, নৈঃশব্দ্য-গ্রস্ত অন্তেবাসী নারীর জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিসর নেই, উচ্চারণও নেই 'There is no space from where the subaltern (sexed) subject can speak.' (১৯৮৫ ১২২)। পিতৃতন্ত্র এতই সর্বগ্রাসী যে নর্মসঙ্গিনী ও যৌনপুত্তলিকা হিসেবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নারীর জন্যে কোনো স্বাধীন ইচ্ছার সম্ভাবনা পর্যন্ত অনুমোদন করতে নারাজ। সুতরাং নারীচেতনা বহুমাত্রিক ঔপনিবেশিকতার আক্রমণে প্রান্তিকায়িত হচ্ছে অহরহ। গায়ত্রী যাকে 'Planned epistemic violence of the imperialist project' (১৯৮৫ ১৩১) বলেন, তাকে কার্যকরী ভাবে মোকাবিলা না-করে নারীচেতনা কখনও নিজস্ব পরিসরে উত্তীর্ণ হতে পারে না। অতএব নারীচেতনাবাদীর কৃত্য বহুমুখী। একদিকে আধিপত্য-প্রবণ মহাসন্দর্ভের মোকাবিলা করে ছদ্ম-ইতিহাসের পুঞ্জীভূত মিথ্যাকে চিনিয়ে দেওয়া, অন্যদিকে সার্বভৌম নারী-অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। উপনিবেশীকৃত অপরের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে প্রতাপের ঔদ্ধত্যকে অস্বীকৃতি জানানোও তার আরেকটি বড়ো দায়, কেননা তাছাড়া সত্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক উপনিবেশোত্তর চেতনা ও নারীচেতনার যুগলবন্দিতে ক্রমশ গড়ে উঠছে নতুন তত্ত্ববিশ্ব, তার মূল বার্তা হল সার্বিক পুনর্নির্মাণ। সাহিত্য, তাৎপর্য ও মূল্যবোধের নারীচেতনাবাদী পুনর্বিন্যাসে আমূল রূপান্তরিত হয়ে চলেছে মানবিক প্রেক্ষিত ও নান্দনিক প্রক্রিয়া। স্বভাবত প্রতীচ্যে উদ্ভূত হয়েও এই তত্ত্ব উপনিবেশোত্তর সংগ্রামে নিয়োজিত তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষভাবে বাঙালির ভুবনে নতুন দ্যোতনায় গৃহীত ও পুনঃপঠিত হচ্ছে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাত

নারীচেতনাবাদের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করে যেমন তার অন্তর্নিহিত অজস্র বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারি, তেমনই তার মধ্যে লক্ষ করি কেন্দ্রীয় এক বিতর্কের আভাসও। লেখিকা হিসেবে নারীর কৃতিত্ব বিশদ করা কি প্রধান কৃত্য হবে আমাদের, নাকি, বিভিন্ন পাঠকৃতিতে চিহ্নায়ক হিসেবে বিধৃত নারীসত্তার তাৎপর্য উন্মোচনই হবে আমাদের কাজ? অ্যানেট কোলোড়্নি বহুত্ববাদী ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তাঁর মতে, এর ফলে কোনো সমালোচকই নিজের সন্দর্ভকে চূড়ান্ত বলে মনে করতে পারবেন না। বরং প্রকৃত নারীচেতনাবাদীকে তৈরি থাকতে হবে 'Ongoing dialogue of completing potential possiblities'-এর প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়ার জন্যে। আর, এই দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াই চূড়ান্ত উপলব্ধির পর্বে পৌঁছে দিয়ে ভাবাদর্শের গভীর ও ব্যাপক প্রতাপকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই প্রসঙ্গে তত্ত্বের প্রবল প্রতিপত্তি সম্পর্কে কোনো কোনো নারীচেতনাবাদীর দ্বিধার কথাও মনে আসে। এলেন শোয়ালটেরের খটকা ছিল, তত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব দিলে নারীচেতনাবাদীরা কি নারীর নিজস্ব রচনা সম্পর্কিত নিবিড় ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরে যাবেন? তোরিল মোই অবশ্য এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হননি; তিনি তত্ত্ব ও জ্ঞানের তথাকথিত বিরোধিতাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, এমন কোনো জ্ঞান কি কোথাও আছে যার সঙ্গে তত্ত্বের কখনও সম্পর্ক থাকে না? বিশেষত মার্ক্সীয় নারীচেতনাবাদীরা তত্ত্বকে তাঁদের সমালোচনা প্রকরণের অনিবার্য ও অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য হল, এমন কোনো জ্ঞান যেহেতু সম্ভবই নয় যাকে তত্ত্বের কাঠামোর বাইরে বোঝা ও বোঝানো যায়, এমন কোনো বিশিষ্ট নারী-অভিজ্ঞতা হতে পারে না যার তত্ত্বনিরপেক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে। তত্ত্ববিশ্বে পুরুষের আধিপত্য স্পষ্ট, এটা ঠিক, কিন্তু তত্ত্বপ্রকরণ পুরোপুরি পুরুষের বিষয়, এ ধরনের চিন্তা ভুল। বরং আকরণবাদ, চিহ্নবিজ্ঞান, মনোবিকলনবাদ, মার্ক্সবাদ প্রভৃতির সাম্প্রতিক প্রবণতা লক্ষ করে একথা অনায়াসে বলা যায়, সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার আধার ও আধেয় হিসেবে নারীচেতনা এইসব তত্ত্বের দারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। অনবরত দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে নারীচেতনা বরং প্রমাণ করছে যে তত্ত্ববিশ্বে লৈঙ্গিক প্রাধান্য সত্ত্বেও তা পুরুষের একাধিপত্যের অভিব্যক্তি হতে পারে না কখনও। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে তাই ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল নারীর অবিরল পথ-পরিক্রমা থেকে অর্জিত উদ্‌ভাসন। নারী-সত্তার অবিচ্ছিন্ন পুনর্নির্মাণ কোনো অলীক স্বর্গের কল্পনা যে নয়, তা দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আজ। কোন্ পথে যাবে নারীচেতনাবাদ, একথা বলা সম্ভব নয়—উচিতও নয়। এইটুকু বলা যেতে পারে যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-নান্দনিক অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে পথ ও পাথেয়; তত্ত্ববিশ্বও মুহুর্মুহু রূপান্তরিত হচ্ছে। তথ্য জন্ম দিচ্ছে তত্ত্বকে আবার তত্ত্ব পরিশীলিত করে চলেছে তথ্যকে। এই অবিরল প্রক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নারীচেতনাবাদীরা যুগপৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন এবং তাত্ত্বিক ভিত্তিকেও দৃঢ়তর করছেন। বাখতিনের সূত্র অনুযায়ী, দ্বিবাচনিকতা সর্বত্র রয়েছে। তত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও তথ্যের সমান্তরাল প্রবাহ আসলে জীবন-সঙ্গীতের যুগলবন্দি। একে অবহেলা যদি করেন কোনো নারীচেতনাবাদী, তাহলে তোরিল মোই যেমন বলেন, নিজেরই অজ্ঞাতসারে পথভ্রষ্ট হয়ে ভেসে যেতে হবে 'Perilously close to the male critical hierarchy whose patriarchal values we oppose.'

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠে আসছে ইদানীং। সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়নের ফলে লিঙ্গনির্বিশেষে যাঁরা প্রান্তিকায়িত, তাঁদের সার্বিক মুক্তির লড়াইতে শামিল না হয়ে প্রকৃত নারীমুক্তি কি সম্ভব? অর্থাৎ নির্যাতিত পুরুষদের মধ্যে যাঁরা ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা পান না, তাঁদের কথা ভুলে গিয়ে, তসলিমা নাসরিনের মতো, নির্বিচারে সমস্ত বর্গের পুরুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা কি যুক্তিসঙ্গত? এখানে আমাদের মনে পড়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ হার্বার্ট মার্কুজের কথা। তিনি নারীচেতনাবাদকে ভবিষ্যতের শোষণহীন সমাজে পৌঁছানোর ছোট্ট একটি ধাপ বলে মনে করেছেন। নর্মান ও ব্রাউনের সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্কুজ লিখেছিলেন 'The roots of repression are and remain real roots, consequently their eradication remains a real and rational job. What is to be abolished is not the reality principle; not everything, but such particular things as business politics, exploitation, poverty!' (১৯৬৮ : ২৩৫) মার্কুজ যে-বাস্তবতার মধ্যে পীড়নের ছবি দেখেছেন, তা শোষকের প্রতাপেরই অভিব্যক্তি। অন্তেবাসী বর্গের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত হতমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে বাস্তবতার এই ধরনকে প্রত্যাখ্যান করার কথা বলেছেন মার্কুজ। কিন্তু এ বিষয়েও বিতর্কের অভাব নেই। ম্যাগি হুম (১৯৮৬ ১১) সাধারণভাবে সমস্ত পুরুষ সমালোচককে ভর্ৎসনা করেছেন, কেননা তাঁরা বিভ্রান্তিকর ও একদেশদর্শী ভাবে সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করে চলেছেন। ম্যাগি যদিও বামপন্থী সমালোচকদের তুলনামূলকভাবে প্রশংসা করেছেন, তবু মার্কুজের বক্তব্যেও তিনি খুঁজে পেয়েছেন পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাবৃত্তের প্রভাব। টেরি ঈগলটন যদিও নারীচেতনাবাদের সমর্থক, ম্যাগি তাঁর মধ্যেও লক্ষ করেছেন অনিবার্য অপূর্ণতা। কে. কে. রুথভেনকে তিনি তিরস্কার করেছেন কৃষ্ণাঙ্গ ও সমকামী নারীচেতনাবাদী ভাবনাকে গুরুত্ব না-দেওয়ার জন্যে। কেননা এতে, তাঁর মতে, নারীচেতনাবাদের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক মাত্রা লুপ্ত হয়ে যায়। ম্যাগির তত্ত্ববিশ্বে পুরুষ তাত্ত্বিকদের স্থান নেই বললেই চলে। এমনকি, তিনি প্রতিটি প্রচলিত বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন : 'Every critical handle, like author, is itself tainted and suspect. Every critic, male or female,is trained in the techniques of paternal criticism.' (তদেব ১২)

সুতরাং, ম্যাগির বক্তব্য, 'বন্ধুত্বপূর্ণ' পুরুষ সমালোচকেরাও তাঁদের অপরিহার্য লৈঙ্গিক অবস্থানের প্রভাবে প্রকৃত নারীচেতনার উন্মোচনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। নারীর প্রতিবেদনকে তাঁরা, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বিকৃত করে ফেলেন। আকরণবাদ বা মার্ক্সবাদের মতো তত্ত্বপ্রস্থানে নির্ভর না-করে নারীচেতনাবাদকে তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম হতে হবে। নারীকে পুরুষ পাঠকের চিরাগত কৃৎকৌশল এড়িয়ে যথার্থ নারী-অভিজ্ঞতার ভিত্তি ও কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত ম্যাগির বক্তব্য অনুযায়ী, সমর্থক বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্বিশেষে সমস্ত পুরুষই নারীচেতনাবাদের পক্ষে অপাঙ্‌ক্তেয়। কেন না, 'A male reading as a feminist is not a feminist critic because he carries with him the possibility of escape into masculinity and into patriarchy.' (তদেব ১৩)। পিতৃতন্ত্রের অমোঘ প্রতাপে তাঁর বিশ্বাস নিরঙ্কুশ বলে লৈঙ্গিকভাবে নির্ধারিত নারীসত্তার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে তিনি নারাজ। জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে ওঠে নারীর নিজস্ব পাঠ-প্রকরণ, এই তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি। তাঁর মতে, নারী আত্মনির্মিত নারীত্বের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে পাঠকৃতির মুখোমুখি হয়। তৃতীয়ত, সামাজিকভাবে নির্মিত নারী-অস্তিত্বের চেতনা নিয়েও সে পড়ে। ম্যাগি বলেছেন, 'We are different readers and therefore different critics, from men because our gendered reading is both essentially different and one produced by our agreeing to read 'difference' as a crucial paradigm of cultural construction. The extent of difference is therefore infinite.' (তদেব)। নারী ও পুরুষের পার্থক্য যখন অনন্ত, পরস্পরের সহযাত্রী হওয়ার অবকাশই নেই কোনো। তাহলে চেতনা-দর্শন- সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজ-ইতিহাস, এক কথায় সব কিছুকে, আড়াআড়ি ভাবে দ্বিখণ্ডিত করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না। ম্যাগি আহ্বান জানাচ্ছেন যাতে ঐ অনন্ত পার্থক্যের কথা মনে রেখে নারী সর্বতোভাবে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করে 'We debrief ourselves and step out of the contaminated spacesuits of women by established patriarchal aesthetics.' (তদেব)। পিতৃতান্ত্রিক নন্দনের কথা যেহেতু উত্থাপিত হল, পুরুষ-রচিত সমস্ত প্রতিবেদনের নারীচেতনাবাদী পুনঃপাঠ পুনর্বিশ্লেষণ, পুনঃপরীক্ষা করে সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রশ্নটিও এসে যায়। সমাজে আবহমান কাল ধরে নিপীড়িত হওয়ার ফলে নারীর যে-কণ্ঠস্বর অশ্রুত রয়ে গিয়েছিল, তাকে পুনরুদ্ধারের ব্রত নিতে চান ম্যাগি। শ্রুতি-সাহিত্য যেহেতু মূলত নারী-সংস্কৃতির অভিব্যক্তি, তার ওপরও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ পুরুষ উৎপাদিত সন্দর্ভের ভোক্তামাত্র হয়ে নারীর ভূমিকা শেষ হচ্ছে, এই চিরাচরিত অবস্থার বদলে নতুন বর্গের লিখিয়ে-পড়ুয়াদের মধ্য দিয়ে প্রতি-ঐতিহ্য গড়তে চেয়েছেন তিনি।

আট

ম্যাগি যদিও পুরুষের নির্বাসন চেয়েছেন, তাঁর মূল বক্তব্য যে আসলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে—একথা ভুললে চলবে না। নারীর স্বতন্ত্র পরিসর নারীকেই অর্জন করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোনো সচেতন পুরুষ নীরব পর্যবেক্ষক হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁকে নিতেই হবে সহযোগীর ভূমিকা। যেমন সমাজে, তেমনি সাহিত্যের পাঠ বিশ্লেষণে। ম্যাগি যা-ই বলুন, সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়েও কোনো পুরুষ যদি নারীচেতনাবাদকে সমর্থন করেন, সমাজে এবং সাহিত্য-পাঠে অনুকূল সুপবন বয়ে যেতে বাধ্য। কোলোড্‌নি যেমন বলেছিলেন, বৌদ্ধিক নিরপেক্ষতার (intellectual neutrality) ভড়ংকে আক্রমণ করে নারীচেতনাবাদ। সাহিত্যপাঠেরও নিজস্ব রাজনীতি

—দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রয়েছে; নিরপেক্ষ নয় কেউ। নির্দিষ্ট অবস্থান নিতেই হয় যখন প্রশ্নটা দাঁড়ায় পীড়ন নিয়ে, পীড়নের প্রতিরোধ নিয়ে। সমাজে ও পাঠকৃতিতে ধারাবাহিকভাবে নিষ্পেষিত নারীবর্গকে অপমান, করুণা ও তাচ্ছিল্য থেকে মর্যাদার উদ্ভাসনে উঠে আসতে দেখে আমাদের মনে যদি অনুকূল প্রতিক্রিয়া না জাগে, তাহলে নিজেকে নিজেই দাঁড় করিয়ে দিতে হবে কালান্তরের কাঠগড়ায়। সমস্ত পূর্বগঠিত ধারণাকে প্রশ্ন করে নারীচেতনাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, এই প্রশ্নময় উচ্চারণ তার অনন্যতারই প্রমাণ। যেহেতু পড়া আসলে সৃজনশীল ভাষ্য রচনার প্রক্রিয়া, নারীচেতনাবাদী পাঠ মানে পিতৃতন্ত্রের পরাক্রম পেরিয়ে গিয়ে নতুন জগৎ নির্মাণের বার্তা। সেইসঙ্গে নতুন বিশ্বাসের, নতুন দৃষ্টিকোণের, নতুন নন্দন-ভাবনার, নতুন কৃৎকৌশলেরও ঘোষণা। অপরতার দর্শন হিসেবে নারীচেতনাবাদ পাঠকৃতির মধ্যে নারীর নিজস্ব ঐতিহ্যকে যেভাবে আবিষ্কার করতে চাইছে, তাতে মনে হয়, শোয়াল্টের যেমন এই সন্ধানকে 'methodological choice rather than a belief' বলেছিলেন—তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। নারীর নিজস্ব পাঠও তো আসলে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট ভাষ্য। বিস্মৃতপ্রায় প্রতিবেদন পুনরাবিষ্কার এবং প্রতাপের ঔদ্ধত্য অগ্রাহ্য করে নারীচেতনাবাদ যে আশ্চর্য নতুন পাঠকৃতিতে পৌঁছাচ্ছে আজ, তাতে সহস্রাব্দ ব্যাপী নৈঃশব্দ্য ও সরবতার দ্বিমেরুবিষম অবস্থান বদলে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে পুরোনো ভাবাদর্শের প্রাচীরগুলি। সেইসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, একটি স্বরের মধ্যে জেগে উঠছে অজস্র অন্তঃস্বর; আর, সাম্প্রতিকের মধ্যে বিম্বিত হচ্ছে প্রবহমান অতীত। হেলেন সিক্সোর উচ্চারণ এ প্রসঙ্গে কাব্যিক মাত্রা পেয়ে গেছে যেন 'The Voice in each woman, moreover, is not only her own but springs from the deepest layers of her psyche her own speech becomes the echo of the primeval song she once heard, the voice of the incarnation of the first voice of the love which all women preserve alive.' (১৯৭৫ ২৭২)। তাঁর বক্তব্য, নারীর কথনবিশ্ব ও লিখনবিশ্ব যেন মহাকাশের গভীরতম পরিসরে গড়ে ওঠে; এই পরিসরের না আছে কোনো অভিধা, না আছে কোনো অন্বয়বিধি। জুলিয়া ক্রিস্তেভাও 'নারীর সময়' নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। তবে সিক্সোর উচ্চারণে যে কাব্যিক মূর্ছনা ও দার্শনিক নিবিড়তা রয়েছে, তা অন্য কারো মধ্যে দেখা যায় না।

নিজের সত্তায় প্রতিফলিত নারীচেতনার মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন মহাকালের নৃত্যচ্ছন্দ। বলেছেন একের মধ্যে বিম্বিত হয় বহু। নিজের অস্তিত্বের ছায়া খুঁজে পান মেডুসা, ইলেকট্রা, আন্তিগোনে, দিদো, ক্লিওপেট্রাতে। এইজন্যে নিজেকে তিনি বর্ণনা করেন 'feminine plural' (১৯৭৭ ৫৩) বলে। স্মৃতি ও বিস্মৃতির দ্বিবাচনিকতায় অহরহ পুনঃপাঠ করেন ঐতিহ্যাগত সমস্ত সন্দর্ভকে। তাই তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন, 'I am myself the earth, everything that happens on it, all the lives that live me there in my different forms ... I am everywhere, my cosmic belly, I work on my world-wide unconscious, I throw death out, it comes back, we begin again, I am pregnant with new beginnings.' (তদেব ৫২-৫৩)। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, সর্বগ্রাসী পিতৃতন্ত্রের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীচেতনা এমন সর্বাস্তিবাদী রূপ নিয়েছে। বারবার নতুন হয়ে ওঠে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুজিৎ নারীসত্তা; পুরুষতন্ত্র যেখানে সহস্র-মৃত্যুর বেসাতি নিয়ে আসে নারীর জন্যে, তার উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে যেন মহৎ প্রতিশোধ নেয় এভাবেই। তাই বারবার নতুন আরম্ভের সম্ভাবনা ভ্রূণের মতো আপন সত্তার গভীরে লালন করে নারীচেতনা।

এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্রতীপে হয়তো দেখা যেতে পারে জুলিয়া ক্রিস্তেভাকে, যিনি 'নারী'র সংজ্ঞা দিতেও অস্বীকার করেছেন। কারণ, পিতৃতন্ত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এ কাজ করে চতুর শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। নারীমুক্তির জন্যে যেখানে প্রচার, আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত, সেখানেও নারী কেবল নেতিবাচকভাবে উপস্থিত থাকে। সুতরাং ক্রিস্তেভা 'নারী' বলতে বোঝেন 'that which cannot be represented, that which is not spoken, that which remains outside naming and ideologies.' (১৯৭৪ ২১)। তাই প্রথাসিদ্ধভাবে নারীত্বের ধারণা তৈরি না করে তিনি কেন্দ্রীভূত প্রতাপের সাংগঠনিক অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রান্তিকায়ন, অন্তর্ঘাত ও বিরোধিতার তত্ত্বকে নারীর সমস্ত সম্ভাবনার আকর বলে মনে করেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদনে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থায় যারা নিষ্পেষিত, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই নারীকে সংঘর্ষ পরিচালনা করতে হবে—এই তাঁর মত। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতাপের প্রতিস্পর্ধী বুদ্ধিজীবী, কিছু কিছু আভাঁগার্দ লেখক এবং শ্রমিক শ্রেণীর সহযোদ্ধা হয়ে নারী দাঁড়াবে আধিপত্যবাদের উল্টো দিকে। ক্রিস্তেভা স্পষ্ট বলেছেন, 'It is the same struggle, and never the one without the other.' (তদেব ২৪)।

এইসব বক্তব্য সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক নিশ্চয় চলতে পারে। দেখা দিতে পারে নানা সংশয়, কটু প্রশ্ন। কিন্তু মূল কথাটি সর্বত্র অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে কেন্দ্রীভূত প্রতাপ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ সফল হতে পারে না কখনও যদি প্রান্তিকায়িত নারী তার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তাতে শামিল না হয়। সমস্ত নারী যেমন প্রকৃত নারীচেতনায় উদ্দীপিত হতে পারেনি আজও, তেমনই সমস্ত পুরুষও নয় পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি। সাহিত্যের প্রতিবেদন যখন পুনঃপাঠ করতে উদ্‌যোগী হই, প্রাথমিক এই কথাটি যেন মনে রাখি। উপনিবেশোত্তর তৃতীয় বিশ্বে সাধারণভাবে নারীচেতনার নতুন সমিধ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, বাঙালির সাহিত্য-ভাবনায় সেই সমিধের সন্দীপনী স্পর্শে জেগে উঠছে নতুন নন্দন রচনার আর্তি। প্রতীচ্যের ভাবনাকে একই মানব-বিশ্বের অধিবাসী হিসেবে গ্রহণ করেও বাংলা সাহিত্যে অভিব্যক্ত নারীচেতনা যে পার্থক্য ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিক বয়ন গড়ে তুলছে ক্রমশ, তা লক্ষ করে বাঙালি পাঠক তৈরি হচ্ছেন নতুন প্রতিশ্রুতিকে আবাহন জানাতে। এই প্রতিশ্রুতি উত্তরণের, বিভেদ ও পীড়ন থেকে মানব-বিশ্বের সমগ্রতায় উত্তীর্ণ হওয়ার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ

নতুন সহস্রাব্দ পেরিয়ে এলাম এক দশক আগে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গীয় শতাব্দী বরণ করতে গিয়ে আমাদের হুজুগপ্রিয় সমাজ যা ধুন্ধুমার কাণ্ড লাগিয়ে দিয়েছিল, তাতে সহস্রাব্দ বিদায় এবং বরণ নিয়ে যা হয়েছে, তা প্রত্যাশিতই। কিন্তু এই হুজুগের বাইরে আমাদের পাওয়া আর হারানোর হিসেবও কষছেন প্রাজ্ঞজনেরা, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষ নামক প্রাণী মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলছে কি? বিজ্ঞান আর যন্ত্রপ্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষ কি উত্তরোত্তর বাড়তে—থাকা অমানবিক আয়তনকে থামাতে পারছে নাকি উসকে দিচ্ছে কোনো এক মীমাংসার অতীত কূটাভাসের তাড়নায়? আর, আমরা যাকে মানবিকী বিদ্যা বলে বোঝাতে চাই, তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় শুধু গ্রন্থিলতা, শুধু জটিল চিন্তার ধূপছায়া। আমরা তর্ক করি কিন্তু সমাধানে পৌঁছাতে চাই না; আমরা সেই ক্ষ্যাপার মতো পরশপাথর খুঁজে মরি কিন্তু কিছুই বিশ্বাস করি না। নিজেরাই নিজেদের কাছে দূরীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত অপর। আমরা লিখি কিন্তু সেই লেখা কখনও নিবিষ্ট হয়ে পড়ি না। আমরা তাকিয়ে থাকি কিন্তু দেখি না কিছুই। সময়ের কথা বলি সমাজের কথা বলি, কিন্তু সেইসব কথা থেকে কোনো বার্তা উঠে আসে না, জাগে না কোনো উদ্‌ভাসন। জাগে না কারণ, শতাব্দী আসুক কিংবা সহস্রাব্দ, বর্ণবর্গলিঙ্গ বিভাজিত সমাজে চিরকাল যেখানে ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সেখানে আলো এখনও নিছক অবভাস। এই নিয়ম এখনও অনড় এবং পরেও অনড় থাকবে। এ সময়ের কাব্যিক উচ্চারণে এই পরিস্থিতির অমোঘতা ফুটে উঠেছে 'শতবর্ষ এগিয়ে আসে, শতবর্ষ যায়/চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়'!

তবু, অনড় অটল পরিস্থিতির দুঃসহতা মেনে নিয়েও আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা পুনঃপাঠ করার এখনই উপযুক্ত সময়। পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা এইজন্যে যে, পূর্ববর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতা সাধারণত মেলে না। তার মানে, উৎস-উপকরণ-অভিব্যক্তি দিয়ে গড়ে উঠছে যে সাংস্কৃতিক পাঠকৃতি—গ্রহীতা তাঁর ইতিহাস-লালিত চলিষ্ণুতায় অর্জিত দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ঐ পাঠকৃতি থেকে নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরি করে নেবেন। আর, প্রতিবেদনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে যেহেতু সত্য ও উপলব্ধির সংকেত—এক প্রজন্মের সত্যবোধ অন্য প্রজন্মের কাছে সত্যভ্রম বিবেচিত হতে পারে। আসলে হয়েও থাকে। তাই অভিজ্ঞতার নিরন্তর পুনঃপাঠ এত জরুরি। আমাদের সংস্কৃতি, সমাজ, ইতিহাস ও সাহিত্যকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে চাই বলে নানা ধরনের তত্ত্বেরও আশ্রয় নিই। আবার ঐসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বিবাচনিকতা অনিবার্য বলে পুনঃপাঠ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখাও আমাদের একটি বড় কৃত্য। এই প্রক্রিয়ার সার্থকতার জন্যেই বহুধাপরীক্ষিত নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছাতে হয় গ্রহীতাকে অর্থাৎ পাঠক-দর্শক-শ্রোতাকে। আমরা লক্ষ করি না শুধু, প্রতিবেদন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যোগও দিই। যে-পরিমাণে প্রতিবেদনকে বদলে নিই, সেই পরিমাণে আমরা নিজেরাও বদলে যাই। এই রূপান্তর কখনও ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয়; ইতিহাসের মহাসন্দর্ভে সংবেদনশীল পাঠক-গ্রহীতা নিজে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। তবু রূপান্তরিত ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনশীল প্রতিবেদন আর প্রাগুক্ত ঐ মহাসন্দর্ভের মধ্যে দ্বিবাচনিক সম্পর্কও বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়। অতএব নিয়তপরিশীলিত পুনঃপাঠ শতাব্দী সহস্রাব্দের চলমান মুহূর্তগুলিতে আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার পাঠকৃতিকে বিনির্মাণ করতে শেখায়। কেননা এই বিনির্মাণই তো সমস্ত মানবিক প্রতিবেদন পুনর্নির্মাণের আবশ্যিক প্রাক্‌শর্ত। বিনির্মাণ করব কেন? করব, কারণ, জ্ঞান ও প্রতাপের অতিকেন্দ্রিকতা আমাদের চিন্তার স্বাতন্ত্র্যকে দীর্ঘকাল রুদ্ধ রেখেছে। অলিন্দশূন্য বাতায়নশূন্য সুরক্ষিত বন্দীশালায় আমাদের মেধা ও হৃদয় শৃঙ্খলিত হওয়ায় আমরা যে আসলে আধিপত্যবাদী শক্তির পুতুলমাত্র, এই বোধের প্রকাশ ঘটেনি ঈপ্সিত মাত্রায়। 'ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও, না হয় ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও / যা খুশি তোমার'—কৃত্তিবাসী কবির এই উচ্চারণ যেন এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। পিছিয়ে-পড়া সমাজে উপনিবেশবাদ সবচেয়ে শক্ত শেকলটা পরিয়ে দেয়, কারণ মন যখন স্বেচ্ছাবন্দিত্ব মেনে নেয়—আধিপত্যবাদ নিরঙ্কুশভাবে তার জগন্নাথের রথকে চালিয়ে যেতে পারে সর্বস্তরে। উপনিবেশীকৃত মন কখনও আধিপত্যবাদী মহাসন্দর্ভকে প্রশ্ন করতে পারে না, বিকল্প কোনো প্রতিবেদন খোঁজার তো কথাই ওঠে না। জ্ঞান ও প্রতাপের ইতিহাস এবং রাজনীতি টিকে থাকে পরাভূত বর্গের এই বিকল্পহীনতার ওপর। ভাষা-চেতনা-সংস্কৃতি—এককথায় জীবনযাপনে, দখলদারি কায়েম করে তাদের ঠেলে দেয় অন্তেবাসীর অবহেলিত অবস্থানে! লোকায়ত সাংস্কৃতিক উপলব্ধি ঐ মহাসন্দর্ভে কিছুমাত্র স্বীকৃতি পায় না এবং উপনিবেশীকৃত মনও নিজের শেকড়কে নিজেই তাচ্ছিল্য করতে শেখে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকেরা একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো এত সহজে ভেঙে পড়ে না। উপনিবেশোত্তর সমাজেও সৃষ্টি ও মনন যেসব বুদ্ধিজীবীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাঁদের চিত্তবৃত্তি উপনিবেশীকৃত হলে অটুট থেকে যায় আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে তোলার অভ্যাস। চতুর ও সচেতন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এবং বহুবিভাজিত সমাজের অন্তর্বৃত দুর্বলতার সুযোগে যে কেন্দ্রীভূত মহাসন্দর্ভ অজস্র গুল্মমূল ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে পরাভূত না-করা পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর সমাজে কোনো যথার্থ নতুন সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা জীবনবোধের সূত্রপাত হতে পারে না। গড়ে উঠতে পারে না কোনো নতুন প্রতিবেদন। এইজন্যে বলেছি বিনির্মাণ এক জরুরি এবং আবশ্যিক আয়ুধ।

আবার, বিনির্মাণ যিনি করবেন, তাঁর অবস্থানের নির্দিষ্টতা বা অনির্দেশ্যতার ওপর নির্ভর করছে ঐ প্রক্রিয়ার সার্থকতা। পৃথিবী জুড়ে তত্ত্বের বিপুল বিস্ফোরণ চলেছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারণ সামাজিক ইতিহাসের পর্ব থেকে পর্বান্তরে বিপুল ভিন্নতা আর কল্পনাতীত গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এই ভিন্নতা ও গতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় আজকের সত্য কালকের সত্যভ্রমে পরিণত হচ্ছে কিংবা কাল যা ছিল মনোযোগের অতীত, আজ হয়তো সেইটি দেখা দিচ্ছে মধ্যমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয়। এই অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত হচ্ছে সৃষ্টি ও মননের নানা ক্ষেত্রে। কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, ঔপনিবেশিক মহাসন্দর্ভের প্রলম্বিত ছায়াকে চিনে নেওয়ার জন্যেই বিভিন্ন তত্ত্ব সাম্প্রতিক জিজ্ঞাসুদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হচ্ছে। মিখায়েল বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা ও অপরতার তত্ত্ব উপন্যাসের প্রতিবেদন বিশ্লেষণে যুগান্তর এনে দেয়নি কেবল, মানবিক সংস্কৃতির অন্যান্য দিগন্ত উদ্‌ভাসনেও তার কার্যকারিতা অসামান্য। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে লক্ষ করেছি, পাঠককেন্দ্রিক বিশ্লেষণ এবং পুনঃপাঠের সংবেদনশীলতা হ্যান্স রবার্ট হাউস, আইজের, স্ট্যানলি ফিশ, মিশেল রিফাটেরে, নর্মান হল্যাণ্ড প্রমুখ তাত্ত্বিকদের কল্যাণে আজ সর্বত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। লুকাচ-পরবর্তী পর্যায়ে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ-প্রকরণের উত্তরোত্তর দিগন্ত-বিস্তার থেকেও সাম্প্রতিক পাঠক দিগ্‌দর্শক সূত্র পেয়ে যাচ্ছেন। এই চিন্তাবিদদের মধ্যে রয়েছেন আলত্যুসের, গোল্ডম্যান, মাশেরে, অ্যাডোর্নো, বেঞ্জামিন, উইলিয়ামস্, জেমসন এবং ঈগলটন। আকরণবাদীদের মধ্যে সোস্যুর, বার্ত, লেভিস্ট্রোস, গ্রাইমাস, টোডোরভ, লোজ প্রমুখ কার্যত মানবিক চিন্তাপ্রকরণের ধাঁচই বদলে দিয়েছেন। আবার আকরণোত্তরবাদ নানা প্রবণতার মধ্যে ঐক্যসূত্র সন্ধান করে বহুস্বর সঙ্গতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, যেমন বার্ত, লাকাঁ, একো, দ্য ম্যান, ক্রিস্তেভা, দেরিদা এবং ফুকোর সম্মিলিত প্রভাব আজকের দিনে কোনো জিজ্ঞাসু পড়ুয়া অস্বীকার করতে পারবেন না। অবচেতন ও মনোবিকলন সম্পর্কে লাকাঁর অবদান কিংবা বার্ত ও একোর পাঠকৃতি বিশ্লেষণ বিষয়ে নতুন আলোকপাত অথবা দেরিদা, দ্য ম্যান ও ব্লুমের বিনির্মাণ সম্পর্কিত বক্তব্য আর সবার উপরে, ফুকোর প্রতাপ, যৌনতা, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অসামান্য ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদনতত্ত্ব সমালোচনার খোলনল্‌চে পাল্‌টে দিয়েছে।

অন্যদিকে নারীচেতনাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিপুল বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পুরোপুরি নতুন পাঠক্রিয়ার ধারণা। শোয়াল্‌টের, ক্রিস্তেভা, সিক্সো, ইরিগেরে প্রমুখ তাত্ত্বিকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারি, কীভাবে মানবিকী বিদ্যায় কোনো সীমান্তই স্বীকৃত নয় আর। নানা উৎস-জাত চিন্তা ও বিশ্বাস এবং বিশ্লেষণের আয়ুধ আত্মস্থ্ করে নারীচেতনাবাদ বিকল্প প্রতিবেদনের প্রস্তাবনা পেশ করেছে। এই প্রতিবেদন শুধু সাহিত্যের পাঠ ব্যাখ্যার জন্যে নয়; মানবিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক—বলা ভালো, মানুষের সামাজিক ইতিহাস এবং জীবনযাপনের তাৎপর্য ও ঔচিত্য সম্পর্কে—সাহসী ও প্রত্যয়িত পাঠান্তর উপস্থাপিত করছে নারীচেতনাবাদ। এছাড়া রয়েছে আধুনিকোত্তরবাদী ভাবনার দ্রুত প্রসারণশীল দিগন্ত। জাঁ বদ্রিলার, জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিওতার, আইহাব হাসান, ডিউয়ি ফকেমা, লিণ্ডা হ্যাচিয়ান, ফ্রেডরিক জেমসন এবং আরো অনেক চিন্তাবিদদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আধুনিকোত্তরবাদী বিশ্ববীক্ষার সমবায়ী প্রতিবেদন আজ পৃথিবীর সর্বত্র পঠিত ও পুনঃপঠিত হচ্ছে। এ সময়ের বিশেষ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রণিধানযোগ্য ভাবপ্রস্থান গড়ে উঠেছে উপনিবেশোত্তর পরিস্থিতির ব্যাপক ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে। তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের, সর্বাধিক আত্মদ্বন্দ্বমথিত জনগোষ্ঠী হিসেবে, বাঙালিসত্তা ঐ পরিস্থিতিকে কীভাবে মেনে নিচ্ছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবচেতনার পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার অভিব্যক্তি কতটা ধরে রাখছে—এই পর্যালোচনা নিঃসন্দেহে কৌতূহলজনক। এখানে আপাতত বলা যাক, আকরণোত্তরবাদী ভাবনার প্রায়-বৈপ্লবিক প্রভাবে ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনের ইতিহাস-নিবিষ্ট ভূমিকা পঠিত ও পুনঃপঠিত হচ্ছে মোটামুটিভাবে ষাটের দশক থেকে। এই ভাবপ্রস্থানকে 'উপনিবেশোত্তরবাদী সমালোচনা' বলতে চেয়েছেন বিদ্বজ্জনেরা। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক অবচেতনায় লালিত এ ধরনের প্রতিবেদনে বীক্ষণ-বিন্দু গড়ে ওঠে নিম্নবর্গীয় অন্তেবাসী জনের অবস্থানকে প্রাথমিকতা দিয়ে। আধিপত্যবাদীদের মৌরসিপাট্টা ভেঙে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র যে বিকল্প চেতনার আবাহন চলেছে, তার চরিত্র অবশ্যই রাজনৈতিক। শেকল ভাঙার এই আবেগ থেকে জন্ম নিচ্ছে সার্বিক বিকেন্দ্রায়ন এবং প্রাকৃতায়নের প্রেরণা। জ্ঞান ও প্রতাপের যুগ্ম আক্রমণ প্রতিহত করার তাগিদে তত্ত্ববিশ্বকেও সংশয়ের চোখে দেখা অবশ্যম্ভাবী; আবার মানব-বিশ্বের অবিভাজ্যতার জন্যে তত্ত্বকে এড়িয়ে চলাও অসম্ভব। সুতরাং যা ঘটে, তাকে বলা যেতে পারে, পরীক্ষা ও পুনর্গঠনের দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ উপনিবেশোত্তরবাদী চিন্তাপ্রস্থানের আদলটিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দুই

এই দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল কাঁধে নিয়ে চলেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতাই নয়, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াও উপনিবেশবাদের ছায়ায় আবিল। এমনকি বাহ্যত যখন ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ঘটে, তারপরে আরও দীর্ঘদিন ধরে মননে-বীক্ষণে-প্রকাশ মাধ্যমে উপনিবেশগ্রস্ত মনের অষ্টাবক্রদশা প্রকট থাকে। বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে দুটি ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ, সর্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক মন্দা এবং পুঁজিবাদের রূপবদল ঘটেছে। প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন গণ আন্দোলনের মোকাবিলা করতে না-পেরে পিছু হটেছে। এই শতকের দুই-তৃতীয়াংশকাল পেরোতে-না-পেরোতে, এশিয়ায়, আফ্রিকায় উপনিবেশের নিগড় খুলে ফেলেছে বেশ কিছু পিছিয়ে-পড়া দেশ। যতদিন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপস্থিতি বিশ্বপুঁজিবাদের মোকাবিলা করতে পেরেছে, ততদিন দেশে দেশে প্রতিবাদের উত্তাপ ও লক্ষ্য অবিচল ছিল। তথাকথিত হিমযুদ্ধ সত্ত্বেও উপনিবেশোত্তর ভাবনা ধীরে ধীরে মুকুলিত হতে পেরেছে। আবার এই সময়পর্বেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উৎকর্ষকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে নব্য উপনিবেশবাদ একদিকে সুচতুরভাবে অন্তর্ঘাত করেছে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয়, অন্যদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির নবীন প্রজন্মের চেতনায় নিপুণভাবে আঁটোসাটো ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও গ্যাট চুক্তির পরবর্তী দুনিয়ায় স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে নব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশবাদের আক্রমণ নিরঙ্কুশ হয়ে পড়েছে। দখলদারদের প্রসার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অধিসংগঠনে আবদ্ধ নেই, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক উপরিকাঠামোয় ঔপনিবেশিক শক্তির শ্যেনচক্ষু কেন্দ্রীভূত।

সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বে চেতনাকে পাথর করে দেওয়ার জন্যে প্রতিটি গণমাধ্যম এখন যন্ত্রগণকের দক্ষতায় নিয়োজিত। আমাদের এই ভারতবর্ষে গত কয়েক বছরে প্রতিটি গণমাধ্যম কার্যত প্রভুশক্তির স্বেচ্ছাবৃত দাসে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। নব্য উপনিবেশবাদ উপগ্রহ-প্রযুক্তিকে কব্জা করে নিয়ে মহাকাশে তাদের যে-জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তার ফলে অজ-পাড়াগাঁ থেকে মহানাগরিক জীবন পর্যন্ত বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলি তাদের মোহিনী মায়ায় গেঁথে নিয়েছে। সদর ও অন্দর এখন একাকার, পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে ভালো ও মন্দের বোধ অপসারিত এবং সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি মেধাগ্রাসী অনুভূতিগ্রাসী উন্মত্ততা। শেক্সপীয়রের ভাষাকে মনে রেখে বলা যেতে পারে, এই উন্মত্ততারও নিজস্ব যুক্তি-শৃঙ্খলা রয়েছে। দেশি-বিদেশি দূরদর্শন চ্যানেলের পরে চ্যানেল খুলে দিচ্ছে, ইথার তরঙ্গে এখন কেবল সস্তা মজা ও মাদকের আয়োজন। সমস্ত ধরনের প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গকে সূচনাতেই নিভিয়ে দেওয়ার জন্যে নব্য উপনিবেশবাদ তৈরি করেছে অজস্র ভুলভুলাইয়া। সমস্তই পণ্যসর্বস্ব, বাজারের বিক্রয়যোগ্যতা দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে সব মূল্যমান। গন্তব্যহীন যাত্রায় প্ররোচিত করার জন্যে নব্য উপনিবেশবাদ এভাবে নিরন্ধ্র ও অবক্ষয়ক্লিষ্ট আধুনিকোত্তর সমাজকে ব্যতিক্রমহীন একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

তবুও অন্ধকারের উৎস-হতে উৎসারিত আলোর মতো ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিস্পর্ধী উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জেগে ওঠে, জেগে থাকেও। উপনিবেশীকৃত মনে জগৎ ও জীবন, সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর, সাফল্য ও ব্যর্থতা সমস্ত বিকৃত হয় না কেবল, তাদের ভেদও লুপ্ত হয়ে যায়। সময় ও পরিসর হয়ে পড়ে বিমূর্তায়িত, ফলে তাদের কোনো চিহ্নায়কও ঔপনিবেশিক সন্দর্ভে প্রাসঙ্গিক থাকে না আর। এইজন্যে উপনিবেশোত্তর চেতনা সবচেয়ে বড়ো দায় বলে গ্রহণ করে যে-কর্তব্যকে, তাকে বলা যেতে পারে যাবতীয় ছদ্মবেশের উন্মোচন এবং অলীক বাস্তবতার বিনির্মাণ। অবশ্য বিনির্মাণে শেষ হয়ে যায় না তার আর্তি, নবীন পুনর্নির্মাণের আয়োজনও করে যেতে হয়। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত বিকল্প বাস্তব বিকল্প সন্দর্ভ বিকল্প মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে না পারছে, ততক্ষণ নব্য উপনিবেশবাদের গোপন ও প্রকাশ্য সন্ত্রাস থেকে নিস্তার পাওয়ার সুযোগ নেই কোনো। কীভাবে উপনিবেশোত্তর চেতনা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য শেকল ভেঙে ফেলছে, তারই প্রতিবেদন সামাজিক ও নান্দনিক ইতিহাসে গড়ে উঠছে অহরহ। এই ইতিহাসকে দেখার জন্যেও চাই 'দ্রষ্টা চোখ', প্রতিবাদী মূল্যবোধ ছাড়া ঐ চোখ কার্যকরী হয় না। সাহিত্যে-সঙ্গীতে-ছবিতে-ভাস্কর্যে নতুন দৃষ্টির উদ্ভাসন হয়ে চলেছে; উপনিবেশের করাল গ্রাসে নিঃসাড় হয়ে-যাওয়া মনের খোলনলচে পাল্‌টে দিয়ে জেগে উঠছে নতুন অঙ্কুর। এতদিন যেসব কণ্ঠস্বর নিরুদ্ধ ছিল, প্রান্তিকায়িত সেইসব বর্গের উপস্থিতি স্বীকৃত হচ্ছে উপনিবেশোত্তর চেতনা-ঋদ্ধ প্রতিবেদনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশেষভাবে সাহিত্যে এই মৌলিক বিবর্তন চিহ্নায়িত হচ্ছে বলে বিকল্প মূল্যবোধ ও তার অভিব্যক্তির তাৎপর্যকে ঐ চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার নিরিখে বিশ্লেষণ করতে পারি। স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে, কাকে বলব উপনিবেশোত্তর সাহিত্য?

ব্রিটিশ-ফরাসি-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-স্পেনীয় রাষ্ট্রশক্তি এশিয়ায়, আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায় যে-সমস্ত দেশকে দীর্ঘদিন পীড়ন করে গেছে—প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলা সেখানকার সমস্ত সত্য ও অভিব্যক্তিকে গ্রাস করেছিল। তবু পাথর-ফুঁড়ে ঝরনাধারা বেরোবার মতো সেখানেও অনুচ্চার পরিসর থেকে জেগে ওঠে তিমিরবিনাশী আলোর রেখা। 'উপনিবেশোত্তর' শব্দটির মানে যদিও উপনিবেশবাদী শাসন অবসান হওয়ার পরবর্তী পর্যায়, যান্ত্রিকভাবে নবীন চেতনা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় না। বরং উপনিবেশবাদ যখন শাসিতের সমাজে দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যায়, দ্বিবাচনিক পদ্ধতিতে ঠিক সেই বিন্দুতে শুরু হয়ে যায় প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষপর্ব। অর্থাৎ উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জ্যামিতিক নিয়মে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এর চমৎকার প্রমাণ রয়েছে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। তাহলে, ঔপনিবেশিক শাসনের পর্যায়েও আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিবেদনে অন্তর্ঘাত করার আগ্রহ জন্ম নিতে পারে। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসায় কখনও অর্ধস্ফুট কখনও অস্ফুটভাবে সক্রিয় থেকেছে প্রতিসন্দর্ভ তৈরির অধ্যবসায়, বলা ভালো, স্বপ্ন। হয়তো ঐতিহাসিক কারণে স্বপ্ন আবছা রয়ে গেছে, তবু আধিপত্যবাদী প্রতাপের অজস্র কৃৎকৌশল সত্ত্বেও অন্তেবাসী বর্গের প্রতি উদাসীন সন্দর্ভের বয়নে অন্তর্বয়ন হিসেবে উপস্থিত ছিল বিনির্মাণের আর্তি। এতে সন্দেহ নেই যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরে উপনিবেশোত্তর পর্যায় স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর হয়েছে : কিন্তু তখনও ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের মূল প্রবণতাগুলি পুরোপুরি মুছে যায়নি। নতুন চেহারায় নতুন আঙ্গিকে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ ভেক পাল্‌টে নিয়েছে। ধীরে ধীরে উপনিবেশোত্তর পর্যায়ে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিরুচ্চারবর্গ বুঝতে পেরেছে, শাসকের শরীরের রং বদলে গেলেও পীড়নের কোনো হেরফের হয়নি। বরং জটিলতর হয়েছে তার আগ্রাসন।

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আদলটিকে বুঝতে চাই যদি, আধুনিকতা নামক প্রতীচ্যায়িত আকল্পটিও সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে আরও। উনিশ শতকে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করে এদেশে ঔপনিবেশিক শাসকের চাতুর্যে এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সহযোগিতায় আধুনিকতার যে-বিশেষ আদলটি গড়ে উঠেছিল, স্থিতাবস্থার পোষকতা করাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার দর্শনকে ভিত্তি করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নন্দনকে তা জন্মসূত্রে পঙ্গু করে দিয়েছে। যত দিন গেছে, প্রতীচ্যের সংস্পর্শে স্তরে-স্তরে পলিমাটি অনেক জমে উঠেছে; ফসলও গোলায় উঠেছে অনেক। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে নামমাত্র। বরং নিজস্ব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর ঐ বিচ্ছিন্নতার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টায় মুখোশের ওপরে চেপে বসেছে আরো অনেক রঙিন মুখোশ। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে-ফসলের কথা এইমাত্র লিখেছি, তা জনমানসকে যত না পুষ্টি দিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি বিভ্রান্ত করেছে। স্ববিরোধিতা আর আত্মঘাত দিয়ে গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতিবেদন; প্রতিমূল্যবোধ ও প্রতিবাস্তবতার চাষ হয়েছে সর্বত্র। সত্যভ্রম ঢেকে দিয়েছে সত্যকে। বিশেতে বাঙালি সমাজে উপনিবেশবাদ-স্পৃষ্ট বৌদ্ধিকতার আড়ম্বরের আড়ালে পড়ে গেছে জীবনপ্রবাহ। স্বাধীনতা এসেছে ভাঙনের পথ ধরে ফলে ভুল স্বপ্নে প্ররোচিত হয়ে পথিক হারিয়ে ফেলেছে তার গন্তব্য এবং পথ। আধুনিকতা আধিপত্যবাদীদের আয়ুধে পরিণত হওয়ার ফলে বাইরে যদিও উপনিবেশের অবসান হয়েছে, শৃঙ্খলিত মননে মুক্তির জন্যে কোনো সত্য আগ্রহ জাগেনি। একদিকে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এবং অন্যদিকে অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রা সমস্ত কিছুই ক্রমশ নব্যউপনিবেশবাদের চোরাবালিকে প্রশস্ততর করেছে। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী দুটি দশকে বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করি পুরোনো প্রতিবেদনের বিস্তার এবং তার প্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যহীন উদ্যমে নানা বিচিত্র বিভঙ্গ। বিকল্প মূল্যবোধ যে বিকল্প গ্রন্থনা এবং বিকল্প নন্দন ছাড়া হতে পারে না, সে-সম্পর্কে কিছু কিছু একদেশদর্শী প্রস্তাবনা মাত্র হয়েছে; কোনো মৌলিক সন্ধান শুরু হয়নি। হয়নি, কারণ সন্ধান যাঁরা করবেন, তাঁরা নৈরাজ্যকে মনে করেছেন প্রতিবাদ; প্রতিনন্দন ও প্রতিভাবাদর্শের চক্রব্যূহে অভিমন্যু হওয়াকে মনে করেছেন আধুনিকতার চরম অভিব্যক্তি। অথচ উপনিবেশোত্তর পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ ও আত্মস্থ করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সূত্র আহরণের কথা কেউ ভাবেননি। ষাটের শেষে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের আবর্ত তৈরি হচ্ছিল। প্রতিবেদনের, সত্যের, তত্ত্বের, সমাজসংবিদের গোটা আদল ভেঙে যাচ্ছিল যেন। আশ্চর্য এই সমাপতন যে, বাঙালির ভুবনেও ঠিক তখনই দেখা দিয়েছিল বিদ্রোহের, প্রত্যাখ্যানের আবেগ। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে তার একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি তো ছিলই; নান্দনিক স্তরেও ঐ সময় আসলে জলবিভাজন রেখা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, একথা আজ আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছি। ফ্রান্সে ছাত্র-আন্দোলন যদিও খুব বড়ো ধরনের সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসেনি শেষ পর্যন্ত, কিন্তু ১৯৬৮ সাল ভাবজগতে, তত্ত্ববিশ্বে বিপুল অভিঘাতের সূচনা করেছিল। তাতে আকরণবাদ থেকে আকরণোত্তরবাদ, চিহ্নবিজ্ঞান, বিনির্মাণবাদ প্রভৃতি বহুমুখী চিন্তাধারার উৎপত্তি হল—শুধুমাত্র এইটুকু বলা যথেষ্ট নয়। আসলে তখন সমস্ত ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রবণতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার সাধারণ বৈশিষ্ট্য মানবিক মননের চালিকাশক্তি হয়ে উঠছিল—এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপনিবেশোত্তর চেতনাও এই পর্যায়ে ক্রমশ পরিণততর অভিব্যক্তি অর্জন করে নিচ্ছিল—তথ্য হিসেবে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও প্রকরণকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যাহ্বান জানিয়ে সমস্ত ধরনের পূর্বধার্য বর্গায়তনকে চূর্ণ না-করা পর্যন্ত কোনো বিকল্প মূল্যবোধের জন্ম হতে পারে না—এই হল তার মৌল বক্তব্য। সুতরাং উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রত্ন-উপনিবেশোত্তর চেতনার প্রাথমিক উন্মেষ ঘটলেও অর্থাৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের আদল দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও পরবর্তী পর্যায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঔপনিবেশিক বৌদ্ধিকতার চাপে প্রতীচ্যায়িত আকরণ ও অন্তর্বস্তু সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। যেহেতু প্রতিটি তাৎপর্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়, দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অমোঘ প্রভাবে ঐ প্রক্রিয়া ছিল প্রান্তিকায়িত হয়ে। একদিকে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তীব্র হয়ে-ওঠা গণসংগ্রাম এবং অন্যদিকে অধিসংগঠনে অজস্র পিছুটান ও আত্মদ্বন্দ্ব মথিত অভিব্যক্তি এই নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদন। তার সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত ছিল অন্য আর এক বিপ্রতীপতা প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও প্রাগাধুনিক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মীমাংসাহীন দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পাততাড়ি গোটানোর পরে ঐ বিপ্রতীপতা কিন্তু শেষ হল না; বরং নতুন জটিলতা ও কৌণিকতা নিয়ে দেখা দিল। সত্তর ও আশির দশকে প্রাতিষ্ঠানিকতার জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে ফেলে নবীন প্রাণের জলঝরনার ধ্বনি আবিষ্কারের যে-চেষ্টা শুরু হল, তাতে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেরণাই ছিল প্রধান।

তিন

উপনিবেশবাদের কাছে জ্ঞানও পীড়নের হাতিয়ার। পৌর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে প্রতাপ যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত, তাদের স্বার্থের পোষকতা করার জন্যেই জ্ঞান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যাখ্যাত ও দূরীকৃত অপরের কাছে যেমন সেই জ্ঞানের আলো পৌঁছায় না কখনও, তেমনই আধার ও আধেয়তে অপর অস্তিত্বের কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। তাই জ্ঞানের কেন্দ্রীকৃত প্রতাপের উপযোগী প্রতিবেদনে অন্তর্ঘাত না-করে এমন কোনো বিকল্প প্রতিসন্দর্ভ জেগে উঠতে পারে না যা অনালোকিত ও স্থবির পরিসরে আলো ও গতির বার্তা নিয়ে আসতে পারে। তাই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাধান্যপ্রবণ প্রতিবেদনকে ক্রমাগত অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে সমস্ত ধরনের আরোপিত বিধিবিন্যাসকে বিনির্মাণ করার মধ্যে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের প্রাথমিক সূচনা ঘটে। শিল্পে ও সাহিত্যে একই সঙ্গে সামাজিক ও নান্দনিক প্রক্রিয়ায় উপনিবেশবাদী আকরণকে চূর্ণ না-করে কোনো নতুন সূচনার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আমাদের বাস্তবতায় রয়েছে অজস্র স্তর এবং তাদের কোষে কোষে বহুদিনের অভ্যাসে সংক্রামিত হয়ে গেছে ঔপনিবেশিক গ্লানি ও অবসাদ তাই আধিপত্যবাদী প্রকরণ ও অন্তর্বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাস্তবতাকে অর্থাৎ সোচ্চার অভিব্যক্তিকে অপরতাশূন্য ছদ্ম-বাস্তব হিসেবে আগে বুঝে নিতে হবে। একে ছদ্ম-বাস্তব বলছি কেননা তা প্রতাপের যুক্তি-শৃঙ্খলা অনুযায়ী সুবিধাভোগী বর্গের জন্যেই নির্মিত এবং তাতে অনুচ্চার ও চির অনুপস্থিত অন্তেবাসী বর্গের কোনো ভূমিকা নেই। যদিও সত্যের ভান করে ঐ বাস্তব, তা আসলে সত্যভ্রম এবং বহু ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা। উপনিবেশোত্তর চেতনা সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে মুখোশ থেকে মুখকে এবং সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী এবং বিনির্মাণপন্থী। জীবনে-সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে-সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরনের আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে, তাদের বিপ্রতীপে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে নৈঃশব্দ্যের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করে তোলা এর প্রধান লক্ষ্য। তাই একই সঙ্গে প্রচলিত ধারণাগুলির বিনির্মাণ ও পুনঃপাঠ করার উপযোগী কৃৎকৌশল আবিষ্কার করাও তার কৃত্য। এই সূত্রে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ মূলত বহুমুখী প্রতিসন্দর্ভ তৈরি করতে চায় যাতে চিরউপেক্ষিত ব্রাত্যজন এবং নারীর নিরুচ্চার উপস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক প্রতাপ লালিত মহাসন্দর্ভকে অস্বীকার বা বিনির্মাণ করার মধ্যে তাই ফুটে ওঠে প্রতিবাদের ও বিদ্রোহের রাজনীতি। নিষ্পেষিত বর্গ এভাবে নিজের অনুপস্থিতিকে প্রমাণ করতে চায় যে-পাঠকৃতি অনুপস্থিত ছিল এতদিন, সম্ভাবনার পরিসর থেকে তার আদল ক্রমশ জেগে ওঠে। গায়ত্রী স্পিভক যাকে 'Planned epistemic violence of the imperialist project' (১৯৮৫ ১৩১) বলেছেন, সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ত্রাসের সার্বিক বিরোধিতায় উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ শানিত হয়ে ওঠে। এই সন্ত্রাসের ফলশ্রুতিতে প্রতাপমত্তেরা যা দেখায়, যা বোঝায়, যা জানায়—ততটুকু দেখা-বোঝা-জানা উপনিবেশীকৃত মনের সম্বল। আগেই লিখেছি, সত্য-মিথ্যা যোগান-নিয়ন্ত্রণ-উৎপাদন করে ঔপনিবেশিক শক্তি এবং শাসিত বর্গকে তা নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। এডোয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই 'Orientalism'-এ খুব জরুরি কিছু কথা বলেছেন যাতে প্রাগুক্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ত্রাসের কূটকৌশল ও সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি মননে তথাকথিত প্রাচ্যতত্ত্ব কীভাবে একান্তিক প্রতিবেদনের মৌল আলম্বন হয়ে উঠেছিল, এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আজও অপেক্ষিত রয়ে গেছে। নিম্নবর্গীয় চেতনা ও নারীচেতনা এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও পর্বান্তর ব্যাখ্যাকে একটি জরুরি কৃত্য হিসেবে ইদানীং গ্রহণ করা হচ্ছে তাই। গায়ত্রী স্পিভক ও পার্থ চ্যাটার্জীর কিছু কিছু নিবন্ধ এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বিবেচিত হতে পারে।

প্রাচ্যতত্ত্ব কীভাবে ঔপনিবেশিক আকল্পকে পুষ্ট ও সমর্থন করেছে, এ বিষয়ে আমরা এখনও যে অবহিত নই, তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসে। ইতিহাসের ভ্রান্ত প্রতিবেদনকে যতক্ষণ বিনির্মাণ না করতে পারছি, ঐতিহ্যের কল্পপ্রতিমা প্রকৃত বাস্তবকে আড়াল করে রাখবে। অতীত আর ঐতিহ্য যে সমার্থক নয়, প্রাচ্যতত্ত্বের ভুল প্রেরণা আমাদের সেকথা ভুলিয়ে দিয়েছে। ফলে একদিকে মহিমান্বিত অতীত আর অন্যদিকে বেপথুমান বর্তমান এমন কিছু মিথ্যা ভাবকেন্দ্র গড়ে তুলেছে যার দ্যুতিতে সুবিধাভোগী বর্গ খানিকটা উদ্‌ভাসিত হলেও অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজনদের জন্যে তা বিবরের আঁধারকে নিশ্ছিদ্র করেছে আরও। বিনির্মিত ইতিহাস থেকে নতুন প্রতিবেদন গড়ে তোলার দায় ইদানীং বহন করছেন কেউ কেউ। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করতে পারে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ। উপনিবেশবাদ সচতুরভাবে নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছিল;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচ্যতত্ত্ব ছিল তার বিশেষ কার্যকরী আয়ুধ। ঐ জগৎ যে আসলে অপজগৎ তা ঘোষণা করার প্রয়োজন এইজন্যেই ফুরিয়ে যায়নি এখনও। নব্য উপনিবেশবাদী আধুনিকোত্তর পর্যায়ে, মূলত ঐ অপজগতের দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়ায়, পরিক্রমা অব্যাহত রয়েছে ছিন্নমূল বুদ্ধিজীবীদের। ঔপনিবেশিক আমলে প্রতাপের কৃৎকৌশল যেমন ছিল, খানিকটা ভেক পালটে নিলেও আজকের বৌদ্ধিক ও নান্দনিক প্রতিবেদনেও অদ্ভুত ভাবে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে ধূসর পাণ্ডুলিপি। এইজন্যে উপনিবেশোত্তর চেতনা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে এতদিনকার দূরীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত অপর সত্তাদের পরিসরে। আবার সেইসঙ্গে পুনঃপাঠ করছে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভকেও যাতে অবদমিত উচ্চারণের বিকল্প পাঠকৃতিকে প্রান্তিকায়িত অবস্থান থেকে ফিরিয়ে আনা যায় মনোযোগের কেন্দ্রে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'কে এভাবে পুনঃপাঠ করি যদি, দেখব, বর্গলিঙ্গবিভাজিত ঔপনিবেশিক সমাজের প্রতিবেদনেও সুপরিকল্পিতভাবে অন্তর্ঘাত করতে পারেন সুবেদী লেখক। শোষক ও শোষিত, সোচ্চার ও নিরুচ্চার অবস্থানের মধ্যে তখন পারস্পরিক ঠাঁইবদল হয়ে যায়; পাঠক লক্ষ করেন তাতে 'anticolonialist representation of antagonistic forces locked in struggle, with a configuration of discursive transactions.' (১৯৯৫ ৪২)। 'কঙ্কাবতী'র পুনঃপাঠ থেকে আমরা যেমন প্রতিসন্দর্ভের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হই, একইভাবে কিছু কিছু বাছাই-করা পাঠকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা প্রাগুক্ত 'তির্যক বিনিময়'-এর দৃষ্টান্ত পেতে পারি আরও। ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে প্রাথমিক বোঝাপড়ার দিনগুলিতে প্রতীচ্যাগত উজ্জ্বল বিভায় অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও প্রাকৃতায়নের প্রতিসন্দর্ভও যে অন্তরালে নিজেকে গড়ে নিচ্ছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করাটা খুব জরুরি; নইলে একান্তিক ও কেন্দ্রীভূত প্রতিবেদনের আস্ফালনে সত্যের দ্বিবাচনিক চরিত্র ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাংলার প্রতীচ্যায়িত বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক আখ্যানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সূত্রধার। তাঁদের বীক্ষণ মূলত প্রাতিষ্ঠানিক; সমস্ত ধরনের দ্বিবাচনিকতাকে অস্বীকার করে যদিও তাঁরা সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন—আজকের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হয়, ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করলেও তাঁরা পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র লোহার বাসর গড়তে পারেননি। ইতিহাসের ভেতরে যেহেতু সঞ্চিত থাকে অন্তর্ঘাতের বারুদ, ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের চেতনাতেও প্রচ্ছন্ন ছিল আত্মবিনির্মাণের সম্ভাবনা। নিজেরা সচেতনভাবে যে সোচ্চার স্বরন্যাসের বৃত্তান্ত রচনা করেছেন, অবচেতনভাবে আবার তারই প্রতিস্পর্ধী নিরুচ্চার আয়তনকে লালন করে গেছেন। স্ববিরোধিতা ও আত্মদ্বন্দ্ব আসলে সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক সংঘর্ষের বীজ ধারণ করেছে। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ দিয়ে আমাদের সেই ঈষৎ-আলোকিত অতীত পরিসরকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। এখানে এবিষয়ে বিস্তারিত লেখার সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এইটুকু বলা যায় যে, এই পর্বে একদিকে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং অন্যদিকে সতীনাথ ভাদুড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা। ঔপনিবেশিক প্রতাপ আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসাকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্তা ও অপরতার বহুমুখী দ্বিবাচনিকতাকে পুনঃপাঠ করে আমরা নিজেদের বৌদ্ধিক ইতিহাস পুনর্বিন্যস্ত করতে পারি। উপনিবেশীকৃত সমাজের শেকড়ে জলের ঘ্রাণ পৌঁছায় না; বিপিনচন্দ্র পাল যাদের বলেছেন—বারান্দার টবে ঝুলিয়ে-রাখা ব্যক্তিত্ব, তাদের কাছে ভূমিও নেই আকাশও নেই। তাদের তৈরি সন্দর্ভকে আধিপত্যবাদী বর্গ যদিও নিজেদের স্বার্থে প্রাধান্য দিয়েছে, প্রকৃত ভূমিসংলগ্ন বাস্তবতায় যে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ গোকুলে বেড়ে উঠেছে—সেদিকে মনোযোগী হতে পারি আজ। এই সূত্রে নিম্নবর্গীয় ও নারীচেতনাবাদী পাঠ উপস্থাপিত করে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারি আধিপত্য-বিরোধী সামাজিক ও নান্দনিক প্রতিসন্দর্ভকে। এই প্রতিসন্দর্ভ, বলা বাহুল্য, সব ধরনের শৃঙ্খলবিরোধীও। বিখ্যাত তাত্ত্বিক হোমি ভাবার মতে এই উপনিবেশবাদ-প্রতিস্পর্ধী বিকল্প সন্দর্ভ 'requires an alternative set of questions, techniques and strategies in order to construct it.' (১৯৮৩ ১৯৮)।

যতদিন প্রতাপ থাকবে ততদিন থাকবে বিদ্রোহ আর সংঘর্ষ। মূর্ত ও বিমূর্ত—দু'দিক দিয়ে প্রতাপ প্রবল ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ঢেকে দিতে চায় মাটি ও আকাশ, শুষে নিতে চায় আলো ও হাওয়া। তবু সমস্ত আধিপত্য-প্রবণতাকে চূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে নিপীড়িত ও প্রান্তিকায়িতা জনের মধ্যে; সামাজিক সম্পর্কের নামে যে পীড়নের আকরণ এবং প্রতিভাবাদর্শের বিচ্ছুরণ সর্বত্র প্রকট—তাকে প্রত্যাহ্বান জানানোর জন্যে প্রস্তুত হয় উপনিবেশোত্তর চেতনা। বস্তুত পীড়ন যত তীব্র হয়, তত ব্যগ্র হয়ে ওঠে প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষাও। নইলে বিমানবায়নের উৎকট আয়োজনে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত মানবিক উত্তাপ ও নবনির্মাণের স্থাপত্য। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে পুঁজিতন্ত্র ক্রমশ আক্রমণের শৈলী পাল্‌টে নিয়েছে। ধীরে ধীরে অবক্ষয়ী আধুনিকতা রূপান্তরিত হয়েছে আধুনিকোত্তরবাদে। যন্ত্রপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উৎকর্ষের পর্যায়ে পণ্যায়নের প্রক্রিয়াও আমূল বদলে গেছে। বিশ্বায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি-সাহিত্য জুড়ে নেমে এসেছে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা। একদিকে মহাকাশে উপগ্রহের জাল বিছিয়েছে বিশ্বায়নের মুরুব্বিরা, অন্যদিকে গ্যাট-ডাঙ্কেলের ফাঁদ পেতেছে ওরা। দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে উপনিবেশোত্তর সমাজগুলির ঘর গোছানোর কাজ ভুলে গিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রলয়ঙ্কর বন্যায় যেমন মুছে যায় মাঠ-ঘাট-নদী-পুকুরের স্বাতন্ত্র্য, তেমনি একুশ শতকে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার হুংকারে সমস্ত প্রাকৃতায়নের প্রেরণা ও প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হতে বসেছে। যেমন একটিমাত্র প্রতাপস্পর্ধিত মহাসন্দর্ভের কাছে অবান্তর হয়ে পড়েছে সমস্ত লঘু ঐতিহ্য ও বিকল্প সম্ভাবনার বয়ন। মানুষের ইতিহাসের ভয়ঙ্কর এই সন্ধিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে স্বভাবত উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধকেও হতে হচ্ছে আরো দৃঢ়মূল, প্রত্যয়দীপ্তি ও যুক্তিশানিত। শুধুমাত্র স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ যথেষ্ট নয় আর, প্রাকৃতায়নের শৌর্য ও সৌন্দর্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে বিকল্প সন্দর্ভ ও বিকল্প ইতিহাসের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপিত করে উপনিবেশোত্তর বীক্ষণ দাঁড়াচ্ছে সমস্ত বর্গের ব্রাত্যজনের পক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমালোচক বেনিটা প্যারি প্রসঙ্গত ফ্রানৎস ফ্যাননের প্রতিবেদনকে আজকের পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। উপনিবেশোত্তর চেতনায় ঋদ্ধ গবেষকদের কাছে ফ্যাননের পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য কেননা, তাতে পাচ্ছি কীভাবে 'dialogical interrogation of European power and native insurrection reconstructs a process of cultural resistance and cultural disruption, participates in writing a text that can answer colonialism back and anticipates another condition beyond imperialism.' (১৯৯৫ ৪৩)।

এ মন্তব্যের শেষ দিকে যে পাঠকৃতি রচনায় যোগদানের কথা বলা হয়েছে, তা প্রতিবাদী অপ্রাতিষ্ঠানিক মননে ঔপনিবেশিক প্রতাপের উদ্ধত সন্দর্ভকে প্রত্যুত্তর দেয় দেন। উপনিবেশবাদের আস্ফালন তুচ্ছ করে এবং তাকে পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছাতে চায় নতুন জীবনস্বপ্নের প্রতিবেদনে। আধুনিকোত্তরবাদ ঐ প্রেরণাকে দুরূহ করে তুলেছে হয়ত, অসম্ভব করেনি। অন্তেবাসীবর্গের উপযোগী মূল্যবোধ যে-প্রতিসন্দর্ভ গড়তে চায়, তার জন্যে পুরোপুরি নতুন 'stratagems and subterfuges' (ভাবা যেমন জানিয়েছেন প্রাগুক্ত) প্রয়োগ করতে হচ্ছে, এইমাত্র। অবশ্য কেবল অধিসংগঠনে এই অস্থিরতা ও অজস্র রূপান্তর যদি চলতে থাকে এবং আর্থরাজনৈতিক অবসংগঠনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে—তাহলে শেষ পর্যন্ত কোনো কৃৎকৌশল ও বিস্ফোরক প্রকল্প লক্ষ্যাভিমুখী হতে পারে কিনা, এই নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এই সংশয় সত্ত্বেও নান্দনিক ও তাত্ত্বিক ভাবনায় উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের ক্রমাগত জোরালো হয়ে ওঠা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। ফ্রান্‌ৎস্ ফ্যাননের বিখ্যাত বই 'The Wretched of the Earth'-এর সঙ্গে আমাদের সময়ের দূরত্ব ছয় দশকেরও বেশি এবং আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতেও ব্যবধান বিস্তর। তবু তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য এখনও প্রাসঙ্গিক; তিনি লিখেছিলেন, ঔপনিবেশিক প্রভুর মুখোমুখি শাসিত জনেরও 'has a past to legitimate, a vengeance to extract' (১৯৫২ ২২৫)। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যুক্তিবর্জিত ভাবে কোনো কৌম সভ্যতার পুনরুত্থান চাইছেন আজকের বুদ্ধিজীবী। তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন যে 'I will not make myself a man of the past...I am not a prisoner of history; it is only by going beyond the historical instrumental hypothesis that I will initiate the cycle of my freedom.' (তদেব ২২৯, ২৩১)। নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুদের এখন আর সরাসরি দেখা যায় না; তাই মেঘের আড়ালে-থাকা মেঘনাদের মতো তারা ক্রূরতর ও ভয়ংকরতর। তাদের সম্মোহনী বাণ নাগপাশের চেয়েও কার্যকরী। বিশ্বায়ন যখন সর্বাত্মক যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে, প্রতিরোধকেও হতে হচ্ছে সর্বাত্মক। বিশ্বায়নের উল্টো মেরুতে প্রাকৃতায়নের বার্তাকে প্রতিস্থাপিত করতে হচ্ছে যদিও, কিন্তু ফ্যাননের কথা-মতোই আজকের প্রতিসন্দর্ভের সূত্রধারও অতীতের মানুষ হতে চাইছেন না। ইতিহাসের বন্দীশালায় নিজেকে নিক্ষিপ্ত করছেন না; বরং ইতিহাস প্রস্থনার নামে আধিপত্যবাদীদের কেন্দ্রীকরণ-প্রবণ 'totalising discourse'-কে প্রত্যাখ্যান করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজের সঙ্গে জগতের দ্বিবাচনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবী এবং সেইজন্যে ইতিহাসের নামে তৈরি সমস্ত খাঁচাকে ভেঙে ফেলতে চাইছেন। কেননা তাঁর লক্ষ্য বিমানবায়ন থেকে মানবিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার যাত্রায় অবিচল থাকা। নিজের ও পারিপার্শ্বিকের সমস্ত শৃঙ্খলকে যুগপৎ চূর্ণ করতে হলে ইতিহাসের প্রতিবেদন থেকে সমস্ত কালো ছায়া মুছে ফেলতে হবে আগে।

চার

কিন্তু উপনিবেশোত্তর চেতনার সন্দর্ভ তৈরি করতে গিয়ে ঔচিত্যার্থক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছি কেন? নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, তবে কি আমাদের অভিজ্ঞতায় আজও বিকল্প বয়ন বিকল্প মূল্যবোধ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি! তাই ইচ্ছাপূরণের সম্ভাবনাকে তত্ত্বকথার মোড়কে হাজির করছি আমরা? না, সেকথা বলা যায় না। আসলে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে ভাবাদর্শগত সুনির্দিষ্ট অবস্থান অত্যন্ত জরুরি একটি প্রাক্শর্ত। প্রতিবেদনের পেছনে কার্যকরী থাকে যে-সূক্ষ্ম ব্যাপক রাজনীতির বাধ্যবাধকতা, গত তিন দশকে তা বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। আর, এইজন্যে, ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এতদিন সমাজে ও মননে যেসব নিরুচ্চার উপস্থিতি অবদমিত হয়েছে, তাদের গৌরবময় পুনর্বাসন প্রতিবেদনের চরিত্র আমূল বদলে দিতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কোনো রৈখিকতা নেই; বরং অন্তর্বৃত বৈচিত্র্য ও অন্তর্বয়নের বিভঙ্গে তা সমৃদ্ধ। শুধুমাত্র এইটুকু লক্ষ রাখতে হয় যে নবজায়মান প্রতিবেদনের সূচনায়, ক্রমবিকাশে ও পরিণততর পর্যায়ে প্রশ্ন ও সংঘর্ষ কীভাবে তাৎপর্যের ভিত্তি তৈরি করছে। এই প্রশ্ন ও সংঘর্ষ মূলত ঔপনিবেশিক চিন্তারীতিকে বিনির্মাণ করে; কেননা অভ্যাসের জগদ্দল পাথরকে না-সরানো পর্যন্ত নতুন ভাবকল্পের জন্ম হতে পারে না, প্রতিষ্ঠা তো আরো অসম্ভব। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আকরণ এবং চিন্তাপ্রণালী বাঙালির চিত্তে যেভাবে দখলদারি জারি করে অজস্র শেকলের পাকে-পাকে জড়িয়ে নিয়েছে—তাতে কোনো নতুন সম্ভাবনাকে তাৎপর্যবহ হতে হলে আগে ঐ দখলদারির শেকল ভেঙে ফেলতে হবে। এতে কোনো ঔচিত্যার্থক প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি নেই, রয়েছে অনিবার্য বাস্তবতার ঘোষণা। 'মননে স্বরাজ' নামে বিখ্যাত নিবন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যে-সমস্ত জরুরি কথা বলেছিলেন, আজ তা নতুন-ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আগে বিনির্মাণ, তারপর পুনর্নির্মাণ। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে পুরোপুরি নতুন ধাঁচের চিত্তবৃত্তিতে যা অভ্যাসের জাড্যকে মেনে নেয় না কখনও, উৎকেন্দ্রিক হওয়ার বদলে প্রাকৃতায়নের অনুভবে শেকড় ছড়িয়ে দেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলা বাহুল্য, বিনির্মাণ মানে সামাজিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-নান্দনিক মহাসন্দর্ভের বিনির্মাণ। আর, এখানেই আকরণোত্তরবাদী ভাবনাপ্রস্থানের সঙ্গে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের নিবিড় আত্মীয়তা। একই কথা প্রযোজ্য নিম্নবর্গীয় চেতনা ও নারীচেতনার সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়েও। আগেই লিখেছি, আধুনিকোত্তরবাদী ভাবনার সঙ্গে উপনিবেশোত্তর চেতনার বহুরৈখিক ও জটিল সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সন্দর্ভে অন্তর্ঘাত না-করে এই নবজায়মান চেতনার সূত্রপাত হয় না। আবার সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের পর্যায়ে আধুনিকোত্তরবাদ যখন এক নয়, অনেক—উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কগত অনেকান্তিকতা দেশকালগত পটভূমি দ্বারা নির্দিষ্ট হচ্ছে। তাই উপনিবেশোত্তর সাহিত্যতত্ত্ব বিনির্মাণপন্থী না হয়ে পারে না; স্বভাবেই তা অপ্রাতিষ্ঠানিক ও চিরপ্রতিবাদী। কেন্দ্রীকরণ প্রবণ সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকে প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাঘাত করতে পারে এই মূল্যবোধ, এখানেই তার সবচেয়ে বড়ো জোর। অরো যে-গুরুত্বপূর্ণ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন, তা হলো, আগ্রাসী প্রতাপের দম্ভকে অনিবার্য ও স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে না-নিয়ে অন্তেবাসী অবস্থানের অগৌরবকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে নিপীড়িত জনেরা। উপনিবেশবাদ যখন বাঙালির অস্তিত্ব ও মননকে ছিন্নমূল করে দিতে চাইছিল, লক্ষণীয় ভাবে, সেসময় জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী প্রকরণে শিকড় সন্ধানের আর্তি ও আত্মশক্তি উদ্বোধনের চেষ্টা প্রতিসন্দর্ভের বীজ বপন করছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে রবীন্দ্রনাথের কথা বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যখন ইংল্যান্ডে গবেষণা করে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন, উৎফুল্ল রবীন্দ্রনাথ সেসময় একদিকে তাঁকে লিখছেন 'য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না।' (এপ্রিল ১৯০২ চিঠিপত্র ৬ ১৯৯৩ ৪২) আবার পাশাপাশি একথাও লিখছেন যে, প্রতীচ্যের জ্ঞান আমাদের যেন উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক করে না তোলে; আমরা যেন আত্মগৌরবকে কখনও লাঘব না করি। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বদেশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিসরকে উদ্‌ভাসিত করার লক্ষ্যে যেন নিজেদের যাবতীয় অধ্যবসায় নিয়োজিত হয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, একে আমরা উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ অভিব্যক্তির সূচনাপর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে আরো লিখেছেন 'তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে, তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে—বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে।... ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উপর আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে?' ([illegible] ৪[illegible])

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে উপনিবেশোত্তর মূলবোধের প্রাথমিক স্ফুরন লক্ষ করি, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। প্রতীচ্য ধাঁচের আধুনিকতা যখন সমস্ত ধরনের ঐতিহ্য ও বহমানতার বোধকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছিল, সেসময় রবীন্দ্রনাথ না-এর আস্ফালনকে বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাসের প্রবহমানতাকে প্রাধান্য দিতে চাইলেন, কেননা এছাড়া আত্মমর্যাদা ও স্থিতিশীলতার আকরণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বিভূতিভূষণকেও এই একই ইতিবাচক প্রত্যয়ের সূত্রে গ্রথিত করা যেত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা কোনো প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ফিরে যায়নি; সময় ও পরিসরের বিন্যাসক্রমে তিনি কোনো ধরনের পশ্চাৎবর্তিতাকে প্রশ্রয় দেননি কখনও। আগেই লিখেছি, অতীত ও ঐতিহ্য সমার্থক নয় এবং নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন। তিনি কেবল প্রতীচ্যায়িত ধারণার কাছে সার্বিক সমর্পণের বিরোধিতা করেছিলেন এবং নিজস্ব ভূমিতে রসগ্রাহী শেকড় প্রোথিত করতে চাইছিলেন। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ ছিলেন স্মৃতিমুগ্ধ পথিক, যাঁর সমস্ত পথ কেবল ব্যথিত বর্তমান থেকে ছুটি নিয়ে ফিরে যায় অতীতের উজানে। না বললেও চলে যে, প্রাক্ ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর জীবনভাবনা কিছুতেই তুল্যমূল্য হতে পারে না। আমাদের কবিদের মধ্যে যাঁরা ঔপনিবেশিক দীপায়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরা হলেন জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে। কিন্তু তাঁদের কবিতাবিশ্বের অন্যবিধ তাৎপর্য বেশি অনুশীলন করার ফলে সামাজিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ বিষয়ে তাঁদের অবস্থানের গুরুত্ব যথেষ্ট মনোযোগী বিশ্লেষণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি। অথচ এই দু'জনকেই আজ ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আকল্প বিনির্মাণের প্রস্তাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি; বুঝতে পারি কীভাবে প্রতীচ্যাগত দীপায়নের উজ্জ্বল বিভা আত্মসাৎ করেও তাঁরা নিজস্ব সার্বভৌম পরিসরে পৌঁছাতে চেয়েছেন। আর এইজন্যে, ঔপনিবেশিক কবিতা-সন্দর্ভের প্রকরণে অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছেন ঐতিহ্যের পুনর্নবায়ন ও ভাবাদর্শ দিয়ে। হয়তো একেই জীবনানন্দ বলতে চেয়েছেন 'স্থির দিক্‌নির্ণয়ের মতো চেতনা'। এই চেতনার অন্য নাম হল উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ যা সমস্ত পূর্বধার্য অভ্যাসের আয়তন ভেঙে দেয়; কেননা অচলতার দুর্গকে বির্নির্মাণ না করে কোনো যথার্থ পুনর্নির্মাণের প্রস্তাবনা করা সম্ভব নয়। এই মূল্যবোধ আজকের চরম বিমানবায়নের পর্যায়ের মানুষের মধ্যে সহজাত, কেননা পীড়ন যখন তীব্র কঠিন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তখন উন্মুখ। প্রতাপের ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বে তাই চলেছে বিকল্প সন্দর্ভ ও বিকল্প বাস্তবের আয়োজন। মনে পড়ে জীবনানন্দকে আরো একবার : 'কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'।

উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের প্রকৃত ধারক ও বাহক হলো প্রান্তিকায়িত অবস্থানের প্রতিউচ্চারণ যা এতদিনকার যত্নরচিত ও প্রসাধনধন্য সত্যের আকরণকে প্রত্যাহ্বান জানায়। গায়ত্রী স্পিভক একে বলেছেন 'Voice from the margin' (১৯৯২:২২০)। একদিকে উৎপীড়ক কেন্দ্র সবসময় সমস্ত বিপ্রতীপ কণ্ঠস্বরের সম্ভাবনা মুছে ফেলতে চাইছে অন্যদিকে উৎপীড়িত বর্গ কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার যাবতীয় অভিঘাত অস্বীকার করে নিজস্ব পরিসরকে বাঙ্ময় করে তুলতে চাইছে। এই টানাপোড়েন সবসময় ছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবসময় থাকবে। এডোয়ার্ড সাঈদ বা গায়ত্রী স্পিভকের মতো তাত্ত্বিক নব্যমূল্যবোধের জন্যে এই ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, 'Where the marginal can speak and be spoken, even spoken for' (তদেব ২২১)। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষভাবে বাঙালির পরিসরে, নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজন এবং অন্তেবাসী নারীর পক্ষ থেকে কীভাবে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করছে জায়মান প্রতিবাদী মূল্যবোধ—আমাদের সাহিত্য-বিশ্লেষণে এখনও তার ধারাবাহিক অর্থাৎ ইতিহাস নিবিষ্ট অভিব্যক্তি অপেক্ষিত। তাই সাহিত্যিক প্রতিবেদনে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের ক্রমিক উত্থান এখন আমাদের পুনর্বিবেচনার আকর হতে পারে। উনিশ শতকের নক্শা ও প্রহসন গুলিতে বাখতিনের সূত্র অনুযায়ী কার্নিভালের প্রকাশ বিশ্লেষণ করি যখন, আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কেন্দ্রায়িত সন্দর্ভের বিপ্রতীপে বিকেন্দ্রায়িত প্রতিসন্দর্ভ গড়ার তাগিদ। সামাজিক প্রতাপের সহগামী নন্দনের পাঠকৃতিতে অন্তর্ঘাত করে অশ্রুত কণ্ঠস্বরের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চেয়েছিল হতোম প্যাঁচার নকশা, আলালের ঘরের দুলাল, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, সধবার একাদশীর মতো রচনা। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যকেও আজ এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুনঃপাঠ করা যেতে পারে। আবার কোথাও প্রান্তিকায়িত বর্গের উপস্থিতি তাৎপর্যবহ হতে পারল না শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত সন্দর্ভের প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণে পৌঁছাতে না পারার জন্যে—এও স্পষ্ট হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথদের রচনা থেকে। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মূলত ঔপনিবেশিক চেতনা সম্পৃক্ত মহাসন্দর্ভের কাছে আত্মসমর্পণের দলিল। তবে ইতিহাস যেহেতু একরৈখিক নয় কখনও, প্রতিসন্দর্ভ গড়ার অস্ফুট ইচ্ছাও ব্যক্ত হয়েছে কোথাও কোথাও। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। বিশ শতকের বাঙালি জীবনে ও মননে উপনিবেশবাদের নিগড় নিরঙ্কুশ হয়েছে উত্তরোত্তর; ফলে প্রতাপের মৌল সন্দর্ভে আয়তনের পুনর্বিন্যাস দূরে থাক, সামান্য ভাঙচুরও ধারাবাহিকভাবে ঘটেনি। বরং প্রান্তিকায়িত বর্গের উপস্থাপনাও আধিপত্যবাদী মহাসন্দর্ভের বর্ণে রঞ্জিত হয়ে গেছে। তবু নান্দনিক ও সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিকতা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আমরা নিতে পারি।

প্রসঙ্গত ফুকোর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 'No local centers, no pattern of transformation could function if through a series of successive linkages, it were not eventually written into an overall strategy.' (১৯৮০ ৯৯)। এই যে সার্বিক প্রকল্পের কথা বলেছেন ফুকো, ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙালি জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার আবহে তার প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। মোটামুটিভাবে সত্তর দশক পর্যন্ত নব্য ঔপনিবেশিক পীড়ন একটি মাত্রায় উপস্থিত এবং তারপর থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভিন্ন আয়তন জেগে ওঠার ফলে উৎপীড়কদের কৃৎকৌশলও বদলে গেছে। সন্দর্ভের রূপান্তর মানে প্রতিসন্দর্ভেরও পুনর্বিন্যাস। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্যায়ভুক্ত জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু', সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াইচরিত মানস', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপকথা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্ত্তন' ইত্যাদি প্রতিবেদন থেকে লেখকের কৃৎকৌশল ও বিকল্প পাঠের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে-ধারণা অর্জন করি, উপনিবেশোত্তর জীবনের প্রথম পর্বে লিখিত 'গঙ্গা' ও 'জগদ্দল' (সমরেশ বসু), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (অদ্বৈত মল্লবর্মণ), 'লালশালু' ও 'চাঁদের অমাবস্যা' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ), 'জননী' (শওকত ওসমান), 'সূর্যদীঘল বাড়ি', (আবু ইসহাক), 'রাজনগর' ও 'দুখিয়ার কুঠি' (অমিয়ভূষণ মজুমদার), 'অন্তর্জলি যাত্রা' ও 'খেলার প্রতিভা' (কমল কুমার মজুমদার) প্রভৃতি পড়ে পুরোপুরি ভিন্নমাত্রার উপলব্ধিতে পৌঁছাই। ১৯৬৮ নাগাদ বিশ্বব্যাপ্ত উথালপাথাল যখন চিন্তার আকরণকে আমূল পালটে দিচ্ছিল, বাঙালির ভুবনেও তখন একসঙ্গে ঝড় ও ভূমিকম্প চলছে। পশ্চিমবাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন হস্তক্ষেপ করতে চাইছিল অবসাদগ্রস্ত ইতিহাসের ক্লান্তিকর ধারাবাহিকতায় আর পূর্ব-পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভস্মরাশি থেকে জন্ম নিচ্ছিল 'বাংলা' নামে দেশ। নতুন জীবনস্বপ্ন মানে নতুনভাবে অর্জিত দ্রষ্টা চক্ষু আর তার মানেই বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের নতুন দ্বিবাচনিকতা ও কৃৎকৌশল। আর, সব মিলিয়ে, নতুন উচ্চারণের স্থাপত্য, রূপান্তরের পথ ও পাথেয়। ফলে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধেরও যথার্থ ও পরিণততর প্রতিষ্ঠার আয়োজন। উৎপীড়কদের মধ্যে আঁতাত গড়ে উঠেছিল বলে যাবতীয় আধিপত্যবাদ যেমন কেন্দ্রীভূত প্রতিবেদন হিসেবে আধুনিকোত্তর চেতনাকে নিজের মাপে ও ছাঁচে তৈরি করে নিচ্ছিল—তেমনি অন্তেবাসীরাও ক্রমাগত খুঁজছিল নিজস্ব কৃৎকৌশল ও উপলব্ধির সংহিতা। লাতিন আমেরিকায় হোর্হে ল্যুই বোর্হেস, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, হুয়ান রুলফো, আলেহি কার্পেন্তিয়ের প্রমুখ এবং তাঁদের ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা ও গোলকধাঁধার সন্ধান কিংবা অনেকান্তিক সন্দর্ভ ও মুক্ত উপসংহারের প্রস্তাবনা যেমন উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের দিগ্‌দর্শক--তেমনি আফ্রিকান সাহিত্যেও দেখি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে লোককথা ও প্রত্নকথার পুনর্নির্মাণের আয়োজন। পৃথিবীর সমস্ত অন্তেবাসীদের মধ্যে যেমন মহাসন্দর্ভে কার্যকরীভাবে হস্তক্ষেপ করার বহুস্তরান্বিত প্রকল্প আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার স্পর্ধিত ঘোষণায় উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

পথ ও পাথেয় সন্ধান অবক্ষয়ী আধুনিকতা ক্লিষ্ট সমাজে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। গায়ত্রী যাকে 'declared rupture of decolonisation' (তদেব ২২৩) বলেন, উপনিবেশবাদের সমস্ত জারিজুরি ভেঙে ফেলার জন্যে কারো কারো সময় ও শক্তি ব্যয় হয়েছে। হয়তো এই বিনির্মাণের তাগিদ সৎ ও আন্তরিক ছিল ষাটের কয়েকজন তরুণের মধ্যে; কিন্তু নৈরাজ্যপন্থারও যে দর্শনের ভিত্তি চাই, এটি তলিয়ে ভাবেননি বলে শেষপর্যন্ত তা কোথাও পৌঁছাল না। তবু উপনিবেশবাদের প্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার সচেতন প্রতিভাস কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়; অপ্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধে পৌঁছানোর জন্যে জীবন ও মননে ব্যাপ্ত সমস্ত ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে তাঁরা যে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করে গেছেন, তাও চিন্তা ও অভ্যাসের স্থবিরতা চূর্ণ করার প্রয়োজনে। তাহলে কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে এই বিদ্রোহমনস্ক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তরুণদের কেন উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের ধারক বলা যাচ্ছে না? যাচ্ছে না, একারণে যে তাঁরা ভুলে গেছেন, বিনির্মাণ মানে লাগাম ছাড়া ভাঙন নয়। অন্তত ঘুরপথে আবার অবক্ষয়বাদের চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া নয়। সমাজের রীতিনীতি ও নান্দনিক বিধিবিন্যাসকে কেবলমাত্র ভাঙার জন্যে ভাঙতে চাননি নিশ্চয়; তাঁরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন মুখোশের বিভ্রমে, ভণ্ডামির বিপুল প্রসারে। ইউরোপের ডাডাবাদী ও পরাবাস্তববাদীদের মতো নিশ্চয় ঐ নব্য আভাঁগার্দ সম্প্রদায়ও চাইছিলেন ক্ষয়ের সন্ত্রাস পেরিয়ে গিয়ে নবীন নির্মিতিতে পৌঁছাতে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অবক্ষয়বাদী পর্যায়কে অস্বীকার করার নামে তাঁরা যে শস্যের মধ্যে ভূত ঢুকিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ নিজেরা হয়ে যাচ্ছেন অবক্ষয়ী আধুনিকতার শিকার—সেকথা তাঁরা ভেবে দেখেননি।

এই প্রেক্ষিতে 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর', 'চৌষট্টি ভূতের খেয়া' ও 'রঙ যখন সতর্কীকরণের চিহ্ন' নিঃসন্দেহে প্রতিপাঠকৃতির তিনটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। আবার এও ঠিক যে প্রতিসন্দর্ভের মধ্য দিয়ে চেতনার যে ভিন্ন সম্ভাবনাকে এঁরা ছুঁতে চেয়েছেন, তাতে মাত্রাগত ভিন্নতা অনেকখানি। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা প্রত্যাখ্যান করা সম্পর্কে এঁদের রচয়িতারা ঠিক একই নৌকোতে নেই। অথচ উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের প্রকৃত ধারক হতে গেলে অবক্ষয়বাদ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণে অন্তর্ঘাত ঘটানো প্রয়োজন; আধুনিকোত্তর প্রবণতা সম্পর্কে নিজের ভূমিকাও নির্ণয় করা জরুরি। বহু ক্ষেত্রে এটা হয়নি বলে ক্রুদ্ধ প্রত্যাঘাতের প্রক্রিয়াও দুর্বল হয়ে গেছে অচিরে; একক যাত্রা দেখি তাই, সহযোগী সত্তার সঙ্গে সহযাত্রা দেখি না। অথচ অবক্ষয়ী প্রাতিষ্ঠানিকতার অনিবার্য পরিণাম হলো তীব্র বিচ্ছিন্নতা আর উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের মৌল বৈশিষ্ট্য বহুস্বরসঙ্গতি। অস্তিত্বের অনুভব পরস্পরের মধ্যে ভাগ করার তাগিদে সন্দর্ভও হয়ে ওঠে বিকেন্দ্রায়িত, অনেকান্তিক। যতক্ষণ এই উপলব্ধি না হচ্ছে, তারুণ্যের স্পর্ধিত প্রকাশ সত্ত্বেও লক্ষ্যহীন নৈরাজ্য ভুলিয়ে দেবে যে প্রাতিষ্ঠানিক মিথ্যার ধ্বংস চাই নির্মাণের স্থপতি হওয়ার জন্যে। বর্তমানকে ভাঙতে হবে মানুষের আগামীকালকে পরিচ্ছন্ন ও তাৎপর্যবহ করার প্রয়োজনে।

পাঁচ

যন্ত্রপ্রযুক্তির ঔদ্ধত্য আজ যখন উপনিবেশবাদ শৃঙ্খলিত পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির সামাজিক ও নান্দনিক স্বকীয়তা মুছে ফেলতে চাইছে, উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ সংগ্রাম ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, অপরিসীম সংগ্রামী মানসিকতা এই মূল্যবোধের মৌল চিহ্নায়ক। আর, যে-কোনো বিন্দু থেকে শুরু হতে পারে ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণ প্রবণ সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করে—সামাজিক ও নান্দনিক প্রতাপের অবসান ঘটিয়ে—সূচনা হয় পুনঃপাঠ, প্রতিসন্দর্ভ নির্মাণের আয়োজন। অসংগঠিত ব্রাত্যজনকে যদি ফিরে পেতে হয় তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর, তাহলে কেন্দ্রীয় নব্য ঔপনিবেশিক প্রতাপের আকরণকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হবে। যে-কোনো বিন্দু থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার বার্তা ঘোষণা শুরু হওয়ার পক্ষে বাধা নেই কিছু। অবশ্য তারপর বিকল্প পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করতে প্রণালীবদ্ধ ভাবে ঔপনিবেশিক মূল্যবোধকে অগ্রণী ভূমিকায় নিয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সত্তর পরবর্তী বাংলা সাহিত্য এর প্রমাণ দেয়। জ্ঞানের প্রযুক্তি এবং প্রতাপের কৃৎকৌশলের মধ্যে সম্পর্ক যে মোটেই বহির্বৃত নয়, বরং সুচতুরভাবে অন্তর্বৃত—তার সমর্থন পাই গত দুই দশকে বৌদ্ধিক সমাজের চরম মেরুদণ্ডহীনতায়, কাপুরুষতায় এবং সার্বিক অবমূল্যায়নে। তবু এই পচনশীল সময়ের বৌরবেও ব্রাত্যজন ও নারীর অবদমিত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে প্রতিসন্দর্ভের আলম্বন। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার', 'স্তনদায়িনী', 'দ্রৌপদী' এই প্রতিপাঠকৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আসলে উপনিবেশোত্তর পরিসর গড়েছেন উদ্ধত কেন্দ্রায়নকে উপেক্ষা করে এবং এভাবে রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের জলবিভাজনরেখা। যেহেতু বিচিত্র স্বরন্যাসে পূর্ণ এক বহুত্ববাদী সময় ঘিরে রেখেছে আমাদের পৌর ও রাজনৈতিক সমাজকে, গত তিন দশকে আমরা বুঝলাম, উপনিবেশোত্তর চেতনা আসলে এক নয়, অনেক। তাই এই নব্য মূল্যবোধের নানা বিভঙ্গ দেখতে পাচ্ছি অজস্র ইদানীন্তন পাঠকৃতিতে; এদের মধ্য দিয়ে যেন গড়ে উঠেছে অনেকার্থদ্যোতক সমবায়ী সন্দর্ভের আদল। পরিস্ফুটমান জীবনের নানা উচ্চারণ যেন উপনিবেশোত্তর কালের দ্বিধা-সংশয়-অতৃপ্তি-সন্ত্রাস-বিষাদ-আকাঙ্ক্ষা-ব্যগ্রতা-পরাজয়কে চিহ্নিত করে চলেছে। সমস্ত নিয়ে রচিত হচ্ছে আত্মবিদারক জ্বলন্ত সময়ের জটিল বিগ্রহ। বহুত্ববাদী স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করছি উপনিবেশোত্তর চেতনা-সম্পৃক্ত এই রচনাগুলির নাম হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ও 'পাতালে-হাসপাতালে', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা', সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরীর যৌবন' ও 'গায়ত্রীসন্ধ্যা', দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', মলয় রায়চৌধুরীর 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস', সুবিমল মিশ্রের 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারত' ও 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌ-এর মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি', অভিজিৎ সেন-এর 'দেবাংশী' ও 'রহু চণ্ডালের হাড়', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' ও 'মাটির অ্যান্টেনা', ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' ও 'জানগুরু', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু' ও 'চতুষ্পাঠী', সৈকত রক্ষিতের 'আকরিক' ও 'উঠোরে পুতা, জাগোরে পুতা', অমর মিত্রের 'দানপত্র' ও 'অশ্বচরিত', জয়া মিত্রের 'হন্যমান', অনিল ঘড়াইয়ের 'পরীযান' ও 'নুনবাড়ি', নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট' ও 'যুদ্ধপরিস্থিতি'। তালিকাকে আরো একটু দীর্ঘ করা যায় কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। দৃষ্টান্তভুক্ত রচনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা সত্ত্বেও কোথায় খুঁজে পাচ্ছি তাদের ঐক্যসূত্র, এই অত্যন্ত জরুরি বিশ্লেষণটুকু যদি করি, দেখব, ঔপনিবেশিক নির্মিতি এঁরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেইসঙ্গে আলাদা-আলাদাভাবে প্রান্তিকায়িত সত্তাকে নানা প্রকরণে, আখ্যানের বিবিধ বিন্যাসে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন। চিহ্নায়ন মানে মূল্যায়ন তাই প্রথম কৃত্য হিসেবে এই পাঠকৃতিগুলি প্রচলিত চিহ্নায়নকে ভাঙতে চেয়েছে অর্থাৎ চিরাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মূল্যমান অস্বীকার করেছে। পরবর্তী স্তরে প্রত্যেকে পৌঁছাতে চেয়েছে ভিন্নতর মূল্যমানে অর্থাৎ নতুন ধরনের চিহ্নায়নে। এই প্রক্রিয়ার মৌল শর্ত হল রূপান্তর। প্রান্তিকায়িত উপস্থিতিও এর ফলে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। গায়ত্রী এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন 'Marginality... is in fact the name of a certain constantly changing set of representations that is the condition and effect of it.' (তদেব ২২৭)।

উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের প্রেরণায় সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে আমাদের অন্তেবাসী পরিচয়ের বিভিন্ন সূত্র পরীক্ষিত ও পুনঃপরীক্ষিত হচ্ছে। একদিকে আধুনিকোত্তর মুহূর্ত পরম্পরা আমাদের মিশ্র সমাজে জটিল আবর্ত তৈরি করছে আবার অন্যদিকে আমাদের অবস্থান চিহ্নিত হচ্ছে উপনিবেশোত্তর চেতনায়। এই দুইয়ের মধ্যে বিপ্রতীপতার ঐক্য কিংবা দ্বিবাচনিক সম্পর্ক স্থাপন তত্ত্বগত ভাবে কীভাবে এবং কতটা সম্ভব, আজকের চিন্তাবিদেরা সে-ব্যাপারে ভাবছেন। পার্থক্যবোধের সূত্র যখন পৌর এবং রাজনৈতিক সমাজের গভীরে প্রচ্ছন্ন—সাহিত্যের প্রতিবেদনে তার বিচ্ছুরণ ঘটতে বাধ্য। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ অহরহ সাংস্কৃতিক আকরণের পুনর্বিন্যাস দাবি করছে ইতিহাস ও দর্শনের কাছে চাইছে এমন এক পরিসর যেখানে বহু অস্তিত্বের মধ্যে সমান্তরালতা ও পার্থক্যের দ্বিবাচনিকতা স্বতঃসিদ্ধ। শুধুমাত্র একটাই প্রাক্‌শর্ত মাননীয়; প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজনের চেতনার রঙে রঞ্জিত হতে হবে সমস্ত সন্দর্ভকে। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে-হস্তক্ষেপে প্রচলিত সন্দর্ভগুলি রূপান্তরিত হবে প্রতিসন্দর্ভে। আত্মপরিচয় অর্জিত হবে নতুনভাবে আর সেই সূত্রে পুনঃগৃহীত হবে বিশ্বপরিচয়ও। সাংস্কৃতিক কৃতিতে স্বীকৃত হবে অজস্র অন্তর্বয়নের সমৃদ্ধি; কিন্তু উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের চিরাগত সম্পর্কের ধাঁচটি প্রতিবেদনে পুরোপুরি বিনির্মিত হচ্ছে বলে বাদী স্বর ও বিবাদী স্বর পরস্পরের সহযোগী হয়ে উঠবে। নতুন প্রতিবেদনের সূত্রধার বিনিময়ের সাবলীল লাবণ্যে বিশ্বাসী হবেন, বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া প্রতাপের কৃৎকৌশল মেনে নেবেন না কখনও। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে ভূমিসংলগ্নতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আকাশবিহারের নামে আধুনিকতাবাদী উৎকেন্দ্রিকতা তার কাছে অগ্রাহ্য বিবেচিত হচ্ছে তাই। গায়ত্রী লিখেছেন "It is a question of developing a vigilance for systematic appropriations of the social capacity to produce a differential that is one basis of exchange into the networks of cultural class or gender identity.' (তদেব ২২৮)। দূরীকৃত ও বহিষ্কৃত অপরের পরিসর পুনরাবিষ্কার ও পুনর্নির্মাণ করে উপনিবেশোত্তর পাঠকৃতি। স্বভাবত সামাজিক, রাজনৈতিক সঙ্কট বিশ্লেষণ করার নতুন পদ্ধতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বকে একই কারণে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ আমূল পালটে নিচ্ছে। গত কয়েক বছরে বিশ্বপুঁজিবাদ যেভাবে আরো আগ্রাসী হয়ে তৃতীয় বিশ্বের অপরতাকে সর্বস্তরে মুছে ফেলতে চাইছে, তাতে 'অপর' সত্তার পক্ষ থেকে নব্যউপনিবেশবাদের আয়ুধে যান্ত্রিক আধুনিকোত্তর মহাসন্দর্ভে অন্তর্ঘাত করার আয়োজনও হয়ে উঠছে আরো নিরঙ্কুশ, আরো তীব্রসুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বদ্ধ সমগ্রতাকে প্রতিহত করে মুক্ত সমাপ্তির ধারণাকে প্রতিস্পর্ধী কৃৎকৌশল হিসেবে উপস্থাপিত করছেন পাঠকৃতির সূত্রধারেরা এবং বিনির্মাণপন্থী পাঠকেরাও। উপনিবেশোত্তর মুহূর্তের অধিবাসী হিসেবে আমরা, তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দশ বছর পেরিয়ে এসে, দেখতে পাচ্ছি, 'অপর' সত্তাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধতা মেনে নিচ্ছে না আর। তাদের প্রান্তিকায়িত পরিসর আজ দ্যুতিমান সন্ধিকালের স্পন্দনে, নতুন সূচনার সম্ভাবনায়। ফলে খসে পড়ছে প্রতাপের কৃৎকৌশলে আরোপিত অভ্যাসের নিয়মগুলি; কেন্দ্র ও পরিধির চিরাচরিত সম্পর্কে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে নতুন মূল্যবোধের বয়ন। বস্তুত উপনিবেশোত্তর মুহূর্ত যত না বর্তমানের, তার চেয়ে ঢের বেশি ভবিষ্যতের। আমাদের সুপরিচিত এক কবির উচ্চারণ যেন এখনই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' উদ্ধত প্রতাপের পীড়ন যত ভয়ংকর, যত সূক্ষ্ম, যত ব্যাপক হোক না কেন—উপনিবেশোত্তর চেতনায় প্রতিরোধের আকল্প এবং সত্যের সন্ধান তত প্রতিবাদী মূল্যবোধে নিষিক্ত হচ্ছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস আজ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসার প্রচলিত আকরণগুলি আমূল পাল্‌টে দিচ্ছে। এখনও অবশ্য প্রতিবেদনের পুরোনো ধাঁচ অব্যাহত রয়েছে, তবে একটু আগে যে-সমস্ত রচনার উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে এই প্রমাণটুকু অন্তত পাওয়া যাচ্ছে যে, বয়নের রীতি এবং অবলম্বন সম্পর্কিত ধারণা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ভাষা, সত্য, প্রতাপ কীভাবে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত, দর্পণের বিপ্রতীপে গিয়ে লেখকেরা বোঝাতে চাইছেন। আর, এখানেই উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতা। সমস্ত রকম অভ্যাসের খাঁচা ভেঙে দিয়ে প্রাগুক্ত পাঠকৃতিগুলি প্রমাণ করছে, লিওতার যেমন বলেন, 'Knowledge is no longer the subject but the servant of the subject' (১৯৮৭: ৪১)—আর, তাই সত্যকে বিমূর্তায়িত করার আধিপত্যবাদী কৌশল ঐ লেখকেরা প্রতিহত করছেন। প্রকাশভঙ্গিতে যত ভিন্নতা থাক, তাঁরা একটি অভিন্ন মূল্যবোধের শরিক। সত্যকে তাঁরা জানেন 'Socially mediated entity' (তদেব) হিসেবে। ভাষা ও সত্যের উপর অন্তেবাসী অপরসত্তার বিপ্রতীপ প্রতাপ বিচ্ছুরণের নিদর্শন লক্ষ করি 'চিলেকোঠার সেপাই' বা 'দেবাংশী' বা 'আকরিক' বা 'হারবার্ট'-এর মতো পাঠকৃতিতে। এই বিচ্ছুরণ সংগ্রামেরও, তাই উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে সংগ্রাম ছাড়া কিছুই অর্জনীয় নয়। বিল অ্যাশক্রফ্‌ট প্রমুখ আলোচকেরা 'The Empire writes back' এর প্রতিবেদনে খুব জরুরি কথা লিখেছেন 'Power is that which annexes, determines and verifies truth. Truth is never outside power, or deprived of power, the production of truth is a function of power.' (১৯৮৯ ১৬৭)।

সুতরাং সম্ভাবনার পরিসর বিস্তৃততর হওয়ার এই সন্ধিলগ্নে পৌঁছে একথা অনায়াসে বলা যায় যে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ প্রান্তিকায়িত জনের বিপ্রতীপ প্রতাপ উপস্থাপনার সূত্রে ইতিহাসের প্রতিবেদনে সত্যের তাৎপর্য পুনর্নির্মাণ করছে। 'অপর'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্তার প্রতিরোধে সময় ও পরিসরের নন্দন যখন বিনির্মিত হচ্ছে আজ, উপনিবেশোত্তর জগতের নৈঃশব্দ্যই হয়ে উঠছে দধীচির অস্থি। বজ্রের সম্ভাবনা তাই নতুন মূল্যবোধের প্রেরণা ও আশ্রয়। 'We cannot exercise power except through the production of truth'—একথা যে বলেছেন ফুকো (১৯৭৭ ১২), তা সমর্থন করে আরও বলতে পারি, সত্যভ্রম দিয়ে আবৃত সত্যের অবয়বকে অপাবৃত করার দায়িত্ব নিয়েছে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ। কিন্তু তবু ঐ নৈঃশব্দ্যের ব্যাপকতা আমাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে থাকে কতটা ধারাবাহিক উদ্যম থাকলে এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার কাছে কতখানি নিবেদিত হলে তবে দৃশ্য ও অদৃশ্য অভ্যাসের দীর্ঘলালিত শেকড়গুলি উপড়ে ফেলা সম্ভব? আপাতত এই প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টাই আমাদের জরুরি কৃত্য।

ছয়

অখণ্ড এই মানববিশ্বের ইতিহাস পুনর্বিবেচনা করে দেখি, ফ্রানৎস ফ্যাননের বহুপঠিত 'দি রেচেড্ অফ দি আর্থ'—যার ভূমিকা লিখেছিলেন জাঁ পল সার্ত্র, প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ঔপনিবেশিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত আলোচনা পুরোপুরি নতুন গুরুত্ব পেয়ে গেছে। তবে ৮০-র দশকে উপনিবেশোত্তরবাদ কথাটি প্রকৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর দার্শনিক ভিত্তি যে ছিল আকরণোত্তরবাদ ও বিনির্মাণবাদের মধ্যে নিহিত, সেকথা আগেই লিখেছি। আমরা দেখলাম, উপনিবেশোত্তর চেতনার অন্যতম গোত্রলক্ষণ হলো সংশ্লেষণের প্রবণতা; নানা উৎসজাত ভাববীজ তাতে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছে। যেমন, বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা ও অপরতার তত্ত্ব, গ্রামসির আধিপত্যবাদ বিষয়ক তত্ত্ব, দেরিদার বিনির্মাণবাদ, ফুকোর জ্ঞান ও প্রতাপ সম্পর্কিত মতবাদ, প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক আখ্যান-সন্দর্ভ ও কৃৎকৌশলের সর্বজনীন হয়ে ওঠার প্রবণতা সম্পর্কে লিওতারের আধুনিকোত্তরবাদী সমালোচনা ইত্যাদি। এদের সঞ্চরমান ছায়া লক্ষ করি উপনিবেশোত্তর চেতনায়। এডোয়ার্ড সাঈদ, হোমি ভাবা, গায়ত্রী স্পিভক চক্রবর্তী, হেনরি লুই গেট্স্ এই ধারার পুরোধা তাত্ত্বিক। বিশেষত গায়ত্রী যেহেতু তাঁর রচনায় বিশ্বপরিবেশের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিয়েছেন, তাঁর যুক্তিশৃঙ্খলা আমাদের আলাদা মনোযোগ দাবি করে। ১৯৮৮-এর১৬ জুলাই, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গায়ত্রী বলেছিলেন যে, নব্য উপনিবেশবাদ প্রসারের ফলে অন্তেবাসীদের উচ্চারণ আরো প্রান্তিকায়িত। প্রান্তিক অবস্থান থেকে ক্রমশ উঠে আসছে যেসব কণ্ঠস্বর, উপনিবেশোত্তর চেতনা-জাত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদনের সূত্রধার হবে তারা-ই। ঔপনিবেশিক শক্তির কৃৎকৌশলে সাংস্কৃতিক রাজনীতির পাঠকৃতি কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তা যদি সতর্কভাবে লক্ষ না করি, তাহলে বিভিন্ন সাহিত্যমাধ্যমের প্রতিবেদনে অভিব্যক্ত 'a voice from the margin' (গায়ত্রী ১৯৯২ ২২০) ও চিহ্নিত করতে পারব না! ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনের বিশ্লেষণী পাঠ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনভ্যাস জনিত সংশয়-দ্বিধা-চিন্তার একমাত্রিকতা কাটিয়ে উঠে পাঠক আজ নিশ্চিত হতে পারছেন যে, নিরুদ্ধ-কণ্ঠ অন্তেবাসীরা তাদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাচ্ছে। প্রান্তিকায়িত অবস্থানকে ঘিরে অপরিচয়ের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে এবং তাদের উচ্চারণ এতদিনকার আধিপত্যবাদী স্বরন্যাসকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে সামাজিক পরিস্থিতির পুনঃপাঠকে প্রতিবেদনের কেন্দ্রীয় আকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রতাপের সুস্পষ্ট স্তরান্বিত অভিব্যক্তি আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের মৌল অবলম্বন। উপনিবেশোত্তর চেতনা এই অবলম্বনের অভ্যস্ততা ভেঙে দিতে চায় বলা বাহুল্য, কাজটা খুবই কঠিন এবং জটিল। কারণ এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতার আগ্রাসী ভূমিকা অস্বীকার করার প্রশ্নটিও। বর্গবিভাজিত সমাজে বিভাজনই তো প্রতাপের উৎস; যদি ঐ প্রতাপকে প্রতিহত করতে হয়, মান্যতাপ্রাপ্ত প্রতিবেদনে হস্তক্ষেপ, বা বলা ভালো, অন্তর্ঘাত করার কৃৎকৌশল আয়ত্ত করতেই হবে। কেবলমাত্র তখন গড়ে তোলা যাবে বিকল্প বাস্তব, বিকল্প গ্রন্থনা, বিকল্প সন্দর্ভে পৌঁছানোর পথ ও পাথেয়।

দিন দিন যত জটিল হচ্ছে নয়াউপনিবেশবাদী প্রভুত্ব বিস্তারের ছলাকলা, উপনিবেশোত্তর চেতনাও তত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভাবে জাল কেটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। বিকল্প প্রতিবেদন গড়তে গিয়ে যা কিছু উদ্যাম নেওয়া হচ্ছে কৃৎকৌশলের স্তরে, সেসব মূলত গভীরতর রাজনৈতিক সংবেদনার ফসল। তাই আজকের বাংলা সাহিত্যে কোনো পাঠ কিংবা বিশ্লেষণ অরাজনৈতিক নয়। বিশেষত ফুকো যে সামগ্রিক কৃৎকৌশলের (overall strategy) প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, ঔপনিবেশিক শোষণের জালে বন্দী মরিয়া অন্তেবাসীর পক্ষে তার আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য। প্রান্তিকায়িত অবস্থানের স্বরূপ জানার এবং সমস্ত ধরনের কেন্দ্রায়িত প্রতাপ ও তার দাম্ভিক বিচ্ছুরণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টাই ইদানীং দেখা যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক মহাসন্দর্ভ এবং তার অতিনির্দিষ্ট বাস্তবতা ও বয়নপদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করার জন্যে এবং, একটু আগে যেমন লিখেছি, সচেতন হস্তক্ষেপ করে আখ্যানের প্রতিবেদনে পুরোপুরি নতুন ধরন গড়ার প্রয়োজনে লাতিন আমেরিকায় গার্সিয়া মার্কেজ লিখলেন 'শতবর্ষব্যাপী নিঃসঙ্গতা' কিংবা 'সরলা এরেন্দিরা এবং তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'র মতো উপন্যাস। প্রতীচ্যাগত ও চিরাভ্যস্ত উপন্যাসবীক্ষার প্রতি অতি-নির্ভরতা ভেঙে গেল এতে; লেখক-কেন্দ্রিকতার বদলে সূচনা হল পাঠক-প্রাধান্যের। কেননা, বাস্তবতার ধারণাই তো এধরনের ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার চমকপ্রদ অভিব্যক্তিতে লোকায়ত চিহ্নায়ন, কিংবদন্তি, প্রত্নকথার সঙ্গে অনায়াসে মিশে গেছে সাম্প্রতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। ভি. এস. নইপালের 'গোরিলাজ' এবং সলমন রুশদির 'মিডনাইট্‌স্ চিল্ডরেন' উপন্যাসেও প্রতিবেদনের ব্যতিরেকী আদল স্পষ্ট।

ভারতীয় উপমহাদেশে যখন নয়াঔপনিবেশিক পরিস্থিতি সগৌরবে বিরাজমান, বাঙালি লেখকেরা আধিপত্যবাদী মহাসন্দর্ভের প্রতি কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, স্বভাবত কৌতূহল জাগে। আধুনিকতার নামে সামন্ততান্ত্রিক পিছুটানের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সানন্দ সহাবস্থান-ধন্য অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পণ্যায়িত প্রতাপের আয়ুধ হিসেবে সক্রিয় বিমানবায়ন ও বিকৃতির তুমুল হট্টরোল স্থিতাবস্থাপন্থী লেখকদের বদান্যতায় একমাত্র 'সত্য-হিসেবে উৎপাদিত হচ্ছে। আত্মরতি, যৌনতা, হিংস্রতা, অনাচার, প্রগতিবিরোধিতা, সংস্কারমুগ্ধতা, ধর্মীয় ভাবুকতা—এইসব কিছুর বিচিত্র ককটেল ছাড়া যেন অন্য কোনো প্রতিবেদন নেই জীবনের। এর বাইরে সমস্ত অপরতা নির্বাসিত, দূরীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত! উচ্চমধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তের আদর্শহীন নিরালোকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন পাঠকেরা। আসলে পাঠক নয়, ভোক্তা, যেহেতু বিজ্ঞাপনচাতুর্যে বিক্রি হয়ে-যাওয়া মেধাপণ্যে একটিমাত্র সম্পর্ক স্বীকৃত যোগানদার এবং ভোক্তা-ক্রেতা। মাঝখানে বিক্রেতারা আসল নাটের গুরু, তাদের তৈরি সুতোয় গাঁথা পুতুলেরা বসছে-হাঁটছে-নাচছে-গাইছে। এই বিক্রেতারা ঠিক করে দিচ্ছে কে ছোটো লেখক কে বড়ো লেখক কে-ই বা 'নতুন' 'ধারা' তৈরি করছেন এবং কে পিছিয়ে যাচ্ছেন। কারা 'পুরস্কৃত' হবেন এবং কারা তিরস্কৃত। সাহিত্যমূল্যে নয়, পণ্যমূল্যে। পাঠকসমাজ অবান্তর, চাই হাটের মাদকতা। হালে প্রগতিও পণ্য হয়ে পড়েছে। অতএব প্রতাপ-যৌনতা-বিজ্ঞাপনের অক্ষশক্তি নয়াউপনিবেশবাদের কৃৎকৌশল হিসেবে সক্রিয় থাকবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অসতর্ক ও সরলমতি পাঠকের জন্যে দান্তের এই সতর্কীকরণই যথেষ্ট 'Abandon all hope, ye, who enter here!' একটু আগে যে-ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার কথা লিখেছি, উপনিবেশোত্তর আকল্প হিসেবে এর বহুমুখী তাৎপর্য ভেবে দেখার মতো। বাস্তবতার নামে পরিবেশিত সন্দর্ভ যখন একমাত্রিক, সম্ভাবনাশূন্য ও রুদ্ধাবকাশ, সেসময় তাতে কার্যত কোনো নান্দনিক পরিসর আর অবশিষ্ট থাকে না। ঐ বাস্তবতাকে যে আক্রমণ করে সে-ই তাকে বাঁচায়। তাছাড়া বহুধাবিভাজিত সমাজের বাস্তবতাও তো আধিপত্যবাদী বর্গের সুবিধামাফিক রঞ্জিত হয়ে থাকে, নিম্নবর্গীয় লোকায়ত জীবন-ভাবনার স্বীকৃতি তাতে থাকার কথা নয়। সবার উপরে রয়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আদল অটুট রাখার মোহ। এই বাস্তবতা আর যা-ই হোক, সর্বজনীন নয় কখনও কিংবা নয় সর্বত্রগামী। এই প্রেক্ষিতে লোকায়ত জীবনের অজ্ঞাতপূর্ব সমান্তরাল প্রবাহ থেকে অঞ্জলি ভরে তুলে-আনা উপকরণ দিয়ে উপনিবেশোত্তর চেতনা-সিঞ্চিত লেখক গড়ে তোলেন আশ্চর্য বিকল্প প্রতিবেদন যাতে সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা কিংবা বস্তুসত্তা ও রূপক-অস্তিত্ব সহাবস্থান করে না শুধু, পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। তাই ঔপনিবেশিক সন্দর্ভে যেখানে চূড়ান্ত একবাচনিক সত্যভ্রমের অভিব্যক্তি, উপনিবেশোত্তর চেতনায় বিনির্মিত বাস্তব ও ক্রমশ পুনর্নির্মিত প্রতিবেদন সেক্ষেত্রে দ্বিবাচিনিক সত্যে গ্রথিত। এমনও বলা যায়, যেখানে ঔপনিবেশিক কেন্দ্রিকতার স্পর্ধিত আড়ম্বর—সেখানেই উপনিবেশোত্তর চেতনায় নান্দনিক ও সামাজিক অন্বয়বোধের পুষ্পিত হয়ে ওঠা আর বিকেন্দ্রায়নের প্রতিশ্রুতি। যেখানে পীড়ন, সেখানেই মুক্তির প্রয়াস। এদিক দিয়ে দেখলে 'উপনিবেশোত্তর' শব্দটি কাল বা পর্যায়বাচক নয়, চেতনাদ্যোতক। তার মানে, সময়ের মাপকাঠিতে উপনিবেশবাদের পরে নয় উপনিবেশোত্তর ভাবনা; এই প্রতিবাদী অবস্থান তখনই গড়ে ওঠে নিপীড়িত জনসমাজে যখন তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইজন্যে উনিশ শতকের শেষে বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের প্রতীচ্যাগত ও কেন্দ্রায়িত আকল্পকে পরাভূত করার জন্যে প্রাকৃতায়নের উপলব্ধিতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন তাঁর 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস। এর প্রতিবেদনে দেখি ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার প্রস্তাবনা, যেখানে লোক-উপাদান নির্দ্বিধায় গৃহীত ও পুনর্নির্মিত হয়েছে আর যেখানে বাস্তব থেকে সম্ভাবনায় আর সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে অনায়াস যাতায়াত সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শৈলী ও আকল্পের রূপান্তর আসলে তাৎপর্যে রাজনৈতিক। তবে আরও একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার আয়োজন যতক্ষণ গভীরতর ভাবাদর্শগত প্রেরণা কিংবা সামাজিক ইতিহাসের নিবিড় পাঠ থেকে উঠে না আসছে, অন্তত ততক্ষণ এর উপযোগী প্রতিবেদন দানা বাঁধছে না। কিংবা একক প্রয়াসের আন্তরিকতা সত্ত্বেও যতক্ষণ ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী খাঁটি প্রাকৃতায়নের অনুভবে এবং প্রতিবাদী নিম্নবর্গীয় চেতনায় ধারাবাহিকভাবে উদ্দীপ্ত না হচ্ছেন—ততক্ষণ তাঁর উদ্যমের আয়ু দীর্ঘজীবী হচ্ছে না। এইজন্যে ত্রৈলোক্যনাথ স্বকালে কোনো সহযাত্রী পাননি কিংবা কাছাকাছি সময়ে তাঁর উত্তরসূরিও কেউ ছিল না। ঔপনিবেশিক মহাসন্দর্ভের কেন্দ্রীভূত প্রতাপের আলোকবিচ্ছুরণ এতই চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে সমান্তরাল অপরসত্তা সম্পর্কে কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না কোথাও। ফলে ত্রৈলোক্যনাথ ভুল ভাবে ব্যাখ্যাত হন রঙ্গব্যঙ্গের লেখক বা উদ্ভট রসের যোগানদার বা শিশুপাঠ্য রূপকথার কথক হিসেবে। আখ্যানে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া প্রতিহত হওয়ার এবং প্রতিবাদী বিকল্প গড়ে ওঠার নিদর্শন ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় প্রাথমিক ভাবে দেখেছি; আর, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, এখন সেই ধারা পণ্যসর্বস্ব শিবিরের সমস্ত বিরোধিতা চূর্ণ করে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও গায়ত্রী শঙ্কিত হয়ে বলেছেন 'the declared rupture of decolonization, boringly repeats the rhythms of colonization with the consolidation of recognizable styles' (প্রাগুক্ত ২২৩), তাঁর আশঙ্কার সঙ্গে একমত হয়েও বলা যায়, এক ঝাঁক তরুণতর লিখিয়েদের মধ্যে উপনিবেশোত্তর চেতনা বিষয়ভাবনায় ও প্রকরণে বিকল্প বাস্তব ও বয়নের খোঁজে দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

এদের পাঠকৃতি বিশ্লেষণ করি যদি, উপনিবেশোত্তর চেতনা মূলত নিম্নবর্গীয় অন্তেবাসীদের প্রান্তিকায়িত অবস্থান থেকে উৎসারিত হয়েছে—একথা স্পষ্ট বুঝতে পারি। একদিকে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা আর অন্যদিকে প্রাকৃতায়নের বিপুল প্রেরণা কীভাবে উপন্যাসের কথাবয়ন, ভাষারীতি ও প্রাকরণিক বিন্যাসকে আমূল পালটে দিচ্ছে এবং পণ্যায়নের বিপ্রতীপ সম্ভাবনাকে সার্থক ভাবে কর্ষণ করছে—এইটি লক্ষ করে পাঠকও ঔপনিবেশিক আধুনিকতা প্রসূত সমস্ত রুদ্ধতা ও স্থবিরতা পেরিয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করে নেন। এমন হয়, কারণ পাঠকৃতির উন্মোচনে তিনিও তো সক্রিয় সহযোগী; বয়নের ভেতরে যে-সমস্ত শূন্যায়তন কিংবা ধূপছায়া-বলয় রয়েছে, তার প্রকৃত তাৎপর্য ছেঁকে নিতে পারেন শুধু সংবেদনশীল পাঠক। প্রাগুক্ত বইগুলিতে কেউ যদি আখ্যানের পেছনে ছুটতে থাকেন, তাঁর যাত্রা শেষ হবে চোরাবালিতে। লেখক অনুপুঙ্খ গ্রন্থনার সাহায্যে বিকল্প বাস্তব ও তাঁর উপযোগী বিশ্ববীক্ষাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস্যভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন কিনা, এই প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরি। পাঠকৃতির তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায়, উপনিবেশোত্তর চেতনায় অর্জিত সামাজিক সত্যটি লেখক ও পাঠকের মধ্যে সেতু গড়ে ওঠার পরেই কেবল প্রকাশিত হতে পারে। পল রিকোর মন্তব্য 'The objectification of meaning is a necessary mediation between writer and reader' (১৯৮১ ১৮৫)। এই সেতু কিন্তু ঔপনিবেশিক আধুনিকতা-স্পৃষ্ট রচনায় গড়ে ওঠে না, কারণ ভোক্তা সম্পর্কে যোগানদারের কৌতূহল নিছক আপাত-কৌতূহল। একটু আগে যে-উপন্যাসগুলির দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তাদের পাঠকৃতিতে কাহিনিমূল্য গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়, কিন্তু সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় তা হলো এই জিজ্ঞাসা কোন্ বার্তা এরা পৌঁছে দিচ্ছে পাঠকের কাছে! রিকো আরো জানিয়েছেন 'to understand a text is to follow its movements from sense to reference, from what it says, to what it talks about!' (তদেব ২১৮)। লক্ষণীয় ভাবে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে উপনিবেশোত্তর চেতনা-ঋদ্ধ কথাকারেরা বহতা কালকে তাঁদের পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় আকল্প হিসেবে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনে, তুলে ধরেছেন। আধুনিকতাবাদীর মতো পৌর্বাপর্যহীন টুকরো সময়কে একান্তিক আধেয় হিসেবে তাঁরা আঁকড়ে ধরেননি। মহাভারতীয় আদিকল্পটি তাঁদের প্রতিবেদনে পুনর্নির্মিত হলো যেন কালঃ পচতীতি বার্তা! স্মৃতিপীড়িত বেদনা ও সমসাময়িক অনুষঙ্গকে তাঁরা নিজ নিজ ধরনে অন্তর্বয়ন হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে উপন্যাসের পক্ষে জরুরি দ্বিবাচনিকতাও তাঁদের রচনায় প্রকট।

শুধু যে লোকায়ত ও ব্রাত্য জীবনের অনাবিষ্কৃত পরিসর এঁদের কথাবয়নের উপজীব্য, তা-ই নয়, মধ্যবিত্তমেদুর অবস্থানে থেকে বাস্তব ও বিকল্প গ্রন্থনা সহ জীবনের বিকল্প পাঠ এবং উপন্যাসের বিকল্প নন্দন প্রস্তাবনাও এদের অভিপ্রায়। তার মানে, উপনিবেশোত্তর সৃজনী কল্পনারও রয়েছে নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র পরিসর। মধ্যবিত্তবর্গ নিয়ন্ত্রিত বাংলা সাহিত্যে এতদিন সাধারণভাবে যাদের প্রত্যাখ্যাত ও দূরীকৃত অপর বলে অপাঙক্তেয় করে রেখেছিল, নতুন চেতনা তাদেরই দিচ্ছে মধ্যমঞ্চে পৌঁছে যাওয়ার গতি ও উপযোগী পরিসর, দিচ্ছে আত্মতার উপলব্ধি ও ভাষা। ফলে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আধিপত্যপ্রবণ সন্দর্ভ অস্বীকৃত হচ্ছে : দেখা দিচ্ছে এমন বিকল্প নান্দনিক প্রত্যয় যা ঐ প্রবণতাকে খোলাখুলি প্রত্যাহ্বান জানায়। ঔপনিবেশিক সত্তার বিচ্ছুরণ অটুট রাখতে গিয়ে আধুনিকতাবাদী উপন্যাস কার্যত সমস্ত ধরনের বিকল্প উচ্চারণের সম্ভাবনাকে খারিজ করে দিয়েছে। উপনিবেশোত্তর চেতনা ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'তে যেভাবে অন্তেবাসীর নিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে মুক্তি দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের মধ্যেই আরেক সমান্তরাল সন্দর্ভ গড়ে নিয়েছিল, তেমনি প্রাগুক্ত কথাকারদের মধ্যে লক্ষ করি ঐ চেতনার বিস্তার আর প্রতিবেদনের আশ্রয় হিসেবে অপর বর্গের সন্ধান। পদ্মাপারের জেলেজীবন, হাঁসুলী নদীর পাশে কাহারদের কৌম সমাজ, তিতাসের তীরে মালোপাড়ার উদয়-অস্ত, তিস্তাপারের বসতিতে রাজবংশীদের ব্রাত্যজীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখি তথাকথিত মূল স্রোতের বহির্ভূত ও বিচ্ছিন্ন অপর বর্গকে প্রান্তিক অবস্থান থেকে তুলে এনে প্রতিবেদনের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন লেখকেরা। সমালোচক টেরি গোল্ডি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যে বিরাজমান ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের আধিপত্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন, প্রাকৃতায়নের প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল (১৯৯৫ ২৩৫)। কারণ লেখকের ভাবাদর্শগত অবস্থান ব্রাত্য লোকায়ত জীবনের কথকতাকেও বৌদ্ধিকতায় রঞ্জিত করে দিতে পারে। তার মানে, ভাবকল্প এবং কল্পনাপ্রতিভার প্রকাশেও মুহুর্মুহু ঘটে যেতে পারে সচেতন বা অবচেতন অন্তর্ঘাত। কেন্দ্রায়িত পণ্যসাহিত্যের অনুপস্থিতিও কখনও কখনও জোরালো নেতিবাচক উপস্থিতি দিয়ে বিকল্প সন্দর্ভে ছায়াপাত করতে পারে এবং করেও থাকে। তাই উপনিবেশোত্তর চেতনার জিয়নকাঠির কার্যকারিতা নির্ভর করে লেখকের প্রখর ভাবাদর্শগত সুস্থিতির ওপর।

সাত

এমন নয় যে লেখকের ভাবাদর্শ ও প্রেরণা প্রতিবেদনে সোচ্চার ভাবে ঘোষিত হবে। বরং যেখানে তিনি নিরুচ্চার, নৈঃশব্দ্যের পরিসরও নান্দনিক প্রতীতির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে সেখানে। কবিতায় বেশি প্রাসঙ্গিক হলেও উত্তরায়ণমনস্ক উপনিবেশোত্তর মননের জন্যেও এই প্রতীতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শব্দিত অভিব্যক্তির চেয়েও দ্যোতনা বা নৈঃশব্দ্যের ভাষা কথাবয়নে—গল্প-উপন্যাস কিংবা কবিতার গ্রন্থনায়—সাম্প্রতিক পর্যায়ে বেশি মনোযোগ দাবি করছে। বস্তুত কথাকারের ভাবাদর্শ ও প্রেরণাকে চিনি এবং অনুভব করি নিরুচ্চার উপস্থিতিতে। পিয়ের মাশেরের একটি মন্তব্য মনে পড়ে, 'an ideology is made of what it does not mention; it exists because there are things which must not be spoken of.' (১৯৭৮ ১৩২)। কবিতায় শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের দ্বিবাচনিকতা যেহেতু অনেক বেশি স্পষ্ট ও প্রখর, ভাবাদর্শের নিরুচ্চার উপস্থিতি সেখানে বেশি অনুভবগম্য। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রলম্বিত ছায়ায় বাংলা কবিতা কীভাবে আকীর্ণ, তার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের চক্রব্যূহ থেকে নিষ্ক্রমণের জন্যে উপনিবেশোত্তর চেতনা কবিতায় মনোযোগী হয়েছে শেকড়-সন্ধানে, প্রাকৃতায়নের মধ্যে খুঁজছে নিদালির ঘোর-ভাঙানো সোনার কাঠি। আধুনিকতা যখন দ্রুত অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদে পরিণত হচ্ছিল, আত্মরতি ও বিচ্ছিন্নতার মোহিনী আড়াল সরিয়ে দিয়ে কবিরা খুঁজতে শুরু করলেন নান্দনিক ও সামাজিক পরিসরের অন্বয়সূত্র। কবিতা বলতে সাধারণ ও বিশিষ্ট পাঠক নির্বিশেষে যে 'কাব্যিকতা'কে বুঝে থাকেন, তার ঘেরাটোপ যিনি প্রথম ভেঙেছিলেন, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই ভাঙার তাৎপর্য বহুমুখী, 'কাব্যিক প্রতিবেদন'-এর মধ্যে অভ্যাসের যে-অনড়তা রয়েছে, তাকে না-ভাঙলে উপনিবেশোত্তর নন্দনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এখানেও পথিকৃৎ। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আকল্প যখন বুদ্ধিজীবী কবিদের মধ্যে একমাত্র আকরণ বলে গৃহীত হচ্ছিল এবং সমস্ত 'অপর' ভাবনার সম্ভাবনাও নির্বাসিত হচ্ছিল—সেসময় রবীন্দ্রনাথই নিয়েছিলেন প্রতিবাদী অবস্থান। তখন, এবং তারপরেও, প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে, খানিকটা অনুকম্পায় আর খানিকটা কৌতুকে, বয়স্কসুলভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিছিয়ে-পড়া-চিন্তা বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কবিতা কী এবং কবিতা কেন—এ বিষয়ে সেদিনকার তরুণ প্রজন্ম যে বৌদ্ধিক অবস্থান নিয়েছিলেন, তার অতিমান্যতা কোনো ধরনের বিকল্পকে ঠাঁই দেয়নি।

কিন্তু জীবনানন্দ যখন 'মধুর অবসাদের', 'নিঃসঙ্গতার' কবি হিসেবে প্রত্যাশিত প্রতিবেদন আর ক্লান্তিহীন ভাবে পুনরাবৃত্ত করতে চাইলেন না, লিখলেন সাতটি তারার তিমির' আর 'বেলা অবেলা কালবেলা' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র কিছু কিছু অগ্রন্থিত কবিতা—প্রচলিত কবিতার কেন্দ্রীভূত আকল্পের/প্রতিবেদনের পক্ষপাতী জনেরা আর্তনাদ করে উঠলেন। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভ্যস্ত পথ থেকে সরে যাওয়ার স্পর্ধা দেখানোর জন্যে অভিযোগের তর্জনি তুলে ধরা হলো জীবনানন্দের দিকে কবি স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন, তিনি 'নির্জনতম' অভিধার মুকুট খুলে ফেলে কোলাহলমুখর জনসমাজের মধ্যে দাঁড়াতে চাইছেন! আসলে কবিতা সম্পর্কিত ধারণার খোলনলচে পালটে দিতে চাইছিলেন জীবনানন্দ; নান্দনিক ও সামাজিক প্রত্যয়ের অন্বয়সূত্র খোঁজার প্রেরণা সেদিন তাঁকে দিয়েছিল উপনিবেশোত্তর চেতনা। এই চেতনাই তাঁকে জরাজীর্ণ বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের সত্যে নিয়ে যাচ্ছিল, কবিতার প্রতিবেদন গড়ে নিচ্ছিল নতুন ছাঁদে ও চরিত্রে—শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের অভিনব আততি ও দ্বিবাচনিকতায়। যাঁর কাছে কবিতা ও জীবন একই রকম জিনিসের দু'রকম উৎসারণ, তিনি যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বলয় থেকে দূরে সরে এসেছেন, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনানন্দের পরে বাংলা কবিতার প্রতিবেদন যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রায়ন প্রবণতার টানাপোড়েন স্পষ্ট। নয়া উপনিবেশবাদের পর্যায়েও ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর আকল্প বেশি মান্যতা পেয়েছে এই মান্যতা কবিতাকে জীবন-বিবিক্ত অবস্থানে নিয়ে যায়নি শুধু, সংযোগের সমস্ত সেতুকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। জীবনানন্দের পথ অনুসরণ না-করেও কোনো কোনো কবি বিকল্প বয়ন ও বিকল্প কৃৎকৌশলের মধ্যে আধিপত্যপ্রবণ সন্দর্ভের ছায়াঞ্চল থেকে মুক্তি খুঁজছেন। উপনিবেশোত্তর চেতনার স্ফুরন ঘটেছে ঐ চেষ্টায়, একথা বলা যায়। কিন্তু ভাবাদর্শ ও প্রেরণার স্থির কেন্দ্র না থাকাতে কোনো ধারাবাহিকতা লক্ষ করি না কবিতায়। পরিসরের সামাজিক ও নান্দনিক মাত্রা তাই কোনো বিশিষ্ট আদলও অর্জন করতে পারেনি। তার ওপর ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নিরন্তর অন্তর্ঘাত, যার প্রভাবে কত ধারা মরুপথে হারিয়ে গেছে। সুকান্ত-মঙ্গলাচরণ-রাম বসু-সুভাষ-অরুণ মিত্র থেকে শুরু করে রমেন্দ্রকুমার-বীরেন্দ্র-শঙ্খ-মণিভূষণ প্রমুখ কবিদের মধ্যে উত্তরায়ণ- মনস্কতার অভিব্যক্তি নিশ্চয় লক্ষ করি; তাঁদের প্রতিবাদী মনন অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের ব্যাপ্ত ছায়াকে অস্বীকারও করে। কিন্তু কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রায়নের দ্বিবাচনিকতা যেহেতু সবসময় স্পষ্ট নয় আর প্রাকৃতায়নের প্রেরণাও উজ্জ্বল নয় সর্বদা, অথচ অন্যদিকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতাবাদের পণ্যায়ন-মুখী যুক্তিশৃঙ্খলার চতুর হস্তক্ষেপে বারবার ধ্বস্ত হয়ে গেছে কবিতার নির্মীয়মান প্রতিবেদন ও বহুস্বরসঙ্গতির প্রস্তাবনা—সম্ভাবনার ইশারা জাগিয়ে রেখেও কত কবি তলিয়ে গেলেন স্বরচিত (এবং এইজন্যে পরিত্রাণহীন) চোরাবালিতে। তবু অন্ধকারের উৎস হতেই আলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসারিত হওয়াটা নিছক আপ্তবাক্য নয় বলে নয়া ঔপনিবেশিক সমাজসংস্থার গোকুলে বেড়ে ওঠে দধীচির বজ্র। উপনিবেশোত্তর ভাবনার উপকূল জেগে ওঠে উত্তরায়ণমনস্ক অনুভূতির শক্তি ও লাবণ্য এবং প্রতিরোধের উপযোগী নান্দনিক কৃৎকৌশল নিয়ে। এমন হয় বলেই ইতিহাস থেমে থাকে না, ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে সামাজিক ইতিহাসের পাঠকৃতি। জ্ঞান, প্রতাপ ও যৌনতাকে আয়ুধ করতে চায় আধিপত্যবাদ কিন্তু নিম্নবর্গীয় অন্তেবাসী জনের অনুভূতি প্রান্তিকায়িত অবস্থান থেকে ইতিহাসেরই অমোঘ নিয়মে মধ্যমঞ্চে চলে আসে। নিরুচ্চার বর্গের কণ্ঠস্বর ক্রমশ জোরালো হয়েছে বলে প্রতিবেদনের সুবিধাবাদী একান্তিকতা কেটে যাচ্ছে, বহুস্বরসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষা শক্তি অর্জন করে নিচ্ছে। বাংলা কবিতায় তাই দেখি সম্ভাবনার পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, প্রাকৃতায়ন প্রতিস্পর্ধা জানাতে পারছে বৌদ্ধিক সন্দর্ভের চাতুর্য-সর্বস্ব কেন্দ্রিকতাকে। জীবনানন্দ-বীরেন্দ্র-শঙ্খ প্রস্তাবিত সঞ্জীবনী ধারাকে প্রজন্মের দূরত্ব থেকে বিনির্মাণ করি যদি, দেখব, নদী একই খাতে দু'বার বয়ে যায় না বলে তাঁদের কৃৎকৌশল ও কবিতার পরিসর হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়নি। কিন্তু কোনো সংশয় নেই যে পরিবর্তনশীল সময়ের অভিজ্ঞতাকে শুষে নিতে নিতে মৌল উপনিবেশোত্তর চেতনার দিগন্ত-বিস্তার ঘটেছে। তার মানে, জীবনানন্দ-বীরেন্দ্র-শঙ্খ-মণিভূষণ যে পতাকা তুলে ধরেছেন এবং কালজ প্রবণতার বাইরে গিয়ে ইতিবাচক জীবন-ভাবনাকে অন্ধকারের নির্লজ্জ ও স্পর্ধিত আস্ফালন উপেক্ষা করে প্রাধান্য দিয়েছেন—সেই বিশ্ববীক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের কবিতায় বিকল্প বীক্ষণ, বিকল্প নন্দন, বিকল্প সন্দর্ভের উৎস হয়ে উঠেছে। অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ যখন নব্য উপনিবেশবাদের প্রতিনন্দনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে উত্তরায়ণমনস্কতায় অন্তর্ঘাত করছে, অপ্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধও নিজের অনেকান্তিক পরিসর খুঁজে নিচ্ছে বাংলা কবিতায়! উপনিবেশোত্তর চেতনার একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হলো বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূগোল জুড়ে বিকেন্দ্রায়ন এবং স্বভাবত প্রাকৃতায়নের আয়োজন। কালিক মাত্রা ও স্থানিক পরিসরের অনৈক্য ও উচ্চাবচতা আজকের কবিতার প্রতিবেদনে বিচিত্র কৌণিকতা ও জঙ্গমতার আকর। বহু সমান্তরাল অপরের সহাবস্থান কবিতার স্বরন্যাসে নিয়ে এসেছে আশ্চর্য অভিনবত্ব। যদিও, এক্ষেত্রেও, কবির সামাজিক ও নান্দনিক ভাবাদর্শের অন্বয় খুব জরুরি প্রশ্ন। কেননা, এই অন্বয়ের অভাবে কত নবীন সূচনার প্রতিশ্রুতি ঈপ্সিত সমাপ্তিরেখায় পৌঁছাতে পারে না। বিভিন্ন কবিদের সন্দর্ভ নিবিড় পাঠ করলে বুঝব কীভাবে নিয়ত পুনর্নির্মিত হয়ে চলেছে সমবায়ী চেতনার পাঠকৃতি। যেহেতু এই সানুপুঙ্খ পাঠের সুযোগ এখানে নেই, উপনিবেশোত্তর নন্দনের স্থপতি কবিদের নামোল্লেখ তালিকামাত্র হয়ে দাঁড়াবে। অতএব এই তালিকা দিয়ে লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, মহানাগরিক 'কেন্দ্রে' গৃহীত হওয়ার হীনমন্যতা কেটে যাচ্ছে বলে নির্মল হালদার-কল্লোলশ্রী মজুমদার-বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়-তপন রায়-শঙ্করজ্যোতি দেব-গৌতম মিত্র-প্রবুদ্ধসুন্দর কর-রুদ্র পতি-বিশ্বরূপ দে সরকার-গৌরীশঙ্কর দে-সাজিদুল হক-খোন্দকার আশরাফ হোসেন-এজাজ ইউসুফী-মৃদুল দাশগুপ্ত-রাহুল পুরকায়স্থ ইত্যাদি নামগুলি তাৎপর্যবহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছে আজকের নিবিষ্ট পাঠকের কাছে। এখানে গায়ত্রীর একটি সংবেদনশীল মন্তব্য সমর্থিত হচ্ছে যেন "Postcoloniality may serve as the name of a strategy that repeatedly un-does the seeming opposition' (১৯৯২ ২৩৯)। খুব সত্যি কথা। এই যে উপনিবেশোত্তর কৃৎকৌশলের কথা বলা হলো, তা কি শুধু কবি-লিখিয়েদের জন্যে? না, একই সঙ্গে পাঠকের পক্ষেও কথাটা প্রযোজ্য! নতুন চেতনায় পাঠকের দায়ও আজ বেড়ে গেছে অনেকখানি। সমাজে যাঁরা ধারাবাহিক ভাবে নিপীড়িত, কীভাবে পাঠকৃতিতেও তাঁদের প্রান্তিকায়িত হতে হয়েছে, এইটি লক্ষ করে তিনি নিজস্ব পাঠপ্রকরণকে কৃৎকৌশল হিসেবে তৈরি করুন। কেন্দ্রায়িত সন্দর্ভে যেহেতু সত্যভ্রম আড়াল করে রাখে প্রকৃত সত্যকে—তাকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আগে ফাঁপা ইমারত বা মিথ্যার স্থাপত্যকে চিনে নিতে হবে। তিনি দেখবেন কীভাবে কথাবীজ, ভাববীজ বাচন বা ভাষাবিন্যাস, আঙ্গিক বা আকরণ, পরিসর বা প্রেক্ষিত, কালিক মাত্রা বা স্থানিক আয়তন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বময় সামাজিক ইতিহাস নিয়ন্তা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি লক্ষ করবেন, ইতিহাসের পাঠ যাদের বীক্ষণবিন্দু থেকে তৈরি হচ্ছে—তারাই ঠিক করে দিচ্ছে নান্দনিক প্রত্যয় ও অভিব্যক্তির সার্থকতা ও অসার্থকতা। পাঠক যখন বিনির্মাণ করবেন, তাঁকে এই বড়ো বাধা পেরিয়ে যেতে হবে আগে। পাঠকৃতির মধ্যেই কীভাবে প্রায়-নিরুচ্চার ও নিরুচ্চারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে বিপ্রতীপ কণ্ঠস্বর কিংবা অনুপস্থিতের মধ্যে সম্ভাবনাময় কোনো উপস্থিতি, এইটি বোঝার জন্যে প্রতিবেদনে চিহ্নায়কের বা সংকেতের পরম্পরাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করবেন তিনি। যা প্রতীয়মান, তার প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা না-দেখিয়ে সম্ভাবনার আশ্রয় হিসেবে অর্থাৎ পাঠকের নিজস্ব সন্দর্ভে পৌঁছানোর জন্যে কবি-লেখক উত্থাপিত জরুরি আদি-পাঠ হিসেবে ঐ প্রতীয়মানকে গ্রহণ করবেন। বলা ভালো, সমস্ত আরোপিত উপস্থিতির অন্তরালে থাকা সম্ভাব্য এক গভীরতর সত্যের সাংকেতিক গ্রন্থনায় পৌঁছানো উপনিবেশোত্তর চেতনার অভিপ্রেত এবং পাঠকের অপরিহার্য কৃত্য। বারবারা জনসনের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে 'The deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion, but by the careful tearing out of warring forces of signification within the text itself.'

আট

তাহলে মোদ্দা কথা এই যে শমীগর্ভে প্রচ্ছন্ন আগুনের মতো উপনিবেশবাদী সন্দর্ভের গভীরে জন্ম নিয়েছে উপনিবেশোত্তর চেতনা। অন্যভাবে বলা যায়, আধিপত্যবাদী ও কেন্দ্রীভূত আত্মতার প্রতিপত্তি ধারণ করে তার বিপ্রতীপকে অর্থাৎ প্রতিরোধকামী ও বিকেন্দ্রায়িত অপরতার প্রাকৃত উপলব্ধিকে। এই চেতনা পুনর্নির্মাণের মধ্যে নবীন জীবনস্বপ্নের ঘোষণা করে এবং সেইজন্যে বিকল্প থেকে বিকল্পান্তরে যেতে তার বাধা নেই কোনো। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক নির্মিতি প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠা দিতে

—দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চায় বলে তার মধ্যে রয়েছে সমস্ত বিকল্প সম্ভাবনার প্রতি উদ্ধত অস্বীকৃতি! প্রতীচ্যের সমৃদ্ধ ভোগবাদী দেশগুলিতে আধুনিকোত্তরবাদ যত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বে নানা কৌশলে নব্য উপনিবেশবাদ বাড়বাড়ন্ত অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করছে—সেই অনুপাতে, ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, পিছিয়ে-পড়া সমাজগুলিতে স্থানিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানাভাবে বিকশিত হচ্ছে উপনিবেশোত্তর চেতনা। ফলে সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক সন্দর্ভে যা ছিল পরিধিতে প্রান্তিকায়িত, সেইসব চলে আসছে ভাবকেন্দ্রে। বিষয় ও বিষয়ীর পুরোনো বিভাজন অটুট থাকছে না। কিন্তু এই পরিবর্তনেরও আছে নিজস্ব প্রকরণ ও যুক্তিবিন্যাস। যেমন : বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে পুনর্নির্মাণে পৌঁছানো। আবার, বিনির্মাণও কোনো সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শগত অবস্থান ছাড়া লক্ষ্যহীন ও তাৎপর্যহীন হতে বাধ্য। তাছাড়া উপনিবেশোত্তর চেতনা স্বভাব-পরিচয়ে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলে দ্রোহাত্মক প্রতিরোধ তাকে কোনো মেকি নিরপেক্ষতার মুখোশ পরতে দেয় না। লাঞ্ছিত অন্তেবাসীদের জন্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছে এই চেতনা, তাই সমস্ত ধরনের বিভাজনপন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিম্নবর্গীয় ভাবনা এবং নারীচেতনাবাদকে তার আয়ুধ ও পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে। সন্দেহ নেই যে, ব্যাপক ও গভীর রাজনৈতিক অবচেতনায় তার শেকড় দৃঢ়প্রোথিত। এই নবীন চেতনায় উদ্ভাসিত পাঠকৃতির নিবিষ্ট বিশ্লেষণ সম্ভব হচ্ছে না এখানে, একথা আগেই লিখেছি। শুধুমাত্র বক্তব্যের সমর্থনে গত কয়েক বছরের কয়েকটি মাত্র পাঠকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কবিতায় সব্যসাচী দেবেরে 'মেঘদূত', অমিতাভ গুপ্তর 'বুলন্দ দরওয়াজা', অঞ্জন সেনের 'গৌড়বচন', গৌতম বসুর "অন্নপূর্ণা ও শুভকাল", মোহাম্মদ রফিকের "গাওদিয়া", খোন্দকার আশরাফ হোসেনের "সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর" এবং ছোটগল্পে মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' বা 'স্তনদা...ী', হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পাতালে হাসপাতালে' ...রথ মিশ্রের 'রাবণ' বা 'ঝোরবন্দী', অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' বা 'ব্রাহ্মণ', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু' বা 'ভিডিও ভগবান নকুলদানা', অমর মিত্রের 'জংশন', সৈকত রক্ষিতের 'উঠোরে পুতা জাগোরে পুতা'। নাটকেও উপনিবেশোত্তর চেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ করি নাট্যকার-পরিচালকদের প্রাকৃতায়নে, বিকল্প বাস্তব ও বিকল্প নাট্যগ্রন্থনার সন্ধানে। আর, সেইসঙ্গে বিকেন্দ্রায়নের প্রবণতায়! পরনির্ভরতা কেটে যাচ্ছে নাটকে, সময় ও সমাজের দেশজ রূপ খোঁজার ক্ষেত্রে দ্বিধা নেই বলে দর্শকও হয়ে উঠছেন নাট্যকৃতি গ্রন্থনার সহযোগী। বালুরঘাট-কোচবিহার- আগরতলা-খোয়াই-শিলচর-চট্টগ্রাম-বগুড়া-পুরুলিয়ার মতো মফঃস্বলেও নাটকচর্চায় নবার্জিত উপনিবেশোত্তর নন্দন ব্যাপক প্রকৃতায়ন ও মৌলিক পুনর্নির্মাণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে যে-পরগাছাবৃত্তি দেখা দিয়েছিল, তাকে পরাভূত করে নতুন চেতনা। কেননা, আগেই লিখেছি, যেখানে নিষ্পেষণ সেখানেই তার প্রতিবাদের আয়োজন। একে বিল অ্যাশক্রফ্‌ট প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা (১৯৯৫ ১১৭) 'discourse of oppositionality' বলতে চেয়েছেন এবং আধুনিকোত্তরবাদী সন্দর্ভের সঙ্গে লক্ষ করেছেন তার নিবিড় সাদৃশ্য! তাঁদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মতে মূল কথা হল 'the postcolonial project of dismantling of the centre/ Margin binarism of impartial discourse' (তদেব)। শুধু তা-ই নয়, হোমি ভাবা বা এডোয়ার্ড সাঈদ বা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভকের বিশ্লেষণী পাঠ অনুসরণ করে বেশ কিছু পরিচিত আকরণোত্তরবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে এই চেতনার বিপুল সাদৃশ্য লক্ষ করি। চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার অস্থিরতা ও মেরুবদল, বাচনিক কাঠামোয় অর্থাৎ ভাষায় ও প্রতিবেদনে দ্রষ্টা-সূত্রধার ব্যক্তিসত্তার বিশেষ অবস্থান এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতাপের চলিষ্ণুতা এবং তার প্রত্যাহ্বানের স্বীকৃতি—এই সবই উপনিবেশীকৃত মনের শৃঙ্খলমুক্তির সূচক। রাজনৈতিক অবচেতনায় পুষ্ট এই সংবেদনা হয়তো বা আকরণোত্তরবাদী ভাবনার নানা ধরনের চিত্রিত আঙ্রাখা চাপিয়ে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক ও নব্য উপনিবেশবাদী সমাজে অন্তেবাসী বর্গের আত্মউন্মোচক 'Subversive Strategy' হিসেবে একে বুঝতে ও গ্রহণ করতে বাধা হয় না কোনো। ফ্রেডরিক জেমসনের প্রবাদপ্রতিম শব্দবন্ধ অনুযায়ী আধুনিকোত্তরবাদ হলো বিলম্বিত পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক যুক্তিশৃঙ্খলা—যা কিনা নব্যঔপনিবেশিক পর্যায়ে এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ে গড়ে-ওঠা এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার আস্ফালন পর্বে ভারতের দ্রুত পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রেক্ষিতে সমস্ত স্থানিক আয়তন ও বৈশিষ্ট্য ভেঙে দুমড়ে মুছে নিয়ে একই ছাঁচে সব কিছুকে ঢালাই করে দিতে চাইছে। উপনিবেশোত্তর চেতনা হলো বিড়ম্বিত, নিরুপায় ও প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজনের বেঁচে থাকার রণকৌশল, প্রতিরোধের ঘোষণা ও যুদ্ধক্ষেত্র। সাম্প্রতিক নারীচেতনাবাদও স্বভাবত একই মোহানায় এসে মিশছে। বহু উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির সংশ্লেষণ প্রবল হয়ে উঠছে যত, পাঠকের দায়িত্বও সেই অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে এবং জটিলতর হচ্ছে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিসর। কুমকুম সাঙ্গারি উপনিবেশোত্তর লেখকের 'hybridity' এবং 'continual deferral authenticity' (১৯৯৫ ১৪২ ১৪৭)-এর কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন, এ হল সৃজনী ক্ষমতার উৎস। বাংলা সাহিত্যের দিকে যখন তাকাই, এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে পাঠকৃতির নিয়ন্তা বলে শনাক্ত করতে পারি।

আকরণোত্তরবাদীরা সাধারণত চিন্তার পৌত্তলিকতাকে ভেঙে দিতে চান কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন প্রতিমা অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেখা দেয় অনাবিষ্কৃত পথ সন্ধানের আগ্রহ আর, জীবনানন্দ যাকে বলেছেন নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য—তারই আলোকসম্পাত। পুনঃপাঠের সাহায্যে তাই চেনা জগৎকেও রহস্যনিবিড় হয়ে উঠতে দেখি। বহুপঠিত পাঠকৃতি ও পুরোপুরি নতুন তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিন্যস্ত হয়ে এমনভাবে অন্তর্দীপ্তি অর্জন করে যে নিয়মের পুরোনো খাত নতুন চিন্তার স্রোত বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে। অবশ্যই সরলীকৃতভাবে বলছি না যে, পুরোনো বোতলে নতুন মদ পরিবেশন করছে আকরণোত্তরবাদ। তবে এইটুকু বলব যে, এই ভাবনা-প্রস্থান শুরু হওয়ার পরে কিছুটা সময় পাড়ি দিয়ে এসে পুনর্বিবেচনার সুযোগ পেয়েছি আমরা। তাতে মনে হচ্ছে, এক ধরনের নব্য রোমান্টিকতা ও ইতিহাসাতিযায়ী অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার ঝোঁক এতে রয়েছে। ফলে চিন্তার পৌত্তলিকতা ভাঙতে চেয়েও শেষপর্যন্ত এক ধরনের বিধিবিন্যাসের কাছে আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মান্যতা দিচ্ছেন আকরণোত্তরবাদী। অন্যদিকে উপনিবেশোত্তর সাহিত্যপ্রয়াস প্রচলিত নিয়ম বা নান্দনিক সংস্কার বা বিধিবিন্যাসকে বহুধা-বিভাজিত সমাজের প্রতাপ বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৃৎকৌশল হিসাবে দেখে থাকে। ফলে ইতিহাসের কেন্দ্রায়িত সন্দর্ভের দৃশ্য ও অদৃশ্য নিগড়গুলিকে বিষয়-চেতনায়, প্রকরণবোধ, ভাষাবিন্যাসে এক কথায় প্রতিবেদনের কোষে কোষে আর স্তরে স্তরে ব্যক্ত সানুপুঙ্খ গ্রন্থনায়—প্রতিহত করার আয়োজন গড়ে তোলে নতুন নন্দন। সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি, তার খোলনলচে পাল্‌টে দিতে চায় উপনিবেশোত্তর চেতনা। শুধুমাত্র বৌদ্ধিকতায় মানুষের অস্তিত্বকে টুকরো করে না দেখে তার সমগ্র সত্তাকে বিশ্লেষণ করে নির্মীয়মান ইতিহাসের পটে। ফলে এই পর্যায়ের সাহিত্য সমালোচনা কিংবা তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাও ভিন্ন গোত্রের হতে বাধ্য। সুতরাং আকরণোত্তরবাদের ছায়া যতই থাকুক, উপনিবেশোত্তর চেতনায় নিষ্ণাত উত্তরায়ণমনস্ক সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাঠকৃতি তাৎপর্যে ও অভিব্যক্তিতে ভিন্ন হবেই। ইতিহাসের ভুল পাঠ যে-কৃষ্ণবিবর তৈরি করেছিল, তার আগ্রাসন থেকে নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজনেরা এবং নারী নিজেদের মুক্ত করে নিচ্ছে। কেন্দ্র-পরিধির দ্বিবাচনিকতায় সমস্ত অপরসত্তা ও অনালোকিত আঞ্চলিক সমাজ তার প্রকৃত উপলব্ধি ও শেকড়ে জলের ঘ্রাণ দিয়ে নতুন ভাষা ও নতুন বার্তা পেশ করছে। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির জটিলতা যত নতুন মোড় নিচ্ছে, কালিক মাত্রা ও স্থানিক আয়তন তত বেশি প্রখরতা নিয়ে নবীন পরিসরের দাবি পৌঁছে দিচ্ছে পাঠকের কাছে।

হ্যাঁ, পাঠকেরই কাছে; কেননা, এখনও উপনিবেশোত্তর চেতনা তার ক্রান্তিলগ্ন পেরিয়ে যায়নি। আধিপত্যপ্রবণ মহাসন্দর্ভের প্রলম্বিত ছায়া এত তাড়াতাড়ি মুছে যায় না; তাই নিরন্তর পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক বিনির্মাণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেছেন। ইতিহাস অনুশীলন থেকে অর্জিত সুনির্দিষ্ট বীক্ষণবিন্দু থেকে পাঠক যখন সূত্রধার-লেখকের আদিপাঠ গ্রহণ করছেন এবং হয়ে উঠছেন পুনর্নির্মাণের কুশলী স্থপতি—ঔপনিবেশিক রুদ্ধতার বিপ্রতীপে আমরা পাচ্ছি মানবিক ও শৈল্পিক সম্ভাবনার পরাজগৎ। বিকার ও স্থবিরতার উল্টো পিঠে স্বভাব ও গতির এই বিচ্ছুরণকেও অন্তর্ঘাত করবে, বলা ভালো করছে, বিমানবায়নপন্থী নব্য ঔপনিবেশিক আধুনিকতাবাদ। তাই সোনার হরিণের হাতছানিতে লুব্ধ ও ভ্রষ্ট হওয়াটা এড়ানো যাচ্ছে না। সুতরাং প্রতিনন্দনের চতুর ও চোরাগোপ্তা আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার জন্যে উপনিবেশোত্তর চেতনাসম্পন্ন কবি-লিখিয়েরা ইতিহাস-নিবদ্ধ দৃষ্টিকে আবিল হতে দেবেন না নিশ্চয়। সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক ঠিকই লিখেছেন 'the problems of representation in the postcolonial text assume a political dimension' (১৯৯৫ ১১৮)। জীবনানন্দের ভাষায় তাই এই চেতনার ভরতবাক্য লেখা যেতে পারে

> 'পথ থেকে পথান্তরে সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
> দূরতর অন্তঃস্থলে সত্য আছে, আলো আছে, তবুও
> সত্যের আবিষ্কারে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্ক্সীয় সাহিত্যবীক্ষা

অন্য যে-কোনো তত্ত্ব-প্রস্থানের তুলনায় মার্ক্সবাদ অনুপ্রাণিত সাহিত্য-ভাবনার ইতিহাস সবচেয়ে দীর্ঘায়ত এবং অন্তর্বস্তুর বিচারে সবচেয়ে গ্রন্থিল। এর মধ্যে রয়েছে নানা পর্যায়, নানা স্তর, নানা বিভঙ্গ। কাল থেকে কালান্তরে যত বিবর্তিত হয়েছে মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, মার্ক্সীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যেও ঘটে গেছে অভূতপূর্ব রূপান্তর। সাহিত্য-সমাজ-নন্দন-ইতিহাস-দর্শন অর্থাৎ মানববিশ্বের এমন কোনো দিক নেই, যার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষা বারবার জীবনের নতুন তাৎপর্য খুঁজে নিতে চায়নি। অথচ রাজনৈতিক কারণে মার্ক্সবাদের এই রূপান্তর প্রবণতা সবার কাছে সমান গুরুত্ব পায়নি। আংশিক ব্যাখ্যা ও ভুল বিশ্লেষণে মার্ক্সবাদের সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বের নিগূঢ় সম্পর্কও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষা বহু ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে এবং সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করে তাতে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা ও কৌণিকতা। এক কথায় মার্ক্সীয় বীক্ষণরীতি চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে দিয়েছে এবং তত্ত্ববিশ্বের মানবিক উপযোগিতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রতাপের ঔদ্ধত্য যখন সর্বগ্রাসী, খুব সূক্ষ্মভাবে মার্ক্সীয় বীক্ষা অন্তর্বয়নের অনেকান্তিক টানা ও পোড়েন হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। উনিশ শতকে প্রথম আবির্ভাব-লগ্নে তার যে-তাৎপর্য ও চরিত্র ছিল, বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে তাতে প্রভূত বিবর্তন ঘটে। তখন প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল বিতর্কিত পটভূমি। আবার পরের কয়েকটি দশকে মুহুর্মুহু পাল্টে গেছে তার তাৎপর্য ও সংকেত। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্নে দোলায়িত হয়েছে মার্ক্সীয় বিশ্বাসের জগৎ, স্বভাবত ভাষ্য থেকে ভাষ্যান্তরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসার ধরনও পাল্টে গেছে। মূলত মার্ক্সীয় সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি বিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। মানববিশ্বের কত ভাঙাগড়া ও পালাবদল এই সদ্যবিলীন শতকে আমরা দেখতে পেয়েছি, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও তাদের অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা, আণবিক বোমার বীভৎস প্রতিক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী নৈতিকতায় ও সৌন্দর্যবোধে চরম ভাঙন, গণমাধ্যমের বিস্ফোরক প্রকাশ, প্রায়োগিক কৃৎকৌশলের সার্বিক আগ্রাসন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লব, সর্বগ্রাসী বিমানবায়ন মানুষের জগৎ কোথাও আর স্থায়িত্ব খুঁজে পাচ্ছে না। সংশয় ও রিক্ততা পর্যন্ত বৌদ্ধিক চর্চার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। অস্থিরতার ফলে সময় ও পরিসর সম্পর্কিত যাবতীয় ধ্যানধারণা এই মুহূর্তে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের ঝড়ে আন্দোলিত হচ্ছে। মার্ক্সীয় চেতনা থেকে মার্ক্সবাদ-উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতির কথাও বিবেচনা করছেন কেউ কেউ। তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে পৃথিবী জুড়ে যে পুনঃপাঠ ও পুনর্বিশ্লেষণের তাগিদ দেখা দিয়েছে, মার্ক্সীয় সাহিত্য-জিজ্ঞাসার উপযোগিতাকে তারই নিরিখে পর্যালোচনা করতে চাইছেন কেউ কেউ।

সব মিলিয়ে একথা স্পষ্ট যে প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন মার্ক্সীয় তত্ত্বপ্রস্থানের পুনর্বিবেচনা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, মানবিক অস্তিত্বের নির্যাস, যুক্তি-বিন্যাসের আকরণ, অনুভূতি ও আবেগের সংগঠন—সমস্তই এখন আমূল পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-প্রকরণ প্রত্যাহ্বান ও সংশয়ের মোকাবিলা করতে বাধ্য হচ্ছে। লক্ষণীয়ভাবে, নিজস্ব সীমান্তের মধ্যে এদের কেউই সম্ভাবনার সমস্ত সূত্র চূড়ান্তভাবে তুলে ধরতে পারছে না। অন্য দিক দিয়ে, বহুত্ববাদী এই সময়ে নিজেদের প্রতিবেদনকেও একই সঙ্গে সংশ্লেষণ ও মৌলিকতার প্রতি দায়বদ্ধ রাখতে অসমর্থ হচ্ছে। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে যতই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ ও যান্ত্রিকতার অভিযোগ তুলে ধরা হোক, মার্ক্সীয় চিন্তা-পরম্পরা এখনও পর্যন্ত মানবিক সত্যের সন্ধান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই বইতে আলোচিত প্রতিটি তত্ত্বপ্রস্থানে মার্ক্সীয় চিন্তাবিদেরা হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছেন নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার তাগিদে। সুতরাং ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ থেকে সাম্প্রতিক চিন্তা-চেতনার পর্যায় পর্যন্ত তত্ত্ববিশ্বে বহুস্বরসঙ্গতির উপযোগী প্রতিবেদন কীভাবে নির্মিত হয়ে চলেছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করাও আমাদের বড়ো একটি দায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কার্ল মার্ক্স যখন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু সাধারণ মন্তব্য করছিলেন, সাহিত্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু সন্দর্ভ গড়ে তোলার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। তবে কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্—দুজনেই ছিলেন বহুশ্রুত সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব। সমাজ-বদলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তাঁরা যখন ব্রতী হয়েছিলেন, পাশাপাশি মানববিশ্বের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি হিসেবে সাহিত্যকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের ইতস্তত ছড়িয়ে-থাকা রচনাপুঞ্জ থেকে সন্ধান ও বিশ্লেষণের সাহায্যে মার্ক্সীয় সাহিত্যভাবনার বস্তুভিত্তি তৈরি করে নিয়েছে। যদিও মার্ক্স-এঙ্গেলসের বিপুল রচনার তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য, তবু সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐ ভাবনাসূত্রের প্রভাবের পরিধি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। আসলে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ জীবন ও জগৎকে বিশ্লেষণ করার জন্যে মূল যে-বিশ্ববীক্ষার সন্ধান দিয়েছিলেন, তারই সূত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও প্রসারিত করে গড়ে তোলা হয়েছে মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিবেদন। স্বভাবত মূল প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে জীবন ও জগৎকে দেখার চোখ নিয়ে। যাঁর সেই দৃষ্টি নেই, তিনি অবিরত অবিশ্বাস ও সংশয়ের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াবেন। আবার এই বিশেষ ধরনের চোখে বিশ্বাস যাদের অস্খলিত, তাঁরাও এক ধরনের রৈখিকতা ও বৃত্তবন্দিত্বের শি[illegible] ২৫৩ পারেন যদি অনবরত ঐ দেখার প্রামাণ্যতাকে প্রশ্ন না করেন। শুধু তা-ই নয়, অহরহ পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়েও তত্ত্বের উপযোগিতা পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন এবং ভাবনার মূল ভরকেন্দ্রকে অবিচলিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেখে তত্ত্বচিন্তার বিন্যাস ও পরিধিকে পুনর্গঠন করার প্রস্তুতি নেওয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্য কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনা থেকে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব নির্মাণ সাধারণত অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে গিয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদেরা বহু স্ববিরোধিতা ও কূটাভাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সরলীকরণ ও যান্ত্রিকতা সবচেয়ে বড়ো দুটি বিপদ; স্বভাবত প্রতিপক্ষ এর সুযোগ নিতে দ্বিধা করেনি। এখানে শুধু একথা বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক বর্গগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে নান্দনিক উপলব্ধির সূত্র ও প্রতীতি। যাদের স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস বলা হচ্ছে, গভীর ও সংবেদনশীল বিশ্লেষণে তাদেরও যে মীমাংসা সম্ভব—সেদিকে আলোকপাত করেছেন কেউ কেউ। বহতা জীবন একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বর্গায়তনগুলিকে ধারণ করে—যার প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হল বিপরীতের ঐক্য। সামাজিক উৎপাদনের মতো সাহিত্যও মূলত উৎপাদন। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর রচনা থেকে যে সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের আদলটি পাওয়া গেছে, চিন্তাবিদদের প্রকৃত উপজীব্য হলো তা-ই। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে নানা পর্যায়ে কীভাবে তত্ত্বের কাঠামোটি গড়ে উঠেছে, আমাদের লক্ষ করতে হবে সেদিকে। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ ঐ জীবনদর্শনের মুখ্য স্থপতি; তাঁদের দর্শনের আলোয় উদ্ভাসিত পরবর্তী তত্ত্বপ্রবাহ। আজকের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সংকটের দিনে বহু আলোচক যে পুনঃপাঠ করতে চাইছেন তাঁদের মৌলিক রচনাকে—এর তাৎপর্য কম নয়।

আমাদের শুধু মনে রাখতে হয় একথা, চরিত্রগত ভাবে মার্ক্সীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিত একই সঙ্গে বিশ্লেষণপ্রবণ ও রাজনৈতিক। কোনো পূর্ব-নির্ধারিত চিন্তার আকরণকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, জগৎ ও জীবনের বিবর্তনশীল চরিত্রকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা। ফিরিয়ে আনতে হয় তাই লেনিনের দুটি বিখ্যাত উচ্চারণকে 'বিপ্লবী মতবাদ কোনো প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য নয়।' (বামপন্থী কমিউনিজম শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা) এবং 'মতবাদকে বাস্তব কাজে লাগাতে হয়; বাস্তব কাজকর্মের মধ্যে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, মতবাদকে তার উত্তর দিতে হয়।' (জনসাধারণের বন্ধুদের স্বরূপ কী) এইজন্যে দার্শনিক উপলব্ধির মূল পরিপ্রেক্ষিত অবিচলিত থাকলেও বিভিন্ন পর্যায়ে তার তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি ভিন্ন না হয়ে পারে না। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষে বাস্তবতার দাবিতে চিন্তাধারা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, লেনিনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বক্তব্য তা থেকে আলাদা। আবার, লেনিনোত্তর রাশিয়ায় সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে দেখা গেল নিয়ন্ত্রণবাদের দাপট। গিয়র্গ লুকাচ চিন্তাজীবনের শুরুতে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির যে-আদল গড়ে তুলেছিলেন, শেষ পর্যায়ে তা থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন। একইভাবে ইতিহাসের তাগিদে গ্রামশি মূল পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেই ভিন্ন ধরনের চিন্তার আকরণ গড়ে নিয়েছেন। তাঁরা যদি শুধুমাত্র সময়ের দাবি মিটিয়ে শেষ হয়ে যেতেন তাহলে নতুন আধুনিকোত্তর এবং প্রতিবিপ্লবোত্তর বিশ্বপরিস্থিতিতে লুকাচের বিবর্তন ও গ্রামশির তত্ত্ববিশ্ব ইদানীং আর পুনঃপঠিত ও পুনর্বিশ্লেষিত হত না। একই ভাবে রেমন্ড উইলিয়ামস, লুই আলত্যুসের, টেরি ঈগলটন, ফ্রেডরিক জেমসন, থিয়োডোর অ্যাডোর্নো, লুসিয়েন গোল্ডম্যান, হার্বার্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কুজ, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনদের বক্তব্য নিবিষ্ট মনোযোগ দাবি করে। এঁরা প্রত্যেকে সময়ের দাবি অনুযায়ী চিন্তাপ্রকরণকে পুনর্বিন্যস্ত করতে গিয়ে মার্ক্সীয় ভাববিশ্বের মূল পরিপ্রেক্ষিতকে কতটা সমৃদ্ধ করেছেন বা নতুন মাত্রা ও কৌণিকতা যোগ করেছেন—বিশেষভাবে সেকথা বিচার্য।

দুই

এবিষয়ে যে-কোনো আলোচনার শুরুতে কার্ল মার্ক্সের দুটি বহুচর্চিত মন্তব্য স্মরণ করা আবশ্যিক : (ক) চেতনা মানুষের সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না; মানুষের সামাজিক প্রেক্ষিতই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। (খ) দার্শনিকেরা নানাভাবে এ জগতের ভাষ্য করেছেন। জগতের সার্বিক পরিবর্তন ঘটানোই আমাদের দায়।

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে এই দুটি কথা যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল তার কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনে চৈতন্যের সার্বভৌমত্ব ছিল স্বতঃসিদ্ধ। কখনও কখনও বস্তুবাদী চিন্তা কিছু কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলেও চেতনার একাধিপত্য ছিল প্রত্যাহ্বানের অতীত। মার্ক্স যেন মধুচক্রে লোষ্ট্রপাত করলেন। দর্শন যে শুধুমাত্র বায়বীয় শূন্যে বিচরণ নয় এবং জগৎকে বিমূর্তায়িত করার অভ্যস্ত প্রবণতার উল্টোদিকেও থাকতে পারে সত্য সন্ধানের বিপ্রতীপ পথ—এবিষয়ে তিনি অবহিত করে তুললেন। এছাড়া বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক পরম্পরায় গ্রথিত এবং হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চিন্তার বিপরীতেও যেতে চাইছিলেন মার্ক্স। ঐ দার্শনিক ঐতিহ্যের মূল বক্তব্য ছিল, এজগৎ চিন্তায় বিধৃত আর সর্বব্যাপ্ত যুক্তির বিধি ক্রমশ দ্বান্দ্বিক ভাবে উন্মোচিত হতে হতে ইতিহাসের প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। যাকে আমরা বস্তুগত অস্তিত্ব বলি, তা আসলে বিমূর্ত আত্মিক নির্যাসের অভিব্যক্তি। মানুষের জীবন প্রশ্নাতীতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মানবিক সমস্ত দৈব যুক্তিতে। অর্থাৎ যাবতীয় ধ্যানধারণা, সাংস্কৃতিক প্রত্যয়, আইন-ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ঐ যুক্তির সৃষ্টি। মার্ক্স এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিকল্প সন্দর্ভ পেশ করলেন। তাঁর মতে আকরণের শিকড় নিহিত রয়েছে ভাবাদর্শের জমিতে আর ভাবাদর্শ হল বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফসল। ইতিহাসের কোনো বিশেষ পর্বে রাষ্ট্রশক্তি যাদের দখলে থাকে সেই আধিপত্যবাদী বর্গ তাদের শ্রেণিস্বার্থ অনুযায়ী সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের উপর নিরঙ্কুশ প্রতাপ বিস্তার করে। নিজেদের উচ্চারণকে তারা গোটা সমাজের উচ্চারণ বলে উপস্থাপিত করে এবং বৃহত্তর জনসাধারণকেও ঐ সংকীর্ণ দৃষ্টির শরিক করে তোলে। সুবিধাভোগী বর্গের ছিল অফুরন্ত অবকাশ কেননা তারা নামমাত্র মূল্যে সভ্যতার পিলসুজরূপী শ্রমজীবীদের কায়িক শ্রমকে কিনে নিতে পারত। অবসর বিনোদনের জন্যে তারা গড়ে তুলত সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের বিপুল সৌধ এবং নিম্নবর্গীয়দের কাছে ঐসব সৌধকে ব্যতিক্রমহীন সত্য হিসেবে তুলে ধরত। এইজন্যে সাহিত্যের বাস্তবতা মানে আধিপত্যবাদী বর্গের বাস্তবতা। বিশ্বসাহিত্যে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মেলে। বাংলা সাহিত্যের দিকে যখন তাকাই, বুঝতে পারি চর্যাপদ ও ময়মনসিংহ গীতিকার মতো দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আসলে একমাত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্রেণি-বাস্তবতার ইতিহাস। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয়দের কণ্ঠস্বর প্রায় সর্বত্র নিষ্পেষিত কিংবা অনুপস্থিত। সমাজে যারা ধারাবাহিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে, অবধারিতভাবে পাঠকৃতিতেও তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। উপরন্তু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতাপের বীক্ষণ আর আধিপত্যবাদী বর্গের ভাবাদর্শ। মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষা এভাবে আমাদের এমন এক দৃষ্টিকোণ উপহার দেয় যাতে আর্থসামাজিক ইতিহাসের প্রাথমিকতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্যে মার্ক্স স্থাপত্যের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন: অধিসংগঠন (Superstructure) এবং অবসংগঠন (base)। অধিসংগঠন বলতে মার্ক্স ভাবাদর্শ, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন আর অবসংগঠন বলতে বুঝিয়েছেন আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক। এরা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে তার বস্তুজীবন গড়ে তোলে, তারই নিগূঢ় প্রতাপে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যেহেতু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ অনিবার্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তার কালো ছায়ায় আবিল না হয়ে পারে না। সমাজের রাশ যাদের হাতে, তারা একদিকে গড়ে তোলে মিথ্যার সযত্ন প্রসাধনচর্চিত প্রতিবেদন এবং অন্যদিকে শ্বাসরুদ্ধ করে শোষিতজনের সত্যকে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বাঙালির জীবনে যেহেতু আধুনিকতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের এবং অবক্ষয়ী আধুনিকতা ও আধুনিকোত্তর প্রবণতার সঙ্গে নয়া ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সম্পর্ক খুব স্পষ্ট, সাহিত্যিক প্রতিবেদনের বহুমাত্রিক জটিলতা বিশ্লেষণের জন্যে মার্ক্সীয় বীক্ষা ও পদ্ধতি খুব কার্যকরী।

অবসংগঠন ও অধিসংগঠনের সম্পর্ক এবং তার সম্ভাব্য যান্ত্রিকতা নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা প্রচুর বিতর্ক ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। এই নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তবে সংকেত হিসেবে মনে রাখা যায় যে বিদ্বজ্জনেরা মার্ক্সের বক্তব্যেও আদি পর্যায় ও পরিণত পর্যায়ের বিভাজন ভেবে নিয়েছেন। বৌদ্ধিক জীবনের শুরুতে মার্ক্স যেভাবে ভেবেছেন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিন্তাধারা বিবর্তিত হওয়ার ফলে পরিণত পর্যায়ে মার্ক্স নিজস্ব চিন্তার কিছু কিছু পরিমার্জন করে নিয়েছেন। বৌদ্ধিক জীবনের শুরুতে মার্ক্স যেভাবে ভেবেছেন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিন্তাধারা বিবর্তিত হওয়ার ফলে পরিণত পর্যায়ে মার্ক্স নিজস্ব চিন্তার কিছু কিছু পরিমার্জন করে নিয়েছেন। তবে একে সংশোধন বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। একথা না লিখলেও চলে যে, মার্ক্স তাঁর মৌল বিশ্বাস থেকে পরবর্তীকালে সরে আসেননি কিংবা এমন কোনো দ্বিধার প্রকাশও ঘটাননি যা আধিপত্যবাদী বর্গের পরিপোষক বুদ্ধিজীবীদের উল্লাসের কারণ হতে পারে। এঙ্গেলস্ জীবনের শেষ পর্বে তাঁর নিজের এবং মার্ক্সের বক্তব্যসূত্র ব্যাখ্যা করেছেন বা স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও তাঁদের মৌল দার্শনিক আকরণ থেকে কিছুমাত্র সরে আসেননি। তাঁরা দুজনেই নতুন মানবিক নির্যাসের সন্ধান করেছেন এবং নতুন মানববিশ্ব নির্মাণের পথরেখা তৈরি করেছেন। শোষণমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার পথ খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা মানবিক সমগ্রতার দাবি মেনে নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। বিকল্প ভাববিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁদেরও অধ্যবসায় নিয়োজিত হয়েছিল। কোনো ধরনের কূট বৌদ্ধিকতা দিয়ে এর অপব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু ইতিহাসের খাতিরে এবং আলোচনার সুবিধার জন্যে উল্লেখ করতে হয় ১৮৪৩ এর 'Economic and philosophical manuscripts' এবং ১৮৪৬ এর 'The German Ideology' এর কথা। বাস্তব জীবন প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ও প্রতিধ্বনি হিসেবে নৈতিকতা, ধর্ম ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মার্ক্স-এঙ্গেলস্ এদের বর্ণনা করেছিলেন 'phantoms formed in the brains of men' বলে। আবার ১৮৯০-এর পরে লেখা চিঠিপত্রে এঙ্গেলস জানিয়েছিলেন, সমাজের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা যদিও সর্বদা অন্য সব উপকরণের চূড়ান্ত নিয়ন্তা বলে গ্রহণ করেছিলেন—তবু একথা তাঁরা জানাতে ভোলেননি, শিল্পকলার মতো চেতনার বিশিষ্ট কিছু অভিব্যক্তি তুলনামূলকভাবে স্বতশ্চল ও স্বতন্ত্র। এঙ্গেলস আরো জানিয়েছিলেন, মানুষের যথাপ্রাপ্ত অস্তিত্বকে বদলে দেওয়ার স্বাধীন প্রকরণ ও ক্ষমতা শিল্পকলার আছে। বস্তুত তা যদি না হত, তাহলে রাজনৈতিক প্রতিবেদন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মার্ক্সবাদীরা জনগণের চেতনা-স্তরকে পরিবর্তিত করার কথা ভাবতেই পারতেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের ওপর দাঁড়িয়ে মার্ক্সবাদী ভাষ্যকারেরা বিগত কালের সাহিত্যিক প্রতিবেদন ও দর্শন-ভাবনা পুনঃপাঠ করতে পারেন। দেখাতে পারেন, কীভাবে আর্থ-সামাজিক অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত হয়েও সেইসব সাহিত্যিক ও দার্শনিক অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র পরিসর গড়ে তুলেছে। সেইসঙ্গে লক্ষণীয়, কীভাবে ঐ পরিসরের নন্দন সমসাময়িক ও পরবর্তী সমাজ-ভাবনাকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিবিষ্ট পাঠে বুঝতে পারি, এমন ঘটে দ্বন্দ্ববাদের নিয়ম অনুযায়ী। এইজন্যে সামন্তবাদী সমাজের ফসল হয়েও কোনো কোনো পাঠকৃতি আগামীকালের কণ্ঠস্বর নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে। কিংবা ধনতান্ত্রিক সমাজের উন্মেষ পর্বের কোনো রচনায় বিভিন্ন বর্গের মধ্যবর্তী টানাপোড়েন ও ভাবাদর্শগত সংঘর্ষ সমকালকে পেরিয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে সমাজের অভ্যন্তরে ঘটতে-থাকা জটিল ও বহুমুখী শ্রেণিদ্বন্দ্ব পাঠকৃতিতে অভিব্যক্ত ভাবাদর্শগত সংঘাত ও সংকটের আকর। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হয় যে অধিসংগঠনের অন্য সব উপকরণের তুলনায় সাহিত্যে এই সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ নয় সব সময়; এমন কি বহুক্ষেত্রে তা সূক্ষ্ম ও আভাসিত। প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে শিল্পের সত্য আর জীবনের সত্য কি আলাদা? এবিষয়ে কূট তর্ক যথেষ্ট হয়েছে। এখানে শুধু একথা বলা যায় যে মূল দার্শনিক পরিপ্রেক্ষা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজে মানুষের সার্বিক বিকাশ সম্পর্কে যাঁর প্রত্যয় অস্খলিত, তিনি হয়তো জীবনানন্দের একটি বিখ্যাত উচ্চারণ মনে রেখে বলতে পারেন, জীবন ও সাহিত্য অভিন্ন বহুস্বরিক সত্যের দুরকম উৎসারণ। সুতরাং শিল্পের সত্য আর জীবনের সত্য আলাদা—এমন কল্পনা অযৌক্তিক। বিপুল মানববিশ্বের সূক্ষ্ম ও ব্যাপক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এরা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত অর্থাৎ সত্য আপাতবিভাজনের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের আগ্রাসনে মানুষ যত আপন সত্তার নির্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত হয়ে পড়ে, ততই জগতের সঙ্গে কোথাও কোনো সঙ্গতিসূত্র খুঁজে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পায় না। ক্রমাগত নিজেকে ব্যর্থ উদ্ভট ও অমানবিক জগতে নিরুদ্ধ কল্পনা করে মানুষ ভোগে হতাশায়, অসহায়তায়, চরম অবসাদে। বিমানবায়নের প্রবল অভিঘাত যেহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি, লেখক-শিল্পীরা যদি এই ব্যবস্থার শরিক হয়ে পড়েন, তাহলে বিরূপ ও বিভ্রান্ত বিশ্বে নিজেকে একাকী পথিক ভাবতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। অর্থাৎ আধিপত্যবাদের ছায়ায় কলুষিত হলে জীবনে ব্যাপ্ত মিথ্যা শিল্পেও মিথ্যার ইমারত গড়ে তুলবে কেবল। আধিপত্যবাদের আগ্রাসন যদি লেখক ও শিল্পীর চিন্তাচেতনাকে অধিকার করে, তাদের অপরিচ্ছন্ন দর্পণে বিমানবায়নের বিকার আরো জটিল ও দুর্ভেদ্য হিসেবে প্রতিফলিত হবে। তাই সৃষ্টিকুশল ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীন ও প্রশ্নময় অবস্থান অত্যন্ত জরুরি প্রাক্‌শর্ত।

ধনতন্ত্রের বিবর্তন মানবিক চেতনার উপর নাগপাশের বাঁধনকে যত নিরঙ্কুশ করে তুলছে, বিমানবায়িত পৃথিবীর দাপট সম্পর্কে যন্ত্রণা-ক্ষোভ-প্রতিবাদ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। তাই বিশ শতকের প্রথম পর্বের সাহিত্যে তবু যতটুকু মানবিক অভিজ্ঞান পাওয়া গেছে, শতকের শেষ পর্বে তার চিহ্নমাত্র নেই। উপনিবেশোত্তর চেতনায় নিষ্ণাত নব্য প্রতিবাদপন্থা উদ্ভূত না হওয়া পর্যন্ত আমরা শুধু পেয়েছি গোলকধাঁধার বিস্তার ও বিচ্ছিন্নতাবোধের ক্রমপ্রসারিত চোরাবালি। মার্ক্সীয় বীক্ষা অনুযায়ী লেখক ও শিল্পীকে কেবলমাত্র পীড়া সংক্রমণের প্রতি তর্জনি সংকেত করে ক্ষান্ত হলে চলে না; উপরিকাঠামো বা অধিসংগঠনের স্তরে প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখার কৃৎকৌশলও সন্ধান করতে হয়। ভিত্তি বা অবসংগঠনের প্রকট অনড়তায় বিব্রত বা হতোদ্যম হয়ে যদি কোনো লেখক তাঁর প্রশ্নার্তি তুলে যান এবং প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য নিগড়ে বন্দী হয়ে পড়েন—তাহলে পণ্যসর্বস্ব বিশ্বপুঁজিবাদের দ্বারা অভিভূত ও জীর্ণ হওয়াই তাঁর নিয়তি হয়ে পড়বে। লেখকের উপস্থিতি সামাজিক অস্তিত্ব- নিরপেক্ষ হয় না কখনও; তাই যিনি স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না, স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ভেসে যাওয়াই তাঁর অনিবার্য ভবিতব্য।

এখানে মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর বিখ্যাত মন্তব্য (Collected Works : voll iii 1975 176) স্মরণ করা যেতে পারে '....immediate task of philosophy, which is at the service of history, once the holy form of human self estrangement, has been unmasked, is to unmask self-estrangement in its unholy forms.'! নিঃসন্দেহে একে আপ্তবাক্য বলে লঘু করতে পারি না; বরং মানববিশ্বের খণ্ডায়ন ও অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্ত ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধের বিকার থেকে মানবিক সমগ্রতায় উত্তীর্ণ হওয়ার অঙ্গীকার লক্ষ করি এখানে। সাহিত্য-পাঠ ও বিশ্লেষণ মূলত ভাবাদর্শের দ্বারা প্রাণিত ও সঞ্চালিত প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ভাবাদর্শগত আকরণের বাইরে কোনো পাঠ বা ভাষ্য গড়ে উঠতে পারে না। আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে অভিব্যক্ত ভাবাদর্শ এবং শৈল্পিক ও সাহিত্যিক বিকাশের মধ্যে প্রতিফলিত ভাবাদর্শ যে গাণিতিক ঐক্যে বিধৃত নয়, সেকথা আগেই লিখেছি। স্বয়ং মার্ক্স সেকথা বলে গেছেন। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও শৈল্পিক বিকাশের মধ্যে জ্যামিতিক যোগসূত্র খোঁজার পরিবর্তে তাদের মধ্যে পরিস্ফুট আপাতবৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত গ্রিক ট্র্যাজেডির নিবিড় অধ্যয়ন-লব্ধ উপলব্ধি থেকে তিনি জানিয়েছেন, সাহিত্য-বিচারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এইসব রচনা শীর্ষস্থানের অধিকারী, যদিও সমাজ-সংস্থা ও ভাবাদর্শগত অবস্থানের দিক দিয়ে এরা উদ্ভূত হয়েছিল সভ্যতার উষাকালে। গ্রিক প্রত্নকথায় প্রতিফলিত ভাবাদর্শ আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক নয় আর; তবু নতুন প্রজন্মের পাঠকও গ্রিক সাহিত্যের প্রতিবেদন পুনঃপাঠ করে গভীরতর তাৎপর্য খুঁজে পান। এই রহস্য মার্ক্সকে ভাবিয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কেন দীর্ঘকাল আগে হারিয়ে-যাওয়া সমাজ-সংস্থায় উদ্ভূত সাহিত্য-শিল্প আজও আমাদের নান্দনিক তৃপ্তি দেয়। মনে মনে ঐ সাহিত্যিক প্রতিবেদনের প্রলম্বিত ছায়াকে আমরা লালন করি; মূল্যবান হিসেবে চিহ্নিতও করি কিন্তু এও জানি যে, ঐ আকল্প প্রাপনীয় নয় আর। কেউ কেউ বলেছেন, মার্ক্স যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কিছু কিছু সূত্র, যেমন সাহিত্য-শিল্পের সার্বভৌম ও কালাতীত স্বভাব, মেনে নিয়েছেন। এঁদের বক্তব্য, এর মানে, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে হেগেলের চিন্তাধারায় শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন মার্ক্স। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হয়, সব জিনিসকে টুকরো-করে-আনা যাদের পদ্ধতি, তারা মার্কসীয় চিন্তাবৃত্তকেও সমগ্রতার বদলে দেখতে ও দেখাতে চাইবে আংশিক ভাবে। মার্ক্স আসলে মূল যে-কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন, তা হল, মহৎ সাহিত্যের হয়ে ওঠা এবং তাদের তাৎপর্যের বিস্তার সামাজিক প্রক্রিয়ারই ফসল। অর্থাৎ গ্রিক ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব মানবিক অস্তিত্বের সার্বভৌম ও অপরিবর্তনীয় অংশ নয়; বরং তাদের মধ্যে প্রতিফলিত জীবনাদর্শ প্রতিটি প্রজন্মে পুনর্নির্মিত হয়ে থাকে। সামাজিক মনন যেহেতু বিবর্তিত হচ্ছে, প্রতিটি পুনর্নির্মাণ তার আলো-ছায়া শুষে নিয়ে নতুন তাৎপর্যবহ হয়ে উঠছে!

রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনাত্মক সন্দর্ভ (১৮৫৭) তৈরি করতে করতে খসড়ার শেষদিকে মার্ক্স যেসব কথা লিখেছিলেন, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি। মার্ক্স সেখানে প্রয়োগের মধ্যে তত্ত্বের সার্থকতা খুঁজেছেন; আপ্তবাক্য উচ্চারণের বদলে বিশ্লেষণী মননকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নিবিড় পাঠ থেকে এই সংকেত পাই যে, বস্তুবাদী বিশ্লেষণের মূল সমস্যা কিন্তু সাংস্কৃতিক সংগঠনের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি নিয়ে নয়, পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে তার গৃহীত ও পুনর্গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ও সংকট নিয়ে। মার্ক্স লিখেছেন

'In the case of the arts, it is well known that certain periods of their flowering are out of all proportion to the general development of society, hence also to the material foundation, the skeletal structure as it were of its organisation. For example, the Greeks compared to the moderns or also Shakespeare...

Certain significant forms within the realm of the arts are possible only at an undeveloped stage of artistic development. If this is the case with the relation between different kinds of art within the realm of the arts, it is already less puzzling that it is the case in the relation of the entire realm to the general development of society. The difficulty consists only in the general formulation of those contradictions...The difficulty is that they still afford us artistic pleasure and that in a certain respect they count as a norm and as an unattainable model. A man cannot become a child again, or he becomes childish. But does he not

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

find joy in the child's naivete, and must be he himself not strive to reproduce its truth at a higher stage?...Why should not the historic childhood of humanity, its most beautiful unfoldings as a stage never to return, exercise an eternal charm?' (Grundrisse Penguin 1973 110-111). মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় এই বক্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম; তাই বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। এর প্রতিটি বাক্য আমাদের নিবিষ্ট মনোযোগ দাবি করে। বিশেষত উদ্ধৃত অংশের শেষ দুটি বাক্য যে-প্রশ্ন তুলে ধরছে, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে বহু জিজ্ঞাসার মীমাংসাসূত্র। সমাজের যে-আদিম ও অপরিণত স্তরে গ্রিক শিল্পকলা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, তার সঙ্গে কোনো বিরোধমূলক দ্বন্দ্বের অবকাশ তৈরি হয় না যদি আধুনিক ও আধুনিকোত্তর পর্যায়ে ঐসব রচনা মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। যে-বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষিতে এদের উদ্ভব, কোনো কারণে তা ফিরে আসবে না—এই জেনে তাৎক্ষণিকবিষণ্ণতা আমরা অনুভব করতে পারি হয়তো, কিন্তু মোহানার প্রতি ধাবমান স্রোতধারাকে রুদ্ধ করে নিশ্চয় উৎসে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি না।

তিন

রাতের সমস্ত তারা যদিও দিনের আলোর গভীরে লুকিয়ে থাকে, দিনের আলোয় কখনও রাতের প্রহর ফিরে আসে না। এক শতাব্দী পরে উত্তরসূরি আলোচকেরা যে-সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, মার্ক্স যেন তার আগাম সংকেত দিয়ে গেছেন। সময় ও পরিসরের বিন্যাসক্রমে কতটা পরিমাণে নিহিত থাকে সামাজিক অনুপুঙ্খপুঞ্জ এবং ভিন্নতর আবহে ঐ বিন্যাসক্রম কীভাবে পুনর্বিশ্লেষিত ও পুনর্গৃহীত হতে পারে, পরবর্তী তাত্ত্বিকেরা সে-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে নতুন-নতুন সন্দর্ভ প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু মার্ক্সীয় ভাবনার পুনঃপাঠ প্রাজ্ঞ আদি-সূত্রধারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাতে সাহায্যই করে; আমরা বুঝতে পারি, তাঁর তাত্ত্বিক অন্তর্দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটে পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে। আর, বিস্তারের নিরবচ্ছিন্নতাই রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্নায়ুকেন্দ্র। সাহিত্যের কোনো বিশেষ মর্যাদাবান অবস্থান যদি বা আমরা প্রত্যাখ্যানও করি, তবু একটা প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে সমাজের সাধারণ ঐতিহাসিক বিকাশ থেকে সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক ক্রমগতি কতটা বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন? 'Literature and Revolution' বইতে ট্রটস্কি রুশ প্রকরণবাদীদের ওপর আক্রমণ শানাতে গিয়ে মেনে নিয়েছিলেন, সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক নিজস্ব সূত্র ও নিয়ম অনুযায়ী সাহিত্যিক প্রতিবেদন বিকশিত হয়ে থাকে। তিনি বলেছিলেন, শিল্প সৃষ্টি হল 'a changing and a transformation of reality in accordance with the peculiar laws of art.'। বাস্তবতা কী ও কেমন, এই নিয়ে মার্ক্সবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট বিতণ্ডা করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদেরও কত বিচিত্র বিভঙ্গ দেখতে পাই। এবিষয়ে লুকাচের সঙ্গে বিতর্ক খুব বিখ্যাত। যা-ই হোক, বাস্তবতার দার্শনিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্য এবং সাহিত্যিক প্রকরণের গুরুত্ব ও ভাবাদর্শগত অন্তর্বস্তু সম্পর্কে মার্ক্সবাদী শিবিরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহুধাবিভক্ত। আমরা এখানে লক্ষ করতে পারি, ট্রটস্কি বাস্তবতাকে প্রকরণগত ভাবনায় সীমাবদ্ধ বলে মনে করেননি; তিনি এর বিপুল গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। পরবর্তী মার্ক্সীয়-লেনিনীয় নন্দনতাত্ত্বিকেরা, বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার গবেষকরা, এবিষয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। আভনের জিস লিখেছেন, 'The diversity of forms of social consciousness is born first and foremost of the diverse and many faceted nature of real life.' (১৯৭৭ ৪১)—এই মন্তব্যকে আরো একটু বিশদ করে তিনি জানিয়েছেন, 'Through its definition of subject of art, materialist aesthetics accomplished two things on the one hand, it provides a basis for opposition to formalist theories and the dehumanised world of anti-realist art, on the other, it provides methodological direction for realist artists' creative practice.' (তদেব ৪৩)।

এই মন্তব্যের সূত্রে দৃষ্টিকোণগত দুটি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথমত, মার্ক্সীয়-লেনিনীয় বিশ্ববীক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত বস্তুবাদী নন্দনতত্ত্ব প্রকরণবাদের দ্ব্যর্থহীন বিরোধিতা করে। তেমনি ভাবাদর্শগত কারণে বাস্তবতাবিরোধী শিল্পের বিমানবায়িত অপজগৎকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয়ত, কাঙ্ক্ষিত আদর্শ ও লক্ষ্যের উচ্চারণ মাত্র করে বস্তুবাদী নন্দনতত্ত্বের দায় ফুরোয় না; বাস্তববাদী শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যাতে লক্ষ্যচ্যুত না হয় কখনও, এইজন্যে নিরন্তর পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পদ্ধতিগত মার্গ ও কৃৎকৌশল যোগান দিয়ে যায়। তার মানে, নন্দন ও ভাবাদর্শের সুষম সমন্বয় যেমন কাম্য, তেমনি পথ ও পাথেয়ের সুসংহতি এবং তত্ত্বের প্রায়োগিক উপযোগিতাও খুব জরুরি। মানুষকে যা-কিছু মানবিক নির্যাস থেকে উন্মূল করে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে একদিকে মনন ও সৃষ্টিকে জাগ্রত রাখে, অন্যদিকে ভাবাদর্শ ও নন্দনের যুগ্ম সমর্থনে বিকল্প পথের দিশারি হয়ে ওঠে। মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা কীভাবে ছদ্ম-বাস্তবতার চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করতে হয় বলে মার্ক্সীয়-লেনিনীয় নন্দনচিন্তা প্রকৃতি ও বাস্তবতার পুনরুত্থাপন সম্পর্কিত যাবতীয় অনুপুঙ্খকে পর্যালোচনা করে পারস্পরিক অন্তর্বয়নের জটিলতায়। খণ্ডিত পরিচয়ে নয়, অস্তিত্বের সমগ্রতায় মানুষকে দেখতে ও দেখাতে চায়। তাই প্রাগুক্ত তাত্ত্বিক লিখেছেন, সমাজবিজ্ঞান আমাদের সামাজিক জীবনের নির্দিষ্ট কিছু উপকরণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় কিন্তু শিল্পকলা ও সাহিত্য মানুষের জীবনকে সুসংহত সমগ্রতায় উপস্থাপিত করে 'Art is concerned with an integral reproduction of men's life, depicting men in the totality of their relations with each other and the world around them, depicting various aspects of their life and the ways in which the diverse spheres of men's life, activity interweave. In art, phenomena taken from life are assessed from the ideological and aesthetic angle.' (তদেব ৪৫ ৪৬)।

সুতরাং সামাজিক বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর এবং তাদের গ্রন্থিল বুনট সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত করার দায়িত্ব নেয় সার্থক শিল্প ও সাহিত্য। সামাজিক পরিস্থিতির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্যাস উপলব্ধি কাম্য নিশ্চয়, কিন্তু শুধুমাত্র নির্যাসই সৃষ্টির আধেয় নয়। ঐ নির্যাস কীভাবে জীবনের বিচিত্র পটে মূর্ত হয়ে উঠছে—তা দেখানোয় এবং বিশ্লেষণ করাতেও সৃষ্টির উদ্যম প্রকাশ পায়। বাস্তব জীবনের নানা অনুষঙ্গ কীভাবে নান্দনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন রূপ ও চরিত্র অর্জন করছে আর নির্বিশেষ হয়ে উঠছে বিশেষ—সেদিকে তর্জনি সংকেত করে মার্ক্সীয়-লেনিনীয় সাহিত্যতত্ত্ব। জীবনের এই বিশিষ্ট প্রতিফলন আসলে মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন যেখানে নান্দনিক ও ভাবাদর্শগত বিচার একই বিন্দুতে এসে মেশে। নান্দনিক চেতনা, প্রয়োজন, সংবেদনা, প্রক্রিয়া, দৃষ্টিকোণ এই সবই বিচিত্র সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফসল। মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিনের অবদানও স্মরণীয়। আগেই লিখেছি, নানা পর্যায়ে নানা চিন্তাবিদের যোগদানে বিকশিত হয়েছে এই তত্ত্বপ্রস্থান। তবে স্পষ্টত, মার্ক্স-এঙ্গেলস ছাড়া লেনিনের অবদানও অসামান্য। এইজন্যে মূলত সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং গৌণত বহির্জগতে এই ধারার তত্ত্বচিন্তা মার্ক্সীয়-লেনিনীয় ঘরনা হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ এর মতো লেনিন মূলত সমাজ-বিপ্লবী বলে বিপুল কর্মোদ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে যেসব অভিমত দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে পরবর্তী নন্দনতাত্ত্বিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের ভাবনার ইমারত গড়ে ওঠে। টলস্টয় সম্পর্কে লেনিনের আলোচনা এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাস্তব জগতের প্রতি নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব নান্দনিক বর্গ প্রাধান্য পেয়ে থাকে, লেনিনের বক্তব্য থেকে তাদের সম্পর্কে আমরা কিছু মূল্যবান সূত্র পেয়ে যাই। মানুষের সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নান্দনিক দৃষ্টিকোণও অজস্র ভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। নৈর্ব্যক্তিক জগতের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে যখন নান্দনিক ভাবে মূল্যায়ন করতে চাই, সেসময় সংবেদনা এবং প্রয়োজনের তাগিদও ঐ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রে গড়ে ওঠে। স্বভাবত বিভিন্ন বর্গের মধ্যে টানাপোড়েন এবং সমাপতনের অভাব নেই। এইসব বর্গকে জীবন উপলব্ধির স্বতন্ত্র স্তর হিসেবে চিনে নেওয়া যে খুব জরুরি, তা লেনিনের একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্ট : 'man is confronted with a web of natural phenomena, Instinctive man, the savage does not distinguish himself from nature. Conscious man does distinguish, categories are stages of distinguishing, that is of cognising the world, focal points in the web which assist in cognising and mastering it.' (Collected Works vol. 38 93).

আজকের দিনে যে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ অসামান্য গুরুত্ব অর্জন করেছে, লেনিনের একটি মন্তব্যে যেন তার পূর্বাভাস লক্ষ করি : 'philosophical notes books' বইতে লেনিন ফয়েরবাখের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন 'the clearer manner of writing consists, among other things, in assuming that the reader also had a mind, in not expressing everything explicitly, in allowing the reader to formulate the relations, conditions and restrictions under which alone a proposition is valid and can be conceived.' (তদেব ৮২)। লেখক ও পাঠকের সম্পর্ক গণতান্ত্রিক অর্থাৎ লেখক স্বৈরতন্ত্রী শাসকের মতো পাঠকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেবেন না বা ফতোয়া জারি করবেন না। সব কিছু খোলামেলা ভাবে তাঁর বুঝিয়ে দেওয়াও দরকার নেই, কারণ পাঠকের স্বাধীন মনন ও কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভর করাটাই কাম্য। লেখক যা আভাসে জানিয়েছেন, পাঠক যখন তাকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করবেন—কেবলমাত্র তখনই কোনো প্রতিবেদন সার্থক হয়ে উঠবে। বিরুদ্ধবাদীদের সংঘবদ্ধ প্রচারের ফলে মার্ক্সীয়-লেনিনীয় সাহিত্যতত্ত্বের একমাত্রিকতা সম্পর্কে যে বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত আছে, তা নিতান্ত একদেশদর্শী—লেনিনের প্রাগুক্ত মন্তব্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। এই তত্ত্বপ্রস্থান জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ রক্ষা করাটা যে সমস্ত নান্দনিক ভাবনার স্নায়ুকেন্দ্র, একথা মনে না রেখে উপায় নেই। পাশাপাশি অবশ্য এও মনে রাখতে হয় যে, সাহিত্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের পুষ্টি যোগাবে—এই সূত্র সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের মনেও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত গোর্কি সম্পর্কে লেনিনের কিছু কিছু বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। আসলে মূল কথাটা হলো এই যে, সমাজবদলের প্রক্রিয়া থেকে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। নতুন জীবন-স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে চান বলে যাঁরা সাহিত্যিক প্রতিবেদনে সমস্ত পুরোনো গ্রন্থিকে ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী হন, একই তাগিদে তাৎপর্যশূন্য সমাজ-ব্যবস্থা থেকে নতুন মানব-সমাজে উত্তরণের সংগ্রামে তাঁরা অংশ নেন। শিল্পকলার জন্যে শিল্পকলা জাতীয় ফাঁপা বাগাড়ম্বরে মার্ক্সবাদীদের কোনো উৎসাহ নেই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াই আর সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিমানবায়নের আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর লড়াইকে তাঁরা মানুষের সার্বিক মুক্তির পথে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন।

শোষক ও শোষিতবর্গের ক্রমাগত তীক্ষ্ণ হয়ে-ওঠা দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের পরিবর্তনশীল অভিব্যক্তি সম্পর্কে বক্তব্য উত্থাপন করেই কিন্তু মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এই তত্ত্বপ্রস্থান সম্পর্কে অগভীর বিচারণের ফলে এর মধ্যে যাঁরা শুধু সরলীকরণের প্রক্রিয়াই দেখতে পান, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষা এই প্রাথমিক পাঠ দেয় যে, মানববিশ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে কিছু হতে পারে না। সব কিছুই অপর সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সাহিত্য, সাহিত্যিক, পাঠক, পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি সব কিছুই বৃহত্তর ভাববিশ্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এরা প্রত্যেকেই অপরের দর্পণে উদ্ভাসিত হয়ে সত্য হয়ে ওঠে। এখানে মিখায়েল বাখতিনের চিন্তা-জগতের সঙ্গে মার্ক্সীয় ভাববিশ্বের সাযুজ্য খুব স্পষ্ট। বাখতিনের অন্যতম মূল সূত্র হলো, চেতনা আসলে অপরতার প্রত্যয় (consciousness is otherness) এবং প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা (Every being is a co-being)। এই সত্তার উপলব্ধি ও সমান্তরালতার বোধ জগৎ ও জীবনের যাবতীয় দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিভূমি। অন্যদিকে সমস্ত ধরনের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় বলে মার্ক্সীয় চেতনা-পরিধির সঙ্গে নিম্নবর্গীয় চেতনা, উপনিবেশোত্তর চেতনা এবং নারীচেতনার মৌল প্রেরণা অন্বিত হয়ে পড়ে। এভাবে মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষা মানববিশ্বের বিভিন্ন দার্শনিক ধারার সঙ্গে, সত্তা ও অপরতার সমান্তরাল উপস্থিতির ভিত্তিতে, দ্বিবাচনিক বিনিময়ের আবহ গড়ে তুলেছে। পারস্পরিক এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংলাপ অপরিহার্য ও ক্রিয়াত্মক; তাই মানবিক প্রতিবেদন একান্তিক হতে পারে না কখনও। পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তার উদ্ভাসিত বলয়। এইজন্যে মার্ক্সীয় বিচারপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণবাদী ও যান্ত্রিক বলে ভাবাটা গ্রহীতার অন্যমনস্কতা ও অগভীর বিচরণের প্রমাণ। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বে এমন কোনো ভাবপ্রস্থান নেই যা ঐ বিচারপদ্ধতিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পেরেছে। বরং সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার অনেক প্রবণতা আত্মস্থ করে নিয়েছে যাতে আজকের মানুষের উপযোগী বহুস্বরসঙ্গতি একটি সন্দর্ভের প্রধান আধেয় হতে পারে। মার্ক্সীয় দর্শনের অভিঘাতে অংশকে আর খণ্ডিত একক হিসেবে দেখছি না আমরা, দেখছি সমগ্রের দর্পণে। আবার সমগ্রকে যখন বিশ্লেষণ করতে চাইছি, অংশ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যসমৃদ্ধ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করছি। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই জগৎকে অনড় অচলায়তন হিসেবে দেখছি না কখনও : দেখছি নিয়ত বহমান পরিবর্তনের স্রোতধারায়। বিকাশের প্রক্রিয়াকে দ্বান্দ্বিক বলে যেহেতু চিহ্নিত করেছেন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরা, এর কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই প্রক্রিয়ার মূল কথা হল, সভ্যতা-সংস্কৃতির কোনো স্তরেই তার পূর্ববর্তী স্তর পুরোপুরি নিরাকৃত হয় না। এই মুহূর্তে যা ভাবছি বা যে-অবস্থানে পৌঁছাচ্ছি, বিগত মুহূর্তের ভাবনায় বা অবস্থানে তার সম্ভবনাটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল। জীবনে কোনো কিছুই পুরোপুরি নতুন নয় তাই। হেগেলের প্রবাদপ্রতিম মন্তব্যটি এখানে মনে করতে পারি 'Wesen ist was gewesen ist' (আমাদের সত্তার নির্যাস হল আমরা কী ছিলাম!) ফলে কোনো স্তরকেই তার পূর্ববর্তী স্তরের সীমানায় রুদ্ধ হতে দেখি না। লেখক-শিল্পী বিনির্মাণ করতে করতে এগিয়ে যান; সমাজ ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে কখনও জরাগ্রস্ত অচলায়তনে পরিণত হতে দেন না। পুরোনো পাথর ভেঙে নতুন প্রবাহ আনতে পারেন বলে তাঁরা আসলে মানুষের বোধশক্তিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে যান, জড় চিত্তের অবসাদ ভেঙে দিয়ে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেন। সবই ঘটে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

চার

লেনিনোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'-এর ধারণাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। তথাকথিত 'মুক্ত' ইউরোপে এই মতবাদের সমালোচনাও একটি পূর্ব-নির্দিষ্ট গৎ-বাঁধা পথে এগিয়ে গেছে। আশির দশকের শেষ কটি বছরে বিশ্বপুঁজিবাদের দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্তে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিচ্যুতি ও অন্তর্লীন আত্মবিরোধিতার ফলে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান যেহেতু জয়ী হলো, উত্তরমার্ক্সবাদ জাতীয় শব্দবন্ধ ইদানীং প্রচলিত হয়ে গেছে। হয়তো এখনই তাই উপযুক্ত সময় নির্মোহ পুনর্বিবেচনার, নিবিড়তর পুনঃপাঠের। সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি সাহিত্যতত্ত্ব বলে খানিকটা বিদ্রূপে, খানিকটা তাচ্ছিল্যে তখনকার বক্তব্যকে 'মুক্ত' প্রতীচ্যের বুদ্ধিজীবীরা নস্যাৎ করতে চাইতেন। স্ট্যালিনের আমলে, বিশেষভাবে ১৯৩২-১৯৩৪ এর মধ্যে, সোভিয়েত লেখকসংঘ যে-তত্ত্বের বনিয়াদ তৈরি করেছিলেন, তার ভিত্তি অনেকটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল লেনিনের ১৯১৭ সালের পূর্ববর্তী কিছু বক্তব্য। ঐ বক্তব্যকে তাঁরা পুনর্বিশ্লেষণ করে নিজেদের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছিলেন। এবার আমরা যদি ইতিহাসের ভিন্ন অবতলে দাঁড়িয়ে লেনিনের বক্তব্য নতুন ভাবে বুঝতে চাই, তাহলে সমসাময়িক আসক্তি ও বিভ্রান্তি—দুটোকেই এড়িয়ে জরুরি কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। মূল কথা হল, লেনিন কিংবা মার্ক্স-এঙ্গেলস্—যাঁর বক্তব্যই বিবেচনা করি না কেন, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বা প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের মন্তব্য ব্যবহার করা চলে না। তাঁরা কোন পরিস্থিতিতে কেন লিখেছিলেন, তা যদি বিবেচনা না করি, বিমূর্তায়নের ঝোঁক দেখা দিতে বাধ্য। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, নির্দিষ্ট কালসীমার বাইরে তাঁদের বক্তব্যের কোনো অর্থ নেই। তা যদি হত, দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে আমাদের কাছে সেসব তাৎপর্যবহ হত না। কিন্তু তাঁদের মন্তব্য থেকে সঠিক অর্থ বুঝে নেওয়াটা আমাদের বড়ো দায় নিশ্চয়। যখন এটা বুঝব, সোভিয়েত রাশিয়ায় উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সঙ্গে লেনিনের চিন্তার সাযুজ্য কিংবা অসঙ্গতি যথাযথ ভাবে নির্ণয় করতে পারব। তিরিশের দশকে সাহিত্যের বিবর্তন, শ্রেণীসম্পর্ক বিন্যাসের সাহিত্যিক প্রতিফলন এবং সাহিত্যের সামাজিক ক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছিল।

কিন্তু লেনিনের 'Party organisation and party literature' নামক ১৯০৫ সালের নিবন্ধটি বহুদিন ধরে যান্ত্রিকভাবে গৃহীত হওয়ার ফলে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ উদ্দেশ্যে লেনিন এই নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে শত্রুপক্ষ যেমন অস্ত্র শানিয়েছেন তেমনি মার্ক্সবাদীরাও অযথা জটিলতা তৈরি করেছেন। ১৯০৫ সালে বিপ্লবী গোষ্ঠীরা যখন নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে গণসংগ্রামকে দুর্বল করে ফেলছি এবং প্রতিবিপ্লবী স্বৈরতন্ত্রের দাপটে রুশ বিপ্লব বারো বছরের জন্যে পিছু হটছিল, সেই ছিন্নভিন্ন পরিমণ্ডলে উপযুক্ত বইপত্র না-পাওয়ার সমস্যাকে লেনিন গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। পার্টি লিটারেচার বলতে তিনি পার্টির উপযোগী বইপত্র বুঝিয়েছেন, সৃজনশীল কল্পনার সাহিত্যকে বোঝেননি। সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে নিয়মশৃঙ্খলা কঠোরভাবে চালু করাটা তখন বিপ্লবের স্বার্থে আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। একথা মনে রেখেই লেনিন লিখেছিলেন 'Down with non-partisan writers! Down with literature supermen! Literature must become part of the common cause of the proletariet, a cog and a screw of one single great Social Democratic mechanism set in motion by the entire politically conscious vanguard of the entire working class. This absolute freedom is a bourgeois or an anarchist phrase... one can not live in society and be free from society. The freedom of the bourgeois writer, artist or actress is simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money bag, or corruption or prostitution' (Collected Works Vol. X 45. 48)

'সাহিত্যিক অতিমানব' বলতে লেনিন নিশ্চয় লিও টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, পুশকিন বা আলেকজান্ডার ব্লকের কথা ভাবেননি। তিনি আসলে মেনশেভিক গোষ্ঠীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্লেখানভ, মার্তভদের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন যেহেতু এঁরা গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবী ও লেখক হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই সংকটকালে পার্টির বাইরে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি অনুযায়ী লেখাপত্র প্রকাশ করতেন বলে বিপ্লবী সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। বৃহত্তর স্বার্থে এদের লক্ষ করেই লেনিন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন : বলেছিলেন, একটা মুক্ত মুদ্রণ প্রকাশন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবীদের ঈপ্সিত যা কিনা নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি লাভের ব্যক্তিস্বার্থ এবং বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে মুক্ত থাকবে। এখানে সৃজনশীল কর্মে নিয়োজিত সাহিত্যিকদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার কথা বলা হয়নি। ১৯১৭ সালের পরে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পরিস্থিতি যখন আমূল পরিবর্তিত হলো, তখনও নতুন সমাজের নন্দন-চিন্তা রৈখিকভাবে এগিয়ে যায়নি। অবশ্য সামাজিক দায়বদ্ধতা, প্রগতিশীলতা, কালসচেতনতা ইত্যাদির তাৎপর্য নিয়ে নানা ধরনের সূক্ষ্ম তর্ক অব্যাহত ছিল। জনগণের সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কিত যাবতীয় অনুষঙ্গ পারিভাষিক মর্যাদা অর্জন করে নেয় ক্রমশ।

পাশাপাশি বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি রুশ প্রকরণবাদীদের মধ্যে নতুন প্রেরণা এনে দেয় এবং তাঁরা তাঁদের শিল্পতত্ত্বকে অনেকটা পরিমাণে পরিমার্জিত করে নেন। এদিকে লেনিনের মৃত্যুর পরে সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণের নামে এক ধরনের নব্য রক্ষণশীলতা ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ে। এঁরা প্রকরণবাদকে খুব সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং রুশ বাস্তববাদের উনিশ শতকীয় ঐতিহ্যকে নতুন সাম্যবাদী সমাজের উপযোগী নন্দন-চিন্তার একমাত্র যোগ্য ভিত্তি বলে বিবেচনা করতেন। বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ থেকে ইউরোপে সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতে আধুনিকতাবাদী বিপুল রূপান্তর দেখা যাচ্ছিল (যার পুরোধা ছিলেন পাবলো পিকাসো, জেমস্ জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, টি. এস. এলিয়ট, স্ট্রাভিন্‌স্কি, শোয়েনবার্গ এর মতো ব্যক্তিত্ব)। সোভিয়েত সমালোচকদের দ্বারা ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ী অভিব্যক্তি হিসেবে তা নিন্দিত হয়েছিল। এতে অবশ্য এক ধরনের কূটাভাস তৈরি হচ্ছিল। কেননা ঐ আধুনিকতাবাদীরা প্রথাগত বাস্তববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অথচ সমাজতান্ত্রিক নন্দনের নামে রুশ তাত্ত্বিকেরা তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। সাংস্কৃতিক রাজনীতির যে-তত্ত্ব আরো পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত হবে, প্রারম্ভিক পর্বে ঐ রাজনীতি অনুপ্রাণিত নন্দনতত্ত্বের স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে পড়ছিল। নান্দনিক ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে সাযুজ্য আনার জন্যে সোভিয়েত তাত্ত্বিকেরা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, কোনো কালপর্বের শিল্প-সৃষ্টি মর্যাদাবান হতে পারে কেবল সমাজচেতনার শক্তিতে। যুগের আনন্দ ও ব্যাধি, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যথার্থ শিল্পীকে যেমন আলোড়িত করে তেমনি তার মধ্যে থাকে প্রগতির প্রতি আভিমুখ্য। বর্তমানের দর্পণে তিনি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আভাসিত করেন এবং সেইসঙ্গে অতীতেরও পুনর্মূল্যায়ন তুলে ধরেন। তবে সবই ঘটে অন্তেবাসী শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় রঞ্জিত হয়ে। আকাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলিতে সত্যিকারের লোকপ্রিয় শিল্পকলা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের সত্তায় হারিয়ে-যাওয়া সমগ্রতার বোধ ফিরিয়ে দেবে—এই হল তাঁদের প্রত্যয়। এছাড়া শিল্পকলার শ্রেণী-স্বভাব নিয়েও সোভিয়েত তাত্ত্বিকেরা যথেষ্ট আলোচনা করে গেছেন। একদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন শ্রেণী-চেতনার প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতায় এবং অন্যদিকে পাঠকৃতিতে প্রতিফলিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অভিব্যক্তিতে।

কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকলেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি হবে, এর কোনো মানে নেই। এই প্রসঙ্গে বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলসের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। রাজতন্ত্রের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বালজাক কিন্তু ফরাসি দেশের আর্থ-সামাজিক অনুপুঙ্খগুলিকে তৎকালীন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের তুলনায় অনেক বেশি সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। লেখকের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব যেদিকেই থাকুক না কেন, তাঁর সংবেদনশীল মন কিন্তু ক্রান্তিকালীন সত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ মার্ক্সীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকদের অন্যতম মৌল অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখক সংঘের অধিবেশনে যে-ধরনের বিতর্ক হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নান্দনিক ভাবনা অনেকটা পরিমাণে বৃত্তবন্দী হয়ে পড়ে। আন্দ্রে ঝানোভ ঐ অধিবেশনে মূল বক্তৃতা দিয়ে গিয়ে সমবেত লেখকদের কাছে স্ট্যালিনের একটি মন্তব্য তুলে ধরেছিলেন। লেখকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন 'মানবাত্মার অভিযন্তা' (Engineers of the human soul) হওয়ার জন্যে। ততদিনে লেখক-শিল্পীদের উপর মতান্ধ রাষ্ট্রশক্তির পীড়ন অনেকটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ ঠিক সাতাত্তর বছর আগে এঙ্গেলস যদিও মার্গারেট হার্পনেসকে লিখিত চিঠিতে স্পষ্টভাবে 'সমাজতান্ত্রিক' উপন্যাস না-লেখার জন্যে প্রশংসা করেছিলেন এবং আটচল্লিশ বছর আগে লেনিন টলস্টয় সম্পর্কিত রচনায় যথেষ্ট সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ঝানোভের আমলে তার অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। এইজন্যে তিনি নির্দ্বিধায় ও সগর্বে ঘোষণা করলেন 'Yes, Soviet literature is tendentious, for in epochs of class struggle—there is not and cannot be a literature which is not class literature, not tendentious, allegedly non-political.'

পাঁচ

উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে মার্ক্সীয় সাহিত্যচিন্তার বিবর্তন-রেখাটি খুব কৌতূহলব্যঞ্জক। প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞানর আকল্প নির্মাণ করতে গিয়ে চিন্তাবিদরা যে সাংস্কৃতিক অণুবিশ্বের কথা উত্থাপন করছিলেন, তাতে শিল্প ও সাহিত্যের ভূমিকা ছিল নিতান্ত গৌণ। তবু, এও ঠিক যে এর গুরুত্ব তাঁরা অস্বীকার করেননি। উনিশ শতকের শেষে মার্ক্সবাদের সাংস্কৃতিক বীক্ষা কীভাবে গড়ে উঠেছিল, তার একটা ধারণা আমরা করে নিতে পারি জি. ভি. প্লেখানভের রচনা থেকে। তাঁর 'Unaddressed Letters' ও 'Art and Social Life' প্রাগুক্ত চিন্তা-বিবর্তনের রূপরেখাটি ধরিয়ে দেয়। সেসময় মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় যে নৈতিক স্বর স্পষ্ট ছিল, তার প্রভাব প্লেখানভের মধ্যে রয়েছে। তিনি শিল্পকলার শক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে তার সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করেছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর সাধারণ দৃষ্টিকোণের প্রামাণিকতা পরীক্ষা করার আধার হিসেবে বিবেচনা করেছেন শিল্পকলাকে। তাঁর মতে, সংস্কৃতির উচ্চতম সোপানে শিল্পকলা যেহেতু নিজেকে উন্নীত করতে পারে—তার বিপুল বৌদ্ধিক শক্তি অনস্বীকার্য। এখানে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, নন্দন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্লেখানভের অবদান কতটা, সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। তবে বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পকলার উপযোগিতা কীভাবে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এ বিষয়ে তাঁর ভাবনা মনোযোগ দাবি করে। কেউ কেউ বলেছেন, প্লেখানভ তত্ত্বের দিক দিয়ে পজিটিভিস্ট হওয়াতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়তিবাদী ঝোঁকের প্রতি প্রশ্রয় দেখিয়েছেন; পরবর্তী মার্ক্সবাদী চিন্তায় শৈল্পিক প্রতিবেদনে হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ যদিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, প্লেখানভ সে-বিষয়ে কিছু বলেননি।

অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে ইতিহাসে ও সাহিত্যিক সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি মার্ক্সীয় শিল্পবিচারে প্রাধান্য পেয়ে যায়। পরবর্তী প্রজন্মের তাত্ত্বিকেরা কাউৎস্কি ও প্লেখানভকে সম্মান দেখিয়েছেন কিন্তু অনুসরণ করেননি। লেনিন, ট্রটস্কি, লুক্সেমবুর্গ প্রমুখ চিন্তাবিদদের অনিবার্য আলোচ্য বিষয় ছিল রাজনৈতিক সংগঠন, বৈপ্লবিক সংগ্রামের রণকৌশল এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের বিপুল কর্মযজ্ঞ। শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁদের চিন্তাধারা এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। এই তত্ত্বপ্রস্থানের ক্রমবিকাশ শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের ওপর ন্যস্ত ছিল না। মার্ক্সীয় উৎস-বহির্ভূত চিন্তাধারাও এই তত্ত্বকে নানাভাবে পুষ্টি দিয়েছে। যেমন রোমান য়্যাকবসন, ভিক্টর স্কলোভস্কি, ইউরি টিনিয়ানভ্ প্রমুখ প্রকরণবাদী কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের সঙ্গে ঐক্যসূত্র খুঁজলেও মূলত স্বতন্ত্র পথগামী ছিলেন। পারস্পরিক বিনিময়ের প্রেরণায় তাঁরা নন্দনচিন্তার জন্যে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ তৈরি করেছিলেন। সাংস্কৃতিক প্রেরণা এবং অস্তিত্ব ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উপায়ের পক্ষপাতী হয়ে তাঁরা গড়ে তুলতে চাইছিলেন সমালোচনা ও সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার নতুন বিধি। সোভিয়েত রাশিয়ার টালমাটাল প্রথম পর্বে বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক ক্ষেত্রে যে অসামান্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে তাঁদের অবদান সামান্য নয়। আবার প্রকরণবাদ নিজেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের দ্বারা পুনর্নির্মিত হচ্ছিল। কেউ কেউ বলেন, মিখায়েল বাখতিনের চিন্তাধারায় উত্তর-প্রকরণবাদী ভাবনার ছাপ রয়েছে। স্ট্যালিনের পর্যায়ে ক্রমশ সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের সমস্ত চিহ্ন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সাহিত্যতত্ত্বও তখন প্রবলভাবে প্রকরণ-সর্বস্ব হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড়ো কথা, শিল্পীর আপেক্ষিক স্বাধীনতাও অস্বীকৃত হয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের নামে একরৈখিক ও একস্বরিক জগৎ নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। এসময় বৈপ্লবিক রাজনৈতিক চিন্তাকে লেনিনবাদ বলে প্রচার করা হয় বলে পরবর্তী সাহিত্যতত্ত্বও মার্ক্সীয়-লেনিনীয় সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। তর্ক-বিতর্কের জন্যে কোনো স্থান ছিল না বলে সমাজতান্ত্রিক নতুন মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় ভাবনা তাৎপর্যশূন্য হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বপ্রস্থানের ক্ষেত্রে আর যাঁদের বিপুল অবদান এই চিন্তাবৃত্তকে নতুন মাত্রাযুক্ত করেছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আন্তনিও গ্রামশি ও ক্রিস্টোফার কডওয়েল। ইতালীর বিক্ষুব্ধ পরিবেশে গ্রামশির নতুন চিন্তা মার্ক্সবাদের প্রায়োগিক উপযোগিতাকে বাড়িয়ে দেয়নি শুধু, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তার ক্ষেত্রেও বিপুল তরঙ্গাভিঘাত তৈরি করেছে। এইজন্যে গত দশ বছর ধরে ইউরোপীয় মার্ক্সবাদী ও আধুনিকোত্তরবাদী চিন্তাবিদেরা গ্রামশির বক্তব্যকে পুরোপুরি নতুন ভাবে পুনর্বিবেচনা করে চলেছেন। অন্যদিকে কডওয়েল ছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সাহিত্যে সমান পারঙ্গম। তাঁর 'Illusion and Reality' ও 'Studies on a Dying culture' দীর্ঘদিন মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রতিবেদন হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

এরপর আমাদের মনে আসে গিয়র্গ লুকাচের নাম। মার্ক্সীয় সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি নিঃসন্দেহে পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সঙ্গে যেমন তাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, তেমনি এবিষয়ে সূক্ষ্ম সমালোচনাত্মক বয়ানও তিনি পেশ করেছেন। মার্ক্সীয় চিন্তাবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টত হেগেলীয় শৈলী প্রবর্তন করেছিলেন অর্থাৎ সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে একটি নির্দিষ্ট বিকাশমান পদ্ধতির প্রতিফলন হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, বাস্তববাদী রচনায় অবশ্যই থাকবে কোনো সমাজপদ্ধতিতে নিহিত আত্মদ্বন্দ্বের আকল্প সম্পর্কে সূক্ষ্ম উদ্ভাসন। লুকাচ যেহেতু সমাজ-সংস্থার বস্তুগত ও ঐতিহাসিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত মার্ক্সীয়। লুকাচের দ্বারা ব্যবহৃত 'প্রতিফলন' শব্দটি তাঁর সামগ্রিক বিশ্লেষণ বোঝার চাবিকাঠি। সমসাময়িক ইউরোপীয় উপন্যাসের স্বভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি প্রাচীনতর বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিকোণে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছিল, উপন্যাস যে-বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে তা কেবলমাত্র বহিরঙ্গ অবয়ব ব্যক্ত করার মধ্যে সীমিত নয়। বাস্তবতার এমন গতিশীল প্রতিফলন ঘটানো লুকাচের ঈপ্সিত যা আরো গভীরতর সত্য, আরো সম্পূর্ণতর ও আরো স্পষ্টতর আয়তন সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলে। এই প্রতিফলনের পারিভাষিক তাৎপর্য কী? এর মানে, শব্দে রূপান্তরিত মানসিক আকরণের বিশিষ্ট উপস্থাপনা। জনসাধারণেরও সাধারণভাবে বাস্তবতার প্রতিফলন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা থাকে। লক্ষ করলে দেখা যায়, তা কেবল বস্তু-সন্নিবেশের চেতনা নয়, মানব-স্বভাব এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়েও প্রাসঙ্গিক।

লুকাচ বলেছেন, উপন্যাস পাঠকদের বাস্তবতায় নিহিত গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে সচেতন করে তোলে, যা কিনা সাধারণ বস্তু-প্রতীতিকে অতিক্রম করে যায়। তাছাড়া সাহিত্যিক পাঠকৃতি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করে না, জীবনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। সতর্ক পাঠক একথা মনে রাখেন যে, পাঠকৃতি নিজেই বাস্তবতা নয়; তা হল বাস্তবতা প্রতিফলনের বিশেষ প্রকরণ। এ বিষয়ে সানুপুঙ্খ আলোচনা-না করে আমরা শুধু একথা এখানে বলতে পারি যে, লুকাচ মার্ক্সীয় বিচার-পদ্ধতিকে হেগেলীয় শৈলী অনুসরণ করে বিকশিত করেছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসচিন্তা মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের আদিপর্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে। তাঁর 'History and class consciousness', 'Soul and form', 'Theory of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

novel' তত্ত্বচিন্তার একটি পর্যায়কে এবং 'The Historical Novel', 'Studies in European realism' এবং 'The meaning of contemporary realism' অন্য আরেকটি পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। আধুনিকতাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের আপত্তি এখানে চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত জয়েস, কাফকা, বেকেট, মান ও ফকনার সম্পর্কে তাঁর চমৎকার বিশ্লেষণ থেকে আমরা মার্ক্সীয় বিচার-পদ্ধতির বেশ কিছু মূল্যবান সূত্র পেয়ে যাই। আধুনিকতাবাদের ভাবাদর্শকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করে তিনি তাঁদের মধ্যে কোনো ধরনের সাহিত্যিক সম্ভাবনা খুঁজতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, আধুনিকতাবাদী অন্তর্বস্তু যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল, আধুনিকতাবাদের আঙ্গিকও একই ভাবে গ্রহণের অযোগ্য। শ্রেণীদ্বন্দ্ব জর্জরিত সমাজে নৈর্ব্যক্তিক বস্তুবাদের বদলে উদ্বেগ (angst) ও অবসান (ennui) ক্লিষ্ট জগতের ছবি কেবল ফুটে উঠেছিল আধুনিকতাবাদীর চোখে। আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল তখন, এর কারণ, আত্মগত উপলব্ধি সম্পর্কে এক ধরনের তাচ্ছিল্য। বিকাশমান ধনতন্ত্রের অভিঘাতে যে প্রকট ব্যক্তিবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ ইতিহাস ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে বিমূর্তায়িত করে দিয়ে অর্থহীন প্রতিপন্ন করছিল—এই সবই তার পরিণাম।

তিরিশের দশকের গোড়ায় আধুনিকতাবাদী আঙ্গিক সম্পর্কে লুকাচের আপত্তি বের্টল্ট ব্রেখ্টের সঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত করে। ১৯২৬ সালের আগে ব্রেখটের নাটকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি বিরোধিতা থাকলেও তাতে স্পষ্ট রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল না। মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে তাঁর রচনায় শ্রমিক শ্রেণীর উপলব্ধি ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে যদিও তিনি কখনও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হননি। নাৎসিবাদের উত্থানের পরে তিনি জার্মানি ছেড়ে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। ১৯৪৯ সালে তিনি ফিরে আসেন পূর্ব জার্মানিতে যদিও স্ট্যালিনবাদী কর্তৃপক্ষের কাছে ব্রেখ্ট যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ ছিলেন। কেননা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ছিল বস্তুবাদী বিভ্রম, প্রাকরণিক ঐক্য ও ইতিবাচক নায়কের পক্ষপাতী; অন্যদিকে ব্রেখট নাট্যপদ্ধতি হিসেবে যে 'alienation effect' তুলে ধরেছিলেন—তার সঙ্গে সূত্রায়িত শিল্পতত্ত্বের সাযুজ্য ছিল না। ঐ পদ্ধতি দিয়ে তিনি বরং বস্তুবাদী বিভ্রমকে ভেঙে চৌচির করতে চাইছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, 'নায়ক' এর ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রেখ্ট জীবনের অপ্রসাধিত কর্কশতাকে সামনে নিয়ে আসছিলেন। আর, লুকাচ যে-ধরনের প্রাকরণিক কৌশল (তা সে নতুনই হোক কিংবা পুরোনো) ব্যবহার করতে হবে নির্দ্বিধায়। এছাড়া লুকাচ যেভাবে বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক আঙ্গিককে বাস্তববাদের একমাত্র যথার্থ আদর্শ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাকে ব্রেখট প্রকরণবাদেরই বিপজ্জনক একটি ধরন বলে মনে করেছেন। কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ আঙ্গিক যত বড় সাহিত্যপ্রতিভার মধ্যে বিধৃত হোক না কেন, তা নির্বিচারে অনুসরণ করা ভুল। অন্য বাস্তববাদীদের পদ্ধতি যিনি নকল করবেন, তিনি নিজস্ব বাস্তব থেকে সেই মুহূর্তে বিচ্যুত হবেন অর্থাৎ নিজেকে আর বাস্তববাদী বলে পরিচিত করতে পারবেন না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত চতুর ছদ্মবেশ ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্রেখ্ট তাঁর দর্শকদের সম্ভাব্য অন্যমনস্কতা ও তৃপ্তিবোধে আঘাত করতে চেয়েছেন নতুন নতুন উপায়ে। তাঁর চমৎকার মন্তব্য এখানে স্মরণ করতে পারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'Methods wear out, stimuli fail, New problems loom up and demand new techniques. Reality alters to represent it, the means of representation must alter too.'

ছয়

লুকাচ ও ব্রেখটের মধ্যে বাস্তবতাবাদ নিয়ে এই পরস্পর-বিরোধী অবস্থানের পাশাপাশি যখন ফ্রাঙ্কফুর্ট শাখার মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব বিচার করি, দেখি যে, এই ধারার প্রবক্তারা ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বাস্তববাদকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা যে বিশেষ ধরনের বিশ্লেষণী পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন, তাকে তাঁরা 'Critical Theory' বলেছেন। এতে হেগেলীয় মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডীয় উপকরণ আত্তীকৃত হয়েছে, সাহিত্য-সমাজতত্ত্ব-দর্শন-নন্দনতত্ত্ব- ইতিহাস-রাজনীতি-বিজ্ঞান এখানে পরস্পরের সহযাত্রী নয় শুধু, নিবিড়ভাবে অন্যোন্যসম্পৃক্ত। নাৎসি জমানায় নির্বাসিত হয়ে পুরোধা তাত্ত্বিকেরা ১৯৩৩ সালে নিউইয়র্কে সংস্থাকে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন, আবার ১৯৫০ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে নতুনভাবে তাঁদের কর্মোদ্যম শুরু হয়। দর্শন এবং নন্দনতত্ত্বে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন মার্ক্স হর্কহাইমের, থিয়োডোর অ্যাডোর্নো, হার্বার্ট মার্কুজ। অ্যাডোর্নো ও হর্কহাইমের সমাজপদ্ধতিকে দেখেছিলেন হেগেলীয় দৃষ্টিতে, অর্থাৎ এমন এক ধরনের সমগ্রতার আকল্প হিসেবে, যাতে সমস্ত উপকরণ অভিন্ন নির্যাসের প্রতিফলন ঘটায়। আধুনিক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ ফ্যাসিবাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কেননা জার্মানীর সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে আধিপত্যবাদী চক্র বাঘনখ বিস্তার করেছিল। আমেরিকার প্রবাসজীবনেও তাঁরা তথাকথিত গণসংস্কৃতির মধ্যে একমাত্রিকতা লক্ষ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন কীভাবে পণ্যকেন্দ্রিকতা জীবনের প্রতিটি দিককে কলুষিত করছে। হয়তো এজন্যেই বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কফুর্টশাখার চিন্তাধারায় এক ধরনের নৈরাশ্যবাদ প্রকট হয়ে পড়েছে। তবু এও ঠিক যে তাঁদের চিন্তায় সাহিত্য ও শিল্পকলার স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডোর্নোর মতে, নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী কৃৎকৌশল দ্বারা অধিগত বিশ শতকের ভাববিশ্বে একমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছে দর্শন ও শিল্পকলা। লুকাচের বাস্তববাদ সম্পর্কিত ধারণাকে সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। শিল্পের অস্তিত্ব পরিচিত বাস্তবতা থেকে ভিন্ন; এই ভিন্নতাই তাকে দেয় বিশেষ তাৎপর্য ও শক্তি। অ্যাডোর্নোর বিখ্যাত মন্তব্য

'Art is the negative knowledge of the actual world.' অবদমিত অন্তেবাসী মানুষদের তাদের যন্ত্রণাদগ্ধ পরিসর সম্পর্কে সচেতন করে তোলে শিল্পকলা; আসলে তা এভাবে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে। এই স্বাধীনতার প্রেরণায় অস্বস্তিকর দৈনন্দিন বাস্তবতায় হস্তক্ষেপ করার তাগিদ অনুভব করে শিল্প-সাহিত্য। এই শাখার চিন্তাবিদদের মধ্যে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের অবদানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বহুপঠিত প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'The work of art in the age of mechanical reproduction' : 'Thesis

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

on the Philosophy of History' ইত্যাদি। শৈল্পিক উৎপাদন ও উপভোগের জন্যে নতুন এক নৈতিকতার কথা তিনি বলেছেন। পরবর্তী আলোচকেরা তাঁর রচনায় আধুনিকোত্তর সাংস্কৃতিক ভাবনার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। নতুন প্রযুক্তির মধ্যে নিহিত বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথা তিনি বলেছেন যদিও তিনি ভালোই জানেন যে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কিছুই ঘটে না। সমাজতান্ত্রিক লেখকদের বড়ো দায় এখানেই যে, তাঁরা এই সম্ভাবনাকে রচনায় মূর্ত করে তোলেন। বেঞ্জামিনের ভাবনার মধ্যে কেউ কেউ ব্রেখ্‌ট-এর চিন্তার ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। শিল্পকলায় নিহিত সময়ের মাত্রা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আমাদের মনোযোগ দাবি করে। তিনি জানিয়েছেন, বিবর্তনশীল সময়ের দিকে তাকিয়ে সৃজনশীল শিল্পীকে বারবার নিজস্ব শিল্পপ্রযুক্তি ও শিল্পসংবিদ বিনির্মাণ করে নিতে হয়। ইতিহাসের জটিল আবহে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অভিঘাতে জন্ম নেয় ঈপ্সিত শুদ্ধ শিল্পপ্রযুক্তি। এই পুনর্নির্মাণ মূলত সময়েরই চিহ্নায়ক। ফ্রাঙ্কফুর্ট শাখার ভাবধারাকে কেউ কেউ 'Critical Marxism' বলে চিহ্নিত করেছেন। বলা হচ্ছে যে, বস্তুবাদকে এই শাখা যত না গুরুত্ব দিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি জোর দিয়েছে দ্বন্দ্ববাদের ওপর। তার মানে, হেগেলের দার্শনিক উত্তরাধিকার এতে স্বীকৃত হয়েছে। হেগেলের মতো ঐ শাখার চিন্তাবিদেরাও সত্যের সমগ্রতায় বিশ্বাসী। (তুলনীয় 'the truth is the whole')। ইউরোপীয় সমাজ যখন পারস্পরিক সংঘর্ষের মাদকে আচ্ছন্ন, পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করছে, দীপায়নের বলয় হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, সে-সময় সমালোচনাত্মক মার্ক্সবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে ফ্রাঙ্কফুর্ট শাখার প্রবক্তাদের রচনায়। এই পর্যায়কে ফ্রান্সিস মূলহের্ণ এভাবে বর্ণনা করেছেন 'The containment and reversal of revolution, the antithetical novelties of avant gardism and the 'culture industry'; the dialectics of liberal traditions in the era of fascism; the courses of subjectivity in landscapes of organized happiness, and the meaning of reason itself in conditions of 'scientific' barbarism these historical realities explain and vindioate the agenda of the new Marxisms, and the ethos of paradox and tragedy that set their characteristic tone.' (Longman 1992 10)।

সাত

ষাটের দশকে ইউরোপের বৌদ্ধিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে আকরণবাদ। স্বভাবত মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব এই সাধারণ আবহকে অস্বীকার করতে পারেনি। মৌল বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে উভয়ের আধেয়তে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে; সামাজিক অস্তিত্বের বাচন (লাঙ্গ) থেকে বিচ্ছিন্ন করে কখনও কোনো ব্যক্তি-অস্তিত্বের একক বাচনকে (প্যারোল) বোঝা সম্ভব নয়। মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন, ব্যক্তি আসলে সমাজ-সংস্থায় বিশেষ অবস্থানের ধারক, স্বাধীন ক্রিয়ার উৎস বা নিয়ন্তা নন। আর, আকরণবাদীরা মনে করেন, ব্যক্তির কর্ম ও উচ্চারণ চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভূত হয়, তার বাইরে কোনো তাৎপর্য কেউ পেতেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারে না। তবে দুইয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও রয়েছে। আকরণবাদী অন্তর্নিহিত আকরণগুলিকে কালাতীত ও স্বনিয়ন্তা পদ্ধতি বলে মনে করেন; কিন্তু মার্ক্সবাদীর মতে সেসব ইতিহাস-জাত, পরিবর্তনীয় ও দ্বন্দ্বসঙ্কুল। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের এই দ্বিবাচনিকতায় মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বে দেখা দেয় আকরণবাদী ধারা। এর মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে তিনজনের নাম করতে পারি লুসিয়েন গোল্ডম্যান, লুই আলত্যুসের ও পিয়ের মাশেরে।

লুসিয়েন গোল্ডম্যান 'The Hidden God' ও 'Towards a Sociology of Novel' বইতে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিবেদন বিশ্লেষণের জন্যে মার্ক্সীয় বিচারপদ্ধতির যে-বিশিষ্ট রূপ তুলে ধরেছেন, তাকে তিনি 'Genetic Structuralism' বলতে চেয়েছেন। পাঠকৃতিকে তিনি ব্যক্তিপ্রতিভার সৃষ্টি বলতে চাননি; তাঁর মতে কোনো বিশেষ সামাজিক বর্গ বা গোষ্ঠীর ব্যক্তি-অতিযায়ী মানসিক আকরণই হল পাঠকৃতির ভিত্তি। ঐসব বর্গ বা গোষ্ঠী দ্বারা বিশ্ববীক্ষাগুলি বারবার নির্মিত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে। রূপান্তরপ্রবণ বাস্তবতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানসিক আকরণ, ভাবমূর্তি ও ধ্যানধারণা অনবরত পাল্টে নেয়। সাধারণত এইসব অনুপুঙ্খ সামাজিক চেতনায় খুব একটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না বা ধরা পড়লেও তার ছবি সুনির্দিষ্ট অবয়ব পায় না। কিন্তু মহান লেখকেরা সেইসব বিশ্ববীক্ষাকে যথার্থ ও সুসংহত আঙ্গিকের মধ্যে বিন্যস্ত করে পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। আপ্তবাক্য কন্টকিত বাস্তববাদের পরম্পরা থেকে বাইরে, বিশেষত লুকাচীয় ঘরানা থেকে দূরে সরে গিয়ে, গোল্ডম্যান নতুন ধরনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন। সামাজিক শ্রেণি ও সাহিত্যিক প্রতিবেদনের অভিব্যক্তিমূলক সম্পর্ক তিনি প্রতিফলিত বিষয়বস্তুতে খোঁজেন নি, খুঁজেছেন প্রকরণের সমান্তরালতায়। উৎস, আকরণ ও অবস্থানের ঐক্য-বিষয়ক ধারণা বিকশিত করে তিনি আধুনিক উপন্যাসের আকরণ ও বাজার-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। উদারনৈতিক পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে রূপান্তরিত হল, নতুন অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির গুরুত্ব কমে গেল অভূতপূর্ব ভাবে। মানববিশ্বের সমস্ত মূল্যমান যত শিথিল হতে লাগল, এই পর্যায়ের উপন্যাসেও দেখা গেল বিপুল রূপান্তর। গোল্ডম্যান এভাবে মার্ক্সীয় বিচার-পদ্ধতির যে-আদলটি তৈরি করেছিলেন, তাতে ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাবৃত্তের নৈরাশ্যবাদ না থাকলেও তাদের সমৃদ্ধ দ্বন্দ্ববাদী অন্তর্দৃষ্টিও অনেকটা অনুপস্থিত।

লুই আলত্যুসের ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বে যত প্রভাব বিস্তার করেছেন, ততটা সম্ভবত আর কেউ করেননি। তাঁর চিন্তা আকরণবাদ ও আকরণোত্তরবাদ—এই দুটি পর্যায়ে উন্মোচিত হয়েছে। মার্ক্সীয় দর্শনের মধ্যে হেগেলীয় চিন্তার পুনরুত্থান তিনি মানতে অস্বীকার করেছেন : কেননা, তাঁর মতে যতটা পরিমাণে মার্ক্স হেগেলীয় চিন্তার পুনরুত্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, ঠিক সেই অনুপাতে জ্ঞানতত্ত্বে তাঁর অবদান প্রকট হয়েছে। হেগেলের সমগ্রতা বিষয়ক ধারণাকে যেমন আলত্যুসের সমালোচনা করেছেন, তেমনি 'সমাজ পদ্ধতি' বা 'শৃঙ্খলা' জাতীয় শব্দের প্রয়োগও এড়িয়ে চলেছেন। সুস্পষ্ট কেন্দ্রযুক্ত আকরণের অস্তিত্ব তাঁর কাছে অস্বস্তিদায়ক, কেননা, এই কেন্দ্রিকতা সমস্ত অভিব্যক্তির আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রণ করে। আলত্যুসের বরং বলেন সামাজিক অবয়ব-নির্মাণের কথা, যার মধ্যে তিনি দেখতে পান বিকেন্দ্রায়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকরণকে। এর না আছে কোনো নিয়ন্তা রীতি, না আছে কোনো উৎস-বীজ, না আছে সামগ্রিক ঐক্য। ঐ নির্মিতির অন্তর্বর্তী বিভিন্ন উপাদান বা স্তর কোনো পূর্বধার্য মূল স্তরের প্রতিফলন মাত্র নয়; কেননা, প্রতিটি উপকরণেরই রয়েছে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। এদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আবার অন্তর্বৃত দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক সংঘর্ষের জটিল সম্পর্ক রয়েছে। তিনি শিল্পকলাকে ভাবাদর্শের নিছক একটি প্রকরণ হিসেবে মনে করেননি। কোনো মহৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি কেবলমাত্র বাস্তবতার প্রতীতিকে ভাবগত ভিত্তির উপর স্থাপন করে না কিংবা শুধুমাত্র কোনো একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির ভাবাদর্শকেও প্রকাশ করে না। বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর বক্তব্য অনুসরণ করে তিনি জানিয়েছেন, শিল্পকলা আমাদের দূর থেকে নিরাসক্ত চোখে দেখতে শেখায়। আলত্যুসের-এর মতে ভাবাদর্শ হল 'A representation of the imaginary relationship of individuals to their condition of existence.'। এই কাল্পনিক চৈতন্য আমাদের যে শুধু জগতের তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে এমন নয়, জগতের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ককে আড়াল বা অবদমিতও করে। যে-ভাবাদর্শ থেকে জন্ম নেয় শিল্প ও যাতে সে আশ্রয় করে, শেষপর্যন্ত তার কাছ থেকেই হয়তো দূরে সরে যায়। এভাবে সাহিত্যিক পাঠকৃতি লেখকের নিজস্ব ভাবাদর্শের সীমাকে পেরিয়ে যেতে পারে।

পিয়ের মাশেরের 'A theory of literary production' (১৯৬৬) বইতে আলত্যুসেরের শিল্পকলা ও ভাবাদর্শ বিষয়ক আলোচনাকে আমরা আরো প্রসারিত হতে দেখি। পাঠকৃতিকে তিনি সৃষ্টি বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্মাণ বলে মনে করেননি; মনে করেছেন বিশিষ্ট উৎপাদন হিসেবে, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয় এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিতও হয়ে যায়। মাশেরে মনে করেন প্রচলিত নান্দনিক রীতি কিংবা লেখকের অভিপ্রায় যা-ই থাকুক, পূর্ব নির্দিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে পাঠকৃতি কখনও পুরোপুরি সচেতনভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে হয়, পাঠকৃতি যেন স্বয়ংক্রিয় অস্তিত্ব এবং তার নিজস্ব অবচেতনা রয়েছে। ভাবাদর্শ নামক চেতনার বিশিষ্ট একটি অভিব্যক্তি যখন পাঠকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, পুরোপুরি ভিন্ন এক প্রকরণ তৈরি হয়ে যায়। বাস্তববাদী লেখক পাঠকৃতির বিভিন্ন উপকরণকে যতই সমন্বিত করার চেষ্টা করুন না কেন, পাঠকৃতির হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যেই অনিবার্যভাবে দেখা দেয় কিছুটা অসঙ্গতি, কিছুটা হয়তো শূন্যতাও। কোনো পাঠক যদি এর তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে চান, তাঁকে মনোবিকলনবাদীর মতো পাঠকৃতির অবচেতনায় দৃষ্টিপাত করতে হবে। কেননা কথিত বাণীর অন্তরালে সর্বদা রয়ে যায় অনুচ্চারিত ও অবদমিত স্বর।

আট

তিরিশের দশকের পরে ইংল্যান্ডের মার্ক্সীয় সমালোচনার ঐতিহ্য অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। তার পুনরুত্থান ঘটল সত্তরের দশকের গোড়ায়। কেউ কেউ বলেন, ১৯৬৮ সালে ব্যর্থ পারী অভ্যুত্থানের পরে গোটা ইউরোপের ভাবরাজ্যে যে বিপুল পরিবর্তনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচনা হয়েছিল, তারই অভিঘাতে ফ্রেডরিক জেমসন, টেরি ঈগলটন প্রমুখ তাত্ত্বিকদের বিকাশ ঘটে। জেমসন-এর 'Marxism and Form' (১৯৭১), 'The prison house of Language'(১৯৭২), 'The political unconscious' (১৯৮১) এবং টেরি ঈগলটনের 'Criticism and Ideology' (১৯৭৬), 'The significance of theory' (১৯৯০), 'The Ideology of the Aesthetic' (১৯৯১) এই নতুন পর্যায়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিবেদন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য 'Marxism and Literature' (১৯৭৭), 'Problems in Materialism and Culture' (১৯৮০) 'Keywords' (১৯৮৩) প্রভৃতি বইয়ের প্রণেতা রেমন্ড উইলিয়ামস্। উইলিয়ামসের তত্ত্বচিন্তা 'সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ' (Cultural materialism) হিসেবে পরিচিত হয়েছে। তিনি সামাজিক দ্যোতনার সমগ্র পরিসরকে নতুন তাত্ত্বিক নিমিতির সাহায্য বোঝাতে চেয়েছেন। সংস্কৃতি হল জীবনের সামগ্রিক পথ ও পাথেয়। চিহ্নায়নের যাবতীয় প্রক্রিয়াকে তিনি উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন করেছেন। ফলে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক প্রকাশমাধ্যমগুলির বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। অবশ্য সমালোচক-জীবনের প্রথম পর্যায়ে উইলিয়ামস্ ধ্রুপদী মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; মার্ক্সের চিন্তার মধ্যে ভাববাদের অবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। ফলে টেরি ঈগলটন পরবর্তী কালে উইলিয়ামসের বক্তব্যকে অসম্পূর্ণতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন।

আলত্যুসেরের মতো ঈগলটনও এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, সমালোচনা পদ্ধতিকে ভাবাদর্শগত প্রাক-ইতিহাস থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞান হতে হবে। মূল সমস্যা হল, সাহিত্য ও ভাবাদর্শের আন্তঃসম্পর্ককে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব। ঈগলটন জানাচ্ছেন, পাঠকৃতিতে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিফলন থাকে না, পাঠকৃতি আসলে ভাবাদর্শের বলয়ে সক্রিয় হয়ে বাস্তবতার প্রতীতি তৈরি করে। একে বাস্তবতার অবভাস বলা যায় কিনা, এ নিয়ে অবশ্য সূক্ষ্ম তর্ক আছে। যেহেতু চরিত্র এবং ঘটনা লেখকের ইচ্ছামতো পাঠকৃতিতে নির্মিত হতে পারে এবং তাদের বিকাশ ও বিলয় তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; মনে হয়, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাঠকৃতি কার্যত স্বাধীন। কিন্তু ভাবাদর্শ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা নেই। বলা প্রয়োজন, নান্দনিক-ধর্মীয়-সামাজিক-ইত্যাদি যত কিছু পদ্ধতি মানবপ্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও মানসিক প্রকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে—তাদের যোগফল হলো ভাবাদর্শ। তাই ভাবাদর্শ বলতে সুনির্দিষ্ট কিছু মতবাদ বোঝাচ্ছে না। প্রতিনিয়ত ভাবাদর্শ নিজস্ব উপায়ে বাস্তবতার আদল ও স্বভাব গড়ে তুলছে। আর, পাঠকৃতি আসলে সেই নির্মিতিকে পুনর্নির্মাণ করে নানা তাৎপর্য ও দৃষ্টিকোণের সমাবেশ ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ পাঠকৃতিতে উপস্থাপিত বাস্তবতা আসলে ছায়ার ছায়া মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে যে বাস্তবতার মধ্যে থাকি, শৈল্পিক বাস্তবতা তার হুবহু অনুকৃতি নয়; এরকম হতেও পারে না। আমাদের অবস্থান নিরালম্ব নয়; ভাবাদর্শের দৃশ্য ও অদৃশ্য, ইচ্ছাতীত ও স্বযাচিত অবলম্বন আমরা অস্বীকার করতে পারি না কিছুতেই। এর মধ্য দিয়ে বাস্তব বলে তা-ই দেখি যা আমরা দেখতে চাই এবং যা আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। অতএব এও মূলত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক নির্মিতি; শিল্পী-সাহিত্যিক এই নির্মিতিকে ভিত্তি বলে ধরে নিয়ে তার উপর আরেক দফা রঙ চড়িয়ে বা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে পুনর্নির্মিত অবয়ব তৈরি করেন। পাঠকৃতির উৎস-রূপ থেকে কত স্তরে ও পর্যায়ে পাঠকৃতিতে নিষ্পন্ন ভাবাদর্শে পৌঁছাতে হয়—এই জটিল ও দীর্ঘায়ত বয়নকে ঈগলটন বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ আলত্যুসের যেমন মনে করেন, সাহিত্যে ভাবাদর্শ থেকে দূরত্ব তৈরি করতে পারে—এই বক্তব্য মেনে নেননি তিনি।

ঈগলটনের বিশেষত্ব এখানেই যে তাঁর তত্ত্বচিন্তা অনবরত এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সঞ্চরণ করছে। সমসাময়িক ভাববিশ্বের বিভিন্ন প্রবণতা তাঁকে ভাবিয়েছে এবং এদের সম্পর্কে মার্ক্সীয় সমালোচনা তিনি পেশ করেছেন। এইজন্যে পূর্বজদের বক্তব্য নিরন্তর অনুশীলন করে ঈগলটন সচল রাখতে চেয়েছেন মার্ক্সীয় ভাববিশ্বকে। আকরণোত্তরবাদ, বিনির্মাণবাদ, নারীচেতনাবাদ সমস্তই তাঁর নিজস্ব প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে। এইজন্যে ধীরে ধীরে আলত্যুসেরের প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে তিনি বের্টল্ট ব্রেখ্ট ও ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ঐ সময় মার্ক্সের প্রবাদপ্রতিম মন্তব্যে বিধৃত সত্য তাঁর ভাবনার ধ্রুবপদ হয়ে দাঁড়ায় 'নৈর্ব্যক্তিক সত্য মানুষের চিন্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা, এই প্রশ্ন আসলে তাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়। এটা খুবই প্রায়োগিক প্রশ্ন। দার্শনিকেরা তো মূলত নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা করেছেন, মূল কথাটা হল একে বদলাতে হবে।' এই কেন্দ্রীয় বোধ থেকে দেরিদা, পল দ্য ম্যান প্রভৃতি চিন্তাবিদদের বিনির্মাণবাদী তত্ত্বে ঈগলটন লক্ষ করেছেন সমস্ত রুদ্ধতা, সমস্ত অতিনিশ্চয়তা ও সার্বভৌম জ্ঞানের প্রকরণকে অস্বীকার করার সম্ভাবনা। অবশ্য বির্নির্মাণবাদ যেভাবে নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব ও শ্রেণিচেতনাকে পাতিবুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাখ্যান করে, ঈগলটন তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। যদি মনে হয় যে এতে ঈগলটনের স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে এর সম্ভাব্য উত্তর হল, তিনি আলত্যুসেরের তত্ত্বপ্রস্থানের উজানে গিয়ে খোদ লেনিনের তত্ত্ববিশ্বে বিশ্লেষণের আধেয় খুঁজে পাচ্ছেন। এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, প্রকৃত তত্ত্ব চূড়ান্ত রূপ নেয় কেবল সত্যিকারের জনগণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রে। ফলে মার্ক্সীয় সমালোচনার মূল আধেয় দার্শনিক বিতর্কে নেই, রয়েছে রাজনৈতিক অনুভবে। স্বভাবত সমালোচককে এখন সাহিত্যের যথাপ্রাপ্ত ধারণাগুলি বিনির্মাণ করেই এগোতে হবে; ব্যাখ্যা করতে হবে কীভাবে পাঠকের আত্মগত উপলব্ধি নির্ধারণে ঐ রাজনৈতিক অনুভব ভাবাদর্শগত আকরণ হিসেবে সক্রিয় থাকে। শুধু তা-ই নয়, সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী রচনা কেমন করে রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে এর আকরণগুলি উন্মোচিত করে দিতে হবে সমালোচককে। আর যেসব রচনা স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক চেতনার সহায়ক হচ্ছে—তাদেরে আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করা মার্ক্সীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকের বড়ো দায়।

ঈগলটনের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের প্রকৃত পরিস্থিতি মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিকাশের ধারায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশেষত ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর অবদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই ঘরানার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিন্তাবিদেরা আধুনিক সংস্কৃতির যে নেতিবাচক সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে তিনি একদিকে লক্ষ করেছেন ইউরোপে ফ্যাসিবাদী আধিপত্য এবং অন্যদিকে আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত ধনতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। সেইসঙ্গে এর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন থেকে তাঁদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিচ্যুতির পরিণামও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। পাশাপাশি ঈগলটন রণকৌশলের প্রয়োগেও যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, এও আমাদের নজরে পড়ে। মার্ক্সবাদের সঙ্গে আধুনিক বীক্ষণের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্যে তিনি লাকাঁর মনোবিকলনবাদ ও দেরিদার বিনির্মাণবাদ কাজে লাগিয়েছেন। সেইসঙ্গে কখনও নারীচেতনাবাদ কখনও পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদ তাঁর বিশ্লেষণী আকল্পকে বারবার নতুন করে তুলেছে। বস্তুত খুব কম সমালোচকই ঈগলটনের মতো এমনভাবে নিজেকে নিরন্তর পালটে নিতে পেরেছেন। ফ্রেডরিক জেমসনের 'Marxism and Form' (১৯৭১) মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বে দ্বন্দ্ববাদকে নতুন প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দ্বান্দ্বিক সাহিত্য-সমালোচনায় বিশ্লেষণের জন্যে একক সাহিত্যকর্ম বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত হয় না, ব্যক্তি সর্বদা বৃহত্তর আকরণ (পরম্পরা বা আন্দোলনের) কিংবা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অংশ। দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাসী সমালোচক সাহিত্যে প্রয়োগ করার জন্যে কোনো পূর্ব-নির্ধারিত বর্গের ওপর নির্ভর করেন না। তিনি এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকেন যে, রচনাশৈলী-চরিত্র-চিত্রকল্প ইত্যাদি আলোচ্য বর্গকে শেষপর্যন্ত তার নিজস্ব ঐতিহাসিক অবস্থানের নিরিখে বুঝে নিতে হয়। কোনো সমালোচক যে-ধারণার কাঠামোকে গড়ে তুলুন না কেন বা যে-দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নেন না কেন, তাঁকে লক্ষ করতেই হয় কীভাবে বাস্তবতার চাপে এইসব কাঠামো ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে যায় এবং অনবরত পরিস্থিতি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উপায়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক পাল্টে নেয়। সময়ের মধ্যে আমাদের আত্মগত অস্তিত্বের ঘেরাটোপ থেকে আমরা যদিও বেরোতে পারি না, তবু সময়-লালিত বাস্তবতাকে আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্যে পূর্ব- নির্ধারিত ধারণার খোলস ভাঙার চেষ্টা অবশ্যই করতে পারি। জেমসন দেখিয়েছেন, একচেটিয়া পুঁজিবাদের শিল্পায়ন-উত্তর জগতে মার্ক্সীয় তত্ত্ববিশ্বও অনেকটা রূপান্তরিত। তার প্রধান উপজীব্য অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক, মূর্ত ও বিমূর্তের বিরোধ, সামগ্রিকতার ধারণা, অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর দ্বান্দ্বিকতা এবং আত্মতা ও বস্তুতার মিথস্ক্রিয়া। প্রকৃত মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক শুধু বহিরঙ্গে তৃপ্ত থাকেন না। আলোচ্য প্রকাশ-মাধ্যমের অন্তর্বৃত প্রকরণ, পাঠকৃতির গ্রন্থনা কীভাবে বহুস্বরিক সত্যকে প্রকাশ করেছে—তা বিশ্লেষণ করাই তাঁর লক্ষ্য। কেননা অন্তর্বৃত স্তরে বিমূর্তায়িত আঙ্গিক মূর্ত জগতের উপলব্ধির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

'The Political Unconscious' বইতে জেমসন মার্ক্সীয় তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে যেন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এতে তত্ত্বভাবনার মৌল দ্বান্দ্বিকতা যেমন উপস্থিত, তেমনি লক্ষ করি সংশ্লেষণী প্রবণতা। পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সংশ্লেষণ ঘটানোর চেষ্টার মধ্য দিয়ে মার্ক্সীয় অণুবিশ্বের সীমারেখাই প্রসারিত হয়েছে। আকরণবাদ, আকরণোত্তরবাদ, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, আলত্যুসেরের বিশ্লেষণী কৃৎকৌশল ও অ্যাডোর্নোর ভাববিশ্বের উপাদান ইত্যাদি আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে জেমসন আসলে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি যেন দেখাতে চেয়েছেন, একমাত্র এভাবেই বিবর্ণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জগতে কিছুটা রং ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। আজকের বহুধা-খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নতার দহনে পীড়িত জগতে হারিয়ে-যাওয়া সমগ্রতাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারি কেবল বহুত্ববাদী বীক্ষণের মধ্য দিয়ে। এছাড়া জেমসন আখ্যানের ব্যাখ্যায়ও যথেষ্ট নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং সমস্ত ব্যাখ্যাকে ভাবাদর্শনির্ভর বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, শোষক এবং শোষিত—এই দুই বর্গেরই তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে রাজনৈতিক অবচেতনা খুব প্রাসঙ্গিক। পাঠকৃতি ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান আকরণোত্তরবাদীরা যেভাবে লুপ্ত করতে চান, স্বভাবত তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করেন, পাঠকৃতির উৎসগত বহুত্ব ও অনেকান্তিকতাকে বুঝতে হবে পাঠকৃতির বাইরে—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের আবহে। জেমসনের 'Post Modernism or the Cultural Logic of Late Capitalism' (১৯৯১) নানা কারণে একটি অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ। সেখানে তিনি আধুনিকোত্তরবাদকে নিছক রচনা- প্রকরণ বলে মনে করেননি; আমাদের সময়ের সাংস্কৃতিক প্রতাপের অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন। কেননা আধুনিকোত্তরবাদ একদিকে আমাদের সমস্ত শৈল্পিক ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চাইছে, অন্যদিকে পুরোপুরি নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতিকে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিসরে পুনর্গঠন করছে। মার্ক্সীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা এর ফলে যে প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হয়েছেন, জেমসন সে-ব্যাপারে সহযাত্রীদের সচেতন করতে চাইছেন—এরকম মনে হয় আমাদের।

সবশেষে আমরা টেরি ঈগলটনের একটি সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া মূল্যবান কিছু সূত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। মাইকেল পেইনের সঙ্গে আলোচনায় (১৯৯০) ঈগলটন বলছেন, আজকের এই অস্থির সময়ে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের দায় আরো গুরুভার হয়ে পড়েছে। একদিকে বিরুদ্ধ ও বিরূপ বিশ্বে সমস্ত বিশ্বাস, ভাবাদর্শ ও অবস্থানকে অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণ করার সর্বগ্রাসী আলোড়ন তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তর্ঘাত মার্ক্সবাদীকে একই সঙ্গে চিন্তার কেন্দ্রিকতা ও বহুত্ববাদী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানে তৎপর করে তুলছে। ঈগলটন-এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন—'there is always more than one emancipatory discourse with which one can work' (১৯৯০ ৭৬)। বদ্ধতা নয়, মুক্তি কোনো মার্ক্সবাদী এই মূল অবস্থান থেকে সরে যেতে পারেন না। সাম্প্রতিক পৃথিবীর চরম কূটাভাস পরিপূর্ণ ও সংশয়দীর্ণ আবহে তিনি মুক্তির একাধিক প্রতিবেদন সন্ধান করেন। কোনো মার্ক্সবাদী তত্ত্বের জন্যেই তত্ত্বকে কর্ষণ করেন না, তিনি জানেন, 'theory is not and should not be self-generating, but should be at the service of certain kinds of practice.' (তদেব ৭৭)। প্রয়োগের মধ্যে যদি কোনো তত্ত্ব পরীক্ষিত, সমৃদ্ধ ও বাস্তবায়িত না হয়—তার সম্পর্কে মার্ক্সীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকের আগ্রহ থাকতে পারে না। বিবর্তনশীল সময়ের পলিমাটি থেকে যত জটিলতার গুল্মজাল জেগে উঠছে, মার্ক্সবাদীকেও তার মোকাবিলার জন্যে নতুন নতুন পদ্ধতি ভেবে নিতে হচ্ছে। সত্তর দশকের 'fetishism of method' (তদেব) থেকে বিচার-পদ্ধতির বহুত্ববাদে উত্তীর্ণ হচ্ছেন তাঁরা। ঈগলটন বলেছেন, বিচার-পদ্ধতির অনড় ধারাবাহিকতার বদলে রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবিচল আগ্রহ এখন শ্রেয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। আকরণোত্তরবাদ বা বিনির্মাণবাদের মতো বৌদ্ধিক চর্যায় হস্তক্ষেপ করছেন মার্ক্সবাদীরা। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে প্রায়ই যে-ব্যবধান ও অসঙ্গতি রচিত হচ্ছে, তার উৎস প্রায়োগিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় নিহিত সমস্যা ও সংকট। মার্ক্সীয় সাহিত্যতাত্ত্বিককে এখন সতর্কভাবে একাধিক রাজনৈতিক ও প্রায়োগিক বিকল্প বিবেচনা করতে হচ্ছে। পাঠকৃতি ও বাস্তবতার অনেকান্তিক সম্পর্ক যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার জন্যে পুনঃপাঠকে তিনি শানিততর আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করছেন। প্রতিপক্ষের বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, সাম্প্রতিক মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ভাবাদর্শের রুদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছে অনেকান্তিক প্রতিবেদনের মুক্ত উপসংহারে। চিন্তার সব সীমান্ত যখন দ্রুত মুছে যাচ্ছে, মার্ক্সবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকের কাজও দুরূহ থেকে দুরূহতর হয়ে পড়ছে। কেননা একদিকে চিন্তা ও বিশ্বাসের কেন্দ্র অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিজ্ঞা এবং অন্যদিকে বহুত্ববাদী প্রবণতার প্রতি আগ্রহ—এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিকতার চরিত্র ও সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হচ্ছে তাঁকে প্রয়োগের অনন্ত পরিসরে। ঈগলটনের চমৎকার মন্তব্য এ-বিষয়ে দিগ্‌দর্শক হতে পারে 'Theory, this enigmatic and mysterious entity, represents now that potential moments for us. It represents the option between trying to move out in ways of broader relevance, of allowing criticism to be shunted into a purely technocratic, siding of no essential social relevance.' (তদেব ৮৩)। সম্ভবত এই উদ্ভাসনী মন্তব্যের নিরিখে সাম্প্রতিক বিশ্বপরিস্থিতিতে মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের কৃত্য ও সম্ভাবনা নির্ধারিত হতে পারে। একটি পথ ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে বিকাশের কেন্দ্রিকতা ও অনেকান্তিক প্রয়োগের দ্বান্দ্বিকতা সম্বল করে, অন্যদিকে আরেকটি পথ তথ্য-সাম্রাজ্যবাদ ও উচ্চতম প্রযুক্তির যৌথ আক্রমণে ভাবাদর্শের আপাত-অপ্রাসঙ্গিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবত প্রথম পথেই পুনর্নির্মিত হচ্ছে মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের মাটি ও আকাশ, নান্দনিক প্রেক্ষিত ও সৃষ্টির লাবণ্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকরণবাদ

সাহিত্যিক পাঠকৃতি যখন বিশ্লেষণ করি, সমালোচনাত্মক সন্দর্ভ প্রস্তুত করি কিংবা তাৎপর্য নির্ণয়ের পথ ও পাথেয় খুঁজি—প্রতিবেদনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকি না। দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব সহ নানা ধরনের প্রসঙ্গ উত্থাপনকে অনিবার্য বলেই ধরে নিই কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন, বাচনাতিরিক্ত প্রসঙ্গের ভিত্তিতে পাঠকৃতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সমীচীন নয়। পাঠকৃতিতে যা আছে, তা-ই বিশ্লেষণ করা উচিত; এক চুল কমও নয় বেশিও নয়। সাহিত্যিক প্রতিবেদনের সাহিত্যিকত্ব অন্বিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়; তাকে আদর্শায়িত করা মানে সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে পূর্বনির্ধারিত তাৎপর্য বয়ানে আরোপিত করা। এধরনের ভাবনা যাঁদের, লেখকের অভিপ্রায় বা বৌদ্ধিক-জৈবনিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের বাধ্যবাধকতা কিংবা বয়ানের দ্যোতনা—কোনো কিছুতেই তাঁদের আগ্রহ নেই। এঁরা শুধু সাহিত্যিকতা বা পাঠকৃতির ভাষা ও বাচনিক সংগঠন সম্পর্কে উৎসাহী। তাঁদের লক্ষ্য 'formal quintessence' বা প্রাকরণিক সারাৎসার। তাঁরা মনে করেন, পাঠকৃতি একান্ত নিজস্ব ধরনে এবং তার অনন্য ভাষায় নিজের কথা জানায়। অতএব এই গণ্ডির বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। ব্যবহৃত প্রকরণের মধ্যেই যাবতীয় অর্থ লুকিয়ে আছে, প্রকরণের বাইরে কিছুই নেই। সমস্ত সার্থক পাঠকৃতিই স্বয়ংপ্রভ ও সার্বভৌম।

প্রকরণবাদের প্রাক্‌কথন হিসেবে এই কথাগুলি লিখছি যখন, ইঙ্গ-মার্কিন নব্য সমালোচনা ধারার বক্তব্য মনে আসে। আর্কিব্যালড ম্যাকলাইশের 'আর্স পোয়েটিকা' কবিতার প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি যেন এই মতবাদের ইস্তাহার : 'A poem must not mean, but be'! আর,সমালোচক মার্ক শোরের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে 'Technique as Discovery' (১৯৪৮) প্রবন্ধে লিখেছেন : আধুনিক সমালোচনা আমাদের বুঝিয়েছে, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করলেই সাহিত্য-পাঠ বা শিল্প-আলোচনা করা হয় না। কারণ, বিষয়বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয় মাত্র। তাকেই প্রকৃত সমালোচনা বলতে পারি শুধুমাত্র যখন 'We speak of the achieved content, the form, the work of art as a work of art, that we speak as critics, The difference between content or experience, and achieved content or art, is technique.'। বলা বাহুল্য, প্রকরণকে যে 'অর্জিত বিষয়বস্তু' বলা হল, তার প্রকৃত তাৎপর্য কেবলমাত্র ভাষার নিরিখে উপলব্ধি করা সম্ভব। যখন কবিতা বা উপন্যাসের নিবিড় পাঠ করি, বাচনের বহুমাত্রিক উপস্থাপনাই তো মূলত লক্ষ করি। আমাদের কোনো সিদ্ধান্তই ভাষার বাইরে যায় না, ভাষা-নিরপেক্ষ হয় না। সাংস্কৃতিক রাজনীতির কঠিন যুদ্ধে সাহিত্য নিশ্চয় অস্ত্র; কিন্তু ভাষা যদি শানিত ও ভারবহনক্ষম না হয়, অস্ত্রপ্রয়োগ অসম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হবে। এইজন্যে বুঝে নিতে হয়, প্রকরণেরও অন্তর্বস্তু আছে; প্রকরণ নিছক যান্ত্রিক উপস্থিতি নয়। কোনো পাঠকৃতিতে কাকে বলব সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিকত্ব, প্রকরণবোধ ছাড়া তা বুঝব কী করে! পাঠকৃতির মধ্যে সাংগঠনিক ঐক্য আছে নাকি নেই—এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসার সমাধান কেবল প্রকরণবাদই করতে পারে। নিরাবেগ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক মননের ওপর গুরুত্ব আরোপ করাও তাই প্রত্যাশিত। রামান সেলডেন ও পিটার হ্বিডোওসোন প্রকরণবাদী চিন্তাপ্রস্থানের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন নব্য সমালোচনা ধারার বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষ করে বলেছেন, শেষোক্তদের অভিনিবেশ ছিল—'to the specific verbal ordering of texts with an emphasis on the non-conceptual nature of literary meaning.' (১৯৯৩ ২৭)। যদিও আমাদের মনে একটু খটকা থেকেই যায়, সাহিত্যিক তাৎপর্যের স্বভাব কখনো ভাববীজ-রিক্ত হতে পারে কিনা! তাঁদের মতে শেষোক্তদের সাহিত্য-পাঠ মূলগত ভাবে মানবতাবাদী। এতে খটকা আরো বেড়ে যায় কেননা উদ্ধৃত বয়ানের সঙ্গে এই ভাবনার স্পষ্ট বিরোধিতা চোখে পড়ে। যাই হোক, প্রাগুক্ত আলোচকেরা নব্য সমালোচনাধারার সঙ্গে রুশ প্রকরণবাদীদের প্রাথমিক কিছু পার্থক্যও লক্ষ করেছেন। অন্তত প্রথম পর্যায়ের রুশ প্রকরণবাদীরা মনে করতেন, আবেগ-সাধারণ বাস্তবতা-বিভিন্ন ধারণাকেন্দ্রিক মানবিক বিষয়বস্তুর নিজস্ব কোনো সাহিত্যিক তাৎপর্য নেই। এরা কেবল সাহিত্যিক কৃৎকৌশলগুলির প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করার জন্যে প্রেক্ষিতের যোগান দেয়।

রুশ প্রকরণবাদের প্রথম পর্যায়ে অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ দ্বিমেরুবিষম দূরত্ব কল্পিত হত, পরবর্তী পর্যায়ে তার তীব্রতা অনেকখানি কমে গেছে। কিন্তু এও লক্ষণীয় যে নব্য সমালোচনা ধারায় নান্দনিক প্রকরণকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে অন্বিত করে দেখানোর প্রবণতা থাকলেও প্রকরণবাদীরা তাকে মান্যতা দেননি। তাঁরা বরং এটা দেখাতে চেয়েছেন যে, সাহিত্যিক কৃৎকৌশলগুলি দ্বারা উৎপাদিত নান্দনিক প্রতিক্রিয়াকে বোঝার জন্যে বিভিন্ন আকল্প ও পূর্বানুমানের গুরুত্ব রয়েছে। আর, সাহিত্যিকতা যুগপৎ সাহিত্যাতিরিক্ত উপকরণ থেকে স্বতন্ত্র এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নব্য সমালোচনাপন্থা সাহিত্যকে মূলত মানবিক প্রতীতির একটি ধরন বলে ভেবেছে; কিন্তু প্রকরণবাদ মনে করেছে, সাহিত্য হল ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ। এই ধারার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে রাশিয়ার ভূগোল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে তা রুশ প্রকরণবাদ হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা-বছরে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে এই চিন্তাপ্রস্থানের সূত্রপাত হয়েছিল। সে-বছর ভিক্টর শ্‌কলোভস্কি 'The resurrection of the word' নামে ভবিষ্যবাদী কবিতা নিয়ে যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাতেই প্রকরণবাদের সূত্রপাত হয়। আবার, ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে ভিক্টরের-ই লেখা প্রত্যাহার-সূচক নিবন্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রার সমাপ্তি। রাজনৈতিক চাপে তিনি প্রবন্ধটি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো চিন্তাপ্রস্থানের উদ্ভব ও বিলয়ের ইতিহাস নিশ্চয় এত সরলীকৃত হতে পারে না। কিংবা, কোনো একক ব্যক্তির উদ্যমেও এমন হয় না। নিঃসন্দেহে সমকালীন রাশিয়ার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের নিষ্কর্ষ থেকেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেগেছে প্রকরণবাদ। আবার একই কারণে তার সাংস্কৃতিক এবং নান্দনিক প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে রুশ চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রকরণবাদের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। ১৯২৩ সালে ট্রটস্কির 'Literature and Revolution' বইতে প্রকরণবাদের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে প্রশ্ন ও সংশয় ক্রমশ অপছন্দ ও বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়।

দুই

১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগেই রাশিয়ায় প্রকরণবাদী চিন্তার সূত্রপাত হয়। ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মস্কো ভাষাবিজ্ঞান আলোচনাচক্র এবং ১৯১৬ সালে লেনিনগ্রাদে প্রতিষ্ঠিত 'Opojaz' বা 'The society for the study of poetic language'-এ সমবেত ছাত্রদের সোৎসাহ সভা, আলোচনা ও প্রকাশনার সূত্রে প্রকরণবাদী তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। মস্কোর সদস্যেরা ছিলেন প্রাথমিকভাবে ভাষা-বিজ্ঞানী যাঁদের আগ্রহ কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত ভাষা-বিজ্ঞানী ও পাঠতত্ত্ববিদ রোমান য়্যাকব্‌সন। পরে আরেকজন বিশিষ্ট সমালোচক পিটার বোগাটিরেভ-এর সঙ্গে তিনি ১৯২৬ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানীতে প্রাগ্‌ ভাষাবিজ্ঞান চিন্তাবৃত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে লেনিনগ্রাদের 'Opojaz' নামক চিন্তাবৃত্তের সদস্যেরা ছিলেন প্রধানত সাহিত্যের ছাত্র; এঁরা সাহিত্য-পাঠের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর, রুশ ভবিষ্যবাদী কবিতা সম্পর্কে তাঁদের প্রবল আগ্রহ ছিল।

ভিক্টর শ্‌কলোভস্কি ছিলেন এঁদের অবিসম্বাদী নেতা। এছাড়া বোরিস আইখেনবাউম, ওসিপ ব্রিক ও ইউরি টিনিয়ানোভ গুরুত্বপূর্ণ আলোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রকরণবাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাঁদের প্রয়াসের সমবায়ী অভিব্যক্তিতেই প্রকরণবাদের তত্ত্ববিশ্ব গড়ে উঠেছিল। এককভাবে নয়, সামূহিক অবদানের নিরিখেই সাহিত্যপাঠে তাঁদের অবস্থান বিচার্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভবিষ্যবাদী কবিগোষ্ঠী যখন অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নান্দনিক বক্তব্য তুলে ধরছিলেন এবং বিশেষভাবে কবিতা ও চিত্রকলায় প্রতীকবাদী আন্দোলনের তথাকথিত আত্মানুসন্ধানের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করছিলেন—তারই মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল প্রকরণবাদের প্রাথমিক প্রেরণা।

এঁরা কবিকে কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্যের সঞ্চালক হিসেবে মান্যতা দিতে রাজি ছিলেন না। যন্ত্রযুগে কোলাহলমুখর বস্তুতন্ত্রই কবিতার উৎস—এই বার্তা প্রচার করেছিলেন বহির্মুখী ভবিষ্যবাদী কবি মায়াকোভস্কি। তবে তাঁরা প্রচলিত বাস্তববাদেরও বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতীকবাদীদের সহযাত্রী। ভবিষ্যবাদী কবিদের ঘোষিত অবস্থান ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ শব্দের সপক্ষে। তাঁরা শব্দের আত্মবৃত ধ্বনিসজ্জার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন, বর্ণনীয় বিষয়ের বিন্যাস তাঁদের কাছে তত গুরুত্ব পায়নি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝোড়ো দিনগুলিতে তাঁরা পুরোপুরি বিপ্লবের পক্ষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মতে শিল্পী-সাহিত্যিকের ভূমিকা মূলত সর্বহারাবর্গের প্রয়োজনে নির্মাণ-নৈপুণ্যকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হয়। ডিমিট্রিয়েভ ঘোষণা করেছিলেন 'The artist is now simply a constructor and technician, a leader and foreman.'

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকরণবাদীরা এমন ধরনের সাহিত্যতত্ত্ব নির্মাণে মনোযোগী হয়েছিলেন যা লেখকের লিখন-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা ও কলানৈপুণ্য পরিমাপের বাইরে কিছুই বিচার্য বলে মনে করে না। সে-সময় সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ যে-পথ ধরে বিকশিত হয়েছিল, তার বাইরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান স্পষ্ট করার জন্যে প্রকরণবাদীরা কবি ও শিল্পীদের সামাজিক ভূমিকা সংক্রান্ত প্রলেতারিয় যুক্তি-বিন্যাস এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে সাহিত্য-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা যান্ত্রিক ধরনের চিন্তা-প্রণালী তাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ভিক্টর শ্‌কলোভস্কি, দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে, কবি মায়াকোভস্কির মতোই, প্রখরভাবে বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন। প্রকরণবাদের প্রথম পর্যায়ে সাহিত্যের বিখ্যাত সংজ্ঞাটি ভিক্টর তৈরি করেছিলেন। সাহিত্য, তাঁর মতে, হল : 'the sum total of all stylistic devices employed in it'! অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ছিটে-ফোঁটাও এই চিন্তায় স্বীকৃত নয়। বিপ্লব পরবর্তী প্রথম ছ'সাত বছরে অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত (১৯২৪) প্রকরণবাদকে কোনো রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়নি। একটু আগে ট্রটস্কির যে-সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছি, তাতে আক্রমণের উগ্র ঝাঁজ ছিল না, পরিশীলিত বিকল্প চিন্তা ও ভাবাদর্শ-প্রসূত আপত্তির অভিব্যক্তি ছিল। তবু এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই তখনকার সাহিত্যচিন্তায় প্রবল প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকরণবাদকে রক্ষণাত্মক যুক্তি-বিন্যাস খুঁজতে হয়। ১৯২৮-এ তারই ফলে প্রকাশিত হল য়্যাকবসন/টিনিয়ানোভ বয়ান।

কেউ কেউ মনে করেন, প্রথম পর্যায়ে প্রকরণবাদ ছিল 'বিশুদ্ধ', কিন্তু পরে রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সমঝোতা করার ফলে তা বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের কাছে এ আসলে প্রকরণবাদের পরাজয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালে রাষ্ট্রীয় অসন্তোষে, বলা ভালো, পীড়নের আশঙ্কায় এই চিন্তাপ্রস্থান বাধ্যতামূলক মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু এই অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে যদি প্রকরণবাদের নিবিড় পাঠ করা যায়, দেখা যাবে, এর চিন্তা-প্রণালীতে এমন কিছু প্রবণতা ছিল যাদের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে অনিবার্য শিথিলতা, অবসাদ ও অবরোহণের প্রক্রিয়া। সমাজতান্ত্রিক মাত্রাকে যত অস্বীকার করার চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাসের ছায়াকে মুছতে পারেনি প্রকরণবাদ। মিখায়েল বাখতিনের আবির্ভাব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোনো সন্দেহ নেই যে বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের প্রধানতম অভিজ্ঞান দ্বিবাচনিকতার সার্থক নিদর্শন লক্ষ করি বাখতিন ও তাঁর সহযোগীদের ভাববিশ্বে। কারণ, তাঁরা প্রকরণবাদ ও মার্ক্সবাদের মধ্যে সংশ্লেষণের পথে সংযোগ গড়ে তুলেছিলেন। সামগ্রিক ভাবে বিশ শতকীয় তত্ত্ববিশ্বের মোহনায় দাঁড়িয়ে যদি উৎসের পানে ফিরে তাকাই, দেখব, পরবর্তী কালপর্বে এর বহুমাত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা সেদিন ঐ সংযোগের মধ্যে আভাসিত হয়েছিল। যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হোক, এ বিষয়ে আরো আলোচনা পরে করা যাবে। এখানে উল্লেখ করা যাক, প্রকরণবাদ ও মার্ক্সবাদ যেমন যুগলবন্দি তৈরি করেছিল—তেমনি আরেক ধরনের যুগলবন্দি গড়ে উঠেছিল প্রকরণবাদ ও আকরণবাদের মধ্যে। মুখ্যত য়্যাকবসন ও টিনিয়ানোভের প্রচেষ্টায়।

রোমান য়্যাকবসন ১৯২০-এ মস্কো থেকে চেকোশ্লাভাকিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সর্বত্র তিনি একই সঙ্গে দীপাধার ও দীপরক্ষী যেন। ১৯২৬ সালে প্রাগে ভাষা-বিজ্ঞানীদের নতুন সংসদ গড়ে উঠল এবং ১৯৩৯ সালে রাজনৈতিক কারণে ভেঙে গেল। নাৎসি জমানায় স্বাধীন চিন্তার কোনো অবকাশই ছিল না। তাই আরেক বিখ্যাত আলোচক রেনে ওয়েলেক এবং আরো কয়েকজনের মতো য়্যাকবসন পাড়ি দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মুখ্যত তাঁরই প্রভাবে সেখানে প্রকরণবাদের বীজতলি থেকে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে নব্য সমালোচনা ধারার উদ্ভব হল। এই প্রতিবেদনের প্রাক্‌কথন হিসেবে সেই প্রসঙ্গ শুরুতে উত্থাপন করেছি। এ যেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের অন্তরা থেকে স্থায়ীতে ফিরে আসা। আলোছায়াময় বিকাশের পথে দাঁড়িয়ে সেই উত্তাপ-উৎসকে চিনে নেওয়া, যার বহুরৈখিক বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়েছে সমতলে ও উপত্যকায়, আরোহী ও অবরোহী পর্যায়ে। আরো লক্ষ করি, শাখা-উপশাখায় সঞ্চারিত প্রকরণবাদের নির্যাস তবু রূপান্তর ও সংশ্লেষণের মধ্যে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে; কিন্তু ১৯৩০-পরবর্তী সোভিয়েত রাশিয়ায় যাঁরা স্থূল আত্মরক্ষার তাগিদকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তত্ত্ববিশ্বের ইতিহাসে তাঁদের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। সংহত ও সংঘবদ্ধ বৌদ্ধিক প্রয়াস যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে টিকে থাকল না, বাহ্যত রুশ প্রকরণবাদের ইতি হলো। ব্যক্তিগত স্তরে পরবর্তী পর্যায়ে অবিতর্কিত 'নিরাপদ' অবস্থান গ্রহণ করে বোরিস আইখেনবাউম কিংবা বোরিস টোমাশেভস্কি নঞর্থকভাবে প্রমাণ করলেন যে, তত্ত্বও যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধে রণকৌশল অবস্থা অনুযায়ী বদলে যেতে পারে; কিন্তু যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে, আর যা-ই হোক, তাত্ত্বিক হওয়া যায় না। তাঁরা বাখতিনের কাছে অত্যন্ত জরুরি পাঠ নিতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁদের অভিনিবেশ ছিল না। 'সত্তা মানে সমান্তরালতার প্রত্যয়'—এই বাখতিনীয় মহাবাক্য থেকে নতুন পর্যায়ের যুদ্ধে ব্যবহার্য নতুন রণকৌশলের ইশারা তাঁরা যে বুঝে নিলেন না বা নিতে পারলেন না—তাও যেন ঘটল ইতিহাসেরই ইঙ্গিতে।

রুশ প্রকরণবাদের প্রলম্বিত ছায়ায় গড়ে-ওঠা প্রাগ ভাষাবিজ্ঞান-চিন্তাবৃত্ত সাধারণভাবে সাহিত্যতত্ত্বে এবং বিশেষভাবে সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কিত ভাবনার ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখে গেছে। য়্যাকবসন ছাড়া এই চিন্তাবৃত্তের অন্য দু'জন প্রধান তাত্ত্বিক হচ্ছেন ইয়ান মুকারোভস্কি এবং এন. এস. ট্রুবেৎস্‌কোয়। এঁদের লেখা 'Principles of Phonology' (১৯৪৯) বইটি ক্লদ লেভিস্ট্রাউসকে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই 'Structural Anthropology' (১৯৫৮) লেখার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রেরণা দিয়েছে। এঁরা মস্কোর সহযাত্রীদের মতো প্রাথমিক ভাবে ভাষা-বিজ্ঞানী ছিলেন। প্রকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক ভিত্তিভূমিতে লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন এঁরা করেননি। সামগ্রিকভাবে এঁদের কাজকে পরিণততর প্রকরণবাদী অবস্থানের পুনঃকথন হিসেবে বর্ণনা করা যায়। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিক যে, ইতিহাস প্রকরণবাদের পক্ষে ছিল না; কিংবা একটু অন্যভাবে বলা যায়, প্রকরণবাদী ভাবুকেরা ইতিহাসের সঙ্গে দ্বিরালাপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পথ খুঁজে পাননি। সময় পরিসরের রূপান্তর ঘটাচ্ছে অহরহ; এর সুরে-তালে-লয়ে নিজেকে বেঁধে নিতে হয়। নিজেদের অজ্ঞাতসারেও যদি কোনো চিন্তাপ্রণালী সময়ের প্রকৃত স্বর নির্ণয়ে ব্যর্থ হয় এবং রক্ষণশীল ভূমিকা নেয়—অচিরেই তার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রকরণবাদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। তাই আত্মশক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে ক্রমশ; কিছুটা কল্পিত-কিছুটা বাস্তব বহিঃশত্রুর বৈরিতা মোকাবিলার বদলে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অথচ প্রকরণবাদের প্রত্যক্ষ ফসল প্রাগ্ ভাষাবিজ্ঞান-চিন্তাবৃত্ত কিংবা বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। বাখতিনীয় ভাবকল্প সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিটি প্রধান চিন্তাপ্রস্থানে পুনঃপঠিত, পুনর্বিশ্লেষিত ও পুনঃপ্রযুক্ত হচ্ছে। আর প্রাগ্ ভাষা-বিজ্ঞান চিন্তাবৃত্ত ইঙ্গ-মার্কিন নব্য সমালোচনাধারা ছাড়াও আকরণবাদ-আকরণোত্তরবাদ- চিহ্নবিজ্ঞান-পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদ প্রভৃতি চিন্তাপ্রস্থানে নানাভাবে আত্তীকৃত হয়েছে। ষাটের দশকে আকরণবাদের উত্থানকে কেউ কেউ তাই প্রকরণবাদের পুনর্জাগরণ বলেও বর্ণনা করেছেন। জেরার্ড জেনেট ও ৎস্‌ভেটান টোডোরোভ—এই দুই বিখ্যাত তাত্ত্বিকের রচনায় প্রকরণবাদ ও আকরণবাদের যুগলবন্দি বিশেষভাবে স্পষ্ট। অন্য সমস্ত বৌদ্ধিক চিন্তাপ্রস্থান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্ব নির্মাণের জন্যে আকরণবাদী আকাঙ্ক্ষা, তাদের বৈজ্ঞানিক বোধিশীলিত প্রত্যয় ও আকল্প, বিশেষত আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় দীপ্যমান আখ্যানতত্ত্ব নির্মাণের আগ্রহ—এই সবই প্রকরণবাদের কাছে বিপুল পরিমাণে ঋণী।

তিন

প্রকরণবাদের কাছে প্রথম আলোচ্য হিসেবে দেখা দেয় এই জিজ্ঞাসা : সাহিত্য-বিশ্লেষণের প্রকৃত অন্বিষ্ট কী? কীভাবে সাহিত্য বিশ্লেষণ করব—এই প্রশ্ন তার কাছে জরুরি নয়। আইখেনবাউম লিখেছেন, প্রকরণবাদের বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নিতে হয় 'only by the attempt to create an independent science of literature which studies specifically literary material' (১৯৬৫ ১০৩)। আর, এই নিরিখে তা 'neither an aesthetic nor a methodology' (তদেব)। তার মানে, অন্তর্জগৎ ও বহির্বিশ্বের অনুকৃতি বা অভিব্যক্তির দ্যোতক সমস্ত সংজ্ঞা প্রকরণবাদীরা অগ্রাহ্য করেন। তাঁদের কাছে সাহিত্য লেখকের ব্যক্তিত্ব বা বিশ্ববীক্ষার অভিব্যক্তি নয়। কিংবা যে-জগতে বাস করি তার বাস্তবসম্মত উপস্থাপনাও নয়। তেমনি সাহিত্য এই দুটি ধারণার মিশ্রণও নয়। তাঁদের বক্তব্য হল, সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে যদি অভিব্যক্তি বা উপস্থাপনার আধার বলে মনে করি, তাহলে যেসব সুনির্দিষ্ট লক্ষণের জন্যে 'সাহিত্য' অভিধা প্রাপ্য—সেই সবই নিতান্ত গৌণ, এমনকি, দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে যেতে বাধ্য। এভাবে তাঁরা লেখকের জীবনকথা বা মনস্তত্ত্ব, সামাজিক ইতিহাস বা রাজনীতি বা সমাজতত্ত্বকে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিবেচনা করেন। প্রতীকবাদী দৃষ্টিকোণও যে এঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিষয়টি সম্পর্কে অ্যান জেফারসন খুব মূল্যবান মন্তব্য করেছেন: 'The Formalist definition of literature is a differential or oppositional one; what constitutes literature is simply its difference from other orders of facts.' (১৯৯৭ ২৭)।

এই চমৎকার সূত্রায়নের নিরিখে বলা যায়, সমস্ত প্রচলিত তথ্য-বিন্যাসের পদ্ধতি থেকে যা আলাদা, তা-ই হলো সাহিত্য। অর্থাৎ অন্তহীন স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞানই সাহিত্যবোধের নিষ্কর্ষ। তাহলে, প্রকরণবাদের উদ্দিষ্ট 'বিষয়' বলে কিছু থাকছে না; এই চিন্তাপ্রস্থান জুড়ে থাকে পার্থক্য-প্রতীতির নিরন্তর প্রবাহ। তবে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সাহিত্যের এই বিজ্ঞান যেহেতু গড়ে উঠতে চেয়েছে, স্বাতন্ত্র্য-বিধায়ক 'নির্দিষ্ট' উপকরণগুলিকে শনাক্ত করা তার প্রাথমিক দায়। শ্‌কলোভস্কির বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখি, যেসব বস্তু বা ঘটনা অভ্যস্ত ও স্বতশ্চল হয়ে পড়েছে, শিল্প-সাহিত্য তাদেরই অপরিচিত করে তোলে। অর্থাৎ অভ্যাস থেকে আমাদের আশ্চর্যে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে (স্বাতন্ত্র্যসূচক নির্দিষ্টীকরণ) মূল রুশ ভাষায় বলা হয়েছে, 'Ostranenic' (ইংরেজি ভাষান্তরে 'defamiliarization') বা অপরিচিতীকরণ। শ্‌কলোভস্কি এই পারিভাষিক শব্দটিকে পরে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা সেইসব ব্যাখ্যা থেকে শেষ পর্যন্ত এই বক্তব্য বেরিয়ে আসে যে শিল্প আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ধারণাকে সজীব করে তোলে। এই বক্তব্য নিয়েও হয়তো পাল্টা প্রশ্ন তোলা যায়। তার চেয়ে বরং তাঁর বয়ান থেকে পাওয়া একটি সহজ কিন্তু চমৎকার দৃষ্টান্তের কথা বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে হাঁটা এমন একটা কাজ যার সহজতম অভ্যাস সম্পর্কে আমরা মোটেই অবহিত থাকি না। কিন্তু আমরা যখন নাচি, স্বতশ্চলভাবেই হাঁটার ভঙ্গি রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আমরা নতুন চোখে তাকে দেখতে শুরু করি : 'a dance is a walk which is felt, even more accurately, it is a walk which is constructed to be felt' (১৯৭৩ ৪৮)। অর্থাৎ অভ্যাসের ঘেরাটোপ থেকে পার্থক্য-প্রতীতির দিকে যখন যাই, রচিত হয় শিল্প। সুতরাং ভঙ্গির বদল মানে আকরণের বদল এবং সেই সঙ্গে বদল নির্যাসেরও। আর, ঐ বদলের ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে শিল্প। এই দৃষ্টান্তকে আরো একটু বাড়িয়ে নিয়ে বলা যায়, আমরা যখন কথা বলি অভ্যাসে, তাতে লক্ষণীয় কিছু থাকে না। কিন্তু অভ্যাস থেকে সরে গিয়ে যখন কথকতা তৈরি হয় কিংবা সুরের সংস্পর্শে কথা গান হয়ে যায়—এই রূপান্তরের শক্তিতে শিল্পে পৌঁছাই। প্রকরণবাদীদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল কবিতার জন্যে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী প্রায়োগিক ভাষা তো অভ্যাসের ভাষা; এর আওতা থেকে যখন সরে যাই, কবিতার পরাভাষা দেখা দেয়। অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাই কবিতায় অপরিচিত ও রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায়। শব্দের ভেতরেই প্রচ্ছন্ন থাকে অভ্যাসের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা, নতুন দৃষ্টির উদ্ভাসন নিয়ে আসার সম্ভাব্য কৃৎকৌশলও। সাধারণভাবে যে-সমস্ত শব্দ, কিংবা ধ্বনি, শুধু উপযোগিতার দাবি মেটায়—কোনো নতুন ধরনের প্রকরণের বিন্যাসে সেইসব অচেনা হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকরণ শব্দের অন্তঃশায়ী আশ্চর্যকে অনুভবগম্য করে তোলার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। জীবনানন্দ দাশের অজস্র কবিতায় তার দৃষ্টান্তও ছড়িয়ে আছে। এ-প্রসঙ্গে আরো একবার শ্‌কলোভস্কির মন্তব্য স্মরণ করা যায় : 'poetic speech is formed speech because defamiliarisation is found almost everywhere form is found.' (১৯৬৫ ১৮)।

প্রকরণবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই চিন্তা-প্রস্থানে পাঠকের অভিনিবেশ কবি-ব্যক্তিত্ব বা তাঁর পারিপার্শ্বিক থেকে কবিতার দিকে সরিয়ে আনা হয়। বাচনাতিরিক্ত নান্দনিক দর্শন যেহেতু অন্বিষ্ট নয়, স্বরান্তরিত, তির্যক, অনভ্যস্ত শব্দবন্ধের মধ্যে কবিতার উপস্থিতি সন্ধান করে প্রকরণবাদ। প্রকরণ মূলত নির্মিতি, তাই নির্মাণ-বিজ্ঞানের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়। এই নিবন্ধের শুরুতে যে সাহিত্যিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে, তা সর্বতোভাবে ভাষা-নির্ভর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বদলে যায় অর্থাৎ অভ্যাস থেকে আশ্চর্যে পৌঁছানোর পথও বদলে যায়। সেইজন্যে সাহিত্যিকতার ধারণাও কোনো একটি নির্ধারিত বিন্দুতে অনড় থাকে না। প্রকরণবাদী দৃষ্টিকোণে সাহিত্যপাঠ যেহেতু বিজ্ঞানের পদবি দাবি করে, সময়ের রূপান্তরকে বাচনাতিরিক্ত ধারণার পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয় না। প্রকরণের নির্দিষ্টতা আবিষ্কার করে সাহিত্যিকতার সার্থকতা বা ব্যর্থতা তাঁরা নির্ণয় করতে চান। য়্যাকবসন জোর দিয়ে বলেছিলেন 'If the science of literature wants to become a real science, it will have to recognize the device as its sole hero.' (O' Tooli and Shukman 1977 37)। পাঠকৃতির নির্মিতির কৌশলকেই যে তার একমাত্র নায়ক বলেছিলেন ঐ তাত্ত্বিক, এর কারণ এক পাঠকৃতি থেকে অন্য পাঠকৃতিতে পৌঁছে পাঠক নতুন-নতুন নায়ককেই লক্ষ করেন। অর্থাৎ সাহিত্যিকতার স্বাতন্ত্র্যমূলক স্বভাবকেই পর্যবেক্ষণ করেন। প্রকরণবাদের প্রথম পর্যায়ে সাহিত্যিকতা ও আঙ্গিক ছিল কার্যত সমার্থক। প্রাগুক্ত এই ধারণাকে ক্রমশ অপরিচিতীকরণের ধারণা বদলে নিয়েছিল।

দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষায় বাচনিক উপাদানগুলি স্বতশ্চলভাবে সামূহিক অবচেতনা থেকে উঠে আসে ব্যক্তি-চেতনায়। আমাদের উচ্চারণের এইসব উপাদানকে কবিতার বিভিন্ন প্রাকরণিক বিন্যাস তির্যক, অপরিচিত ও রহস্যময় করে তোলে। ব্যবহারের উপজীব্য শব্দ হয়তো পরিচিত, কিন্তু তার বিন্যাস অপরিচিত ও বিস্ময়কর। সাধারণ পরিস্থিতিতে যে-সব সম্ভাবনাকে আমরা লক্ষই করি না, প্রকরণবাদ সেইসব দিকে আমাদের বীক্ষণকে নিবিষ্ট করে। পরিচিতকে অপরিচিত করে তোলার এই প্রবণতায় ভাষার অনাবিষ্কৃত ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান প্রকাশিত হয়—এই বার্তা পৌঁছে দেওয়াই প্রকরণবাদী তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সাহিত্যতত্ত্বে বাচনের যে-গুরুত্ব পরবর্তীকালে রোঁলা বার্তের আকরণোত্তরবাদী চিন্তায় কিংবা জাক দেরিদার বিনির্মাণ-পন্থী ভাবনায় কিংবা জাক লাকাঁর মনোবিকলনবাদী চিন্তায় সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার পশ্চাৎপট হিসেবে প্রকরণবাদী ভাষা-ভাবনার অবদান অনেকখানি। যদিও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকরণবাদী চিন্তাবিদদের ভাষা-ভাবনায় বিবর্তন হয়েছে, তত্ত্ববিশ্বের মূল ভরকেন্দ্রটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিচলিত হয়নি। একদিকে সাধারণ ভাষার স্বতশ্চল প্রয়োগ এবং অন্যদিকে পার্থক্য-প্রতীতিতে আধারিত সাহিত্যিকতার অপরিচিতীকরণের প্রবণতা এই দুইয়ের পরস্পর-বিরোধিতাও রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন প্রকরণবাদের প্রথম পর্যায়ে কোনো শিল্পকর্মকে তার কৃৎকৌশলগুলির যোগফল বলে ভাবা হয়েছিল; কিন্তু পরিণত পর্যায়ে ঐসব সাহিত্যিক কৃৎকৌশলগুলিকেই বীক্ষণের স্বতশ্চলতায় প্রভাবিত বলে ভাবা হয়েছে। তার মানে, অভ্যাস ও আশ্চর্যের পরস্পর-বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের মূল পরিসরেই স্থিতিলাভ করেছে। সাহিত্য ও অসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যে যে-বিরোধিতার বীজ খোঁজা হত, তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকল না।

চার

অ্যান জেফারসন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন 'literariness is a feature not just of form as impeded speech, but more importantly, of impeded form.' (প্রাগুক্ত ২৯)। প্রকরণবাদীরা যদিও নিজেদের তত্ত্ব-ভাবনার প্রায়োগিক পরীক্ষায় সাহিত্যের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের ওপর অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত করেছেন, ভালোভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যায়, ঐসব আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যও আসলে অপরিচিতীকরণ প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যম মাত্র। সুতরাং প্রকরণবাদীরা যখন প্রকরণকে কেন্দ্রে রেখে তাদের বয়ান তৈরি করেন, তাতে সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিকতা সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যয় ও আগ্রহ থাকে সঞ্চালক প্রেরণা হিসেবে। অর্থাৎ প্রকরণবাদীদের তত্ত্ববিশ্বে প্রকরণ কখনো বৃন্তহীন পুষ্প নয়। স্বয়ংপ্রভ আলোর মতো তা কেবল নিজেকে আলোকিত করে ফুরিয়ে যায় না। কোনো কৃৎকৌশল কোনো বিশেষ পাঠকৃতির জন্যেই অনন্যতার পদবি অর্জন করে। তাই একটি বিশেষ পাঠকৃতি থেকে তাতে ব্যবহৃত কৃৎকৌশলকে কখনো বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। যেমন জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' বা গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড' বা হোসে সারামাগোর 'দি স্টোন র‍্যাফ্‌ট' পাঠকৃতি হিসেবে অনন্য মূলত তাদের অসামান্য কৃৎকৌশলের উদ্ভাসনে।

আর, এই লেখকেরাও তাঁদের কৃৎকৌশলকে সাধারণ প্রয়োগের জন্যে তৈরি করেননি। বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই, দেখব, রবীন্দ্রনাথের গোরা ও চতুরঙ্গ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্য ও পুতুল নাচের ইতিকথা, কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলী যাত্রা ও খেলার প্রতিভা এবং এরকম উপন্যাসগুলিতেও একইভাবে অনন্য কৃৎকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্যে প্রতিটি পাঠকৃতি আর পুনরাবৃত্ত হয়নি, পার্থক্য-প্রতীতিই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞান। তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাহিত্যিকতার সূক্ষ্ম ও গভীর উপস্থিতিতে বাচনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন কৃৎকৌশলের কথা বলি, অবধারিতভাবে চলে আসে ক্রিয়াত্মকতার প্রসঙ্গও। এই দুটি বিষয় অন্যোন্য-সম্পৃক্ত আবার পরস্পর-ভিন্ন। সাহিত্যিক কৃৎকৌশল থেকে যাতে অপরিচিতীকরণ ঝরে না যায়, এইজন্যে প্রাগুক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মনে মনে তৈরি করে নেন লেখকেরা। কোনো কৃৎকৌশলের মধ্য দিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভ্যাস থেকে আশ্চর্যে পৌঁছানোর জন্যে যে অপরিচিতীকরণ প্রক্রিয়ার সার্থক অভিব্যক্তি প্রয়োজন, তা নিছক কৃৎকৌশল হিসেবে যান্ত্রিক উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে না কখনো। কোনো বয়ানে তা কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে, সেই বিচারই লক্ষণীয়। কেননা, কখনো কখনো একই প্রকরণকে যখন বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে দেখি কিংবা বিভিন্ন কৃৎকৌশল কোনো একক ক্রিয়ার অভিমুখী হয়—তখনো অপরিচিতীকরণ প্রক্রিয়া প্রাসঙ্গিক থাকে। তবে তার প্রয়োগবিধি পাল্টে যায়।

আরো একটি জরুরি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। প্রতিটি পাঠকৃতি জন্ম নেয় যথাপ্রাপ্ত বাচনিক অভ্যাসের পরিমণ্ডলে। এই পরিমণ্ডলের নিরবচ্ছিন্ন চাপ উপেক্ষা করে কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁর উদ্ভাবিত কৃৎকৌশলের সঙ্গে এই চাপের দ্বিরালাপে পাঠকৃতির বাচনিক প্রকল্পে ও ক্রিয়ায় অহরহ যে-নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে—তা-ই আবার সাহিত্যিকতার চরিত্র ও তাৎপর্য বদলে দিচ্ছে। তাত্ত্বিকেরা যে সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে 'a system composed of interrelated and interacting elements' (তদেব : ৩০) বলে মনে করেন—এর সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য এই অনুচ্ছেদের আলোচনার নিরিখে বুঝে নিতে হবে। আসলে তাকেই সার্থক সাহিত্যিক কৃৎকৌশল বলতে পারি, যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে বিচিত্র সম্ভাব্য ক্রিয়ার প্রস্তাবনা। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস থেকে এর বেশ কিছু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে বিভিন্ন কৃৎকৌশল দিয়ে একটি একক ক্রিয়ায় পৌঁছানোর দৃষ্টান্ত প্রতীচ্যের উপন্যাসে যতটা পাওয়া যায়, ততখানি বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবু এর মধ্যেও লক্ষ করতে হয় কীভাবে প্রকরণবাদীদের প্রস্তাবিত অপরিচিতীকরণ প্রক্রিয়া দুটি ক্ষেত্রেই অভ্যাস থেকে আশ্চর্যে পৌঁছে দেয় আমাদের। আর, জীবন-পটভূমির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভিন্নতাসূচক উপাদানগুলিকে লক্ষ্যগোচর করে তোলে।

প্রকরণবাদ আমাদের শিখিয়েছে, ভাষার বিশেষ প্রায়োগিক বিন্যাসে গড়ে ওঠে সাহিত্য। দৈনন্দিন ব্যবহারে ভাষার যে-ধরন সম্পর্কে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি, তা থেকে সরে গিয়ে এবং অনেকটা পরিমাণে তাকে বদলে দিয়ে সাহিত্যিক সংযোগের নতুন ধরন তৈরি হয়। প্রতিটি নতুন প্রজন্মের কবি ও ঔপন্যাসিকেরা নিরন্তর দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা থেকে সাহিত্যিকতার পার্থক্য-প্রতীতি নিজস্ব ধরনে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। অর্থাৎ নির্মিতির বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের নিরিখে সাহিত্যিক বাচনের অভিজ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ এইজন্যে তাঁর পূর্বজ ও সমসাময়িকদের থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যান। কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ আলাদা হয়ে যান নিজেদের সময় ও পরিসরে। প্রাকরণিক নির্মিতির বাইরে নান্দনিক তাৎপর্য নেই কোনো। কবিতাকে যে য়্যাকব্‌সন 'organized violence committed on ordinary speech' (১৯৮০ :২১৯) বলেছেন, তার যথার্থতা কবিদের শাব্দিক নির্মিতিতে উপলব্ধি করি। উচ্চারণের নতুন বয়ানকে যে আমরা স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান বলে বুঝি, তাতে প্রমাণিত হয় যে আমরা নিছক চিন্তার নির্যাস নিয়ে কাজ করি না; চিন্তার বাচনিক স্থাপত্যই কবিতাকে চিনিয়ে দেয়। য়্যাকব্‌সন একেই সংক্ষেপে 'বাচনিক তথ্য' (verbal facts) বলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাচনিক তথ্য সন্নিবেশের নিজস্ব পদ্ধতির জোরে চিনি ঔপন্যাসিকদেরও। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ বাচনিক স্থাপত্য ও তার অন্তর্বয়নের প্রকরণেই বিশিষ্ট। একই কথা প্রযোজ্য কথাকার দেবেশ রায়, কমল কুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্য, রবিশংকর বলদের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও। এই নিবন্ধের অন্যত্র সাহিত্যিকতার লক্ষণ হিসেবে যে 'impeded form'-এর কথা বলেছি, এঁদের রচনার প্রাকরণিক উদ্ভাসন সম্পর্কে তা চমৎকার প্রযোজ্য। বস্তুত আরো যেসব কথাকারের উল্লেখ করা যেত, এঁরা প্রত্যেকেই নিজের মতো করে প্রমাণ করেছেন, নতুন কাল ও পরিসরের মনন-মুদ্রা প্রকরণ-নিরপেক্ষ বিষয়বস্তুতে থাকে না কখনো। আমরা যাকে সময়শীলিত নতুন তাৎপর্যের বলয় বলি, তাকে বুঝতে হয় শুধু উচ্চারণের অনন্যতায়। এইজন্যে কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে সাহিত্যের পাঠ হলো মূলত প্রকরণের নিবিড় পাঠ। ভাষা ও অভিব্যক্তির চলমান পরম্পরা নিশ্চয় সত্য, কিন্তু সত্যতর হল পরম্পরার পথ থেকে সরে যাওয়া, পথান্তরের ইশারা অনুধাবন করা। টুনিয়ানোভ প্রাকরণিক নন্দনের অন্বিষ্ট সম্পর্কে জানিয়েছেন 'The task of literary history....is precisely to reveal form.' (১৯৭৮:১৩২)।

পাঁচ

কোনো যথার্থ প্রকরণবাদী তাই কোনো ধরনের অনন্ত, অনির্বচনীয়, অদৃশ্য বাস্তবতার অভিব্যক্তিতে বিশ্বাস করেন না। তেমন কিছু যদি থাকেও, তাদের সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্মিতির অনুষঙ্গে বিবৃত হতে হবে। আমরা যখন কোনো বস্তু বা ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তার একান্ত সজীবতাকেও বুঝে নিতে হয় স্বাতন্ত্র্যসূচক উপস্থাপনার সূত্রে। যা অতিপরিচয়ে ম্লান, তা সাহিত্যিকতাকে উদ্বুদ্ধ করে না। অপরিচিতীকরণের প্রক্রিয়া আমাদের 'দৃষ্টির উদ্বৃত্ত' সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। এই উদ্বৃত্তের সূত্রে পর্যবেক্ষক ভাষার মধ্যে স্বপ্নের মহিমা ও সজীবতা সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। তবে এটাও ঠিক যে একে মানবচৈতন্যের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলতে পারি না। কারণ দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে যেসব বস্তু আমাদের মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে, কখন যে সেসব সত্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তা আমরা টের পাই না। শিল্প তার বিশেষ ক্ষমতায় আমাদের সজীবতা ফিরিয়ে দেয় এবং বুঝিয়ে দেয় যে অভ্যাস আসলে এক আচ্ছাদন। যাকে পরিচিত ভাবছি, তা আসলে মিথ্যার প্রগল্ভতা। শিল্পপ্রকরণ আমাদের অনুভূতি ও দৃষ্টির সীমাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় না কেবল, সীমার প্রবল উপস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অন্যমনস্কতাও কাটিয়ে দেয়।

এ প্রসঙ্গে শ্‌কলোভস্কির 'Art as technique' (১৯১৭) প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে পড়ে 'the purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived, and not as they are known. The technique of art is to make objects unfamiliar, to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception, because the process of perception

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

is an aesthetic end in itself and must be prolonged. Art is a way of experiencing the artulness of an object; the object is not important.' এই শেষ বাক্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আলাদাভাবে বস্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়; বস্তুর শৈল্পিক সম্ভাবনাই লক্ষণীয়। শিল্প বা সাহিত্য ঐ সম্ভাবনা উপলব্ধির ধরন হিসেবেই গ্রাহ্য।

এইজন্যে বক্তব্য কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে, সেটাই বড়ো কথা। সাহিত্যের বাস্তবতাও পুরোপুরি উপস্থাপনার ধরনের ওপর নির্ভর করে। উপস্থাপনার অর্থই হলো প্রচ্ছন্ন প্রকরণকে প্রকাশ্য করে তোলা। আসলে প্রকাশ মানে কৃৎকৌশলের প্রকাশ। তাই ধ্রুপদী আদর্শে প্রকরণবাদীদের কোনো বিশ্বাস নেই। তাঁরা মনে করেন না যে, শিল্পের কাজ হল তার নিজস্ব প্রকাশ-পদ্ধতি গোপন করে রাখা। 'Art celare artem'—এই মতবাদকে প্রকরণবাদীরা সরাসরি প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন। কোনো প্রতিবেদনে বাস্তবতা 'স্বাভাবিক' ও 'স্বতঃস্ফূর্ত' ভাবে উপস্থাপিত হয়না। যদিও কেউ কেউ বলেন, সেলাই-এর সুতো লুকিয়ে রাখাতেই দক্ষ কারিগরের গৌরব, প্রকরণবাদীরা কিন্তু প্রতিবেদনের 'Seamless unity'-তে বিশ্বাসী নন। উপস্থাপনা মানেই পুনরুত্থাপন। আর, এতে প্রকরণের সূক্ষ্ম ও গভীর বিন্যাস, বাচনের বিশেষ ধরন স্বতঃসিদ্ধ। এই ভাবনার সূত্রে আখ্যানতত্ত্বের বিশ্লেষণে কথাবস্তু ও কাহিনির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকরণবাদী আখ্যানতত্ত্বে কাহিনি ও কথাবস্তুর পার্থক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মতে কথাবস্তু (Plot) প্রকটভাবে 'সাহিত্যিক' অন্যদিকে কাহিনি (Story বা Fabula) হলো সেই কাঁচা মাল যা লেখকের সাংগঠনিক পদ্ধতির জন্যে প্রতীক্ষারত। প্রকরণবাদীরা কথাবস্তু সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনাকে অপরিচিতীকরণের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে কথাবস্তুই ঘটনাপুঞ্জ বা চরিত্র-সন্নিবেশকে পরিচিত অভ্যাসে হারিয়ে যেতে দেয় না। শিল্পী বা সাহিত্যিক অনবরত যথাপ্রাপ্ত বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করতে থাকেন। আমাদের কাছে যা পরিবেশিত হয়, তা হল বিশেষ বিশেষ প্রকরণে বিন্যস্ত ও সযত্ন-নির্মিত বাস্তবতা।

ছয়

রুশ প্রকরণবাদের পরিণত পর্যায়ে বিখ্যাত বাখতিন চিন্তা-প্রস্থানের উদ্ভব হয়েছিল। মিখায়েল বাখতিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের চেষ্টায় মার্ক্সবাদ ও প্রকরণবাদের মধ্যে নিবিড় সংযোগের কিংবা, বলা ভালো, অন্যোন্য-উদ্ভাসনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। মিখায়েল বাখতিন এবং পাভেল মেডভেডেভ ও ভ্যালেন্টিন ভোলোশিনোভ কি পরস্পরের সহযোগী ছিলেন অথবা শেষোক্ত দু-জন বাখতিনের প্রসারিত সত্তা ছিলেন—এই কূটতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, 'The formal method in literary scholarship : A critical introduction to sociological poetics' (১৯২৮) এবং 'Marxism and the philosophy of language.' (১৯৭৩) এই বই দুটি নানা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এই দুটি বইকে প্রকরণবাদী পাঠকৃতির দৃষ্টান্ত বলব না কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে ও পদ্ধতিতে নির্মিত চিহ্নায়ন-প্রকরণ হিসেবে ভাষার বস্তুতান্ত্রিক উপস্থিতির ব্যাখ্যায় আমরা প্রকরণবাদের সঙ্গে মার্ক্সীয় ভাবনার সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পর্ক খুঁজে পাই। সাহিত্যকৃতির ভাষাতাত্ত্বিক আকরণ নিয়ে প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের শরিকদের মনোজগতে প্রকরণবাদের ছায়া সঞ্চালিত হয়েছে।

ভাষাকে ভাবাদর্শ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এই দৃঢ় প্রত্যয়ের উদ্‌ভাসনে তাঁদের বয়ান বিশিষ্ট। না লিখলেও চলে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত এমন প্রত্যয়ের বীজতলি। তাঁরা ভেবেছিলেন, চিহ্নায়ক বস্তুগত ভাবে শরীরী হয়ে উঠলেই চেতনা লক্ষণীয় তথ্য হিসেবে ব্যক্ত হতে পারে। তার মানে, চিহ্নায়িত অভিব্যক্তি প্রতিবেদনের অবয়ব ও চরিত্র অর্জন করে কেবল লক্ষ্যগোচর প্রাকরণিক বিন্যাসের জোরে, কেন না সুনির্দিষ্ট প্রকরণ ছাড়া সার্থক অভিব্যক্তি হতে পারে না। বিমূর্ত ভাষাবিজ্ঞানের যে বিশেষ ধরনে কয়েক দশক পরে আকরণবাদের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের কোনো আগ্রহ ছিল না। ভাষা বা প্রতিবেদনকে সামাজিক তত্ত্ববস্তু হিসেবে তাঁরা দেখতে চেয়েছেন। বাখতিন/ ভোলোশিনোভ লিখেছেন যে, 'সাহিত্যিক শব্দাবলী' সক্রিয় ও রূপান্তর প্রবণ সামাজিক চিহ্নায়ক তাই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বর্গের জন্যে তা নানা ধরনের তাৎপর্য ও নির্যাস নিয়ে আসে। বাখতিন ও তাঁর সহযোগীদের জন্যে ভাষা কখনো ইতিহাস-নিরপেক্ষ বিমূর্ত প্রকাশ ছিল না। বাচনিক ও বস্তুগত প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একবাচনিক উচ্চারণের ধারণাকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভাষা তাঁদের কাছে ছিল সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া ও মীমাংসা প্রয়াসের অভিব্যক্তি,. পরোক্ষ প্রতীতির বিষয় নয়। বাচনিক চিহ্নায়কের পরিসরে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণী-সংঘর্ষের দ্যোতনা খুঁজে পেয়েছেন।

আধিপত্যবাদী বর্গ সর্বদা শব্দের তাৎপর্যকে খর্ব ও সীমায়িত করতে ব্যস্ত; সামাজিক চিহ্নায়ককেও এরা একস্বরিক বলে দেখাতে চায়। কিন্তু সামাজিক আলোড়নের অস্থির সময়ে ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নায়কের সজীবতা ও বহুস্বরিকতা এইজন্যে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে বহুবিধ শ্রেণী-স্বার্থ মূলত ভাষার শরীরে ও আত্মায় কেবলই সংঘর্ষ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাখতিন যখন অনেকার্থদ্যোতনায় প্রতিবেদনের সার্থকতা খুঁজে পান, তিনি কিন্তু অন্তর্বস্তুতে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখেন না। প্রেক্ষিতই সমস্ত উচ্চারণের তাৎপর্য নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক কণ্ঠস্বরের বহুত্ব যত ধরনের প্রাকরণিক অভিব্যক্তির মধ্যে আভাসিত হয়, তিনি তাদের দ্বিবাচনিক উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সত্য দ্বিবাচনিকতায় আধারিত। অজস্র তাৎপর্যের বিচ্ছুরণ নিয়ে আসে উচ্চারণের অজস্র বিভঙ্গ, নিত্য-নতুন সূচনা-বিন্দুর প্রস্তাবনা, চেতনা ও অবচেতনার নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থনা। তার মানে, প্রকরণ অন্তহীন।

সামাজিক কণ্ঠস্বরে অজস্র উচ্চাবচতা নেই কেবল, স্বরের বহুত্বও স্বতঃসিদ্ধ। তার পরিধি নিয়ত প্রসারিত হয়ে চলেছে। তাই আজকের প্রকাশভঙ্গি আগামীকালই হয়তো ভোঁতা, পানসে, পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন চলেছে, উচ্চারণে আসছে নতুন নতুন কৌণিকতা, ধুপছায়া, স্থিতি ও গতির দ্বিরালাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন হয়ে চলেছে প্রকাশভঙ্গিতে; তারই অভিঘাতে রূপান্তর ঘটছে অন্তর্বস্তুতে। এই দ্বিবাচনিকতা অনন্ত, প্রকরণের বিন্যাসে তাই রুদ্ধ সমাপ্তি নেই। যদি কখনো দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রকরণবোধ অচল, অনড়, পূর্বনির্ধারিত সূচক মানে বন্দী হয়ে পড়েছে—তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তাতে ক্ষয়-কীট বাসা বেঁধেছে। সাহিত্যিক পাঠকৃতিতে বাচনের তাৎপর্য সম্পর্কিত বাখতিনীয় আকল্প অনুসরণ করে দেখতে পাই, তাঁর চিন্তাবিশ্বে প্রকরণবাদী অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তাঁর নান্দনিক বিশ্ববীক্ষায় এই অবস্থান অবশ্য অনেকটা পরিমার্জিত।

তবু বাখতিন যখন সত্তাকে সমান্তরালতার অভিব্যক্তি বলে ঘোষণা করেন, বুঝে নিই, তা আসলে পার্থক্য-প্রতীতি ও অপরিচিতীকরণের স্বীকৃতি। জীবন ও জগতে কোথাও রুদ্ধ সমাপ্তি দেখতে পাননা তিনি, বিকল্প উপস্থিতির সম্ভাবনায় আধিপত্যবাদী হস্তক্ষেপের ঔদ্ধত্য স্বীকার করেন না। বরং কোনো নির্দিষ্ট সময়-পর্বে ও পরিসরে বিভিন্ন মূল্যবোধের স্মারক চিন্তাপ্রণালীর মুক্ততম সঞ্চরণকে মহিমান্বিত করে তিনি বিকল্প উচ্চারণের মুক্তিকে তাত্ত্বিক সমর্থন দেন। সুতরাং বাখতিন পাঠকৃতিকে যান্ত্রিকভাবে সমাজে অন্তর্নিহিত শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সূচক বলে মনে করেননি অর্থাৎ প্রভুত্ববাদী কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাচন তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে দ্বিবাচনিক হওয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টিশীল হতে পারে। বিকল্প উচ্চারণের মুক্তি মানে অস্তিত্বের মর্মমূলে সমান্তরালতার উপস্থিতিকে মৌল প্রত্যয় হিসেবে মেনে নেওয়া এবং অধিপত্যবাদী সন্দর্ভের রৈখিকতা ও রুদ্ধতা ভেঙে দেওয়াও। এই নিরিখে বাখতিন স্পষ্টত স্ট্যালিনীয় চিন্তার বিপ্রতীপে রয়েছেন।

সাত

সার্থক উপন্যাসে বহুস্বরিক ও দ্বিবাচনিক প্রকরণের উপস্থিতি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক উপস্থাপনায় বাখতিন কেবল উপন্যাস-ভাবনাকেই অভূতপূর্ব গৌরব দেননি, সঙ্গে সঙ্গে প্রকরণ-চিন্তায়ও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। তাঁর ভাবনা অনুসরণ করে বুঝতে পারি, প্রকরণ কেবল বিষয়ে অভিব্যক্তি ঘটাতে সহায়ক হয় না, ঐ অভিব্যক্তি যখন অভ্যাসের ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে পড়ে, তখন বিনির্মাণের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করাও তার দায় হয়ে পড়ে। বাখতিনের কার্নিভাল সংক্রান্ত বিখ্যাত আলোচনাকে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। যখন ব্যক্তির একক বাচন অভ্যাসের প্রাতিষ্ঠানিকতায় মন্থর, নিষ্প্রভ ও জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন কার্নিভালের লোকায়ত সামূহিক চেতনায় রঞ্জিত হয়ে পাঠকৃতির ভেতরকার প্রকরণ আমূল বিনির্মিত হয়ে পড়ে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সুনির্দিষ্ট সীমান্তগুলি চূর্ণ হয়ে যায়। যারা প্রান্তিকায়িত, তারা মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে এবং যারা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতাপের উদ্ভাসনে একচ্ছত্র সুবিধাভোগী, তাদের মহিমা খর্ব হয়ে যায়। আপাত-বিপরীত অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ তথ্যের সঙ্গে মেশে প্রকল্পনা, আলোর সঙ্গে মেশে ছায়া।

অবহেলিত পরিসর মহিমান্বিত হয় যখন, ঠিক তখনই মান্যতা-প্রাপ্ত বর্গ কাকতাড়ুয়ায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিস্ফোরকের মতো গোপন শ্লেষ প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে বিদীর্ণ করে দেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্নিভালীকরণের এই প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত হয় কার্নিভালীকৃত সাহিত্যিক প্রকরণ। প্রমাণিত হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক গৌরব বা গৌরবহীনতা মূলত আপেক্ষিক। এই চিন্তায় প্রকরণ হয়ে ওঠে নিজস্ব জীবনের অধিকারী; তবে এই জীবন এমন যা নিজেকে নিজেই বিনির্মাণ করে নিতে পারে। বাখতিনের কার্নিভাল-ভাবনা সম্পর্কে সেলডেন ও হিড্‌ডোওসন্ বলেছেন যে, কার্নিভালের তাৎপর্য হল 'Hierarchies are turned on their heads, opposites are mingled; the sacred is profaned. The jolly relativity of all things is proclaimed. Everything authoritative, rigid or serious is subverted, loosened and mocked' (১৯৯৩:৪০)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনা না করেও বলা যায় যে, প্রকরণবাদী ভাবনার বৃত্তকে বাখতিন অনেকটা প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রকরণবাদীরা পাঠকৃতির মধ্যে নানা ধরনের সাংগঠনিক ঐক্যের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। প্রকরণবাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে পাঠকৃতি গড়ে ওঠে সেইসব আকরণের সংহত সমন্বয়ে যেখানে বিভিন্ন শিথিল প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গকে চূড়ান্ত নান্দনিক ঐক্যে সংহত করে নেওয়া হয়। এই সংহতির সূত্রধার হচ্ছে পাঠক-সত্তা।

বাখতিন কার্নিভালের মধ্যে প্রাকরণিক পুনর্বিন্যাসের উৎস আবিষ্কার করার ফলে প্রশ্নহীন সাংগঠনিক বিশ্বাসের অভ্যাসে বড়োসড়ো ফটল তৈরি হল। প্রধান সাহিত্যকৃতি যে অজস্র স্তরে বিন্যস্ত এবং চাপিয়ে-দেওয়া একীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় উৎসুক এই বিষয়টি প্রাধান্য পেতে থাকল। স্বভাবত লেখক-সত্তা আর সর্বেসর্বা থাকতে পারল না। পাঠকৃতিতে উপস্থাপিত ব্যক্তি-অভিজ্ঞান এবং চরিত্রের নির্মিতিও প্রাকরণিক পুনর্বিন্যাসের প্রভাবে পুরোপুরি নতুন মাত্রা অর্জন করল। সাম্প্রতিক আকরণোত্তরবাদী ও মনোবিকলনবাদী পাঠের সঙ্গে যেন গোপন সম্পর্ক রচিত হয় এভাবে। অবশ্য এই বিষয়টি সতর্কতা দাবি করে। কারণ, বাখতিন বার্ত কিংবা ফুকোর মতো লেখকসত্তার ভূমিকাকে নস্যাৎ করেননি। লেখকের নিয়ন্তা শিল্পবোধ তাঁর কাছে খুব জরুরি। তবে বহুস্বরিক উপন্যাসে অন্তর্বয়নের মুক্ত পরিসরকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বাখতিন ও বার্ত অনেকটা কাছাকাছি। বহুবাচনিক পাঠকৃতিতে বিভিন্ন স্বরের উপস্থাপনায় সামাজিক ও ভাবাদর্শগত বাধ্যবাধকতা ও অনেকান্তিকতা সার্থকভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে সূক্ষ্ম প্রকরণবোধের শক্তিতে। পাঠকৃতির মুক্ত পরিসর, নির্বাধ সঞ্চরণ ও অস্থিতিশীলতা বিষয়ক বাখতিনীয় চিন্তা থেকে প্রাকরণিক নন্দনের গভীরতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন উৎসজাত উপকরণ সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় পাঠকৃতিতে কীভাবে অন্যোন্য-সহায়ক ও অন্যোন্য-নিবিষ্ট হয়ে যায়, তা অনুধাবন করতে পারি শুধু সুপ্রযুক্ত ও বহুত্বসঞ্চারী প্রকরণের দর্পণে। বাখতিনের অসামান্য চিন্তাবীজ (অস্তিত্ব মানে অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে উদ্‌ভাসিত সংগঠন)—চমৎকার ভাবে প্রকরণকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে দেয়। যে-সম্পর্ক বিন্যাসে একটি উপাদান অন্য আরেক উপাদানের গভীরে লালিত হয়, সেই অভিসমন্বয় (symbiosis) এর আশ্চর্য ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্মতা প্রকরণভাবনাকে নিঃসন্দেহে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাখতিন চিন্তাপ্রস্থান, য়্যাকবসন-টিনিয়ানোভ প্রস্তাবনা এবং মুকারোভস্কির নান্দনিক বিশ্লেষণ অবশ্য স্কলোভস্কি, টোমাশেভস্কি ও আইখেনবাউম প্রস্তাবিত বিশুদ্ধ রুশ প্রকরণবাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে। পাঠকৃতি নিছক কৃৎকৌশলের সমাবেশ নয়, এই উপলব্ধি-সূত্রে প্রকরণবাদের একটি পর্যায় শেষ হল। পরবর্তী পর্যায়ে এল এই বোধ যে পাঠকৃতি মূলত ক্রিয়াত্মক পদ্ধতির ফসল। য়্যাকবসন-টিনিয়ানোভের ধারাবাহিক বয়ান থেকে ক্রমশ উদ্ভূত হল আকরণবাদী প্রবণতার পর্যায়। একদিকে তাঁরা যান্ত্রিক প্রকরণবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেন, অন্যদিকে সংকীর্ণ 'সাহিত্যিক' প্রেক্ষিতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এলেন। সাহিত্যিক প্রকাশ-পদ্ধতিও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের মধ্যে কীভাবে গড়ে ওঠে, তা বুঝতে চাইছিলেন তাঁরা। তাঁদের মনে হয়েছিল, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সাহিত্যের প্রকাশ-প্রকরণ কীভাবে বিকশিত হয়—তা বুঝতে চাইলে অন্যান্য প্রণালীর অন্তঃস্বরিক ও বহির্বৃত উপস্থিতির প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সমস্ত কিছুর নির্যাস শুষে নিয়েই বিবর্তিত হয় প্রকরণবাদ। তবে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সাহিত্যিক রচনা-পদ্ধতির নিজস্ব বিধিবিন্যাসকে কেননা বিভিন্ন প্রণালীর অন্যোন্য-উদ্ভাসন ও আন্তঃসম্পর্ক সেইসব বিধিবিন্যাসের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাগ্ ভাষাবিজ্ঞান-চক্র এই আকরণবাদী প্রবণতাকে ক্রমশ আরো বিকশিত করেছে। অপরিচিতীকরণ সম্পর্কিত প্রকরণবাদী ভাববীজকে মুকারোভস্কি আরো পরিশীলিত করে সম্মুখায়ন (foregrounding) এর ধারণা উত্থাপন করেছেন। এই পারিভাষিক শব্দের মানে হলো 'the aesthetically intentional distortion of the linguistic components'। তাঁর আরেকটা প্রধান বক্তব্য হল, সাহিত্য-বহির্ভূত উপাদান বা অনুষঙ্গকে তন্নিষ্ঠ সমালোচনা থেকে সরিয়ে রাখা অত্যন্ত ভুল কাজ। এই ভুলের সংশোধন না হলে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে নিয়ত উপস্থিত দৃশ্য ও অদৃশ্য আততি এবং সেই আততির শৈল্পিক অভিব্যক্তি আমাদের মনোযোগের বাইরে রয়ে যাবে। মুকারোভস্কি প্রস্তাবিত নান্দনিক ক্রিয়ায় সীমান্তের ধারণা ও অভিজ্ঞান অনবরত বদলে যায়। আর, সুনির্দিষ্ট বর্গ হিসেবে তাকে গ্রহণও করা চলে না। কেন না একই বস্তুর অনেক ক্রিয়া ও দ্যোতনা থাকতে পারে এবং থাকেও। যেমন কোনো মন্দির যুগপৎ ধর্মীয়স্থান এবং স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। কিংবা পাথর কখনো গঠনমূলক উদ্যমের উপকরণ, কখনো হিংস্রতার আশ্রয়, কখনো বা ভাস্কর্যের আধার। কবিতায় এর দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি পাই। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ভাত নেই, পাথর রয়েছে'। এখানে ভাত ও পাথর অপরিচিতীকৃত অর্থাৎ ভাত মানে ভাত নয়, পাথর মানে পাথর নয়। সংকেতের পরাভাষা বস্তুর মধ্যে অভূতপূর্ব দ্যোতনাত্মক ক্রিয়া সঞ্চারিত করেছে। এরই নাম কাব্যিকতা বা সাহিত্যিকতা। বস্তু-নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন কবির কাছে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নায়ন প্রকরণের আধার হতে পারে। সময়-স্বভাব ও সমাজস্বভাব রূপান্তরিত হলে নান্দনিক মূল্যমানও বদলে যায়। শিল্প ও সাহিত্যের পরিধি অনবরত রূপান্তরিত হচ্ছে; নিরবচ্ছিন্ন গতির বিচ্ছুরণে প্রকরণেও দেখা যাচ্ছে উৎক্রমণের প্রবণতা। এই সমস্তই ঘটছে অন্তর্যামী সামাজিক আকরণের আততিতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আট

এই বিন্দুতে মার্ক্সীয় সমালোচকেরা শিল্প ও সাহিত্যের সামাজিক মাত্রায় ভাবাদর্শের দ্বিবাচনিক উপস্থিতিকে তাঁদের সন্দর্ভের প্রধান আধেয় করে তোলেন। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক আবহে সাহিত্য যেহেতু আমূল প্রোথিত, চিরস্থির ও পূর্ব-নির্দিষ্ট নান্দনিক প্রকরণের কথা তাঁরা বলতে পারেন না। সুবিন্যস্ত কৃৎকৌশলের অচলায়তন কিংবা আঙ্গিক ও প্রকাশ-মাধ্যমের পরিবর্তন-শূন্য পরিসরের প্রসঙ্গও তাঁদের কাছে অকল্পনীয়। নান্দনিক মূল্যের গৌরবে কোনো বস্তু বা শিল্পকর্ম যখন মহিমান্বিত হয়, তাও মূলত সামাজিক ক্রিয়ারই দৃষ্টান্ত। কেননা মূল্যায়নকে কখনো সঞ্চালক ভাবাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। আর, মুল্যায়ন হল সামাজিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত প্রকরণবোধেরই মূল্যায়ন। অন্তর্বস্তু-নির্ভর বিশ্লেষণে আত্মগত ভাবনা ও পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের প্রকট প্রভাব দেখা যায়। ঠিক তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিতে চায় প্রাকরণিক নন্দনের অনুশীলন। প্রকরণবাদীরা সাহিত্যিক ভাষাকে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সু-পরিকল্পিত বিকাশের নিরিখে বিচার করেননি। টিনিয়ানোভের বক্তব্য অনুযায়ী সাহিত্যিক ভাষায় ব্যক্ত হয় 'Colossal displacements of traditions' (১৯৭৮:১৪৪)। তার মানে, পূর্বনির্দিষ্ট কিংবা যথাপ্রাপ্ত সাংগঠনিক অবয়ব থেকে যখনই নিষ্ক্রমণ ঘটছে, সজীব ও নতুন ভারবহনে সক্ষম সাহিত্যিক বাচনেরও জন্ম হচ্ছে। সাহিত্য-শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাষা-ব্যবহার একসময় অচলায়তনে পরিণত হয়। সেই অচলায়তনকে অস্বীকার করার মধ্যেই প্রকরণ খুঁজে পায় নান্দনিক উপলব্ধির সমর্থন। কোনো ব্যক্তিগত কৃৎকৌশল যতই অনন্য হোক, তাকে সামগ্রিক পদ্ধতির প্রেক্ষিতে বুঝে নিতে হয়। এমনকী বিলীয়মান প্রকরণেব অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ কেননা তা পশ্চাৎভূমি হিসেবে জায়মান প্রকরণের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্যগোচর করে তোলে।

অ্যান জেফারসন এইজন্যে লিখেছেন 'form is made perceptible against a background of existing literary form, and the function of a device is determined not just by the structural hierarchy of a particular work, but by its place in the literary system as a whole' (১৯৯৭:৪১)। ভাষাব্যবহারের অভ্যাসকে যে আক্রমণ করে, শেষ পর্যন্ত সেই ভাষাকে নতুন জন্ম দেয়। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় যতক্ষণ বিচ্ছেদ তৈরি না হচ্ছে, অপরিচিতীকরণের তত্ত্ববীজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। চলমানতার মধ্যে ছেদ এনে দিয়েই নতুন প্রকরণ নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং প্রগতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটিও স্পষ্ট করে তোলে। সাহিত্যিকতাও এই সূত্রে ব্যক্ত হয়। তাই প্রকরণের গুরুত্ব উপেক্ষা করার অর্থ হল ইতিহাসকে উপেক্ষা করা। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসই প্রকরণের প্রকৃত নির্মাতা এবং সাহিত্যকৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্যেরও নিয়ন্তা। এইজন্যে পরম্পরা থেকে বিচ্ছেদ রচনার দক্ষতাকেই অনন্যতার অভিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দেশে দেশে কালে কালে এর অজস্র দৃষ্টান্ত মেলে। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, মহাশ্বেতা দেবী, কমলকুমার মজুমদার, জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাস এইজন্যে প্রাকরণিক নন্দনের

—দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূত্রধার হিসেবে গণ্য। অবশ্যই এছাড়া আরো অনেক নাম করা যেতে পারত। তেমনি ইউরোপীয় সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নাট্যসাহিত্যে ইবসেন বা ব্রেখটকে আমরা মনে রাখি ঐতিহ্য থেকে তাঁদের বিচ্ছেদ রচনার অসামান্য ক্ষমতার জন্যেই। প্রুস্ত বা জয়েস, টমাস মান বা ফ্রান্ৎস কাফকা, হোর্হে লুই বোর্হেস বা হোসে সারামাগো স্মরণযোগ্য একই সূত্রে। এঁদের সাহিত্যকৃতির নিবিড় পাঠ করব প্রাকরণিক নন্দনে উদ্ভাসনী আলো নিক্ষেপ করার জন্যেই।

এটা ঠিক যে নানা ধরনের সাহিত্যতত্ত্বের বিচ্ছুরণে প্রকরণবাদ নিজেকে অনেকখানি বিনির্মাণ করে নিয়েছে। তার কাছে আমাদের যা প্রাপ্তি, তাকে যান্ত্রিক ভাবে না দেখাই সমীচীন। সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বাস্তবতার নিবিড় সম্পর্ক কিংবা সাম্প্রতিক চিহ্নায়িত চিন্তাবিশ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সঞ্চালক উপাদানের দ্বিবাচনিকতা, ইতিহাসের কিংবা সন্দর্ভের মৃত্যু-সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণার নিরিখে প্রাকরণিক বিন্যাসের ভূমিকা—এই সবই আমাদের মননে নতুন নতুন প্রত্যাহ্বান নিয়ে এসেছে। প্রকরণবাদ ও প্রাকরণিক নন্দনের মধ্যে জলবিভাজন রেখা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষের দৃশ্য ও অদৃশ্য বিচ্ছুরণ অনুধাবন করা যেহেতু আবশ্যিক, উপলব্ধির প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসের জন্যেই আবার ঐ জল-বিভাজন রেখাটি পেরিয়েও যেতে হয়। সংস্কৃতিকে প্রবল নেতির সন্ত্রাসের মধ্যেও যেহেতু নিশ্চিহ্ন করতে পারিনি, ইতিহাসকেও মোছা যায়নি। ভবিষ্যতেও যাবে না। মানুষ অনবরত নিজেকে বিনির্মাণ করতে করতে বীক্ষণবিন্দুকে মাত্রান্তর ও চলমানতার উপযোগী করে তোলে। এই প্রক্রিয়ারও আছে নিজস্ব প্রকরণ, আছে পরিচিত গণ্ডি থেকে অপরিচিতের দিকে ক্রমিক যাত্রা, আছে পিণ্ডাকৃতি স্থিতি থেকে প্রণালীবদ্ধ বয়ানে উত্তরণ। প্রাকরণিক জিজ্ঞাসার প্রাসঙ্গিকতা তাই আকরণ-নিরপেক্ষ ভাবেই বেঁচে থাকবে চিরকাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোবিকলনবাদ

এত দ্রুত মৌলিক রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থানের প্রতিবেদনগুলিতে সূক্ষ্ম কৌণিকতা ও স্বরন্যাসের তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ শতকে কত ধরনের তত্ত্ববীজ অঙ্কুরিত হল, সংযোগের কত নতুন প্রকরণ প্রস্তাবিত হল। নতুন ঢেউ এসে অনবরত পুরোনো ঢেউদের ভেঙে দেওয়াতে তাত্ত্বিক সন্দর্ভের কোনো নিশ্চিত ধ্রুববিন্দু থাকছে না ইদানীং। বহুত্ববাদী সময়ে আস্থা রাখতে হয় সংশ্লেষণে এবং সমান্তরাল বিকাশে। আবার কূটাভাসের অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই উঠে আসে কিছু প্রতিপ্রশ্ন, এমন কী প্রত্যাহ্বানও। তখন আরো একবার নতুন করে ভেবে নিতে হয় সব কিছু। এভাবেই নতুন পথ, পাথেয় ও গন্তব্যের সংকেত তৈরি হতে থাকে আর সেইজন্যে বারবার ঈক্ষণবিন্দু বদলে নিতে হয় আমাদের। এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে মনে আসে যখন মনোবিকলনবাদী সাহিত্য-সমালোচনায় নতুন-নতুন পরিসরের উদ্ভাসন নিয়ে ভাবি।

মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকলার সৃষ্টিবিষয়ক তত্ত্বের গোপন সুড়ঙ্গলালিত সম্বন্ধ আবিষ্কার নিশ্চয় আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে শানিত করে। সেইসঙ্গে এই জিজ্ঞাসাও উশ্‌কে দেয়, আন্তঃসম্পর্কের এই বিন্যাস সাহিত্যপাঠ এবং সমালোচনার প্রকরণে কটা মৌলিক পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছে! বিশ শতকে বিভিন্ন পর্যায়ে মনোবিকলনবাদী সাহিত্য-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ কতটা ঋদ্ধ করেছে আমাদের। উচ্চারণের গভীরে প্রচ্ছন্ন নিয়ামক শক্তি সম্পর্কে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত বিশ্লেষণ থেকে সূত্রপাত হয়েছে ভাষা ও আকাঙ্ক্ষার নিবিড় সম্বন্ধ বিষয়ে মনোবিকলবাদের নিজস্ব উদ্ভাসন। ফ্রয়েড শুধুমাত্র ভাষায় আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধরনের প্রতীকী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথাও বলেছেন। আকাঙ্ক্ষার ভাষা কখনো পুরোপুরি প্রকাশ্য হয় না, সাধারণভাবে তা থাকে অর্ধস্ফুট বা অস্ফুট, অন্তত অবগুণ্ঠিত। স্বভাবত, এই ভাষার যথার্থ কিংবা শুদ্ধ পাঠ মোটেই সহজ নয়। গোপনচারিতার জন্যেই এর লক্ষ্য বা লক্ষ্যহীনতা কিংবা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কে ভ্রান্তপাঠ তৈরি হওয়ার অবকাশও কম নয়। আদিম জৈবিক আকাঙ্ক্ষা যখন সামাজিক লক্ষ্যের অভিমুখী হয়ে পড়ে কিংবা শারীরিক চাহিদা যখন সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের মধ্যে পরিশীলিত হয়—তখন কত ধরনের অনুঘটক সক্রিয় হয়ে ওঠে। অথবা কতটা নতুন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চারিত হতে থাকে আকাঙ্ক্ষা, মনোবিকলন তা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। ভাষার মধ্য দিয়েই আকাঙ্ক্ষা নিজেকে নিয়মের অনুগামী করে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অথচ এও ঠিক যে শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাকে যথাযথ সংজ্ঞার মধ্যে ভাষা বাঁধতে পারে না। আমাদের সেইসব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণ বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে যাদের ভাষাগত সাধারণ বিধি-বিন্যাস অবহেলা করে বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। সচেতনভাবে আমরা যেসব আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠি, তাদের আওতার বাইরে নিয়ম-বহির্ভূত বিশৃঙ্খল ভাবনা ও প্রতীতি অনেক সময় আমাদের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। আসলে অবচেতনের প্রগাঢ় উপস্থিতিকে বুঝি শুধুমাত্র বিচিত্র প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়ার নিরিখে। আপাত-দৃষ্টিতে যেসব অনুপুঙ্খের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই, তাদের মধ্যেই হয়তো চেতনার অজ্ঞাতপূর্ব গভীরতম পরিসরের ছায়া পড়ে। অতিপরিচিত অভ্যাসের জগৎ থেকে তাদের পার্থক্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনোবিকলনের কাছে স্বপ্ন, প্রকল্পনা এবং চেতনার বিভিন্ন আলো-আঁধারি পরিস্থিতি মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। কীভাবে শরীর ও মনের নানা সন্ধি-বিসন্ধি বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে বিশ্লেষিত হবে, মনোবিকলনবাদ সে-সম্পর্কে যুক্তি-সঙ্গত প্রতিবেদন তুলে ধরেছে। সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প সম্পর্কে তার নিজস্ব বিশ্লেষণ প্রথম থেকেই অনন্য। মনোবিকলনবাদী ভাষ্য অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্রিয়াত্মক। তার ভাষ্য রচনার নিজস্ব প্রবণতাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মিশেল ফুকো ও লুই আলত্যুসের সহমত পোষণ করেছেন।

মনোবিকলনের ক্রম-বিকাশের পথরেখাটি খুবই কৌতূহল-ব্যঞ্জক। এর ধ্রুপদী সূচনা-পর্বে রয়েছেন স্বনামখ্যাত সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। মনোবিকলনের তত্ত্ববিশ্ব মূলত তাঁরই অসামান্য স্থাপত্য। এ বিষয়ে যাবতীয় মৌলিক ধারণা ও প্রতীতির সূত্রপাত তিনিই করেছেন। অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কৃৎকৌশল সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ পরবর্তী চিন্তাধারার আকরণ গড়ে দিয়েছে। শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার প্রকরণগুলি কীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এ বিষয়ে তাঁর আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ আমরা যাকে ফ্রয়েডীয় সমালোচনা-ধারা বলে শনাক্ত করছি, তার ধ্রুপদী স্তর গড়ে উঠেছে নির্জ্ঞান সত্তার মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। মেরি বোনাপার্ট, ফ্রেডেরিক প্রুজ এবং বিখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক ডি. এইচ. লরেন্স এই স্তরের তিন বিখ্যাত প্রবক্তা। এই তিনজন যথাক্রমে লেখকসত্তার, চিত্রিত চরিত্রের এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের মনোবিকলনবাদী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করে ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিশ্বের পরিধিকে প্রসারিত করেছিলেন। প্রতিতুলনায় এনস্টি ক্রিস, সাইমন লেজের ও নর্মান হল্যান্ডকে বলা যেতে পারে ফ্রয়েড-উত্তর সমালোচনা ধারার প্রতিনিধি। এদের কাছে নির্জ্ঞান সত্তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সচেতন অহং-এর উপস্থিতি। ক্রিস মনোবিকলনকে কাজে লাগিয়েছেন নান্দনিক তাৎপর্যের দ্ব্যর্থবোধকতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। আর, লেজের ও হল্যান্ড পাঠকসত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ-প্রতিক্রিয়ার চলিষ্ণুতা ব্যাখ্যার জন্যে অহংকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন। এর পরেই বিচার্য কার্ল গুস্তাভ ইয়্যুং এর বিখ্যাত সামূহিক নির্জ্ঞানের তত্ত্ব। পরবর্তী কালে যাকে আদিকল্পাশ্রয়ী সমালোচনা বলা হয়েছে, ইয়্যুং তার ভগীরথ। সমাজ-মনস্তত্ত্বের গহন থেকে যে-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন প্রতীক আদিকল্পের মর্যাদা পেয়ে যায়, তাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক নিয়ে তিনি অসামান্য আলোচনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই সূত্রে আরো একটি বিশেষ পর্যায়ের কথা লেখা যেতে পারে; এর মূল উপজীব্য সত্তা ও অপরের রহস্যঘন সম্পর্ক। বস্তুবিশ্বের মধ্যে যত বিচিত্র ধরনের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, অবচেতন আকাঙ্ক্ষা তাতে কোন ভূমিকা পালন করে—এই নিয়ে ভেবেছেন মেলানি ক্লাইন, ডি.ডব্লিউ. উইনিকোট, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, আঁদ্রে গ্রীন, আদ্রিয়ান স্টোকস প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা। বিশেষত শিল্পকলার সমালোচনায় এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা গেছে। বস্তুর বস্তুত্ব কীভাবে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে অন্তর্ভেদী অবচেতন পরিসরের উপস্থিতিতে, তা চিত্রকলার নিরিখে চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রকল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক কীভাবে নান্দনিক পরিসরের তাৎপর্য অনবরত বদলে দিতে থাকে, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীতির ইশারাও যেন পাওয়া গেল। এভাবে ব্যক্ত হয়েছে সম্ভাব্য পরিসর এবং অবভাসের ক্ষেত্রও যা কিনা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে সত্তা ও অপরের রূপান্তরপ্রবণ সম্বন্ধকে ধারণ করে।

দুই

ষাটের দশকে শুরু হল আকরণবাদী মনোবিকলনের পর্যায় যখন লিখিত পাঠকৃতির মতো চেতনা ও অবচেতনায় দোলায়িত মনও বিশিষ্ট পাঠকৃতি হিসেবে গৃহীত হল। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ববিশ্বে পুরোপুরি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন জাক লাকাঁ। নির্জ্ঞান ও তার অজস্র কৌণিকতা চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের মধ্যে কিংবা বাস্তব ও অবভাসের মধ্যে যে ভাঙচুর শুরু করে, লাকাঁ সেইসবের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রতিটি লিখিত বা কথিত উচ্চারণ অবচেতনের দ্বারা আক্রান্ত হলেও কাল্পনিক ও প্রতীকী উপস্থাপনাকে কখনো সমান মর্যাদা দেওয়া চলে না—এরকম একটা ধারণা লাকাঁ আমাদের দিয়েছেন। যে-ব্যবস্থা অবচেতনের সৃষ্টি, তার বিপর্যাস কিংবা বিচ্যুতিকে অবচেতন নিজে সংশোধন করতে পারে না—এই যেন তাঁর অভিমত। বিষয় যখন বিষয়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সমগ্রতার প্রতীতিকে যখন অবভাস মনে হয়—সে সময় ভাষা ও আখ্যান একসঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের ভাঙনকে প্রকাশ ও গোপন করে। সাহিত্য ও শিল্পকলার পর্যালোচনায় লাকাঁর অবস্থান এভাবে সংযোগ প্রকরণের ক্ষেত্রে নতুন পর্যায় উন্মোচিত করেছে। লেখক-সত্তা ও পাঠক-সত্তার তুলনামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

রোলাঁ বার্ত ও জাক দেরিদার মধ্য দিয়ে যখন আকরণোত্তরবাদ ও বিনির্মাণবাদের পর্যায় শুরু হল, মনোবিকলনের ক্ষেত্রেও দেখা দিল আকরণোত্তর স্তর। লাকাঁর বিশ্লেষণে আমরা মনকে পাঠকৃতি বলে বুঝেছিলাম; এই পর্যায়ে যেন তার বিপরীত ক্রমে পাঠকৃতিকে মনের বিভঙ্গ বলে বুঝে নিলাম। দেরিদার লিখন-প্রকল্পে চিহ্নায়কের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না। বিভিন্ন চিন্তন-ক্রিয়ায় ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় বিষয়ীসত্তার ভূমিকা নির্ণয়ে লাকাঁ যদিও চিহ্নায়ককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেইসঙ্গে এই উপলব্ধিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ্য বয়ান যেন যুগপৎ পাঠক-সত্তা ও লেখক-সত্তাকে রচনা করে চলেছে। দেরিদা মনে করেন, কথিত বা লিখিত শব্দাবলী পার্থক্য-প্রতীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট তাৎপর্য থেকে বয়ানের গ্রন্থনা অনবরত পার্থক্য রচনা করতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখা আকাঙ্ক্ষাকে যুগপৎ অবদমিত ও প্রকাশিত করে। দেরিদার একটি মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যায় : 'Writing is unthinkable without repression.' (১৯৭৮:২২৬)। তাৎপর্যকে স্থির ধ্রুববিন্দু বলে ভাবা চলে না কেননা প্রতিটি পরবর্তী বয়ানের দায় হল পুরোনো অর্থের প্রক্রিয়াকে স্থগিত করে রাখা এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করা। তাই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া প্রতিটি মুহূর্তে পথ থেকে পুরোনো পদচ্ছাপ মুছতে মুছতে এগোয়। অবচেতনে সঞ্চিত স্মৃতির বিভিন্ন ইশারাকে স্বীকৃতি দিয়েও তাদের প্রতিটি মুহূর্তে মুছে নিতে হয়। আমরা যখন তাৎপর্য উৎপাদন করি, প্রতিটি শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বহু উৎস-জাত স্মৃতির সংকেতকে মান্যতা দিয়েও আমাদের বেশি আস্থা রাখতে হয় পার্থক্য-প্রতীতিতে। লাকাঁ অবচেতনকে ভাষার মতোই অজস্র আকরণে বিন্যস্ত বলে ভেবেছিলেন। আর, দেরিদা অবচেতনকে বিশুদ্ধ স্মৃতিরেখার বয়ন বলে মনে করেছেন। এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান আছে কিনা, এই নিয়ে অবশ্য কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন।

খুব মৌলিক তফাত নেই তাঁদের বক্তব্যে; শুধু দুটি ভিন্ন দিকের ওপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লাকাঁ বলতে চান, ভাষা এমন একটি প্রকরণ চাপিয়ে দেয় যা অবচেতনের স্রষ্টা। ঐ চাপিয়ে দেওয়ার ওপর নজর রাখতে বলেন তিনি। আর, দেরিদার অভিনিবেশ সেই প্রকরণ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবচেতনের প্রবণতার প্রতি। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা পাঠকৃতি বিশ্লেষণে দুটি স্বতন্ত্র ধারার বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ লক্ষ করেছেন। ফ্রয়েডের অবচেতন সম্পর্কিত ধারণার বিনির্মাণ করে নতুন পর্যায়ের তাত্ত্বিকেরা লিখন-প্রক্রিয়া ও বয়ান সম্পর্কে বিচিত্রতর উদ্‌ভাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। দেরিদা যখন বলেন 'Freud Performs for us the scene of writing' (১৯৭৮:২২৯), সম্ভাব্য আরো তাৎপর্য বিচ্ছুরণের ইশারা পাই যেন। লেখাকে দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলে ভেবে নেওয়াটা যে কার্যত রূপকের বীজতলি, তা বুঝে নিতে পারি অবচেতন ও মনোবিকলনের নিয়ত নবায়মান পুনরাবিষ্কারের সূত্রে। আকরণোত্তর এই পর্যায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখি হ্যারল্ড ব্লুমের ফ্রয়েড-পুনঃপাঠে। ব্লুমের কাছে ফ্রয়েড ছিলেন 'কবিদের মধ্যে সর্বোত্তম' (the strongest of the poets ১৯৮২:১৪৪)। মনঃসমীক্ষক বৈজ্ঞানিকের আঙ্‌রাখা সরিয়ে দিয়ে তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন 'সাহিত্যিক' ফ্রয়েডকে। এই সূত্রে পাঠকৃতির তাৎপর্য, লেখকসত্তা, অন্তর্বয়ন সম্পর্কে ব্লুম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেছেন, আকরণোত্তরবাদী তত্ত্বে লেখকসত্তার অবসান ঘোষিত হলেও, ফ্রয়েড-পুনঃপাঠের সূত্রে, ব্লুমের বয়ানে লেখকের প্রত্যাবর্তন সূচিত হয়েছে। এলিজাবেথ রাইট তাঁর 'Psychoanalytic Criticism' বইতে লিখেছেন 'Most ingeniously, there is always an author-in-crisis, belated, wounded and mortal and there is always a prior plenitude of meaning to struggle against. Thus the author returns, but with a difference.... There is an author, but he is a pseudoauthor; there is a myth, but it is grounded in psychology.' (১৯৮৫ ১৫৫)। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও লেখকসত্তার পূর্বমহিমা অস্তমিত। যখন লেখককে বলা হচ্ছে ছদ্মলেখক, বয়ানের তাৎপর্যের ওপর তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিয়ামক ভূমিকা শিথিল হতে বাধ্য। মনস্তত্ত্বে অর্থাৎ অস্তিত্ব ও জ্ঞাতৃসত্তার ধুপছায়ায় ঐ ছদ্মলেখকের উপস্থিতি। একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেতনা এবং অন্যদিকে বৈধতা-সন্ধানী অবচেতন : এই দুইয়ের আততিতে গড়ে-ওঠা মনোবিকলনবাদকে ব্লুম ভিন্নতর তাৎপর্য আবিষ্কারে কাজে লাগিয়েছেন। মনোবিকলনকে প্রতিবেদন হিসেবে যাঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তাঁরা সমাজ ও অবচেতনের অন্যোন্য-গ্রন্থনায় অজস্র কৌণিকতা লক্ষ করেছেন। দেখেছেন ভাবাদর্শের সন্দর্ভ রচনায় তাদের উপস্থিতি কত সূক্ষ্ম ও জটিল। যৌনতা ও প্রতাপের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে মনোবিকলনবাদী চিন্তাপ্রস্থানে কতখানি নতুন মাত্রা যোগ করা যায়, তা মিশেল ফুকো 'History of Sexuality' বইয়ের তিনটি খণ্ডে দেখিয়েছেন। গিলে দেলেউজ ও ফেলিক্স গুয়াত্তারি রচিত 'Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia' (১৯৭৭) যদিও মনোবিকলনবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছে, সাংস্কৃতিক রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত প্রতিবেদন হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেলেউজ ও গুয়াত্তারির মতে মনোবিকলন অবচেতনকে বিকৃত করেছে। পুঁজিবাদী চাতুর্য সব কিছুতে বিকার এনে দেয়। আকাঙ্ক্ষা নেমে আসে অতৃপ্তি ও বুভুক্ষার স্তরে। তাঁরা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি-সমবায়ের যৌন মুক্তি সম্পর্কে মোটেই আগ্রহ দেখাননি; তাঁরা চেয়েছেন সাধারণভাবে আকাঙ্ক্ষার মুক্তি। উপস্থাপনা ও উৎপাদনের প্রাক্-উন্মেষ স্তরে গূঢ়েষার প্রবাহকে তাঁরা আকাঙ্ক্ষা বলে মনে করেছেন। ফ্রানৎস কাফকার পাঠকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহিত্য ও মনস্তত্ত্বের নতুন ধরনের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ঈডিপাস-শ্লিষ্ট অবচেতনার প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করে দেলেউজ ও গুয়াত্তারি পাঠকৃতির 'Schizo-analysis' বা মনোবিভাজন বিশ্লেষণ-এর আকল্প প্রস্তাব করেছেন। এই বিশ্লেষণী আকল্পে চিত্রকল্প ও ভাবকল্প অর্থাৎ ইমেজ ও মোটিফ বেশি গুরুত্ব পায়; আর সাহিত্যিক প্রতিবেদনের সামগ্রিক উপস্থিতির নিরিখে লেখকের সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রাধান্য অর্জন করে।

তিন

আকাঙ্ক্ষার সামাজিক স্বভাবে গুরুত্ব আরোপ করে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে ফ্রয়েডীয় অবচেতনা মূলত পুঁজিবাদী নির্মিতি। প্রতাপের আন্তঃসম্পর্কগত গ্রন্থনা এতে অন্তর্বৃত। পুঁজিবাদী কৃৎকৌশলে ও প্রেরণায় ধাপে ধাপে অবদমনের যে বিপুল চাপ গড়ে ওঠে—তারই পরিণাম বলা যায় ফ্রয়েডীয় অবচেতনাকে। দেলেউজ ও গুয়াত্তারি বিশ্বাস করেন যে এই প্রক্রিয়ার পালে হাওয়া এনে দেয় মনোবিকলন। তাঁদের মতে অবচেতন আকাঙ্ক্ষায় মূলত দ্বিমেরুবিষম অভিব্যক্তি দেখা যায়; স্বভাবে এদের একটি হল 'Schizophrenic' এবং অন্যটি 'Paranoiac'! এই দুই মেরুর মধ্যে প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হল বহুত্ব, বিপুল বৃদ্ধি, হয়ে ওঠা, প্রবহমানতা, সীমান্ত ভাঙা; (চিন্তা-কর্ম-অনুভূতির মধ্যে যেহেতু মানসিক স্তরে বিভাজন ঘটে যায়) এবং তা গড়ে ওঠে আংশিক বিষয়বস্তু, স্মৃতি-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার চূর্ণক দিয়ে। এইসব চূর্ণক পরস্পরের সঙ্গে আকস্মিকতায় ও অপ্রত্যাশিত ধরনে সম্পৃক্ত। আর, শেষোক্তটির বৈশিষ্ট্য হল শৃঙ্খলা, সাদৃশ্য ও সমগ্রতার সন্ধান, একীকরণের প্রবণতা এবং নানা ধরনের পরিচিত সীমার প্রহরা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মান্যতা-প্রাপ্ত বাধা সত্ত্বেও বিষয় ও সত্তার অভিজ্ঞান আর সম্পূর্ণতা সম্পর্কিত প্রত্যয়। প্রথম মেরুর প্রবণতাই হল অনবরত সব ধরনের সীমান্তকে সরিয়ে দেওয়া, অভিজ্ঞানের রূপান্তর সাধন, অতিপরিচিত অবস্থানকে উপেক্ষা এবং নির্দিষ্ট পরিসর মুছে খেলার প্রবণতা। অন্যদিকে, শেষোক্ত মেরুতে রয়েছে নির্দিষ্ট পরিসরের গণ্ডিতে সব কিছুকে বিন্যস্ত করার নিরবচ্ছিন্ন চাপ এবং আকাঙ্ক্ষার অন্বিষ্টকে চিহ্নিত করা ও বজায় রাখার প্রবণতা। এইসব জটিল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত যা লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে, তা হল দেলেউজ ও গুয়াত্তারি কথিত বস্তুতান্ত্রিক মনঃবিশ্লেষণ যার মধ্যে নিহিত থাকে প্রাগুক্ত পরিসর-বোধ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু। স্পষ্টতই, তাঁদের চিন্তাপ্রকরণের বৈশিষ্ট্য এই বিন্দুতে স্পষ্ট।

মিশেল ফুকোর অবস্থান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ফুকো মনোবিকলনকে প্রতাপের এমন প্রতিবেদন হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা অধিকতর জ্ঞান উৎপাদন করার মতো লাভজনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে। কিন্তু দেলেউজ ও গুয়াত্তারি মনোবিকলনকে পুরোপুরি ক্ষতিকর বলে মনে করেন। তাঁরা ঈডিপাসীয় অবদমনের উপস্থিতি সম্পূর্ণত স্বীকার করেন যদিও, এর আওতা থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যাওয়ার প্রয়োজন ও সম্ভাবনার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। আমাদের মনে যদি প্রশ্ন জাগে যে এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্কের সঙ্গে সাহিত্য পাঠের সম্পর্ক কতখানি, দৃষ্টান্তমূলক বয়ানের জন্যে দেলেউজ ও গুয়াত্তারির কাফকা-বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া যেতে পারে। আপাতত ওই সূত্র উল্লেখ করা যায় যে প্রচলিত ও যথাপ্রাপ্ত পদ্ধতিও প্রকরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় বলেই সাহিত্য, 'Schizophrenia' এর সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা মন্তব্য করেছেন 'an author is great because he cannot prevent himself from tracing flows and causing them to ciculate, flows that split asunder the Catholic and despotic signifier of his work, and that necessarily nourish a revolutionary machine on the horizon.' (১৯৭৭ :১৩৩)। কিন্তু কোনো লেখকসত্তা কখনো পুরোপুরি স্বয়ম্ভু ও অন্য-নিরপেক্ষ হতে পারে না। এইজন্যে বিশেষ ধরনের পাঠক-সত্তার প্রয়োজন পড়ে যিনি আকাঙ্ক্ষার মুক্তিদাতা এবং বহুস্তরান্বিত মনোবিভাজন বিশ্লেষক পাঠকৃতিকে আকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ যন্ত্রে রূপান্তরিত করা যার প্রধান কৃত্য। আবার ঠিক এই বিন্দুতে যেহেতু সূক্ষ্মভাবে রাজনৈতিক অনুষঙ্গও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, প্রাগুক্ত যান্ত্রিক কৃৎকৌশল হয়ে ওঠে স্বভাবে বৈপ্লবিক। এই বিষয়টি অত্যন্ত সতর্ক ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দাবি করে, কেননা এতে বাস্তব ও প্রকল্পনা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। এছাড়া আরো কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় নিবিড় অভিনিবেশ দাবি করে। অবচেতনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও অভিব্যক্তিকে কাফকার রচনায় দেলেউজ ও গুয়াত্তারি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা অভিনব।

এখানে বিস্তারিত আলোচনা না-করে শুধু লক্ষ করব, এই দুই তাত্ত্বিক কাফকার সাহিত্যিক অভিজ্ঞান হিসেবে 'Schizoclownishness' এর কথা বলেছেন। সমাজের যথাপ্রাপ্তকে পরিসরশূন্য করে তোলার পদ্ধতি দেখতে পেয়েছেন কাফকার রচনায়। সামাজিক ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার অবচেতন উপস্থাপনাকে 'মানসিক পুঁজি লগ্নীকরণ' বলেছেন তাঁরা। সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই তো মুখ্যত সামাজিক উৎপাদন; শুরুতে আকাঙ্ক্ষা, শেষেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্ক্ষা। চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় এদের মধ্যে সেতু রচিত হয়। বস্তু ও ধারণার অভিব্যক্তিতে আকাঙ্ক্ষার সামাজিক ও ঐতিহাসিক স্বভাব কীভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে, লেখকের প্রতিবেদনে তা অজস্র কৌণিকতায় ধরা পড়ে। কাফকার 'লিখন-যন্ত্র' (writing machine) বাস্তব জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনগত অজস্র আলো-আঁধারিকে অবচেতনের নিপীড়ক আকরণে পরিশীলিত করেছে যেন। প্রতিটি অবস্থান রূপান্তরিত হয়ে গেছে তাতে। গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা শ্লেষ-কৌতুক-প্রহসন ধরা পড়েছে যেমন, তেমনি প্রতিটি অস্তিত্বে দেখতে পাই অন্য অস্তিত্বের সঞ্চরমান ছায়া। প্রতিটি ভূমিকায় তৈরি হয়েছে অসংখ্য ব্যবচ্ছেদ-বিন্দু বা 'intersection points!' প্রতাপের আন্তঃসম্পর্ক ঐসব বিন্দুতে বিচ্ছুরিত হয়। আবার এইজন্যে সেইসব অণুপরিসরে দেখা দেয় প্রতিরোধের সম্ভাবনাও। দেলেউজ ও গুয়াত্তারি মনে করেন, প্রতাপ আমাদের কখনো পুরোপুরি ফাঁদে ফেলতে পারে না। কারণ, এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি না কিংবা যেখান থেকে ফিরে আসতে পারি না। নিজের অবস্থানকে শুদ্ধতর ও সার্থকতর করার জন্যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অটুট থাকে সর্বদা। সুনির্দিষ্ট অবস্থায় ও প্রেক্ষিতে সুপরিকল্পিত রণকৌশল গ্রহণ করলে প্রতাপের চতুরতাকে কার্যকরীভাবে নিশ্চয় মোকাবিলা করা সম্ভব। আকাঙ্ক্ষার গভীরে প্রতাপের উপস্থিতিকে শনাক্ত করাও কঠিন নয়।

দেলেউজ ও গুয়াত্তারি কাফকার 'Schizo' বা মনোবিভাজন-বিশ্লেষণী পাঠ তৈরি করে আমাদের বুঝিয়েছেন, সাহিত্যিক সন্দর্ভের বিভিন্ন অংশ ও অনুষঙ্গ আসলে 'part of a vast topography of desire, rooms whose entrances and exits lead from one section to the next in unexpected ways, a continuum of moving barriers.' (এলিজাবেথ রাইট : ১৯৯৩ ১৭০)। এভাবে এই তাত্ত্বিক যুগল মনোবিকলনবাদী সমালোচনা থেকে পরিসরের নির্দিষ্টতা সরিয়ে দেওয়ার সাহসী উদ্যম হিসেবে তাঁদের Schizo-analytic সমালোচনাধারাকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। নির্জ্ঞান সত্তা-কেন্দ্রিকতা থেকে সচেতন অহং-কেন্দ্রিকতায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে মনোবিকলনবাদী সমালোচনায় যেসব ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, দেলেউজ ও গুয়াত্তারি তার অনেকটা পূরণ করেছিলেন। সাবেক চিন্তাবৃত্তের উপস্থাপনা-প্রকরণে এবং সুনির্দিষ্ট প্রতীকায়নে তাঁরা আমূল পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছিলেন বলেই আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাবর্তিত আকল্পে আস্থা রেখেছেন। তাকে নিষিদ্ধ বলে না-ভেবে বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের উৎসমুখ বলে ভেবেছিলেন। ফলে লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষেই প্রত্যাশিত হল নিরীক্ষার প্রবণতা যাতে যথাপ্রাপ্ত উপস্থাপনার অচলায়তন থেকে নিষ্ক্রমণ সম্ভব হয়। পাঠকৃতি বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ নতুন ধরন এভাবে প্রস্তাবিত হল যখন, মনোবিকলন-অবচেতনা-ভাবাদর্শের তাৎপর্যও বিনির্মিত হল। এ আসলে সর্বাত্মক বিদ্রোহের অভিব্যক্তি যা সাহিত্যিক পাঠকৃতির কৃৎকৌশল সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের চিরাগত ধারণায় নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছে। এলিজাবেথ রাইট দেলেউজ ও গুয়াত্তারির বৈপ্লবিক আবেদনের নিষ্কর্ষ এভাবে তুলে ধরেছেন 'Marxism and psychoanalysis have both made same discovery of the pattern of production that has emerged in capitalism. But Marxism ignores desire

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

while Freudianism has hampered the class struggle in chaning desire to the family...Schizoanalysis reveals the unconscious investments of desire as more powerful than those induced by the state system.' (প্রাগুক্ত ১৬৯)

চার

এই মন্তব্যের সূত্রে কিছু কিছু গোড়ার কথায় আরো একবার মনোযোগী হতে হয়। উনিশ শতকের শেষে ভিয়েনায় সিগমুণ্ড ফ্রয়েড চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূত্রে যখন অবচেতনার তত্ত্ববস্তু নির্ণয় করছিলেন, মানবিকীবিদ্যার ক্ষেত্রে তা কতটা যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করবে—অনেকেই সে-সময় অনুমান করতে পারেননি। মানবিক সম্পর্ক, মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তা যে শুধু নতুন তাৎপর্যে বিশ্লেষিত হল, তা-ই নয়; বিশ শতকের সমস্ত ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক উথালপাথাল অবচেতনের জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক নির্যাস একটু একটু করে পালটে দিল। আর, সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্বস্তু ও অভিব্যক্তিতে দেখা গেল বিপুল পরিবর্তন। ফ্রয়েড যে অবদমনের প্রসঙ্গ তাত্ত্বিকভাবে উত্থাপন করলেন, তলিয়ে ভাবলে মনে হয়, বহুরৈখিক শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে-ওঠা সভ্যতার ইতিহাস 'বহুজনহিত ও বহুজনসুখ' এর প্রয়োজনেই অবদমন অনিবার্য। সুখ ও তৃপ্তির জন্যে মানুষের তৃষ্ণা যদিও স্বাভাবিক, সেই তৃষ্ণাকে অনেকের স্বার্থে দমনও করতে হয়। তবে অবদমন যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, সমাজের পক্ষে তা পীড়ার কারণ হয়। মানুষের বাস্তব ইতিহাস কিংবা চিন্তন-প্রক্রিয়ার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি, দেখব, মাত্রাবোধই সব কিছু। জৈবিক আকাঙ্ক্ষার অবদমন যতক্ষণ ঐ মাত্রাবোধকে ধ্বস্ত না করে, ততক্ষণ তা উদ্বেগের কারণ নয়। চেতনা ও অবচেতনার মধ্যবর্তী আলোছায়া কিংবা এই দুটি প্রধান ভাববীজের পরিসর সংক্রান্ত আলোচনায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বলা ভালো, বৈচিত্র্য যখন সীমা পেরিয়ে যায়, তাকে জটিলতা বলি।

ফ্রয়েড ও মার্ক্স সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে তাঁদের চিন্তা দ্বিমেরুবিষম। অথচ 'Introductory Lectures on Psychoanalysis' বইতে ফ্রয়েড এই মন্তব্য করেছিলেন, 'The motive of human society is in the last resort an economic one'। তবে মার্ক্স শ্রমের প্রয়োজন ও তার প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছিলেন সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক শ্রেণী এবং তাদের বাস্তব প্রসূত রাজনীতির নিরিখে। আর, ফ্রয়েড মনস্তাত্ত্বিক জীবনে এইসব প্রকরণের প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনের আশ্রয় কূটাভাস বা স্ববিরোধিতা। যে-সমস্ত মৌলিক উপকরণ আমাদের অস্তিত্বের নির্মাতা ও নির্ণায়ক, তাদের প্রবল অবদমনের মধ্য দিয়েই শুধু আমরা নিজেদের অভিজ্ঞান অর্জন করি ও নিরন্তর হয়ে উঠি—এই ধারণার মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রাগুক্ত কূটাভাস। কিন্তু আমরা নিজেরা এ বিষয়ে অবহিত নই। যে-সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া আমাদের জীবনকে নির্মাণ ও বিনির্মাণ করে—খুব কম মানুষই সে-বিষয়ে সচেতন থাকে। আমাদের যে-সব আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না কিংবা পুরোপুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়, তাদের অতৃপ্তি জনিত অনুভূতিকে আমরা নিজেদের অগোচরেই অবচেতনে সরিয়ে দিই।

স্বভাবত চেতনার এই গোপন ভাণ্ডার সম্পর্কে আমরা নিজেরা কখনো অবহিত থাকি না। এই বিপুল রহস্যময় কৃষ্ণ মহাদেশের বিশ্লেষণ না করলে সত্যের কোন্ অভিব্যক্তি প্রতীয়মান আর কোনটি যথার্থ, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। বয়ানের সোচ্চার অংশ প্রায়-অনন্ত নিরুচ্চার দিয়ে পিঞ্জরায়িত। এই পিঞ্জরকে শনাক্ত করার জন্যে অবচেতনের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ফ্রয়েড কীভাবে অবচেতনের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষার অবদমন লক্ষ করেছিলেন এবং নিতান্ত দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর মধ্যেও যৌন আনন্দ লাভের অস্ফুট প্রকাশ দেখেছিলেন, এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার স্ফুরন শৈশবের সূচনাপর্বেই হয়ে যায়। শিশু যত ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, তার মধ্যে দেখা দেয় যৌনবৃত্তি। আবার সেই সূত্রে বিকশিত হয় তার ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামাজিক সত্তা।

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, শৈশব আমাদের জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের কোরক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে শিশুকালেই সম্পূর্ণ মুকুলিত হয়ে যায়। চরিত্রের মৌলিক প্রবণতাগুলি তখন নির্ধারিত হয় বলে পরবর্তী পর্যায়ে যা ঘটে, তা স্বাভাবিক রূপান্তর মাত্র—যথার্থ কোনো পরিবর্তন নয়। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে-জৈবিক বৃত্তি অর্জন করি, তা হল কামবৃত্তি ও লিবিডো। যথাপ্রাপ্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার বহুমাত্রিক সংঘর্ষ অনিবার্য। আর, এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই ক্রমাগত বিকশিত হয়ে চলেছে ব্যক্তিত্ব। জীবনের যে-পাঠকৃতি এভাবে অহরহ রচিত হচ্ছে, তাতে আত্ম-সংরক্ষণ ও ধ্বংস যুগপৎ সক্রিয়। প্রগতি ও প্রতিগতির দ্বিরালাপ নানা স্তরে আমাদের ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামাজিক সত্তাকে গঠন করছে। জৈবিক বৃত্তি তাই নিছক কামুকতায় ফুরিয়ে যায় না, গঠনমূলক বহু উদ্যমের মূল প্রেরণা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ফ্রয়েডের সর্বকামবাদ পরবর্তী কালে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। আর, তাঁর বক্তব্যের অন্তর্বর্তী সম্ভাবনাকে বিকশিত করেছেন ইয়ুং। আমরা ফ্রয়েডের বয়ান বিশ্লেষণ করে লৈঙ্গিক নির্মিতির প্রক্রিয়াকে শনাক্ত করতে পারি। আকাঙ্ক্ষা কীভাবে জীবনের পাঠকৃতির নিয়ামক হয়ে ওঠে, কীভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তারই তৈরি প্রকল্প ও অনুকৃতিগুলি কিংবা ভাবকল্প ও অভ্যাস সমূহ, এই বিশ্লেষণ খুবই কৌতূহলব্যঞ্জক। যৌনতা ও আত্মরতির পর্যালোচনায় ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার কেন্দ্রীয় উপস্থিতি এইজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে এর দর্পণে আমরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সেইসব আকরণকে চিনে নিই যা আমাদের পুরুষ ও নারী করে তোলে। এ সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন টেরি ঈগলটন 'It is the point at which we are produced and constituted as subjects; and one problem for us is that it is always in some sense a partial, defective mechanism. It signals the transition from the pleasure principle to reality principle; from the enclosure of the family to society at large, since we turn from incest to extra-familial relations; and from Nature to culture. (১৯৯৫ ১৫৪)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রয়েড-কথিত কামবৃত্তি বা লিবিডো হল ইদ্ বা অভিসত্তার শক্তি। অন্ধ প্রবৃত্তির তাগিদে সুখভোগের স্পৃহায় তার সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইচ্ছাপূরণের জন্যে বহির্জগতের বস্তুকে আকর্ষণ করে; সামাজিক ও নৈতিক বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করাই তার প্রবণতা। কিন্তু তাতে আবার অনিবার্য হয়ে পড়ে অবদমন ও প্রতিবন্ধক তৈরির পদ্ধতি। ঐ পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয় ইগো বা অহং। তা বাস্তবতাকে মেনে চলে; বাস্তবতার পরিপন্থী কোনো কাজে তার সমর্থন থাকে না বলে সুখভোগবাদী অভিসত্তার সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার, এটাও ঠিক যে অভিসত্তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে অহং সক্রিয় হতে পারছে কিনা তার ওপরই অহংএর সার্থকতা নির্ভর করে। এ এক বিচিত্র কূটাভাস। তাছাড়া অহং অনেক সময় নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্যে অভিসত্তার জৈবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে থাকে। অভিসত্তা মূল্যবোধ, নীতি, যুক্তির উর্ধ্বে থাকে বলে তাতে স্থান-কালের প্রাসঙ্গিকতা নেই, পরস্পরবিরোধী বলে কোনো অস্তিত্বও নেই। অভিসত্তা হল তা-ই যা অহং নয়। আর, সুপার ইগো বা পরাসত্তা হল বিবেক বা নৈতিকতা-'the awesome punitive voice of Conscience' (তদেব)। সেও কিন্তু অভিসত্তার স্তর থেকেই রসদ সংগ্রহ করে। বাস্তব পরিস্থিতির অনিবার্য প্রভাবে অভিসত্তার কিছু উপাদান অহং এবং কিছু পরাসত্তায় পরিণতি লাভ করে। পরাসত্তা অহং-এর সতর্ক সমালোচক; অহং যখনই নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ ও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, পরাসত্তা মূলত অবচেতন থেকে উঠে এসে তার মধ্যে উৎকণ্ঠা বা অপরাধবোধ জাগিয়ে দেয়। এ যেন সমাজ-সংবিদের প্রহরী। ব্যবহারিক জীবনের বয়ান যখন সাহিত্যিক পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত হয়, এইসব সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠতন্তুর বিভঙ্গ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। বিশ্লেষক এবং বিশ্লেষিতব্য—উভয় পক্ষেই দেখা যায় জটিল দ্বিগুণিত দ্বন্দ্ব। এলিজাবেথ রাইটের মতে 'Readers do not only work on text, but text works on readers, and this involves a complex double dialectic of two bodies inscribed in language' (প্রাগুক্ত ১৭)। যেহেতু ফ্রয়েড অবচেতনের 'রাজকীয় পথ' খুলে দিয়েছেন, বিশ্লেষক ও বিশ্লেষিতব্যের দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে অন্তহীন। আবার, এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দেখা দেয় সামাজিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের প্রবণতাও। মনোবিকলনবাদের পরিভাষায় লেখক ও পাঠকের সমান্তরাল সম্পর্ককে বলা হয়েছে 'transeference and counterference' (উচ্চলন ও প্রত্যুচ্চলন)। জাক লাকাঁ বলেছিলেন, এই সম্পর্ক-বিন্যাসে শুধুমাত্র 'কথিত শব্দাবলী'র মধ্য দিয়ে পৌঁছানো সম্ভব। তাঁর মতে বিশ্লেষিতব্যের আখ্যানে অবচেতনের নিজস্ব বাস্তবতা সক্রিয় হয়ে ওঠে, কেননা তা নিহিত থাকে ভাষার আকরণের মধ্যে। সাহিত্যিক প্রতিবেদনের তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় এই উপলব্ধির দ্যোতনা সুদূরপ্রসারী। উচ্চলন ও প্রত্যুচ্চলনের আধারে দ্বন্দ্ব যদি প্রবল হয়ে ওঠে, প্রতিবন্ধকের প্রকরণগুলি অবচেতনকে রুদ্ধ করে দেবে। লাকাঁ বলেছেন সেইসঙ্গে 'speech, on the other hand, will open it (অবচেতন) up, for here resistance is directed against the father's law, the order of language which implicates both analyst and analysand in something beyond a dual relation' (১৯৭৭ :১২৩-১২৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

ফ্রয়েডের একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে মনে পড়ে : মনের অবচেতন ক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানে পৌঁছানোর রাজকীয় পথ হল স্বপ্নভাষ্য। তাঁর মতে স্বপ্ন হল মূলত অবচেতন আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতীকী পরিতৃপ্তি। এইসব স্বপ্নের বস্তুভিত্তি যদি সরাসরি প্রকাশিত হত, তাহলে তা হয়তো আমাদের প্রবল অস্বস্তি এবং আশঙ্কার কারণ হত। কেননা জাগ্রত অবস্থায় সচেতন মনে সেইসব আমরা হয়তো ভাবতেও পারি না। আক্ষরিক অর্থেই ঘুমোতে পারতাম না তখন। যাতে আমরা অশান্ত না হই, বিশ্রামের থেকে বঞ্চিত না হই, অবচেতন আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে নানা ছদ্মবেশের আড়ালে গোপন করে রাখে, বদলে দেয়, কোমল ও সহনীয় করে তোলে। ঐসব আকাঙ্ক্ষার বস্তুভিত্তির ওপর পর্দা নেমে আসে, তাদের প্রকৃত নিষ্কর্ষ রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়ে যায়। অবচেতনের এইসব ক্রিয়াই স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্ত হয়। সেই স্বপ্নরাজ্যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নানা ধরনের প্রতীকে রূপান্তরিত হয় বলে এদের ভাষ্য করতে না পারলে তাৎপর্য অধরা রয়ে যায়। অহং বা অস্মিতা প্রহরীর ভূমিকায় স্বপ্নেও সক্রিয় থাকে, কখনো এলোমেলো বার্তা পৌঁছে দেয়, কখনো বা রূপকল্পদের পরিশোধন করে। কিন্তু এতে যুক্তির পারম্পর্য ধ্বস্ত হওয়াতে সব কিছু দুর্বোধ্য হয়ে যায় এবং অবচেতন যখন নিজে এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়, অর্থবোধের কোনো উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না। এই সম্পর্কে ঈগলটনের বক্তব্য হল 'Dream texts are also cryptic because the unconscious is rather poor in techniques for representing what it has to say, being largely confined to visual images and so must often craftily translate a verbal significance into a visual one.' (প্রাগুক্ত ১৫৭-১৫৮)

আসলে অবচেতনের সমৃদ্ধি প্রায় অন্তহীন। শুধুমাত্র স্বপ্নের মধ্য দিয়েই আমরা তাতে প্রবেশাধিকার পাই তা কিন্তু নয়, যদিও এটা তার প্রধান অবলম্বন। অন্যান্য গৌণ পথ সম্পর্কে ফ্রয়েডের প্রচুর বিশ্লেষণ রয়েছে। এইসব প্রধান ও গৌণ পথগুলিকে অহং বা অস্মিতা যখন রুদ্ধ করে, অন্তর্বৃত সংঘর্ষের পরিণামে দেখা দেয় নতুন ধরনের জটিলতা। এইসব গ্রন্থিলতার সমাধানে মনোবিকলন কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা না-করে আমরা অন্য প্রসঙ্গে মনোযোগী হতে পারি। মনে রাখতে হয় শুধু এই কথা যে স্বয়ং ফ্রয়েড যেমন পরিণত বয়সে নিজের চিন্তা-প্রণালীকে অনেকটা পাল্টে নিয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তী তাত্ত্বিকেরাও অবচেতন ও মনোবিকলন থেকে তাৎপর্য সন্ধানের প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট বদলে দিয়েছেন। তাই এই সম্পূর্ণ বিষয়টিকে চিন্তা-প্রস্থানের সামগ্রিকতায় বিচার করাই সঙ্গত।

ফ্রয়েড নিজেই মনোবিকলনের নিষ্কর্ষকে এভাবে সূত্রায়িত করেছেন 'যেখানে অভিসত্তা ছিল, সেখানেই অস্মিতা থাকবে'। চেতনা নিঃসাড় করে-দেওয়া যে প্রবল দুর্বোধ্য শক্তির কবলে পড়ে নিরুপায় হই আমরা, সেখানেই যুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রাধান্য অর্জন করে। আপাত-দৃষ্টিতে ফ্রয়েডকে যুক্তিবাদী মনে হয় না বটে, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা অনুধাবন করলে মনে হয়, তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা অপ্রতিরোধ্য। অর্থাৎ মানুষের ক্ষমতার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর আস্থা ছিল, যদিও সাধারণভাবে তাঁর চিন্তাধারা রক্ষণশীল ও নৈরাশ্যবাদী; কেন না অন্তিম পর্যায়ের রচনায় তিনি এই বোধে পৌঁছেছিলেন যে, সমগ্র মানব জাতি এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু-এষণায় বন্দী। জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মৃত্যু; তা এমন আনন্দময় প্রাণাতীত অবস্থা যেখানে অহং আহত হয় না।

এদিকে তিনি বলেছেন Eros বা যৌন শক্তির কথা যা ইতিহাসকে নির্মাণ করে; আবার অন্যদিকে তিনি দেখিয়েছেন, এই শক্তি Thanatos বা মৃত্যু-এষণার সঙ্গে ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই শুধুমাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিহত হয়ে পেছনে সরে আসার জন্যে। প্রাক্‌চেতনার স্তরে প্রত্যাবর্তনের জন্যে আমরা আত্মসংঘর্ষে লিপ্ত হই। ফ্রয়েড যে অহং বা অস্মিতার প্রতি মমত্ব সম্পন্ন, এর মানে, তিনি আসলে গোটা মানবজাতির জন্যে সহানুভূতিপরায়ণ। আকাঙ্ক্ষার অবদমন ও তৃপ্তি-বোধের অপসারণ দিয়ে যে-সভ্যতার বনিয়াদ তৈরি হয়েছে, তার অসহনীয় দাবির পেষণে মানবজাতি ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতি বদলানো সম্ভব, ফ্রয়েড তা মনে করতেন না। অর্থাৎ এই বিন্দুতে মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রস্থানের সঙ্গে তিনি দ্বিমেরু-বিষম দূরত্বে রয়েছেন।

অবশ্য তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ করব যে তিনি ব্যক্তিগত মালিকানা কিংবা জাতিরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আধুনিকতাবাদী সমাজের সমালোচনা করেছেন। এই সমাজ যে অবদমনের প্রবণতায় নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ছিল না। 'The future of an illusion এর বয়ানে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল কোনো সমাজ যদি উন্নয়নের নামে এক বিন্দুতে এসে থাকে যেখানে এক দল মানুষের তৃপ্তি ও সমৃদ্ধি অন্য আরেক দলের নিপীড়নের ওপর নির্ভর করছে—তাহলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে অবদমিতবর্গ সেই সংস্কৃতি সম্পর্কে তীব্র বৈরিতা পোষণ করবে, যার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে তাদেরই নিরন্তর অধ্যবসায়ে। অথচ অর্জিত সম্পদে শরিক হওয়ার এক্তিয়ার তাদের নেই। এই চিন্তার নিরিখে ফ্রয়েড আশ্চর্যজনক ভাবে মার্ক্সের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। তাঁর এই মন্তব্যটি লক্ষণীয় 'It goes without saying that a civilization which leaves so large a number of its participants unsatisfied and drives them into revolt neither has nor deserves the prospect of a lasting existence.' বাঙালি পাঠকের মনে পড়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান/...দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে।' এ যেন এক অন্য ফ্রয়েড, যাঁকে হ্যারল্ড ব্লুম সর্বোত্তম কবি বলে ভাবতে পারেন। অভিসত্তা, অস্মিতা ও পরাসত্তার জটিল অন্তর্বয়ন এই নিরিখে যেন কবিতার প্রতিবেদন। ফ্রয়েডের চিন্তা অনুসরণ করে তাই ঈগলটন এই কাব্যিক বাচন পেশ করতে পারেন, 'The ego is a pitiable, precarious entity battered by the external world, scourged by the cruel upbraidings of the supergo, plagued by the greedy, insatiable demands of the id', (প্রাগুক্ত ১৬১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছয়

ফ্রয়েডের চিন্তা থেকে যদিও আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তবু বামপন্থী চিন্তাবিদদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে এই সমালোচনা প্রচলিত আছে যে, তাঁর চিন্তা মূলত উৎকটভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক; তিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত স্তরের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও কারণগুলিকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও কারণগুলির বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই অভিযোগ আপাতভাবে যথার্থ, কারণ কীভাবে সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদানকে অবচেতনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হবে, তা নিয়ে প্রকৃত সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক নিবিড় পাঠে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ব্যক্তি-সত্তার বিকাশকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিরিখে উপস্থাপিত করেও ফ্রয়েডের চিন্তাধারাকে কাজে লাগানো সম্ভব। মানবিক প্রেক্ষিতে বিষয়ীসত্তার নির্মাণ সম্পর্কে বস্তুতান্ত্রিক তত্ত্বকেই ফ্রয়েড পুষ্টি দিয়েছেন। শৈশব থেকে নিরন্তর ও সমান্তরাল আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে আমরা বয়স্ক হয়ে উঠি। প্রেক্ষিতের সঙ্গে ব্যক্তি-অস্তিত্বের যে জটিল বিনিময় ঘটে, তাতে জৈবিক উপাদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চয় স্বীকার্য; কিন্তু প্রাগুক্ত আন্তঃসম্পর্কগুলি সর্বদা সামাজিক ভাবে নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট। শিশুর শরীর ও মন বিকশিত করার ক্ষেত্রে মা-বাবার ভূমিকায় সম্পৃক্ত থাকে নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার-অভ্যাস সহ বহু সাংস্কৃতিক উপাদান, যা প্রতিটি সমাজে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ শৈশবের প্রতীতি কিংবা পরিবারের ধারণা ইতিহাসের নির্মিতি। আর, এইজন্যে এদের স্বভাবে নিহিত থাকে প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র। এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মেয়েদের স্বভাবত হীনতর ভেবে নেওয়ার পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতাও। ফ্রয়েডের মনোবিকলন ঠিক এখানেই নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিকের অভিনিবেশ দাবি করে। এবার ফরাসি আকরণবাদী তাত্ত্বিক জাক লাকাঁর মনোবিকলন সম্পর্কিত বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। আগেই লিখেছি, তাঁর মহাবাক্য হল 'আমাদের অবচেতন ভাষার মতোই আকরণে বিন্যস্ত।' তবে লাকাঁ কিন্তু নারীচেতনাবাদের পক্ষপাতী চিন্তাবিদ নন। এমনকী নারী আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও অনুকূল ছিল না। তবে মানববিশ্বে বিষয়ীসত্তার নিষ্কর্ষ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা লাকাঁর বয়ানে লক্ষ করবেন ফ্রয়েডীয় প্রতিবেদন পুনর্লিখনের আশ্চর্য মৌলিক প্রয়াস। দেখবেন কীভাবে ঐ বিষয়ীসত্তার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং বিশেষভাবে ভাষার সম্পর্ক তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ শেষোক্ত কারণে সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কাছে লাকাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। আকরণবাদী ও আকরণোত্তরবাদী প্রতিবেদনতত্ত্বের আলোকে লাকাঁ ফ্রয়েডীয় ভাবনার পুনর্ভাষ্য তাঁর 'Ecrits' বইয়ে তুলে ধরেছেন। আকরণোত্তরবাদী পাঠতত্ত্ব ও মনোবিকলন কত সূক্ষ্মভাবে অন্যোন্য- সম্পৃক্ত, লাকাঁ সেদিকে বিশ্লেষণী আলোকপাত করেছেন। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, ক্রমবিকাশের সূচনাপর্বে শিশু নিজের সঙ্গে বহির্জগতের, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের, সত্তার সঙ্গে অপরতার স্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে পারে না। অস্তিত্ব-সংগঠনের এই অবস্থাকে লাকাঁ 'প্রতিভাস' বা প্রতিফলনমূলক' (imaginary) অভিধা দিয়েছেন। অর্থাৎ এটা হল সেই পর্যায় যেখানে সত্তার সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই;

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই পরিস্থিতিতে 'সত্তা'র উপস্থিতি শুধুমাত্র বিষয়ের পরিধিতে। অবশ্য বিষয় শেষ পর্যন্ত ঐ সত্তার মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই বিনিময় নিরবচ্ছিন্ন অথচ রুদ্ধদ্বার। এ হল প্রাক্-ঈডিপাসীয় স্তর যখন শিশু তার মায়ের শরীরের সঙ্গে 'অন্তরীভূত' (symbiotic) সম্পর্কে যুক্ত থেকেই বাঁচে; মায়ের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত সমস্ত সীমারেখাই তার কাছে ঝাপসা। কেননা জৈবিক বোধের সাহায্যে শিশু জানে, এই শরীরের ওপর তার জীবন নির্ভর করছে। আবার, বহির্জগতের যতটুকু ইশারা সে পায়, তা কোনো ভাবেই তার নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ধরা যাক, একটি ছোট্ট শিশু নিজেকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখছে। লাকাঁর বিখ্যাত 'দর্পণ-স্তর' (mirror stage)-এর ভাববীজ এই রূপকে জন্ম নিয়েছে। অস্তিত্বের প্রাগুক্ত প্রতিভাসমূলক (imaginary) স্তরের মধ্য থেকেই শিশুর অহং-এর প্রাথমিক অঙ্কুরোদ্গম হয়; সংহত ব্যক্তি-স্বরূপের প্রথম ছবিগুলি তার চেতনায় মুদ্রিত হতে শুরু করে।

শারীরিক দিক দিয়ে এই পর্যায়ে শিশু অসংগঠিত; নিজেরই একীভূত ও তৃপ্তিদায়ক প্রতিচ্ছবি যেন তার কাছে প্রতিফলনের মতো ফিরে আসতে দেখে সে। যদিও ঐ প্রতিচ্ছবির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রতিফলনমূলক স্তরেরই পরিচায়ক, দর্পণে বিধৃত প্রতিচ্ছবিতে সে একই সঙ্গে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত। বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্যবোধ তখনও ঝাপসা; তবু, সত্তার কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই সত্তা অবশ্য নিষ্কর্ষের দিক দিয়ে গ্রিক প্রত্নকথার বিখ্যাত চরিত্র নার্সিসাসকে মনে করিয়ে দেয়। জগতের কোনো ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা আমাদের কাছে পুনঃপ্রতিফলিত 'আমিত্ব'—এর বোধ থেকেই আমরা ক্রমশ 'আমি'র ধারণায় পৌঁছাই। 'এ আমাদের অস্তিত্বের অংশ' বলে আমরা তার মধ্যে নিজেদের অভিজ্ঞান খুঁজে পাই; আবার ঐ 'আমিত্ব'কে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন অপরের প্রতিভাস বলেও মনে করি। তেমনি ছোট্ট শিশু যখন দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে, তাকে একারণেই প্রতিভাসিত অপর বলে ভাবে। এ তার ভুল পর্যবেক্ষণ; কিন্তু এই ভুল সত্যের ছদ্মবেশে আসে। শিশু ধীরে ধীরে যত বড়ো হতে থাকে, ক্রমাগত নানা প্রতিফলনের মধ্যেই সে বস্তু-সন্নিবেশের সঙ্গে কাল্পনিক একাত্মীকরণ ঘটাতে থাকে। আর, এই প্রক্রিয়াতেই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব অহং বা অস্মিতার উপলব্ধি। তাহলে, অনুকৃতি বা প্রতিফলনের সমারোহ দিয়েই তৈরি হয় প্রতিভাসের সমবায়ী পরিসর। সত্তা ও জীবনের সন্দর্ভ অনিবার্যভাবেই কি তবে ছদ্মপাঠকৃতি এই প্রশ্ন মনে জাগে। অনবরত নিজেদের একাত্ম করি বস্তু-সমবায়ের সঙ্গে; কেননা এটাই আমাদের জগৎ নির্মাণের পদ্ধতি। অথচ কূটাভাস এখানেই যে, এই জগৎও হতে পারে প্রতিচ্ছবির সমাবেশ, ছদ্ম-জগতে ছদ্ম-অনুষঙ্গের গ্রন্থনা। ঈগলটন সঙ্গত কারণেই ভেবেছেন, লাকাঁর দর্পণ-স্তরের নিরিখে সমস্ত হয়ে ওঠে পুঞ্জীভূত অবভাসের বয়ন; যেহেতু 'in the very act of doing so (We) are led to misperceive and misrecognise ourselves... The ego is just this narcissistic process whereby we bolster up a fictive sense of unitary selfhood by finding something in the world with which we can identify.' (প্রাগুক্ত ১৬৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই প্রাক্-ঈডিপাসীয় প্রতিভাসমূলক স্তর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আসলে সত্তার পঞ্জীয়ন প্রকরণ বিষয়ে মনোযোগী হচ্ছি। এই প্রকরণের মুখ্য দুটি আলম্বন হল, শিশু ও তার মায়ের শারীরিক অস্তিত্ব। শিশুর পক্ষে মা-ই বহির্বৃত বাস্তবের প্রতিনিধি। কিন্তু ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার ছায়া যখন বাবার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিতে গাঢ়তর হতে থাকে, প্রাথমিক সাম্যাবস্থার অবসান হয়। লাকাঁর মতে বাবা হলেন 'আইনগত বিধি'র চিহ্নায়ক, যার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্ত হতে থাকে। মায়ের সঙ্গে শিশুর লিবিডো-গত সম্পর্কে ছেদ পড়ে তখন; বাবার প্রবল উপস্থিতির মধ্যে শিশু সেই পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিন্যাসের ব্যাপক বয়ানকে অনুভব করে, সে নিজেও যার অপরিহার্য অংশ। তার প্রতিভাসবিশ্ব ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে; সে বুঝে নেয় ধীরে-ধীরে, জন্মসূত্রেই সে এমন সামাজিক প্রকরণের বাধ্যতামূলক শরিক যেখানে তার নিজের ভূমিকাও পূর্বনির্ধারিত। বাবার উপস্থিতি শিশুকে মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে না কেবল; ক্রমে-ক্রমে তার আকাঙ্ক্ষার কোরকগুলি উন্মীলিত হওয়ার বদলে পাতালচারী হয়ে যেতে থাকে। অবচেতনে গুহায়িত হয়ে যায় তার উন্মেষপ্রবণ সত্তার বিপুল পরিধি। অর্থাৎ আইনগত বিধিবিন্যাসের আবির্ভাব আর অবচেতন আকাঙ্ক্ষার উন্মোচন ঘটে যুগপৎ। বাবা হয়ে ওঠেন নিষেধ ও প্রতিষেধের প্রতীক; অপরাধবোধের উন্মেষ হয় শিশুর মধ্যে, অবদমন প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে আকাঙ্ক্ষার আয়তন অবচেতনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে যায় যেন।

সাত

এই পর্যায়ে যৌন অভিজ্ঞানের নিরিখে নারী-পুরুষের পার্থক্য সম্পর্কে ঝাপসা ধারণাও তৈরি হতে থাকে শিশুর মনে। প্রাথমিক সাম্যাবস্থায় বাবার অস্তিত্ব সংক্রান্ত উপলব্ধির সূত্রে তা দেখা দেয়। লাকাঁর ভাববিশ্বে বাবার উপস্থিতি তাই চিহ্নায়ক; লিঙ্গ (Phallus) যৌন পার্থক্য সম্পর্কিত চিহ্নায়ন প্রকরণের উৎস ও বিকাশের ধারক। এই পার্থক্যের প্রয়োজন ধীরে ধীরে শিশু মেনে নেয়; স্বভাবত তার শৈশব থেকে কৈশোরে বিবর্তনও সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। লৈঙ্গিক সাম্য ও বৈষম্য সম্পর্কে তার সচেতনতার সূত্রে দেখা দেয় লিঙ্গ-নির্ধারিত সামাজিক ভূমিকা আর বাধ্যবাধকতা। নতুন ধরনের সমস্যা তাকে ক্রমশ বয়স্ক করে তোলে; এইসব সমস্যায় তার প্রতিক্রিয়া যে লৈঙ্গিক বিধিবিন্যাস অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত, তা সে বুঝতে পারে না। তাই পিতৃতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতার পতাকা সে বহন করে নির্দ্বিধায়। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা বিষয়ে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যানকে কীভাবে পুনর্লিখন করেছেন লাকাঁ, তা লক্ষ করলেই তাঁর মৌলিকতা আমরা অনুধাবন করতে পারব। ভাষার নিরিখে ঐ পুনর্লিখন হয়েছে বলে বাচনের মধ্যে আমরা অচিন্ত্যপূর্ব সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিসর খুঁজে নেওয়ার কথা ভাবতে পারছি। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে শিশু প্রতিবিম্বের মধ্যে নিজেকে চিহ্নায়ক বলে বুঝে নিচ্ছে অর্থাৎ এমন একটা কিছু যা তার কাছে তাৎপর্য বয়ে আনতে পারছে। যে-প্রতিচ্ছবি সে দেখছে, তা যেন চিহ্নায়িত। সে নিজে কী, এ সম্পর্কে তার মনে ধারণা তৈরি

—দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। অর্থাৎ শিশুর চোখে ফুটে-ওঠা প্রতিবিম্ব কার্যত তার নিজের সত্তার 'অর্থ' হিসেবে ধরা পড়ছে। সোস্যুর প্রস্তাবিত 'চিহ্ন' এর মতো এক্ষেত্রেও চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িত সাম্যানুভবে একীভূত। লাকাঁর 'দর্পণ'-স্থিতিকে এক ধরনের রূপক বলে যদি বিকল্প পাঠ তৈরি করা যায়, প্রতিচ্ছবির মধ্যে শিশুর সাদৃশ্য আবিষ্কার করার পদ্ধতিতে রুদ্ধ বৃত্তের আদল দেখতে পাই। এই বৃত্তে বিভিন্ন বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে একে অপরের প্রতিচ্ছবি হতে থাকে।

ফলে অস্তিত্বের এই আকল্পে কোনো প্রকৃত পার্থক্য বা বিভাজন স্পষ্ট হয় না। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের মধ্যে কিংবা বিষয়ীসত্তা ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান স্পষ্ট হয় না শৈশবের প্রতিবিম্বপ্রবণ পরিসরে। ঈগলটনের ভাষ্যে এই জগৎ হল 'of plenitude, with no lacks or exclusions of any kind standing before the mirror, the signifier (the child) finds a fullness, a whole and unblemished identity, in the signified of its reflection' (প্রাগুক্ত ১৬৬)। শিশুর বোধে বাবার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে এক ধরনের আকরণোত্তরবাদী উৎকণ্ঠায় নিক্ষিপ্ত হয়—এরকম ভেবেছেন লাকাঁ। এই পর্যায়ে যখন সে ধীরে ধীরে ভাষা ব্যবহার করতে শেখে, অবচেতনভাবেই সে এই পাঠ নেয় যে, অন্য-সমস্ত চিহ্ন থেকে স্বাতন্ত্র্যের জোরেই কোনো একটি চিহ্ন অর্থবহ হয়ে ওঠে। শিশুটি আরো শিখে নেয় যে, চিহ্নায়কের অন্বিষ্ট বস্তু অনুপস্থিত বলেই চিহ্নের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি, এই নিরিখে তা বস্তুবিশ্বের বিকল্প মাত্র। এই বিশেষ নিরিখে সমস্ত ভাষাই রূপকায়িত, কারণ বাচন মাত্রেই কোনো-না-কোনো বস্তুর প্রতিনিধি, পরোক্ষতাই তার আশ্রয়। শিশু যেভাবে অবচেতনের প্রেরণায় ভাষার পাঠ নেয়, তেমনি যৌনতার জগৎ সম্পর্কেও পাঠ নিয়ে থাকে। ফ্রয়েডীয় ভাবনাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে গিয়ে লাকাঁ বহু ধরনের জটিলতার জন্ম দিয়েছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিপ্রশ্নের অবকাশও তৈরি করেছেন। বড়ো হতে হতে শিশু এই সত্য মেনে নিতে বাধ্য হয় যে তার অনুভবের জগতে যত অর্ধস্ফুট ও অস্ফুট ইশারা আসছে, তাদের অনুসরণ বা তাৎপর্য অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না কখনো। বাস্তবতায় তার প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার গ্রাহ্য হবে না। প্রতিবিম্বের জগতে খানিকটা কাল্পনিক ভাবে যে-আপাতপূর্ণ জগতের উপর তার অধিকার ছিল, সেইসব থেকে নির্বাসিত হয়ে ভাষার শূন্য পরিধিতে সে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভাষা শূন্য, কারণ তা পার্থক্য ও অনুপস্থিতির অন্তহীন প্রক্রিয়ামাত্র। কোনো কিছুকেই সম্পূর্ণভাবে অধিকার করা যায় না বলে শিশুকে ক্রমাগত এক চিহ্নায়ক থেকে অন্য চিহ্নায়কে সঞ্চরণ করতে হয়। বাচনিক শৃঙ্খল স্বভাবে অনন্ত, তাকে বাধ্যতামূলক ভাবে অনুসরণ করতে করতে দেখা যায়, এক চিহ্নায়কের সূত্রে অন্য চিহ্নায়ক উপস্থিত হচ্ছে। এ যেন এক অন্তহীন দর্পণের জগৎ। এই জগতে চিহ্নায়ক, চিহ্নায়িত ও তাৎপর্য অনবরত উৎপাদিত হতে থাকে। অথচ এই নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকতে পারে না। এক অভিজ্ঞান মুছে গিয়ে অন্য অভিজ্ঞান দেখা দেয় শুধুমাত্র কিছুক্ষণ পরে মুছে যাওয়ার জন্যে। লাকাঁ এই প্রক্রিয়াকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আকাঙ্ক্ষার আকরণোত্তর বিন্যাসে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর মতে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই একটা অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়; আর, এই অভাবকে তা অনবরত পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। মানুষের ভাষা এই অভাববোধকে মোকাবিলা করার জন্যেই ক্রমাগত নিজস্ব দার্শনিক ও প্রায়োগিক সম্ভাবনা প্রসারিত করে চলেছে। নিরন্তর জন্ম নিচ্ছে চিহ্নায়ন প্রকরণ। তবু অনুপস্থিতি ও বর্জিত অপরতার উপলব্ধি দূর হচ্ছে না। আর, হচ্ছে না বলেই বাচনে নতুন নতুন দিগন্ত জেগে উঠছে। ভাষার ভেতরে প্রবেশ করার অর্থ হল আকাঙ্ক্ষাকে মান্যতা দেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত বলে কিছু থাকতে পারে না। যে-মুহূর্তে ভাষায় প্রবেশ করছি, সেই মুহূর্তেই লাকাঁ কথিত সেই অনধিগম্য 'বাস্তব' পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। কেননা এই পরিসর সর্বদা চিহ্নায়ন প্রকরণ ও প্রতীকী বিধি-বিন্যাসের আওতার বাইরে থেকে যায়। শৈশবের দর্পণ স্তর আর কখনো ফিরে আসে না, এটা ঠিক; রয়ে যায় শুধু অর্থ-পরম্পরার জন্যে অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা।

এভাবে মনোবিকলন ও অবচেতনের সূত্র ধরে লাকাঁ আমাদের পৌঁছে দেন ভাষা-দর্শনের অবাধ অগাধ পরিসরে। আমরা বুঝে নিই, অবচেতন হল চিহ্নায়কপুঞ্জের নিরন্তর সঞ্চরণ ও সক্রিয়তার নামান্তর। চিহ্নায়িতপুঞ্জ যে প্রায়ই আমাদের পক্ষে অনধিগম্য হয়ে যায়, এর কারণ এরা অবদমিত। এইজন্যে অবচেতনকে লাকাঁ বলেন, 'sliding of the signified beneath the signifier'। এই পরিসরে তাৎপর্য অনবরত নিষ্প্রভ ও বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে বলে কোনো ভাষ্যকেই নিশ্চিত ভাবে চূড়ান্ত বলা চলে না। পাঠকৃতির মধ্যে অনবরত তৈরি হতে থাকে তেমন কিছু অন্ধবিন্দু যার পেছনে কখনো থাকে ব্যক্-ব্যবহারের আকস্মিক স্খলন, কখনো বা অভ্যাসের বাইরে যাওয়ার দুর্মর ইচ্ছা আর কখনো ভাষার পিচ্ছিল ও দ্ব্যর্থ-বোধক বিন্যাস। এইজন্যে সচেতন ভাবেও যখন ভাষা ব্যবহার করি, কিছুটা জ্ঞাতসারে কিছুটা অজ্ঞাতসারে আমরা তেমন কিছু লিখি বা বলি যা অভিপ্রেত ছিল না। আবার ঠিক যেভাবে বলতে বা লিখতে চেয়েছি, লেখা বা বলা সেই অভিপ্রেত পথ থেকে অকারণেই বেঁকে গেছে অন্যদিকে। তাই বাচনের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থেকেই যায় ব্যর্থতার বোধ, অপূর্ণতার অস্বস্তি। এই প্রসঙ্গে অসাধারণ একটি মন্তব্য করেছেন ঈগলটন 'আমরা যা বলি ঠিক তা খনো ভাবি না, অন্তত সেই অর্থে কভাবি না; যা মনে মনে ভাবি, ঠিক সেরকম কখনো বলতে পারি না।' অতএব 'Meaning is always in some sense an approximation, a near miss, a part failure, mixing non-sense, and non-communication into sense and dialogue. We can certainly never articulate the truth in some pure, unmediated way.' (তদেব ১৬৯)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আট

ফ্রয়েডীয় মতবাদকে ভাষার নিরিখে পুনঃপাঠ করতে গিয়ে লাকাঁ একে প্রধানত সামাজিক ক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে অবচেতনের সঙ্গে মানব সমাজের সুড়ঙ্গ-লালিত সম্বন্ধ খুঁজে নিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। সমাজের ভেতরে অর্থাৎ সামাজিক মনস্তত্ত্বে ভাবাদর্শ কীভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে, এই প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় লুই আলত্যুসেরের 'Ideology and Ideological State Apparatuses' নামক বিখ্যাত নিবন্ধটি খুব কাজে লাগে আমাদের। অনেকেই এর মধ্যে লাকাঁর 'প্রতিচ্ছবি প্রবণতা' বিষয়ক তত্ত্ববীজের প্রভাব লক্ষ করেছেন। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না-করে আমরা বরং লাকাঁর চিন্তাপ্রণালী থেকে এই নিষ্কর্ষ ছেঁকে নিতে পারি যে, অবচেতন আমাদের অন্তঃশায়ী তীক্ষ্ণ শায়কতুল্য বা বিক্ষুব্ধ বা একান্ত ব্যক্তিগত পরিসর মাত্র নয়; তা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের চলমান প্রতিক্রিয়া। তাই আমাদের অন্দরমহলের বিষয় না হয়ে অবচেতন হয়ে উঠছে বহির্বৃত। কিংবা সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে অবচেতন আমাদের মধ্যে থাকে অন্তর্বর্তী পরিসরের মতো। যেহেতু আমাদের মনের অতলান্ত গভীরতায় তা নিমজ্জিত থাকে, শুধু এইজন্যে তা নাগালের বাইরে থাকে না। তা আওতার বাইরে থেকে যায়, কারণ অজস্র প্রতিবন্ধক কন্টকিত বিপুল অন্তর্বয়নের পরিসর নিয়ে তা আমাদের পুরোপুরি ঘিরে থাকে এবং আমাদের মধ্যে নানা ধরনের টানাপোড়েন তৈরি করে। একে তাই কখনো আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না।

এই অবচেতন হল যুগপৎ আমাদের অস্তিত্ব-সংগঠনের নির্মাণ-উপকরণ এবং আমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার মতো ক্ষমতার অধিকারী। একে লাকাঁ ভাষার বহুমাত্রিক পরিসরে বাঁধতে চেয়েছেন। প্রতীকী শৃঙ্খলাবিন্যাসে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করি। তবু এই ভাষা কখনো পুরোপুরি আমাদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ভাষা আমাদের অন্তর্বৃত ভাবে বিভাজিত করে; তাই একে কেবল প্রায়োগিক আয়ুধ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ভাষা সর্বদা আমাদের আগেই জন্ম নেয়; আমাদের সত্তার উদ্ভব হওয়ার আগেই তা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট বাচনিক অবস্থান তৈরি করে রাখে। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, লাকাঁ নিজে তাঁর তত্ত্বের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে খুব বেশি ভাবিত ছিলেন না; অন্তত সমাজ ও অবচেতনের সম্পর্কগত সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ববিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাহিত্যতত্ত্বকে অনেক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে, কথাসাহিত্যকেও বিচিত্র পথগামী হতে প্রেরণা দিয়েছে—এই সবই ঠিক। কিন্তু মনোবিকলনবাদী সাহিত্যসমালোচনায় লাকাঁ পুনঃপাঠের বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়েও এর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে চাননি।

ভাষা, অবচেতন, প্রতিচ্ছবি নির্মাণের প্রবণতা, প্রতীকী বিধিবিন্যাস, নিয়ামক ব্যক্তি বা সংস্থা এইসব পারিভাষিক দ্যোতনা সম্পন্ন শব্দাবলী ঘুরে ফিরে আসে লাকাঁর প্রতিবেদনে। এরা একে অপরের পরিপূরক এবং অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। পরবর্তী কালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই চিন্তাপ্রণালীর বিপুল প্রভাব পড়ে উপন্যাস রচনায় এবং উপন্যাসের নিবিড় পাঠে। চেতনাপ্রবাহ রীতির কথা আমাদের সবার মনে পড়বে। বিশেষভাবে মনে পড়বে, ডি. এইচ. লরেন্স কিংবা জেমস জয়েসের মতো ঔপন্যাসিকের কথা। একজন কাহিনিনির্ভর বয়ানে এবং অন্যজন কাহিনিনিরপেক্ষ বয়ানে নতুন চিন্তা-প্রস্থানের নির্যাস সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া পাঠতাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'The dynamics of literary response' (১৯৬৮) ও 'Five readers reading' (১৯৭৫) বইয়ের লেখক নর্মান হল্যান্ড, 'Fiction and the unconscious' (১৯৫৭) বইয়ের লেখক সাইমন লেসার কিংবা 'Psychoanalysis and the question of the text' (১৯৭৮) ও 'Literature and psychoanalysis' (১৯৮২) নামক দুটি প্রবন্ধসংগ্রহের সম্পাদক যথাক্রমে জিওফ্রে হার্টম্যান ও সুশানা ফ্যালম্যান-এর কথা।

উপন্যাস আলোচনা শুধুমাত্র মনোবিকলনবাদের প্রভাবেই ক্রমাগত গুহাচারী হয়ে উঠেছে। এইসব প্রতিবেদনে দেখি, ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা যতই সত্তার সংগঠন এবং তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে ধারণ করতে চাই, ততই তা আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। লাকাঁই আমাদের শিখিয়েছেন 'Language always preexists us'। উপন্যাস একদিক দিয়ে সঞ্চরমান আকাঙ্ক্ষার বয়ান। আমরা তা-ই আকাঙ্ক্ষা করি, অপর পরিসরে যা অবচেতনভাবে আমাদের জন্যে আকাঙ্ক্ষিত হয়। উপন্যাসের প্রতিবেদনে যে-সমস্ত পাঠতন্ত্র নিবিড় বয়ানের সঞ্চালক, তা ঐ আকাঙ্ক্ষার চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের লুকোচুরির ফসল। অপর পরিসর আমাদের জন্যে যা কিছু সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাচন-যৌনতা-সামাজিকতায় স্পৃষ্ট সম্পর্ক—তাদের জালে যত জড়িয়ে যেতে থাকি, আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হতে থাকে। আমাদের পরিচিত পাঠকৃতিতে এর সমর্থন পাই।

কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো উপন্যাসের মনোবিকলনবাদী পাঠ কখনো সামাজিক ভাষ্যের বিকল্প হতে পারে না। এতক্ষণ ধরে আমরা লক্ষ করছি যে, অবচেতন প্রক্রিয়া সামাজিক সম্পর্ক-বিন্যাসেরই সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক প্রতিফলন। এইজন্যে অন্তর্বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে কিংবা আখ্যানগত দৃষ্টিকোণ ও চিত্রিত চরিত্রের মধ্যে জলবিভাজন রেখা কল্পনা করা অসম্ভব। এখানে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, মনোবিকলনবাদী সাহিত্য-সমালোচনায় সাধারণত চারটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় পাঠকৃতির লেখক, বিষয়বস্তু, প্রাকরণিক নির্মিতি ও পাঠক। কোন উপাদানের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তারই নিরিখে নির্ধারিত হয় বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে সত্তা, প্রকল্পনা, আদিকল্প প্রভৃতির প্রয়োগও পরীক্ষিত হয়। আলোচিত হয় বয়ানের প্রতীয়মান আকরণ ও গভীর আকরণের প্রসঙ্গও। লেখা বাহুল্য, সেইসঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় আকরণোত্তরবাদী কিংবা বিনির্মাণবাদী চেতনার বিচ্ছুরণ। এভাবে মনোবিকলনবাদী সাহিত্য-সমালোচনাও হয়ে উঠেছে অনেকান্তিকতার আশ্রয়স্থল, চিন্তার নতুন নতুন অভিযাত্রার স্নায়ুকেন্দ্র।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়

এই প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারীচেতনাবাদী দার্শনিক জুলিয়া ক্রিস্তেভার বয়ান যেখানে মনোবিকলনবাদী তত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চমৎকার সংশ্লেষণ ঘটেছে। লাকাঁর প্রভাব ক্রিস্তেভা অনেকখানি আত্তীকৃত করে নিয়েছেন যদিও নারীচেতনাবাদীর পক্ষে তা সমস্যার সূত্রপাত করতে পারে। কেননা লাকাঁ-প্রস্তাবিত প্রতীকী বিন্যাস পিতৃতান্ত্রিক যৌনভাবনা ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলা বিষয়ক ভাবনার রঙে রঞ্জিত। লিঙ্গকেন্দ্রিক চিহ্নায়কের আধিপত্যও তাঁর ভাবনায় উপস্থিত। অথচ নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিকেরা এসব প্রাতিষ্ঠানিক অচলায়তনের বিরুদ্ধেই প্রতিসন্দর্ভ পেশ করে চলেছেন। ক্রিস্তেভা তাঁর কাব্যভাষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে (১৯৭৪) প্রতীকী শৃঙ্খলা বিষয়ক বক্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, যদিও প্রতিচ্ছবি-প্রবণতা সংক্রান্ত লাকাঁর ধারণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেননি। তিনি বলেছেন চিহ্নতাত্ত্বিক আকল্পের কথা, ভাষার গভীরে যার সঞ্চরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব— প্রাক্-ঈডিপাসীয় স্তরের অবশেষ এর মধ্যেই পাওয়া যায়। সমস্যা দেখা দেয়, যখন ঐ চিহ্নতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অবদমনের শিকার হয়। তবে ক্রিস্তেভার মতে এই অবদমন কখনো সম্পূর্ণ সফল হয় না, যদিও ভাষার মধ্যে তার পেষণ অনুভব করা যায় স্বরন্যাসে, ছন্দলয়ের বিপর্যাসে, দ্বন্দ্ব-অর্থহীনতা-অন্তর্ঘাত-নৈঃশব্দ্য-অনুপস্থিতির অভিব্যক্তিতে। এই চিহ্নতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হল ভাষার অন্তর্বর্তী অপর পরিসর যার উৎস ঐ প্রাক্-ঈডিপাসীয় স্তর। ক্রিস্তেভা এই প্রক্রিয়াকে নারীত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বলে মনে করেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ভাষা পুরোপুরি নারী-পরিসরের জন্যে নির্দিষ্ট।

ক্রিস্তেভা শুধুমাত্র চিহ্নতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে সেই প্রতীকী শৃঙ্খলাবিন্যাসের বিপ্রতীপে দাঁড় করাতে চেয়েছেন যার সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক বিধির সম্পর্ক লাকাঁ দেখিয়েছেন। তাছাড়া প্রাক্-ঈডিপাসীয় পর্যায়ে উদ্ভুত চিহ্নতাত্ত্বিক প্রবণতায় লিঙ্গ-বৈষম্য থাকে না। নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, সাধারণ ভাষায় অন্তর্নিহিত পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী অভ্যাসে ছেদ ঘটানোর জন্যে নতুন ধরনের চিহ্নতত্ত্ব প্রণোদিত বাক্‌প্রকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিখ্যাত তাত্ত্বিক হেলেন সিক্সোর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তবে এখানে এইটুকু বলা যাক, চিহ্নায়নের প্রবাহ পাঠকৃতিতে এমন অবচেতন শক্তি সঞ্চার করে যাতে যথাপ্রাপ্ত সামাজিক অর্থবোধের আকরণ বিদীর্ণ হয়ে যায়। ঈগলটনের ভাষায়— 'The semiotic is fluid and plural, a kind of pleasurable creative excess over precise meaning and it takes sadistic delight in destroying or negating such signs. It is opposed to all fixed, transcendental signification.' (তদেব ১৮৮)। এই মন্তব্যের সূত্রে আরো বলা যায়, যেহেতু আধুনিক পুরুষ-কেন্দ্রিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ভাবাদর্শ প্রাগুক্ত রুদ্ধ ও নির্দিষ্ট চিহ্নায়ন প্রকরণের ওপর ঈশ্বর-ধর্ম-রাষ্ট্র-পিতা-সম্পত্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতি প্রতাপকেন্দ্র নির্মাণের জন্যে পুরোপুরি নির্ভরশীল—এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রতিরোধ দ্যোতক বিকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যা বিকল্প সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়, পাঠকৃতি সংশ্লিষ্ট বৈপ্লবিক রাজনীতিকেই তা স্পষ্ট করে। অর্থাৎ নারীচেতনাবাদী চিহ্নতত্ত্ব মুক্তির বার্তাবহ, বাচনিক পরিসরে বিপ্লবের স্মারক।

এ বিষয়ে অবশ্য পাল্টা যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু এই বিতর্কে যোগ না দিয়েও বলা যায়, অবচেতন আর মনোবিকলন ভাষা ও সাহিত্যের সমস্ত যথাপ্রাপ্ত বর্গায়তনকে নতুন চোখে দেখতে প্রাণিত করেছে। বহির্বৃত ও অন্তর্বৃত উপকরণের রূপান্তর-প্রবণ তাৎপর্য, আনুপাতিক গুরুত্ব, অন্বিষ্ট ও উপস্থাপনা নিয়ে বিশ্লেষণও এক বিন্দুতে স্থির থাকছে না। তত্ত্বেরও প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাব যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তাতে স্থিতাবস্থাপন্থী রাজনীতির সমস্ত কলুষ দেখা দিতে থাকে। মনোবিকলনবাদী চিন্তাপ্রস্থান থেকে উদ্ভুত নবায়মান চিহ্নতত্ত্ব তখন সমস্ত সুস্থির অর্থবোধ ও ভাব-প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ঘাত করে। ক্রিস্তেভার এই বক্তব্য সম্পর্কে যদিও ঈগলটন আপত্তি জানিয়েছেন, আমরা বলব, আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে হলে বৌদ্ধিক নৈরাজ্যপন্থা (anarchism) এর প্রয়োজন সরাসরি অস্বীকার করা চলে না। লেখার সুনির্দিষ্ট নারীচেতনাবাদী প্রকরণে পৌঁছাতে গেলে অচলায়তনের স্থিতিকে ভাঙতে হবে আগে। তার মানে, অবচেতনেও চাই আকরণোত্তর বিন্যাস। আমাদের চিরাভ্যস্ত বাচনে, প্রতিবেদনের কৃৎকৌশলে, চিহ্নায়ন পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট সীমান্ত রয়েছে; সেইসব সীমান্তের বাধা পেরোতে চাই যদি, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধক সরাতে হবে আগে। নইলে বিকল্প নারীচেতনাবাদী বয়ান নির্মাণ করা যাবে না; আর, এইজন্যে রণকৌশল হিসেবে (রণনীতি নয়) সাময়িকভাবে নৈরাজ্যপন্থার আশ্রয় নিতে হয়। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসের শেকড় দৃঢ়প্রোথিত, বড়ো ধরনের আঘাত ছাড়া তা উপড়ে ফেলা যায় না। ঈগলটন খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে যদিও লিখেছেন, মালার্মে পড়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করা যাবে না—এর যৌক্তিক ভিত্তি খুব দুর্বল। ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারে রাজনৈতিক নিষ্কর্ষ যখন সন্ধান করি, তা সন্ধানকারীর ভাবাদর্শগত অবস্থানে আলোকপাত করে। সমাজবদলের লড়াইতেও তার একটা তাৎপর্য আছে; তবে পরিবর্তনের আসল লড়াই অন্যত্র হয়ে থাকে, তার কৃৎকৌশল ও নিয়ম আলাদা। এই দুটিকে ঈগলটনের মতো তাত্ত্বিক একাকার না করলেও পারতেন।

এভাবে ফ্রয়েডীয় চিন্তাপ্রণালীর মূল স্রোতধারা থেকে উৎসারিত শাখাস্রোতগুলি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলমান ইতিহাসকে নিয়ত পুষ্ট করে চলেছে। জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আমাদের চিন্তাবিশ্ব ও কথনবিশ্ব পুনর্নবায়িত হচ্ছে, চেতনা ও অবচেতনার সীমান্ত পুনর্নির্ধারিত হচ্ছে। ফ্রয়েড যে 'Prospect of lasting existence' দেখতে না পেয়ে সভ্যতার অবদমন প্রবৃত্তির প্রতি মনোবিকলনের কুঠার প্রয়োগ করেছিলেন, সেই অন্বিষ্ট অস্তিত্বের প্রত্যাশায় দিক থেকে দিগন্তরে যাত্রা করেছে সাহিত্যতত্ত্ব।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ

ইতিহাস আর ইতিহাসের পাঠ এক কথা নয়। তবু কখনো কখনো দুইয়ের মধ্যে ভেদরেখা মুছে যায়। বাস্তব আর বাস্তবের নির্মিতি একাকার হয়ে গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। মানুষের যাবতীয় সাংস্কৃতিক উপার্জনকে যথার্থ তাৎপর্যে বুঝে নিতে চাই যদি, পর্যবেক্ষকের উপযোগী নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব ও দৃষ্টিকোণ আবশ্যিক। ইতিহাসের অস্তিত্ববাদী ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এই পর্যবেক্ষণের চরিত্র নির্ণয় করে। অতীতকে বর্তমানের দর্পণে প্রতিফলিত করার প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নয়; কারণ, কোন্ চোখে দেখব—তা যতক্ষণ ঠিক না হচ্ছে, 'দেখা'ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। ইতিহাসের পাঠ যখন ক্রমশ তাত্ত্বিক বয়ানের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হল, সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে বাস্তব ও কল্পনার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক স্বীকৃত হল। ধীরে-ধীরে নতুন তত্ত্ব-প্রস্থানের আদল স্পষ্ট হওয়াতে তাকে দেওয়া হল ঐতিহাসিকতাবাদের অভিধা। কল্পনার উদ্ভাসনী আলোয় বাস্তব কীভাবে পুনর্নির্মিত হয়ে ইতিহাসের গভীরতর অবয়বকে স্পষ্ট করে তোলে—এই তত্ত্বপ্রস্থান সেদিকে তর্জনি সংকেত করে। এর মূল বার্তা এই যে, ইতিহাস কেবল অতীতের ধূসরতা নয়; সাম্প্রতিকের আলোকসম্পাতে বিগত দিনের নবীন পুনর্নির্মাণ। এই কথকতায় হারিয়ে-যাওয়া মুহূর্তগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে অতীতকে পুনর্গঠন করে। ইতিহাসের এই পাঠকৃতিতে অতীতের অন্তর্বর্তী বর্তমান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু কী তাই? সাম্প্রতিক চিন্তাবিদদের মতে ইতিহাস কেবল মৃত মুহূর্ত-পরম্পরার পুনরুজ্জীবন নয়; যা আসন্ন ভবিষ্যতে ঘটবে, সেদিকে দ্রষ্টা চক্ষুকে সঞ্চালিত করাও তার দায় অর্থাৎ সম্ভাবনার পরিসরকে আলোকিত করা, কিংবা বলা ভালো, নির্মাণ করাও ঐতিহাসিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে সরাসরি বোঝা যায় না, বুঝতে হয় প্রতিবেদনের গ্রন্থনায়। আর, প্রতিবেদন নির্ধারিত হয় সামাজিক পরিবেশের চরিত্র দিয়ে। প্রেক্ষিত-নিরপেক্ষ সত্য নেই কোথাও। সুতরাং ইতিহাসের সত্যকে খুঁজব প্রতিবেদনের দর্পণে, বহুবিচিত্র অনুপুঙ্খের আততিতে। যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে পারত, যা কিছু অস্তিত্বের অনুষঙ্গ এবং যা সম্ভাবনার—সেইসব কিছুর নিরন্তর দ্বিরালাপে গড়ে ওঠে প্রতিবেদন। সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁরা যতক্ষণ দৃষ্টিকোণ ও বয়নের এবং বিশেষত, প্রতাপ ও ভাবাদর্শের, নিগূঢ় আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করতে না পারছেন—অন্তত ততক্ষণ তাঁদের উদ্যম লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। সেইসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাস রচনায় শুধু কৃৎকৌশল যথেষ্ট নয়; পাঠকৃতির নিপুণ বয়ন দিয়েও ইতিহাসবোধের ঘাটতিকে ঢেকে রাখা যায় না। তাছাড়া প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ইতিহাসে নৈর্ব্যক্তিক দ্রষ্টার ভূমিকা সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ হলেও আসলে আত্মগত দৃষ্টির অন্তর্বয়ন বিশেষ জরুরি। ইতিহাসের কথন-বিশ্বে প্রতাপের সঞ্চরমান ছায়া যেমন অনুভব করি, তেমনি বিনির্মাণের তাগিদও খুঁজে পাই। সাহিত্যের ইতিহাস জুড়ে দীর্ঘদিন প্রবল ছিল রৈখিকতা আর একবাচনিক সন্ধান। ফলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখার প্রবণতা তখন দেখা যায়নি। এই প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয় উনিশ শতকে। সেসময় একদিকে উত্তুঙ্গ ব্যক্তিপ্রতিভার কৃতিত্ব হিসেবে দেখানো হচ্ছিল কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন আলোকস্তম্ভকে। যেন ইতিহাস কেবল বিরল অভিব্যক্তির সমাবেশ, যার সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষিতের সম্পর্ক নেই কোনো। অর্থাৎ সত্য কেবল অসামান্য মনীষার দখলে, সাধারণ জীবনের প্রাসঙ্গিকতা তাতে নেই। অন্যদিকে বিকশিত হচ্ছিল ঐতিহাসিকতাবাদের বয়ান যা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটে সাহিত্যের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে চাইছিল। কিন্তু হেগেলীয় ভাববাদের ফসল বলে এই বয়ানের মধ্যে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। এছাড়া হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রকৃতিবাদী দর্শনের প্রভাবও এর মধ্যে দেখা যায়। ঐতিহাসিকতাবাদী সন্দর্ভে কোনো জাতির সাহিত্যিক ইতিহাসকে বিবর্তনশীল অধ্যাত্মবাদী নির্যাসের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস সব কিছুর সারাৎসার প্রকাশিত হয় সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার ঐতিহাসিক প্রতিবেদনে—এটা হল এই মতবাদের মর্মকথা।

শিল্পকলা, বিজ্ঞান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া—সব কিছুতে প্রতাপ অর্জিত ও ব্যক্ত হয় প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে। পরিপূর্ণ সত্য প্রতিবেদন বলে কিছু হয় না, একটি অন্যের চেয়ে বেশি বা কম শক্তিশালী হয় মাত্র। এই শক্তির মূল উৎস নিহিত রয়েছে সমাজের গভীরে। যখন প্রতিবেদন সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে, তাতে প্রচ্ছন্ন থাকে বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের দ্বিবাচনিকতা। অর্থাৎ প্রতাপ অর্জিত হয় না কেবল, প্রতিস্পর্ধাও উচ্চারিত হয়ে থাকে। এইজন্যে সাহিত্যিক ইতিহাসের সন্দর্ভকে বর্ণনা করা হয়েছে 'a violence that we do to things' হিসেবে। ঐতিহাসিকতাবাদ আরো যে-বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা হল, কোনো বিশেষ পর্বের সাহিত্যে যুগের আত্মিক প্রবণতা ব্যক্ত হয়। এতে অবধারিতভাবে ইতিহাসের মানবিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ পার্থিব ও দৈব সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পূর্বনির্দিষ্ট বিধিবিন্যাসে পরম্পরাগত প্রত্যয় বাস্তবকে ঝাপসা করে দেয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত এম. ডব্লিউ. টিলিয়ার্ডের 'দি এলিজাবেথান ওয়ার্ল্ড পিকচার' বইটির কথা বলা যেতে পারে। এতে শেক্সপীয়রের যুগের সাংস্কৃতিক বিশ্ববীক্ষাকে ঐতিহাসিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে টিলিয়ার্ড কার্যত ঐ কালকে বিবিধ উৎসজাত তাৎপর্যের একীভূত বিন্যাসের আধার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর প্রতিবেদন একবাচনিক; এতে পূর্বধার্য নিয়মের বাইরে সম্ভাব্য প্রতিবাদী উচ্চারণের দ্বিবাচনিক অবস্থান স্বীকৃত হয়নি; যেমন ক্রিস্টোফার মার্লোর মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকারের রচনার মধ্যেও তিনি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববীক্ষার বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর প্রত্যাহ্বান লক্ষ করেননি। সুতরাং টিলিয়ার্ড যে হেগেলীয় ভাববাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিকতাবাদ যদিও বস্তুবাদী প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা নিজেই নিজেকে পরাস্ত করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারাকে যদি বিশ্লেষণ করি, দেখব, এর সাধারণ প্রবণতা বাস্তবের বিমূর্তায়নের দিকে। প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য একমাত্র মান্যতাপ্রাপ্ত ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। চর্যাপদকে যদিবা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করি, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নিম্নবর্গীয় চেতনার অভিব্যক্তিকে মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকার রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে এবং সন্ধাভাষার ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রান্তিকায়িত জীবনের প্রতিবেদনকে আড়াল করা হয়েছে। এছাড়া সাহিত্যকে যুগের আত্মিক প্রেরণার প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরায় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতকে গৌণ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া আগাগোড়া আমরা লক্ষ করি। আদি মধ্যযুগের পাঠকৃতি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারি, আধিপত্যবাদী বর্গের দৃষ্টিকোণ যে-পরিমাণে বড় হয়ে উঠেছে ঠিক সেই পরিমাণে তলিয়ে গেছে অন্তেবাসীদের লোকায়ত জীবনবোধ। একই কথা প্রযোজ্য মধ্যযুগের সব ক'টি প্রধান ধারা ও পাঠকৃতি সম্পর্কে। সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের কাছে রাজন্য ও অভিজাতবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি বারবার নিয়ামক হয়ে উঠেছে। রাজসভার সাহিত্য মধ্যযুগের অন্যতম ধারা; কিন্তু এর প্রতি ঐতিহাসিকদের যে-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি—কার্যত সেই একই দৃষ্টিকোণ মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল বা মৈমনসিংহ গীতিকার প্রতিও ব্যবহৃত হয়েছে। ইদানীং বিচ্ছিন্ন কিছু প্রয়াসের সূচনা হয়েছে যদিও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া এখনও অপেক্ষিত। তবে আধুনিক পর্বের ঐতিহাসিক বিবরণে প্রতাপ ও ভাবাদর্শের দ্বিবাচনিকতা নানা কৌণিকতা নিয়ে উপস্থিত। ঔপনিবেশিক সন্দর্ভে আধিপত্যবাদ প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণকে এত সর্বগ্রাসী করে তুলেছে যে বিপ্রতীপ কথকতা বিবেচিত হয়েছে নান্দনিক অপূর্ণতা ও বিচ্যুতি হিসেবে। কেননা যেখানে যত বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের সম্ভাবনা আছে, একবাচনিক ইতিহাসে তা উপেক্ষিত না হয়ে পারে না। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। বিশ শতকের সাহিত্যে ঔপনিবেশিক আকল্পকে যাঁরাই অস্বীকার করেছেন, কোনো-না-কোনো কারণ দেখিয়ে তাঁদের আলোকিত বলয়ের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কেউ সম্পূর্ণত কেউবা আংশিক অস্বীকৃত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক পর্বে এদের সবাইকে হয়তো প্রতিস্রোতপন্থী বলা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক যে পার্থক্য ও সমান্তরালতার বিধিবিন্যাস এদের উপস্থিতির জন্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। জগদীশ গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, বিনয় মজুমদার, শহীদুল জাহির, সুবিমল মিশ্র, রণজিৎ দাশ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, রবিশংকর বল, সৈকত রক্ষিত, নির্মল হালদার, অমিতাভ গুপ্ত, কাজল শাহনেওয়াজ, সেলিম মোরশেদ, মুর্শিদ এ. এম., স্বপন সেন এবং এরকম আরো কয়েকটি নাম এই দ্বিবাচনিকতার আধার ও আধেয়। সাহিত্যের ইতিহাসে যতক্ষণ এঁদের উপস্থিতির তাৎপর্য বিশ্লেষিত না হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তি-শৃঙ্খলার বাইরে বিকল্প পরিসরের সূত্রধার হিসেবে এঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি দেওয়া না হচ্ছে— অন্তত ততক্ষণ, ঐ ইতিহাস যে অপূর্ণ থাকবে, তাতে সংশয় নেই কোনো।

দুই

টিলিয়ার্ডের পথ অনুসরণ করে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী বিশ্লেষণের সূত্রধারেরা কোনো যুগের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আবহের আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে এদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। বৌদ্ধিক বিচার ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে আকরণোত্তরবাদী ভাববিপ্লব সত্তরের দশকে যে-অভূতপূর্ব আলোড়ন তৈরি করেছিল, তাতে প্রাচীনতর ঐতিহাসিকতাবাদের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেল। প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের পাঠ ক্রমশ নতুন আকরণ ও পূর্বানুমান রপ্ত করতে লাগল। ধীরে ধীরে যেসব নতুন প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তাদের মধ্যে প্রথম হিসেবে উল্লেখ করতে পারি ইতিহাসের তাৎপর্য ব্যাখ্যার পরিবর্তনকে। 'ইতিহাস' কথাটির অর্থ মোটামুটি দু'রকম। একটি হল, অতীতের ঘটনাপরম্পরা এবং দ্বিতীয়টি, অতীতের ঘটনা-ভিত্তিক আখ্যানের গ্রন্থনা। আকরণোত্তরবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী ইতিহাস সর্বদা 'বর্ণনীয়' বিষয়। সুতরাং প্রথমোক্ত অর্থটি গ্রহণযোগ্য নয়। অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধ নিষ্কর্ষ হিসেবে অতীতকে পাওয়া যায় না কখনো; তাকে পাওয়া যেতে পারে কেবল উপস্থাপিত প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে। আকরণোত্তরবাদী ভাবপ্রস্থান আবির্ভূত হওয়ার পরে ইতিহাস আর বিমূর্তায়িত হতে পারল না; পাঠকৃতির সত্তা অর্জন করে মূর্ত হয়ে উঠল নতুন উচ্চারণ-বিন্যাসে। এছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রবল হয়ে উঠল যে, ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট পর্ব কেন্দ্রায়িত ও একীভূত অস্তিত্ব নয় অর্থাৎ এমন কোনো পর্যায় নেই যখন ইতিহাস কেবল একটিমাত্র খাতে বয়ে চলে। বরং প্রতিটি পর্বে রয়েছে ইতিহাসের একাধিক ধারা, সন্দর্ভ-প্রতিসন্দর্ভের কৌণিকতা এবং অজস্র চড়াই-উৎরাইয়ের উচ্চাবচতা। ইতিহাস মানে বিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া, যার আরম্ভ আছে কিন্তু প্রথাসিদ্ধ অর্থে কোনো সমাপন নেই এবং থাকতেও পারে না। নিজের মধ্যে অনায়াসে সে ধারণ করে বিস্তর স্ববিরোধিতা। এইজন্যে সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো একক ও সুনির্দিষ্ট বিশ্ববীক্ষা খোঁজা অর্থহীন। যেমন বাংলা সাহিত্যে যখন উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের কথা বলি, আমাদের মন জুড়ে থাকে একবাচনিক ও রৈখিক যুগবৈশিষ্ট্য। ইতিহাসকে এভাবে আসলে কল্পকুহেলিতে আচ্ছন্ন করি আমরা; কেননা বাস্তব পুরোপুরি ভিন্ন কথা বলে। ঔপনিবেশিক সমাজের ওপর যখন আধুনিকতার আঙরাখা চেপে বসছিল, সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতার হাজার পিছুটান সমান্তরালভাবে তখন সমস্ত প্রসাধন মুছে দিচ্ছিল। এক কদম এগিয়ে দু'তিন কদম পিছিয়ে যাওয়ার ফলে ঐ সময়কার বিভিন্ন পাঠকৃতি যুগের বহুস্বরিকতার দৃষ্টান্ত। পরবর্তী কালে মনোরঞ্জক কিংবদন্তি তৈরি করার তাগিদে উনিশ শতকের নবজাগরণে সুসমন্বিত কেন্দ্রীভূত প্রেক্ষণবিন্দু কল্পনা করে নিয়েছি আমরা। এতে বাস্তব পরিস্থিতির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাল্পনিক বিশ্লেষণ মাত্র করা হয়েছে; প্রকৃত ইতিহাস চলে গেছে আড়ালে। এটা ঘটেছে আধিপত্যবাদী বর্গের শ্রেণীস্বার্থের প্রণোদনায়।

ইতিহাসের প্রতিবেদন যাঁরা তৈরি করে চলেছেন, অতীতকে তাঁরা কতখানি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে পারছেন—সেটাই মূল প্রশ্ন। নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখার কথা যারা বলেন, তাঁদের ভাবাদর্শগত অবস্থানই হল প্রকৃত নিয়ন্তা। যথাপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক স্থিতিকে অতিক্রম করা দুরূহ নয় শুধু, অসম্ভবও। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি যেভাবে পাঠ করি, তেমন করে অতীতকে পড়তে পারি না। বড়ো তফাত এখানে হয়ে যায় যে, কেবলমাত্র অতীতের প্রতিবেদন নির্মাণ করেই তার তাৎপর্য পাঠ করা সম্ভব। তবে এই পাঠকৃতিকে আতস কাঁচের মতো ব্যবহার করছি কিনা, সেকথা ভেবে দেখতে হয়। বিভিন্ন ধরনের লিখিত সন্দর্ভ থেকে আমরা যে-ভাববস্তু নিজেদের পছন্দ ও বিশ্বাস অনুযায়ী সংগ্রহ করি, তারই ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে ইতিহাসের প্রতিবেদন। স্বভাবত আমাদের নিজস্ব ইতিহাসবোধ যে সীমারেখা নির্দেশ করে দেয়, তার মধ্যে যাবতীয় তৎপরতা বদ্ধ থেকে যায়। অতএব সাহিত্য ও ইতিহাসের ব্যক্ত ও অব্যক্ত সম্পর্ক-বিন্যাসকে পুনর্বিবেচনা করা খুব প্রয়োজন। এও মনে রাখতে হয় যে এমন কোনো সুস্থির, সুনির্দিষ্ট ও অনড় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত নেই যাকে আমরা সাহিত্যের একবাচনিক নির্ণায়ক বলতে পারি। ইতিহাস মানে যেহেতু অজস্র অন্তর্বয়নের সমাবেশ, সাহিত্যের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ জুড়ে থাকে কেবল মানুষের বহুস্বরিক চেতনার জটিল বুনট। অন্যভাবে বলা যায়, বহু উৎসজাত আরো অনেক পাঠকৃতির সমবেত প্রেরণা শুষে নিয়ে এবং খানিকটা গ্রহণ খানিকটা বর্জন আর খানিকটা পরিমার্জন আর খানিকটা সংযোজন করে গড়ে ওঠে সাহিত্যের নিজস্ব সন্দর্ভ। সুতরাং মহান লেখকের কোনো অনন্য ও উদ্ভাসিত অন্তর্জগতের শক্তি পাঠকৃতির নিয়ন্তা এবং সাধারণ মানুষের ইতিহাসে অভিব্যক্ত বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে এর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই—চিরাগত এই ধারণাকে এখন প্রত্যাখ্যান না-করে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। ইদানীং নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ মানুষের চিন্তাপ্রণালীকে পুরোপুরি নতুন করে ঢেলে সাজাতে চাইছে। সাম্প্রতিক ভাবনাপ্রস্থানগুলির কিরণসম্পাতে এই মতবাদ যদিও যৌগিক চরিত্র অর্জন করেছে, বিনির্মাণবাদকে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বলে মনে করে। আশির দশকে আমেরিকায় মানবিক কৃতিতে বিনির্মাণপন্থা যখন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল, সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বিবাচনিক অভিজ্ঞতা থেকে জেগে উঠছিল প্রত্যাহ্বানের সংকেত।

অধিকাংশ আকরণোত্তরবাদী মনে করেন, ইতিহাসের পরিসরে কোনো বিশেষ সত্য আধারিত নয়; অতএব তা আবিষ্কারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তাঁরা বিনির্মাণের প্রায়োগিক দিকের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে 'সত্য' অভিধার আড়ালে যা-কিছু আভাসিত হয়, তা কোনো প্রক্রিয়ার ফসল অর্থাৎ প্রক্রিয়া-নিরপেক্ষ কোনো পরাসত্তার অস্তিত্ব নেই। আর, 'ঐতিহাসিক' সত্যই একমাত্র অর্জনীয় লক্ষ্য নয়। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীদের বক্তব্য হল, মিশেল ফুকোর প্রতিভাদীপ্ত রচনা পুরোপুরি নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে, দিয়েছে অজ্ঞাতপূর্ব পাথেয় ও গন্তব্যের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সন্ধান। ব্রিটেনে ফুকো-প্রদর্শিত পথ সমৃদ্ধতর হয়েছে মার্ক্সবাদ ও নারীচেতনাবাদের প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়ে। বিখ্যাত মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক রেমণ্ড উইলিয়ামস-এর সন্দর্ভ থেকে শব্দবন্ধ ধার করে জোনাথন ডোলিমোর এঁদের সম্পর্কে এই পারিভাষিক অভিধাটি প্রয়োগ করেছেন 'সাংস্কৃতিক বস্তুবাদী'! এরা রেনেসাঁসের সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে প্রচুর বিশ্লেষণী পাঠ তুলে ধরেছেন যা এ ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে দিগদর্শক। এঁদের ওপর মিশেল ফুকো ছাড়াও লুই আলত্যুসেরের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদের ধারা গড়ে উঠেছে মূলত এই মৌল আকল্পের ভিত্তিতে

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহাসিক অবস্থান মানবিক অভিজ্ঞতাকে গঠন করে। বিশেষভাবে ভাবাদর্শ-প্রসূত সন্দর্ভ এই গঠন-প্রক্রিয়ার সূত্রধার। ফুকো এবং আলতুস্যের এই দু'জনেই দেখিয়েছেন, নানা ধরনের সামাজিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে সক্রিয়ভাবে। এতে নিষ্ক্রিয়তা ও নিরপেক্ষতার স্থান নেই কোনো। এছাড়া তাঁরা জানিয়েছেন, কোনো নির্দিষ্ট কালে ও পরিসরে একাধিক ভাবাদর্শ সমাজে সঞ্চরণ করে থাকে; এদের মধ্যে আধিপত্যবাদী বর্গের মদতে পুষ্ট ভাবাদর্শই প্রাধান্য অর্জন করে এবং সামাজিক বিভাজনের নিয়ন্তা হয়। ঐসব ভাবাদর্শ প্রসূত সন্দর্ভের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা কোনো পরিসর থাকতে পারে না। শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী ঐতিহাসিক কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত থাকে সত্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় প্রতাপ কীভাবে ভাবাদর্শগত কৃৎকৌশলের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে আলত্যুসেরের বিশ্লেষণ সর্বজনবিদিত।

ফুকো প্রতাপ ও জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাষ্য তুলে ধরেছেন। প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি যখন সক্রিয়, কিছু কিছু অনন্বয় ও স্ববিরোধিতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুত মানবিক অস্তিত্বের পক্ষে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এই দ্বন্দ্ব সামাজিক সংগঠনেও প্রত্যক্ষভাবে ছায়াপাত করে। এমনভাবে বিভিন্ন প্রতিবেদন গড়ে ওঠে যাতে উন্মত্ততা, অপরাধ প্রবণতা, যৌন অস্বাভাবিকতা এবং এজাতীয় যাবতীয় বিকৃতির ধারণাকে প্রতিস্থাপিত করা হয় পূর্বনির্ধারিত কিছু কিছু 'স্বাভাবিক' আকল্পের বিপ্রতীপে। ফুকোর মতে, এ ধরনের বিপ্রতীপ ধরন শুধু যে জ্ঞানের প্রক্রিয়া ও প্রকল্পকে দারুণভাবে ব্যাহত করে, তা-ই নয়; কোনো বিশেষ যুগের 'স্বাভাবিকতা' ও 'বিষয়ীগত' ভাবকল্পকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব এসব দ্রুত সঞ্চরণশীল যৌক্তিক শৃঙ্খলে কিছুমাত্র সর্বজনীন গ্রাহ্যতা দেখতে না পেয়ে এদের বিনির্মাণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন ফুকো। তিনি দেখিয়েছেন, শোষণের সামাজিক ভিত্তি ও সম্পর্ক সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এইসব প্রক্রিয়া ইতিহাসের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালে উপনিবেশোত্তর চেতনা ও নারীচেতনা যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করছে বর্তমান সম্পর্কে, তাতে আমাদের ইতিহাসের তত্ত্ব ও প্রয়োগে খোলনলচে পালটে যাচ্ছে। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তিত ইতিহাসবোধ স্বভাবত বিনির্মাণের মৌল প্রেরণা। প্রকরণ ও অন্তর্বস্তু, চেতনা ও আকরণ সর্বত্র নতুন দৃষ্টির উদ্ভাসন লক্ষ করা যাচ্ছে। কেউ কেউ একে 'সাংস্কৃতিক নন্দন' বলে বর্ণনা করেছেন, কেননা সংস্কৃতির অণুবিশ্ব ইতিহাসের সঞ্চরমান ছায়ায় রূপান্তরিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হওয়ার ফলে নান্দনিক চিন্তায় দেখা যায় তার প্রবল অভিঘাত। ইংরেজি সাহিত্যে রেনেসাঁসের বিশ্লেষণ যেভাবে স্টিফেন গ্রীনব্লাটের রচনায় ফুটে উঠেছে, তাতে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদের চমৎকার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। ফুকোর বিচারপদ্ধতি তাঁর লেখায় প্রকট। পাশাপাশি জেরোম ম্যাকগান রোমান্টিক যুগের বিশ্লেষণে মূলত তাৎপর্যতত্ত্বের ওপর বেশি নির্ভর করেছেন। রোমান্টিক সাহিত্যের বিশ্লেষণী পাঠে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। তবে রেনেসাঁস যুগের বিশ্লেষণে এর প্রভাব অনেক বেশি। স্টিফেন গ্রীনব্লাট ছাড়া লুই মোনট্রোজ, জোনাথন গোল্ডবার্গ, স্টিফেন ওগেলি, লিওনার্ড টেনেনহাউজ প্রমুখ আলোচকেরা এই ধারাকে বিকশিত করেছেন। এলিজাবেথীয় সাহিত্যিক সন্দর্ভে এঁরা আবিষ্কার করেছেন ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য পরিসর। সমকালীন রাজতন্ত্রের প্রতাপ ও সংশ্লিষ্ট কৃৎকৌশলে তৈরি প্রতিবেদনে বিধিবিন্যাসের প্রতি সমর্থনই ব্যক্ত হয়ে থাকে। প্রাগুক্ত আলোচকেরা এলিজাবেথীয় পাঠকৃতির মধ্যে ইতিহাস নিরূপিত প্রতাপের সন্দর্ভকে পুনর্নবায়িত হতে দেখেছেন। অর্থাৎ রাজতন্ত্রের ছায়ায় এইসব রচনা লালিত ও পুষ্ট হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই সূত্র খুব কার্যকরী। যাই হোক, আমেরিকার নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীদের মধ্যে সবাই কিন্তু ফুকোর প্রয়োগবাদ মেনে নেননি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এলিজাবেথীয় ও জ্যাকবীয় সমাজসংস্থার সাহিত্যিক উপস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্যবোধ অনুভব করেছিলেন। বিশেষভাবে শেক্সপীয়রের নাটক আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা লক্ষ করছিলেন, মূল সামাজিক প্রতীতিতে আধারিত পাঠকৃতিতে নানা ধরনের প্রতিস্বর অন্তর্ঘাত করছে। একদিকে সমাজশৃঙ্খলার নামে প্রতাপকে অটুট রাখার আয়োজন এবং অন্যদিকে প্রান্তিকায়িত উচ্চারণের কেন্দ্রায়িত হওয়ার তাগিদ— দুটোই ঘটছে ইতিহাসের ইঙ্গিতে। এই দুটি প্রবণতার নিরন্তর দ্বিরালাপ উপনিবেশোত্তরবাদ ও নারীচেতনার ক্রমিক উন্মোচনে স্পষ্টতর হচ্ছে কেবলই। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীরা মনে করেন, গভীর অন্তর্বৃত প্রয়োজনের অভিব্যক্তি হিসেবে এইসব নান্দনিক অন্তর্ঘাত বা হস্তক্ষেপকে বিবেচনা করতে হবে। রাজতন্ত্রের অতি-উদ্ভাসিত বলয়ের ছায়ায় অন্তেবাসীদের নিঃশব্দ পরিসরও যে লালিত হচ্ছিল, প্রাগুক্ত আলোচকদের বিশ্লেষণে সেই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলা দ্বারা অধিকৃত প্রতিবেদনের আলোকিত পরিধি আসলে একান্তিক; একে সম্পূর্ণতা দেয় সমান্তরালতা আর সত্তার সঙ্গে দ্বিবাচনিক সম্পর্ক। ফলস্টাফ, ক্যানিবাল, শাইলক ইত্যাদি চরিত্র শেক্সপীয়র- পরিকল্পিত অপরতার নানা বিভঙ্গকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কেননা নিজেদের অস্তিত্বকে আমরা চিনতে পারি শুধু বিপ্রতীপ দর্পণে অর্থাৎ আমরা কী নই, কেবল তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমাদের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রাগুক্ত চরিত্রগুলি শেক্সপীয়রের উদ্ভাসিত জগতের পক্ষে সেই অস্তিত্ব-উন্মোচক অপরতা; এদের হেয়, বিকৃত ও মসীলিপ্ত না-করে তখনকার কেন্দ্রায়িত শক্তি স্বস্তি পায়নি। এই প্রক্রিয়া ছিল ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার ফসল। ফুকোর চিন্তাসূত্র অনুসরণ করে বলতে পারি, প্রতিষ্ঠিত প্রতাপের যথার্থতার প্রমাণ হিসেবে এদের উপস্থিতি অনিবার্য। কেননা সমস্ত তাৎপর্য প্রসঙ্গনির্ভর এবং বিপ্রতীপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেক্ষিত ছাড়া কোনো কিছুই অনুভবগম্য হয় না। এ সম্পর্কে রামান সেলডেন ও পিটার হ্বিডোওসোনের মন্তব্য হল 'The mad, the unruly and the alien are internalised, others which help us to consolidate our identities' (১৯৯৩ ১৬৪)।

নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী বিশ্লেষণে এই সত্য স্পষ্ট হল যে, পাঠকৃতিতে কোনো বিশুদ্ধ অশৃঙ্খলিত আত্মতার মুহূর্ত নেই। 'বিষয়' হিসেবে মানুষ নিঃসন্দেহে স্বাধীন নয়, কেননা, কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বে ও পরিসরে প্রতাপের নানামাত্রিক অভিব্যক্তির ভাবাদর্শগত ফসল হল মানুষ। তাই তার স্বাতন্ত্র্য নিছক আপাত-স্বাতন্ত্র্য! সাংস্কৃতিক অণুবিশ্বে ইদানীং যে-নৈরাশ্য প্রকট হয়ে উঠেছে, তার অন্তর্নিহিত রাজনীতি স্পষ্টত নিয়ন্ত্রণ করছে মানবসত্তাকে। এই বিশ্লেষণ মূলত আমেরিকার তাত্ত্বিকেরা দিচ্ছেন। একটু আগে সাংস্কৃতিক বস্তুবাদী তাত্ত্বিকদের কথা বলেছি। জোনাথন ডোলিমোর, অ্যালান সিনফিল্ড, ক্যাথারিন বেলসি, ফ্রান্সিস বার্কার এবং আরো কয়েকজন রেমন্ড উইলিয়ামস-এর প্রভাব আত্মস্থ করে সংস্কৃতির মধ্যে আধিপত্যবাদী, অবশিষ্ট ও জায়মান—এই তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। ঐতিহাসিকতাবাদের মধ্যে তীক্ষ্ণতর রাজনৈতিক অবয়ব আবিষ্কার করে তাঁরা এর মধ্যে নৈরাশ্যের বদলে দেখতে পেয়েছেন ইতিবাচক মনোভঙ্গি ও প্রতিরোধ-মনস্কতা। গ্রীনব্লাটের প্রয়োগবাদ তাঁরা মানতে চাননি। ব্রিটেনের এই চিন্তাবিদেরা ফুকোর বিশ্লেষণ থেকে একদিকে প্রতাপের সম্ভাব্য শিথিল ও অস্থির আকরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সূত্র পেয়েছেন, অন্যদিকে আধিপত্যপ্রবণ ভাবাদর্শগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধের ইতিহাসও খুঁজে পেয়েছেন। আসলে ইতিহাসকে তাঁরা একবাচনিক বলে ভাবতে চাননি! আলত্যুসের ও বাখতিনের প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়ে টিলিয়ার্ডের একস্বরিক যুগের তত্ত্ব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই রেনেসাঁসকালীন সমাজের জটিল সমগ্রতা বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তাঁরা সন্ধান করেছেন এমন মুক্ত পরিসর যাতে প্রান্তিকায়িত ও অন্তর্ঘাতক উপকরণের গুরুত্ব স্বীকৃত। এই চিন্তাবিদেরা তুলে ধরেছেন ইতিহাসের ভিন্নতর অবয়ব; দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, পীড়ন যেখানে যত তীব্র, প্রতিরোধও সেখানে তত প্রকট। প্রতিটি পীড়নের ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন থাকে তাই অপরাজেয় মানুষের প্রতিরোধেরও ইতিহাস। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, শমীগর্ভে প্রচ্ছন্ন আগুন কেবল রূপকের ভাষা। বহুধাবিভাজিত বলেই মানুষ উৎপীড়িত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে; কেননা মানুষের মৌল মানবিক পরিচয় আচ্ছন্ন করতে করতে পার্থক্যের বোধকে ক্রমাগত তীব্রতর করে যাওয়াই পীড়কদের কার্যকরী রণকৌশল। কিন্তু এই কৌশলকে ভোঁতা করে দিতে আধিপত্যবাদীদের আয়ুধই ব্যবহার করে ইতিহাস। অর্থাৎ পার্থক্য-প্রতীতি অন্তেবাসী-চেতনার প্রধান আধেয় হয়ে ওঠে এবং প্রত্যাহ্বান জানায় সমস্ত কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে। অতএব প্রতিরোধ-আকাঙ্ক্ষা চিহ্নায়ক নয় কেবল, পিঞ্জরীকৃত ইতিহাস থেকে অপরতার দ্যুতি নিয়ে উত্তরণেরও সূচক। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী ঐ পার্থক্যবোধের দর্শনকে, দেরিদার চিন্তাসূত্র অনুযায়ী, কাজে লাগিয়েছেন এবং পরিবর্তনবিমুখ প্রতাপের ঔদ্ধত্যে অর্গল তুলে দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

সাহিত্যিক পাঠকৃতির তাৎপর্য সন্ধানের পথরেখা ধরে এগোতে এগোতে আমরা তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই, কিছু কিছু পূর্বধার্য সর্বজনীন বিধিবিন্যাস অনুযায়ী কোনো পাঠকৃতি কখনো সম্পূর্ণ রুদ্ধ হতে পারে না। বরং তাৎপর্য নিয়ত সঞ্চরমান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বর্ণে রঞ্জিত হয়ে কেবলই যেন সম্ভাবনার অভিমুখী। ক্যাথারিন বেলসি নতুন প্রবণতাকে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অভিধা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসের নতুন নন্দন 'পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং সত্যের আপেক্ষিকতা'কে প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেইসঙ্গে বিকল্প জ্ঞান এবং বিকল্প বিষয়ীগত অবস্থানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ কী ধরনের তাত্ত্বিক কৃৎকৌশল বিকশিত করে চলেছে, তার ইঙ্গিত পাই মিশেল পেশোর 'ভাষা, অর্থপরিবর্তনতত্ত্ব ও ভাবাদর্শ' (১৯৭৫) বিষয়ক বইতে। মার্ক্সবাদের আলত্যুসেরীয় ধারা, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিকলনবাদকে সমন্বিত করে পেশো প্রতিবেদন ও ভাবাদর্শের নতুন তাত্ত্বিক আকরণ গড়ে তুলেছেন। কোনো বিশেষ ভাবাদর্শগত রাষ্ট্রিক প্রকরণে বিন্যস্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ী যে-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একাত্ম হয়ে ওঠে, আলত্যুসের সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পেশো এমনভাবে এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন যাতে ঐ বিষয়ীদের সম্ভাব্য প্রতিরোধ থেকে কেবল প্রত্যাশার দিগন্তই নয়, তাদের প্রকৃত অবস্থানও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ধর্মীয় আদর্শের অভিব্যক্তি বিনির্মাণ করলে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক আস্তিকদের পাশাপাশি নাস্তিক এবং যুক্তিবাদীদের ভূমিকাও নগণ্য নয়। পেশো মূলত তিন ধরনের বিষয়ীর কথা বলেছেন। প্রথমত উত্তম বিষয়ী, যারা সত্তার ভাবমূর্তিকে ইচ্ছেমতো গ্রহণ করতে পারে, সম্পূর্ণ একাত্মীকরণের প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত, প্রতিবেদন দ্বারা উত্থাপিত এবং পরীক্ষিত হয় সত্তা। কেউ যখন বলে, শেষ পর্যন্ত আমি আমার প্রকৃতসত্তাকে জেনেছি—এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্বসম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা সমন্বিত হয়। দ্বিতীয়ত মন্দ বিষয়ী যারা কোনো সন্দর্ভের দ্বারা প্রস্তাবিত পরিচিতি মেনে নিতে অস্বীকার করে; এদের বক্তব্যে ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হতে দেখি সামূহিক প্রত্যাখ্যান। তৃতীয়ত নিরপেক্ষ বিষয়ী যারা নিজেদের অবস্থানকে কোনো কিছুর সঙ্গে মেলাতে পারে না কিন্তু তাতে সর্বদা প্রত্যয়ের জোর থাকে না।

আমেরিকার নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীরা প্রতাপের আকরণে মূলত দেখতে পান কেবল আত্তীকরণ ও বিপ্রতীপকরণের দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াকে। তুলনামূলক ভাবে ব্রিটেনের তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক অবচেতনায় সমৃদ্ধ। তাঁরা বিষয়ীর সম্ভাবনা কর্ষণে বেশি উৎসাহী যা কেবল বিকল্পের প্রস্তাবই দেয় না, নতুন-নতুন পরিসর নির্মাণও করে। এছাড়া আমাদের চোখে পড়ে কোনো-কোনো ব্যাখ্যাতার কাছে মিখায়েল বাখতিনের তত্ত্ববিশ্ব বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ফুকোর ইতিহাস-তত্ত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে আকরণগত রুদ্ধতা দেখা যায়, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ঐসব ঐতিহাসিকতাবাদীরা খুঁজে পেয়েছেন বাখতিনের চিন্তাজগতে। বিশেষত সাংস্কৃতিক উৎপাদনের মুক্ত আকল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুলে ধরার প্রয়োজনে 'কার্নিভাল'-এর ধারণাকে এঁরা কাজে লাগিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, প্রতিটি যুগে উচ্চবর্গীয়দের 'অভিজাত' চিন্তাধারা সামাজিক সত্যের একমাত্র ধারক নয়। নিম্নবর্গীয়দের লোকায়ত সাংস্কৃতিক ভাবনার অন্তর্নিহিত শক্তি, লাবণ্য ও সজীবতা যতক্ষণ সমান্তরাল অপর অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত না হচ্ছে—অন্তত ততক্ষণ সত্যের অবয়ব স্পষ্ট হতে পারে না। বাখতিন দেখিয়েছেন, কার্নিভাল হল বাদীস্বরের সহযোগী সম্বাদীস্বরের মতো অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির বিপ্রতীপে অবস্থিত অপ্রাতিষ্ঠানিক 'দ্বিতীয়' সংস্কৃতি কোনো সরকারি ফরমান মেনে নেয় না। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে, এমনকি আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়েও, সাধারণ মানুষ এই কার্নিভালের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। তাই সাহিত্যিক প্রতিবেদনে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার কৃৎকৌশল অনুধাবন করা আবশ্যিক। আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতাপ-বিচ্ছুরণে সাহিত্যিক সন্দর্ভ বাহ্যত যত অধিকৃতই হোক, ইতিহাসবেত্তাকে অর্জন করতে হচ্ছে 'দ্রষ্টা চক্ষু', যার উদ্ভাসনে লোকায়ত সমাজের কার্নিভাল হয়ে উঠেছে তাৎপর্যের নিয়ামক।

রুদ্ধ সরকারি কাঠামোয় কার্নিভাল শ্লেষ-কটাক্ষ দিয়ে অন্তর্ঘাত করে না শুধু, সমান্তরাল বিকল্প অস্তিত্বের অনুভবকেও শানিত করে তোলে। মাইকেল ব্রিস্টোল লিখেছেন 'By bringing privileged symbols and officially authorised concepts into a crudely familiar relationship with common everyday experience, carnival achieves a transformation downward or 'uncrowning' of dejure relations of dependency, exploration and social discipline' (১৯৮৫)। কেউ কেউ অবশ্য, এই বক্তব্যে ফুকোর চিন্তাধারার বিপ্রতীপ স্রোত লক্ষ করেছেন। এঁদের আপত্তি হল মূলত এই যে, কার্নিভালও আধিপত্যবাদীদের দ্বারা অনুমোদিত এবং এর অন্তর্ঘাতও প্রকৃতপক্ষে সতর্ক পরিকল্পনার চতুর অভিব্যক্তি। অর্থাৎ কার্নিভালের প্রতিসন্দর্ভেও ছদ্মবেশী প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া লুকিয়ে থাকে। ফলে প্রতাপের যে-ঔদ্ধত্যকে শ্লেষ-বিদ্ধ করে ঐ প্রতিসন্দর্ভ, তা বস্তুত তার সর্বগ্রাসী অস্তিত্বকে প্রমাণিত করছে। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ এই স্ববিরোধিতা মেনে নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক বিদ্যাচর্চায়। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে যাকে দুর্বলতার লক্ষণ মনে হচ্ছে, আসলে সেটা তার স্থিতিস্থাপক শক্তির প্রমাণ। বিশেষত আজকের বহুস্বরিক জগতে সময় ও সমাজের আবহ বিচিত্র ধরনের পরস্পর-বিরোধিতায় আকীর্ণ। এরই মধ্যে পথ ও পাথেয় খুঁজে নিচ্ছে বলে আপাত-দুর্বলতাকে নতুন চিন্তাপ্রস্থান রূপান্তরিত করছে শক্তির লাবণ্যে। সুতরাং নানা মত ও দৃষ্টিকোণের বিপুল পরিধি মুক্ত হয়ে পড়ছে সাহিত্য ও ইতিহাসের যুগলবন্দিতে। বদলে যাচ্ছে নির্মিতিপ্রকরণ, বদলে যাচ্ছে পাঠকৃতির স্থাপত্য। ফলে, প্রথানুগত সাহিত্যের ইতিহাসে বিবৃত যথাপ্রাপ্ত রচনাবিধির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। বিশেষত নারীচেতনা, উপনিবেশোত্তর চেতনা ও নিম্নবর্গীয় চেতনা সাহিত্যের ইতিহাস-চর্চাকে পুরোপুরি নতুন ছাঁচে ঢেলে নিচ্ছে! যে-সমস্ত জিজ্ঞাসা কখনো কেউ উত্থাপন করেনি কিংবা কিছু কিছু বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যামাত্র প্রস্তাবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে—সেসব কিছুতে নতুন উদ্ভাসনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব প্রত্যাহ্বানেরও সূচনা করেছে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ।

স্যাকব্যান বার্কোভিচ, মায়রা ইয়েহলেন, ফিলিপ ফিশের, হেনরি লুই গেটস প্রমুখ তাত্ত্বিক আমেরিকার সাহিত্যচর্চায় সমগ্রায়ন প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন। উনিশ ও বিশ শতকের বিবর্তনশীল সমাজে অপর সত্তাদের গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনাবিষ্কৃত ভূমিকার ওপর তাঁরা আলোকপাত করেছেন। এছাড়া জেন টমকিন্স ও ক্যাথি ডেভিডসন আখ্যানমূলক সাহিত্য-মাধ্যম গঠনের ক্ষেত্রে ঐসব লোকায়ত অপরের বহুমুখী নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এইসব আলোচনার সার্থকতা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদও রয়েছে। এই মতপার্থক্য অবশ্য অপর সত্তাদের ভূমিকা আবিষ্কারের উপযোগিতা সম্পর্কে নয়। সুবিধাভোগী অতিপরিচিত পাঠকৃতিকে নতুন প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও যথাপ্রাপ্ত বিধিবিন্যাস যে কার্যত শিথিল হচ্ছে না, এই ব্যর্থতা লক্ষ করে কিছু কিছু আপত্তি তৈরি হচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীদের বক্তব্যে অনেক স্পষ্টতর প্রত্যাহ্বান খুঁজে পেয়েছেন আলোচকেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে রাজনৈতিক অবচেতনা সম্পৃক্ত বিশ্লেষণ সাংস্কৃতিক পাঠের যে-নতুন আকল্পকে নির্মাণ করেছে, তাতে অনালোকিত ও প্রত্যাখ্যাত অপর জাতিগোষ্ঠীগুলির অজ্ঞাতপূর্ব পরিসর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের অনুপস্থিত উপস্থিতি সন্দর্ভের অন্তর্বর্তী বিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় তাৎপর্য যুক্ত করেছে। গত দুই দশকে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী কৃৎকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফুকো, আলত্যুসের এবং বাখতিনের ভাববিশ্ব বিচিত্রভাবে পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। জোনাথন কুলের, ক্রিস্টোফার নোরিস, সিনথিয়া চেজের মতো প্রাবন্ধিকদের সাম্প্রতিক রচনা পড়ে মনে হয়, ইতিহাসের নতুন নন্দনের প্রেরণা আত্মস্থ করার জন্যে বিনির্মাণবাদের আকল্প ও প্রয়োগরীতি পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে। বিশেষত গত পনেরো বছর ধরে চলেছে সংশ্লেষণের, আত্তীকরণের, সম্ভাবনা-কর্ষণের অবিরাম আয়োজন।

ফুকো-আলত্যুসের-বাখতিনের মতো লাকাঁ-গাদামারও এখন বারবার নতুনভাবে আবিষ্কৃত ও পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছেন। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ নতুন ধরনের অন্তর্বয়ন-সম্পৃক্ত ইতিহাসবোধের সূচনা করেছে। এর মূল লক্ষ্য হল যথাপ্রাপ্ত সামাজিক সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করে অতীতের সার্বিক পুনর্নির্মাণ এবং সেই সূত্রে সত্য-আচ্ছাদক যবনিকারও অপসারণ। এভাবে গড়ে উঠেছে নতুন ধাঁচের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া। পারস্পরিক সীমারেখা পেরিয়ে গিয়ে পরস্পর-বিরোধী কণ্ঠস্বরের বিনিময় কীভাবে সম্ভবপর হয়ে উঠছে, নতুন সাহিত্যিক ইতিহাস তর্জনি সংকেত করছে সেদিকে। তাৎপর্যের মুক্তি যেহেতু ইতিহাসের নতুন নন্দনের আধেয় ও লক্ষ্য, আকরণোত্তরবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কেননা আকরণোত্তরবাদ পাঠকৃতি থেকে প্রতাপের স্থূল হস্তাবলেপ মুছে নিয়ে সন্দর্ভে প্রচ্ছন্ন রহস্য আবিষ্কার করতে উদ্‌গ্রীব হয়েও জানে যে অবচেতনা, ভাষাতাত্ত্বিক আকল্প ও ঐতিহাসিক শক্তির উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না কখনো। পাঠকৃতির ওপর দখলদারি যারা কায়েম করতে চায়, আসলে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের রথকে থামিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টাই করে। কারণ, পাঠকৃতি রুদ্ধ হয় না কখনো, তা চিরমুক্ত চিরস্বাধীন চিরসঞ্চরমান। তাই বারবার চিহ্নায়ক যেন চিহ্নায়িতের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে চায়, দেদীপ্যমান আকাঙ্ক্ষা পথে পথে তাৎপর্যের মুকুলগুলি উদাসী হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে যায়, বিবর্তনপ্রবণ অর্থদ্যোতনা প্রতীকিতার আদলকে ভেঙে দেয়, পার্থক্যপ্রতীতি চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে গড়ে তোলে ব্যবধানের পরিসর, প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের আকরণকে তছনছ করে প্রতাপ, আবার প্রতাপের ঔদ্ধত্যকে অস্বীকার করে প্রান্তিকায়িত বর্গের অজেয় চেতনা। এই প্রেক্ষিতে দেখি, আকরণোত্তরবাদী সমাধান দেওয়ার বদলে প্রশ্ন তুলে ধরতে বেশি আগ্রহী, পাঠকৃতির বয়ানে উক্ত ও অনুক্ত, আকল্পিত ও উচ্চারিত সর্বদা যে অনিবার্য দ্বিবাচনিকতার আবহ তৈরি করে—তার মধ্য থেকে পার্থক্যপ্রতীতি ঈপ্সিত মাত্রায় পৌঁছায় না। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী মূলত ঐ প্রতীতিকে বহুমাত্রিক বলে জানেন এবং বিভিন্ন উৎসজাত প্রতিবেদনের দ্বিরালাপ থেকে ইতিহাস ও সাহিত্যের অজ্ঞাতপূর্ব তাৎপর্য নিঙড়ে নিতে চান।

চার

ইতিহাসের মহা-আখ্যানকে পর্যুদস্ত করে বিকল্প সন্দর্ভের যেসব প্রস্তাবনা নানা চিন্তাপ্রস্থান থেকে উঠে আসছে, নব্য ঐতিহাসিকতাবাদের বিশ্ব-আবহ তৈরি করার ক্ষেত্রে এদের অবদান অপরিসীম। এই প্রক্রিয়ায় পরাপাঠ হল কোনো প্রতিবেদন সর্বকালের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে না; একই সঙ্গে তা কার্য এবং কারণ—'It not only wields power but also stimulates opposition' (১৯৯৩ ১৯০)। সুতরাং যদি কোনো সন্দর্ভ মহা-আখ্যানের পদবি অর্জন করে, তাকে বিদীর্ণ না করলে মহাদেবের জটাজালে বদ্ধ গঙ্গার মতো ইতিহাসের ধারাও অভ্যাসক্রান্ত বয়নের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাবে। জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিওতার ও জাঁ বদ্রিলার এক ধরনের বিকল্প তুলে ধরেছেন; গণমাধ্যমের দুর্বার আগ্রাসনের যুগে তাঁদের চিন্তাপ্রণালী থেকে তাত্ত্বিক সংকট মোকাবিলার কিছু কিছু সূত্র আমরা পেতে পারি। তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী হিসেবে ঔপনিবেশিক বৌদ্ধিকতার মহাসন্দর্ভকে পরাস্ত করার কার্যকরী সংকেত আমরা পেয়েছি ফ্রান্ৎস ফ্যাননের 'দি রেচেড অফ দি আর্থ' (১৯৬১) বইতে। উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষিতে প্রতীচ্যের আধিপত্যবাদী চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিপ্রতীপ দর্পণে প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। বিশেষত নিপীড়িতজনের রাজনৈতিক চেতনা যখন তীব্র হয়ে ওঠে, নিজেদের উপেক্ষিত শিকড়ে জলদানের স্পৃহা জেগে ওঠে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রসূত দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী নিজেদের সাহিত্যকৃতিকে তাচ্ছিল্য করা এবং প্রতীচ্যের আকল্পকে প্রশ্নাতীত মান্যতা দেওয়ার প্রবণতাকে তখন পরিহার করার চেষ্টা শুরু হয়। স্বভাবত সাহিত্যের ইতিহাস নতুনভাবে লেখার তাগিদ ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টটল, দেকার্ত, কান্ট, মার্ক্স, নীৎশে, ফ্রয়েড প্রমুখ ব্যক্তিত্ব দীপ্যমান আলোকস্তম্ভের মতো প্রতীচ্যের ভাববিশ্বকে উদ্ভাসিত করলেও সমস্ত চিন্তার আকরণ তাঁদের বলয়েই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। প্রত্নকথা, আদিকল্প, যুক্তিন্যাস—সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুই কেন্দ্রীকরণপ্রবণ মহা-আখ্যানের দুরপনেয় ছায়ায় লালিত। অতএব লিওতার যাকে 'War on totality' এবং 'incredulity towards master narrative' বলেন, এই মনোভঙ্গি থেকে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের কৃৎকৌশলে প্রত্যাঘাত করে অন্তেবাসী বর্গের চেতনা। আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়, এশিয়ায় পিছিয়ে-পড়া সমাজগুলিতে আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়ে প্রতীচ্য-আরোপিত 'মানবিক ঐক্য'-এর ধারণাকে শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণ করছে। এমনকি, মানবতাবোধ এবং ভাবাদর্শের আকল্পকেও ইতিহাসের উল্টো পিঠে দাঁড়িয়ে ফানুস বলে মনে হচ্ছে। এডোয়ার্ড সাঈদের বহুপঠিত বই 'Orientalism' (১৯৭৮) ও প্রতীচ্যের বহুলালিত প্রতাপের সন্দর্ভকে প্রত্যাখ্যান করে সম্ভাব্য বিকল্প দৃষ্টিকোণের প্রস্তাবনা করেছে। প্রমাণিত হচ্ছে যে, সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্য মূলত সাংস্কৃতিক নির্মিতি। রাজনৈতিক অবস্থান, প্রতাপের আকল্প ও কৃৎকৌশল, প্রান্তিকায়িত বর্গের চেতনা—এই সমস্তই আমাদের উপলব্ধির নিয়ামক। প্রাচ্যের মানুষ হিসেবে আমরা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির শিকার; কারণ, প্রতীচ্যের প্রয়োজনে তৈরি দর্পণে নিজেদের যেভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি—তাকেই সত্য বলে মনে করছি! সুতরাং বাস্তবও হয়ে উঠছে কল্পিত বাস্তব। আমরা বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ না করে কল্পিত পরিস্থতির কাল্পনিক বিশ্লেষণ করছি। চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী ইউরো-কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করার জন্যে ইতিহাসের নতুন পাঠে ব্রতী হওয়াটা আবশ্যিক। সাঈদের সন্দর্ভে আন্তোনিয়ো গ্রামশির মার্ক্সবাদ, থিয়োডোর অ্যাডোর্নোর নেতিবাচক দ্বন্দ্ববাদ, ফুকোর প্রতাপ ও জ্ঞানের প্রতিবেদনতত্ত্ব ছায়াপাত করেছে।

সাঈদ বিশ্লেষণাত্মক বিকেন্দ্রায়িত চেতনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমস্ত ধরনের নিপীড়নমূলক চিন্তাপ্রকরণ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি চূর্ণ করার লক্ষ্যে সম্মিলিত উদ্যোগের কথা বলেছেন। স্রোতের উল্টোদিকে গিয়ে যতক্ষণ প্রতিস্রোতকে জীবনবোধের বিকল্প দর্শন হিসেবে মেনে নেওয়া না হচ্ছে, অন্তত ততক্ষণ ইতিহাসের নতুন আদল গড়ে উঠবে না। সাঈদের পরবর্তী বই 'The World, The Text and The Critic' (১৯৮৩) সাহিত্য ও ইতিহাসের দ্বিবাচনিকতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পাঠকৃতির মধ্যে 'স্বাভাবিক' ও 'আদর্শ' জগতের সংঘর্ষ হতে থাকে, অনুপস্থিত উপস্থিতিকে বদলে দিতে চায়। ইতিহাসের বুনটে এই প্রক্রিয়া প্রসারিত হয় বলে জাতিসত্তা, শ্রেণী-অবস্থান, লিঙ্গ-পরিচয়, ঐতিহ্যের অনুপুঙ্খ—সব কিছুই গৃহীত হয় এবং গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুনর্নবায়িত হয়ে থাকে। কৃষ্ণাঙ্গদের সাহিত্যের ইতিহাসে এইজন্যে নতুন আয়তন আবিষ্কার করেছেন হেনরি গেট্‌স্‌। তাঁর তিনটে বই এ ব্যাপারে যথার্থ যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছে : 'Black Literature and literary Theory' (১৯৮৪), 'Figures in Black Words, Signs and the Racial Self' (১৯৮৭) ও 'The signifying Monkey A theory of Afro-American literary Criticism' (১৯৮৮)! বিনির্মাণবাদ প্রভাবিত বিশ্লেষণে ইতিহাসের নতুন নন্দন রচনায় কেন্দ্রীয় আকল্প হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে গাত্রবর্ণভিত্তিক জাতিসত্তার পার্থক্য-প্রতীতি। এখানে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় সূত্রও আমরা পেয়ে যাই। এছাড়া বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ দাবি করে হোমি ভাবা-র 'Nation and Narration' (১৯৯০) বইটি। জাতিসত্তার সঙ্গে আখ্যানতত্ত্বের এবং সেই সূত্রে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার গভীর ও অন্তর্বৃত সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ অনুসরণ করে আমরা নিজেদের অদেখা অবয়বকে দেখতে পাই যেন। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য পর্দাগুলি সরে যায়; উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে 'a continuous process of meaning making' (হক্‌স্ ১৯৯২ ৭)। যেহেতু সমস্ত তাৎপর্য কেবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়, সন্দর্ভে পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করাই ঐতিহাসিকদের বড়ো দায় এখন। ঐতিহাসিকতাবাদী যেভাবে 'ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন' (লেভিনসন)-এর কথা বলেছেন অথবা এমন এক অতীতকে যথাপ্রাপ্ত বলে দেখাতে চাইছেন 'যার মধ্যে পরিতৃপ্তির পাথেয় পাওয়া সম্ভব' (রিয়ান) কিংবা এমন এক নতুন ঐক্যবোধের কথা বলেছেন, যাতে 'যতটা সম্ভব অতীত তাৎপর্য এবং যতটা সম্ভব বর্তমান দ্যোতনা' সমন্বিত হতে পারে (রবার্ট হুইম্যান)—সেভাবে কিন্তু নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী তাত্ত্বিক বলছেন না। নিজস্ব জগৎকে নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁকে অবস্থান গ্রহণ করতে হচ্ছে যুগপৎ ভাবাদর্শের ভেতরে এবং বাইরে, পরাপাঠে এবং অন্তর্বয়নে। অতীতকে বর্তমান কীভাবে গ্রহণ করছে এবং কীভাবেই বা ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের আদল তৈরি করছে—তার ইঙ্গিত রয়েছে ইতিহাস গ্রন্থনার মধ্যে।

তথ্যের খাতিরে লেখা প্রয়োজন, ১৯৮৮ সালে স্টিফেন গ্রীনব্ল্যাট 'নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ' অভিধাটি ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য কয়েক বছর থেকেই 'Representation' নামক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা ও পাঠকৃতি বিশ্লেষণের নতুন প্রয়োগরীতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে মেরিলিন বাটলার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Repossessing the Past the case for an open Literary History' শীর্ষক বক্তৃতায় নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সময় ও পরিসরে প্রলম্বিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলি কীভাবে সক্রিয় থাকে, তা বিশ্লেষণ করার জন্যে বাটলার আহ্বান জানিয়েছেন! প্রাগুক্ত দুজন তাত্ত্বিক দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন সাহিত্যের উৎপাদন ও গ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাহিত্যের তথাকথিত সার্বভৌম অবস্থানের বিভ্রম তৈরি করার প্রয়োজনে পাঠকৃতির সঙ্গে সমাজের সম্ভাব্য সম্পর্কের সূত্র মুছে ফেলা হয়। আর, ঠিক এইখানে হস্তক্ষেপ করে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ। তাই শেষ পর্যন্ত এই মতবাদ হয়ে ওঠে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের সহযোগী। ইতিহাসের মৌল নির্যাস আবিষ্কার করে সম্ভাবনার পরিসর নির্মাণ করার জন্যে এই মতবাদ যে বিভিন্ন চিন্তা-প্রস্থান থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে বহুস্বরিক প্রতিবেদন গড়ে তোলে—ইতিমধ্যে আমরা তা দেখেছি। আজকের জটিল জীবনে তত্ত্বিক অন্তদৃষ্টি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জরুরি আয়ুধ। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের সন্ত্রাসে জীবন যখন প্রতিনিয়ত নতুন করে বিপন্নতার মোকাবিলা করছে, সে-সময় মানুষের ইতিহাসের নিবিড় পাঠ ছাড়া জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা অসম্ভব। মানবিক উচ্চারণ, বিশেষভাবে সাহিত্যিক পাঠকৃতি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সামাজিক আততির ধারক ও বাহক; অনেকার্থ-দ্যোতনা এর শক্তির আকর। সমালোচক হ্যাডেন হোয়াইট যেভাবে ইতিহাসকে মূলত আখ্যানের নির্মিতি হিসেবে দেখেছেন, তা বিশ্লেষণ করে অতীতকে বর্তমানের দর্পণে বিম্বিত হতে দেখি। আবার বর্তমানও তো এই অতীতের গর্ভজাত। ফলে অপরিহার্য দ্বিবাচনিকতার সূত্রে গড়ে ওঠে ইতিহাস এবং মানুষের বিচিত্র প্রয়োজনে তা ব্যবহৃত হয়। এতদিন ইতিহাসকে বিমূর্তায়িত করে দেওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল; নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ এই প্রবণতা পাল্টে দিয়ে মূর্ত বাস্তব ও সামাজিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করছে। সেইসঙ্গে বিকেন্দ্রায়নের দর্শন অনুসরণ করে প্রান্তিকায়িত অপর বর্গকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তার প্রাপ্য মর্যাদা। ফলে নৈরাশ্যের মন্থরতা পেরিয়ে রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পন্ন আশাবরী ভোরের স্পন্দন আমরা অনুভব করছি। সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্যবোধ ইতিহাসের নতুন নন্দনে যথার্থ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে চলেছে।

এই মতবাদে পাঠকৃতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। অতীত ও বর্তমানের দ্বিবাচনিক গ্রন্থনাও তো সাহিত্য ও ইতিহাসের যুগলবন্দি প্রতিবেদনে প্রকাশ পাচ্ছে। সমস্ত যথাপ্রাপ্ত অবস্থান থেকে নির্যাস শুষে নিয়ে সাম্প্রতিক বহ্নিমান সময়ের জ্বলন্ত পরিধিকে পেরিয়ে যাচ্ছে মানুষের ইতিহাস। সময়ের গভীরে থেকেও সময়ান্তরের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়, যদি ভাবাদর্শের শক্তি ও লাবণ্য অন্ধকার পথে আলো জ্বেলে দিতে পারে। আজকের দিনে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা তাই সৃজনমূলক প্রত্যাহ্বানের নামান্তর। সব অসঙ্গতি পেরিয়ে গিয়ে, প্রসঙ্গ ও পাঠকৃতির ক্রমাগত লুপ্ত হয়ে-যাওয়া ব্যবধান আত্মস্থ করে ইতিহাসবেত্তা নিজস্ব অবস্থানে পৌছাতে চাইছেন। আসলে তাঁরা বুঝতে চাইছেন, উপলব্ধিরও ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা আছে অর্থাৎ উপলব্ধি মূলত ইতিহাসের নির্মিতি। বহতা কালের প্রতিবেদনকে নিবিড় পাঠ করতে গিয়ে তিনি আসলে তাঁর 'Actively mediating Presence'-এর প্রমাণ দিচ্ছেন। তাঁর ইতিহাসবোধ কেবল বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হয় না, নিরন্তর পুনর্মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। আগেই লিখেছি, মূল্যায়ন আসলে সংগ্রাম। এই সংগ্রাম প্রতীয়মানের সঙ্গে যথার্থ প্রতীতির, অতিব্যক্তের সঙ্গে অনতিব্যক্তের, নির্মোকের সঙ্গে গভীরতার। 'Past significance and present meaning in Literary History' নিবন্ধে রবার্ট হাইম্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসের সন্দর্ভ থেকে অতীতের তৎপর্য আমরা বুঝতে পারি শুধু বর্তমান অভিজ্ঞতার উদ্ভাসনী আলোয়। অতীত যতক্ষণ বর্তমান না হচ্ছে, অন্তত ততক্ষণ সাম্প্রতিক চিন্তার আকরণে তার কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। তিনি লিখেছেন : 'Past significance and present meaning engage in a relationship which, in its interdependence, may illuminate either the past work as against its present reception and the contemporary interpretation against the historical significance of the work of art' (১৯৯৩ ২৮৭)। ইতিহাসের সঙ্গে সৃজনশীল নন্দনের যোগসূত্র যখন রচিত হয়, তা সর্বদাই ঘটে সামাজিক পক্রিয়ার আয়তনে। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে শুধু নন্দনের বিশ্লেষণী মূল্যায়ন হয় না, নৈতিক উপাদানগুলিও বিচারের মধ্যে এসে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিক যেমন তখন সাহিত্যসমালোচক, তেমনি সমালোচক হয়ে ওঠেন ঐতিহাসিক। সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে যদি অনুকরণ ও সৃষ্টি বলে মনে করি, তাকে কেবল অতীতের ফসল ভাবলে চলবে না, তাকে ভবিষ্যতের উৎপাদক বলেও ধরে নিতে হবে। নতুন প্রত্যয় অনুযায়ী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হয় যখন, তাতে পাঠকৃতির পশ্চাৎপট ও উৎস এবং অতীত তাৎপর্য গ্রথিত হয়ে থাকে বর্তমান অর্থপ্রতীতিতে। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব প্রসারিত হয়ে যায়। কাজটা খুব সহজ নয়; কেননা ঐতিহাসিককে কালের অন্তর্বিরোধ ও ঐক্যবোধের মোকাবিলা করতে হয় সমান দক্ষতায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নির্মিতিনৈপুণ্য ও ভাবাদর্শ, মৌলিকতা ও প্রভাব পাঠকৃতিতে যে জটিল বয়ন তৈরি করে—ঐতিহাসিক তাকেই তাৎপর্যের আকর মনে করেন। ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিকের আন্তঃসম্পর্ক তাঁর বিশ্লেষণে যেমন ধরা পড়ে, তেমনি আকল্প ও বাস্তবের ব্যবধানও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। প্রাগুক্ত সমালোচক উপলব্ধি মন্দ্রিত উচ্চারণে জানিয়েছেন 'There can be no present or future in life or in art, if the past is not a living reality in its pastness. Editors, bibliographers, textual critics and pedants of all sorts hold the keys in their hands, the keys to the kingdom not merely of literature, but of all human culture.' (তদেব ২৮৮)।

আলোচনাকে এবার সমে ফিরিয়ে আনি। ইতিহাসের নতুন নন্দন এই প্রতীতির জন্ম দিচ্ছে যে, পাঠকৃতিতে সর্বজনীন উপাদান থাকে না কেবল, 'বিশেষ' উপকরণও থাকে। ঐতিহাসিক দেখাবেন, এদের আন্তঃসম্পর্ক বহুরৈখিক। প্রাকরণিক কাঠামো উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু তাকে দেখতে হবে নিরবচ্ছিন্ন মানবিক প্রক্রিয়ার আধার হিসেবে। বিমূর্ত থেকে মূর্তকে জাগাতে জাগাতে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু গড়ছে না কেবল, আত্মসমালোচনার সঙ্গে জগৎ-সমীক্ষাকে অন্বিতও করছে। সব মিলিয়ে, ইতিহাসের নতুন নন্দন আসলে শুদ্ধতার দিকে অবিরাম যাত্রারই অন্য নাম। অনন্বয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক খোঁজেন অন্বয়সূত্র 'in our differences do we learn about, and create, a community' (জেরোম জে. ম্যাকগ্যান ১৯৯৩ ৩০৬)।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্বের নতুন নন্দন

অস্তিত্ব-সত্তা-অস্মিতা ইত্যাদি শব্দে বড়ো মায়া। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তাদের। বহুদিন ধরে কত ভাষ্যকারের টীকা-টিপ্পনিতে এদের তাৎপর্য নিয়ে অজস্র চিন্তাপ্রস্থান রচিত হয়েছে। পুনঃপাঠ ও পুনর্ভাষ্যের তাগিদ তবু ফুরোয়নি এখনও। সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্ব অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়েছে চূড়ান্ত মাত্রায়। অস্তিত্বের মতো বিস্ময়কর, সত্তার মতো দুরধিগম্য, অস্মিতার মতো প্রহেলিকা তবু বিরল। চিরপুরোনো হয়েও চিরনতুন এইসব শব্দ; তাই 'নতুন' নন্দনের কথা ভাবি যখন, নতুনের দ্বিবাচনিক স্বভাব ভুলতে পারি না। যার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে এই স্বভাবের প্রক্রিয়া ও পরিণতি—তার গ্রাহক-উপস্থিতিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গ্রহণ-পুনঃগ্রহণের বিধি যেমন লক্ষণীয়, তেমনই গ্রাহকের যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের ওপরেও নিষ্কর্ষের প্রতীতি নির্ভর করে। দেরিদা যাকে 'metaphysics of presence' (১৯৭৬) বলেছেন, তা তো তাৎপর্যের অন্তহীন বিচ্ছুরণ উপলব্ধির পক্ষে প্রতিবন্ধক। তবু সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতাকে কোনো গ্রহীতা-ভাষ্যকার উড়িয়ে দিতে পারেন না। তাঁর অস্তিত্ববোধ দিয়েই প্রতিবেদনের অন্তর্বয়ন গড়ে তুলবেন তিনি এবং প্রমাণ করবেন, উদ্দিষ্ট সত্তা-অস্মিতা-অস্তিত্ব মূলত নির্মিতি। নির্মাণের আকল্প ও সাংগঠনিক অভিব্যক্তি পুরোপুরি সক্রিয় পর্যবেক্ষকের ওপরে নির্ভর করে। তাই সত্তাকে যতটা অনেকান্তিক ও বহু উৎসজাত অপরতার সূত্রধার বলে ভাবা হয়ে থাকে—তা তার চেয়েও ঢের বেশি। কারণ, পর্যবেক্ষণ অন্তহীন।

মার্ক ফ্রীম্যান 'Rewriting the self' (১৯৯৩ ১৩) বইতে ঠিকই মন্তব্য করেছেন 'We live, in a post absolute world, where one person's telos may be another's worst dream'! আমাদের জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে কথাটির যথার্থতা বুঝে নিতে পারি। প্রতিদিনকার অভ্যস্ত আপাত-তুচ্ছ অনুষঙ্গ থেকে আস্তিত্বিক উল্লাস ও অবসাদ সম্পর্কিত কত জটিল ও গভীর ধারণার প্রাথমিক ভাববীজগুলি সংগ্রহ করে নিতে পারি, তা অনেক সময় আমরা নিজেরাই বুঝিনা। ঘটমান বর্তমানের মুহূর্তগুলিতে যতসব অভিজ্ঞতা অর্জন করছি, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শরিক হয়েও অপেক্ষা করে থাকি কখন সেসব 'অতীত' হয়ে যাবে। যেন নিরাপদ ব্যবধান তৈরি না হলে নিজেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছানো অসম্ভব! এ এক বিচিত্র সর্বজনীন মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস যার নিরিখে 'বর্তমানের সত্তাতত্ত্ব' কেবল কথার কথা মাত্র, যেন অস্তিত্বের তাৎপর্য বোঝার জন্যে সময় ও পরিসরের সমান্তরালতাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে আগে। আরো একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমস্যা আছে যা চোখের সামনে রয়েছে বলেই হয়তো দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়। আপাত-তুচ্ছ দৈনন্দিন অনুপুঙ্খগুলির মধ্যে আস্তিত্বিক সংগঠন সম্পর্কিত দার্শনিক ভাববীজ প্রচ্ছন্ন রয়েছে—এ আমরা প্রায় কেউই লক্ষ করি না। এমনকী, সামাজিক চিহ্নতত্ত্বের নিরিখে এদের অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কেও আমরা সাধারণভাবে উদাসীন। প্রতিদিন জীবন-জীবিকার পরিসরে যোগ্যতার সঙ্গে অযোগ্যতার, বৌদ্ধিক দীপ্তির সঙ্গে নিরেট নির্বুদ্ধিতার, উদারতার সঙ্গে ক্রূর হীনতার, অধ্যবসায়ী সক্রিয়তার সঙ্গে অকর্মণ্য নিষ্ক্রিয়তার, ঈর্ষা ও অসূয়াপ্রবণ অন্তর্ঘাতের সঙ্গে মানবিক উৎকর্ষসন্ধানী চৈতন্যের কত বিচিত্র সহাবস্থান দেখি এবং সেই সহাবস্থানের সঙ্গে কারণে অকারণে সমঝোতা করে চলি আমরা অনেকেই। আমাদের পুঁথিপড়া বিদ্যা কাজে লাগে কেবল অন্ধকারের ভাষ্য রচনায় কিংবা আলো ও অন্ধকারের উৎকট সহাবস্থানের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টায়।

বিদ্যার এহেন দুষ্প্রয়োগ যখন সর্বজনীন নিয়ম, সত্তা কী অস্তিত্ব কী অস্মিতা কী এই মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হব কীভাবে? এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি বিশ শতক উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা নিয়ে কিংবা পান্ডুর জ্যোৎস্নায় ক্লান্ত বধ্যভূমির নীরবতা নিয়ে সদ্য অতীতে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু মনে মনে আমরা তো এখনও ঐ শতকের মানুষ। বিশ্বায়ন-উত্তরমানবিকতাবাদ-দীপায়নোত্তর পরিস্থিতির গোলকধাঁধা যদিও একুশ শতকীয় আধুনিকোত্তর চেতনার আকল্পকে চাপিয়ে দিচ্ছে—ভারতীয় উপমহাদেশের ঈষৎ-বিভ্রান্ত বাঙালিরা বিগত শতকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি করতে পেরেছে কি? তথ্য-বিনোদন প্রযুক্তির সাম্প্রতিক পর্যায়ে নেতিবাচক অর্থে পণ্য-সর্বস্ব বিশ্ব একনীড় হয়ে পড়েছে। ফলে কিছুদিন আগেও যা তত্ত্ববীজ হিসেবে আলোকিত বৌদ্ধিক বর্গের কাছে আগে পৌঁছাত, ইদানীং তা নিতান্ত স্থূলভাবে পিন্ডাকার জনতার কাছে এক লহমায় পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে ব্যক্তি-অস্তিত্বের অজস্র রূপ ও চরিত্র-ভেদ নিয়ে বৌদ্ধিক স্তরে যে-সমস্ত সূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্ক হত, এখন সেই পর্যায় আর নেই। অস্তিত্বের চিহ্নায়ন প্রকরণ শুধুমাত্র বৌদ্ধিক পরিসরে নির্ধারিত হবে না আর, ভোগবাদের তুমুল হুল্লোড়ে নিমজ্জমান জনতার দ্রুত সঞ্চরমান অভিজ্ঞতা থেকে অস্তিত্বের একক ও সামূহিক বাচনের নতুন বিধি-বিন্যাস নির্ণয় করতে হবে।

দর্শন-সমাজতত্ত্ব-সাহিত্য সমস্ত নিরিখেই তাই প্রাগুক্ত মৌলিক প্রশ্নগুলির মীমাংসা-প্রয়াসের ধরন আমূল বদলে গেছে। আধুনিকতাবাদের একীকরণ প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে বহুকেন্দ্রিক আধুনিকোত্তর বিকল্প। এই সূত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে সত্তা ও জগতের তাৎপর্য, তাদের আন্তঃসম্পর্ক, বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্যবোধ, ইতিহাস ও চেতনার গ্রন্থনা, সত্য-পাঠকৃতি-আখ্যান সম্পর্কিত ধারণা, প্রতাপ ও অপরতার সমান্তরাল বিন্যাস। আমাদের অস্তিত্ব টুকরো টুকরো নয় কেবল, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ফলে বাচন ও নন্দনের প্রচলিত ধরনকে সরিয়ে দিয়ে প্রাধান্য অর্জন করছে প্রতিবাচন ও প্রতিনন্দন। আখ্যানের বদলে পরা-আখ্যান ক্রমশ জীবনের আধুনিকোত্তর আদলের উপযোগী বিন্যাস তৈরি করে নিচ্ছে যদিও, অস্তিত্ব কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ববোধের রূপান্তর কিন্তু এখনও বিষমানুপাতিক। অন্যভাবে বলা যায়, আধুনিকোত্তর সময় ও পরিসরের উপলব্ধি আমাদের বাস্তবতাবোধে একই লয়ে-তালে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু শীর্ষ-আধুনিকতার পর্যায়ে জগৎ যেভাবে বিষয়ীকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং বৌদ্ধিক পরিসরে অস্তিত্বের জটিল মাত্রা যেভাবে তাত্ত্বিক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল—সাম্প্রতিক পর্যায়ে একই সঙ্গে চলেছে তার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গ্রন্থনা। এই যে সত্তা কিংবা অস্তিত্ব এবং অস্মিতা—তার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা প্রতিটি কালপর্বে নতুন ভাবে হয়েছে। তাই পুনর্মূল্যায়ন মূলত অন্তহীন ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। বহু প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গের নিরিখে তাত্ত্বিকেরা অস্তিত্বের তাৎপর্য পুনঃপাঠ করে চলেছেন। বিশ শতক জুড়ে দেখা গেছে তারই বিচিত্র অভিব্যক্তি। এতে প্রতিবেদনের ধরন বদলে যায়নি কেবল, বিষয় ও বিষয়ীর সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে, লেখক-সত্তার সঙ্গে কর্তৃত্বের উপলব্ধি এবং সেইসঙ্গে বয়ানের স্বরূপ নিয়েও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। একুশ শতকের সূচনাপর্বে এসে দেখছি, হাইবারস্পেসের পরা-উপস্থিতি এতদিনকার যাবতীয় সত্তাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকেও অনিকেত না হোক, অবান্তর করে দিচ্ছে। চেতনার আধার ও আধেয় সম্পর্কিত ধারণা স্টিফেন হকিং ও কার্ল শাগান পরবর্তী বৌদ্ধিক জগতে নানাভাবে পুনর্বিবেচিত হবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। বিশেষভাবে গত চার দশকে চিন্তাবিশ্ব যেভাবে মুহুর্মুহু আলোড়িত হয়েছে, তাতে অস্তিত্ববিষয়ক সমস্ত মৌল ভাববীজ অস্থির ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। স্বভাবত সত্তা-সংলগ্ন নান্দনিক প্রতীতি ও নন্দন-প্রকরণ এখন মুক্ত আকরণোত্তর বিন্যাসের উৎস-ভূমি। এসময় ইতিহাস-ভাবাদর্শ-নৈতিকতা খারিজ হয়ে যাচ্ছে মহাসন্দর্ভ বলে, ঘোষিত হচ্ছে তাদের মৃত্যু। তাহলে কোথায় দাঁড়াবে যাবতীয় কৃতি ও চিন্তার সূত্রধার রূপী মানুষ? ইতিহাসের বাইরে ভাবাদর্শের বাইরে নৈতিকতার বাইরে কল্পিত যে-অবস্থান মানুষের, গ্রহীতা-সত্তার, লেখক-অস্তিত্বের সেই পরিসর-শূন্য স্থিতি নিয়ে সন্দর্ভ নির্মাণ করছে আধুনিকোত্তরবাদ। নতুন নতুন প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের অভাবনীয় আবর্তের পশ্চাৎভূমি হিসেবে দেখব সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক পরম্পরাকে। অস্তিত্বের নতুন নন্দন কী ও কেন, এই জিজ্ঞাসা আমাদের অবধারিতভাবে নিয়ে যায় অস্তিত্ববাদী ভাবনার বিবর্তনে।

এ বিষয়ে মনোনিবেশ করার আগে আমাদের এই গোড়ার কথাটা মনে রাখতে হয় যে সত্তার ধারণাও মূলত এক নির্মিতি। সামাজিক ইতিহাসের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনুষঙ্গ দিয়ে তিলতিল করে গড়ে ওঠে অস্মিতার বোধ। সত্তাকে কেন্দ্রে রেখে অজস্র অপরতার আততি যে ঊর্ণাতন্তুর বয়ন করতে থাকে, তার সামূহিক অভিব্যক্তিকে বলি অস্তিত্বের সংগঠন। তাতে প্রচ্ছন্ন থাকে যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের দ্বারা খচিত বৈশিষ্ট্য সূত্রগুলি। এতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতাপের নানারকম আলোছায়া থাকে যেমন, তেমনই চেতনা ও অবচেতনার মিথস্ক্রিয়াও থাকে। প্রকাশ ও অপ্রকাশের সমান্তরাল পরিসরের সংযোজক হিসেবে অস্তিত্বের ভূমিকা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। আমৃত্যু অক্ষুণ্ন থাকে তার সক্রিয়তা। না-লিখলেও চলে, নিরবয়ব শূন্যতায় তা অসম্ভব; সমাজকে প্রতিস্পর্ধা জানায় যখন, তাও ঘটে সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের স্পষ্ট কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতীয়মান আবহে। এইজন্যে সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উপলব্ধিকে বুঝি ঐতিহাসিকতায়, অন্য কোনোভাবে নয়। এবং, একই কারণে, যুগে-যুগে অস্তিত্বের প্রত্যয় ও নন্দন ভিন্ন-ভিন্ন। অন্যভাবে বলা যায়, নিরন্তর জায়মান পার্থক্য-প্রতীতি সত্তার প্রকৃত নির্মাতা। এই বক্তব্যের পাশাপাশি যখন মনে পড়ে, 'আমি নিজেকে রচনা করি' (I author myself ফুকো)—সত্তার নির্মাণ-প্রকল্প হয়ে ওঠে অনেকার্থদ্যোতক ও বহুস্বরিক। প্রথমত, জগৎ ও জীবনের অন্য সকল পরিসরের তুলনায়, বলা ভালো, সুস্পষ্ট পার্থক্য-সূত্রে, আপন সত্তাকে অনুভবের ও সক্রিয়তার কেন্দ্রে স্থাপন করি যখন—নানা স্তরে অস্তিত্ববোধ ও তার সংগঠনকে গড়ে তোলার প্রকৃত অর্থ বুঝে নিই। ক্রিয়ার সঞ্চালক ও নিয়ামক সত্তাকে যেহেতু কর্তা বলি, সেই সঙ্গে অবারিত হয়ে ওঠে কর্তৃত্বের প্রসঙ্গও। প্রশ্ন এই, কর্তৃত্ববাদ ও আধিপত্যবাদ যেহেতু সমার্থক—সত্তা কি তবে প্রতাপের বিচ্ছুরণ ছাড়া অসম্ভব?

একটু আগে লিখেছি, জীবনের প্রতিবেদন স্বেচ্ছায় রচনা করে অস্তিত্ব-কেন্দ্র গড়ে তুলতে হয়। এই প্রতিবেদকই লেখক; তার মানে, লেখকসত্তা মূল্যগর্ভ ও ক্রিয়াত্মক অভিজ্ঞান। চেতনা ও নন্দনের স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে তার দায়িত্ব হল—'to characterize the existence, circulation and operation of certain discourses in a society' (ফুকো ১৯৭৭ ১১৪)। কোনো সন্দেহ নেই যে সামাজিক ইতিহাসের বিশিষ্ট পর্যায়ে এবং সমসাময়িক দাবি মেটানোর তাগিদে প্রতিবেদনের বিশেষ আদল ও চরিত্র দেখা যায়। ফলে প্রতিবেদকের অভিজ্ঞানও একই সুরে-তালে-লয়ে বাঁধা পড়ে যায়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রবণতাগুলির প্রতিনিধি হিসেবে লেখক-সত্তাতেও প্রয়োজনীয় বিবর্তন দেখা দেয়। তাহলে কি সময়ের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেই সত্তার উদ্ভব সম্ভব? কালাতিগ কোনো বার্তা কি অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত হয় না কখনো? এই জটিল জিজ্ঞাসার মীমাংসা এত সহজ নয়। দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলাদা ধরনে এইসব আনুষঙ্গিক প্রশ্নের মোকাবিলা করেছেন। বিষয়ীসত্তা ও বিষয়োপলব্ধি : এই দুটি কথা স্বতন্ত্র নিশ্চয় কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য আপাত না প্রকৃত? এমন কি ভাবতে পারি—বিষয়ীসত্তা মুক্ত আর বিষয়োপলব্ধি শর্তাধীন? কীভাবে ঐ মুক্ত বিষয়ী বস্তুপুঞ্জের নিবিড় বিন্যাস ভেদ করে তাদের বিচিত্র তাৎপর্য নির্ণয় করবে? পার্থক্য-প্রতীতিতে আধারিত বস্তুবিশ্বও তো অস্থির, নিশ্চয়তাহীন ও চলিষ্ণু। অতএব একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে রচিত প্রতিবেদনও অনেকান্তিক হতে দেখি। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদক বা লেখকসত্তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। প্রতিটি জীবন অনন্য, প্রতিটি পাঠকৃতিও নতুন। অতএব ফুকো যেন নিদান হেঁকেছেন : 'The subject (and its substitutes) must be stripped of its creative role and analysed as a complex and variable function of discourse.' (তদেব ১৩৭-১৩৮)

~ www.amarboi.com ~

দুই

আসলে আমাদের অস্তিত্ব অমূল তরু নয়, নিঃশর্তও নয়। সত্তার জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে। নইলে চেতনার উন্মেষ হওয়ার পরে তার বিকাশ অবারিত ও অন্তহীন হত। একুশ শতকে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এইটুকু অন্তত বুঝেছি, ক্ষয় ও মৃত্যু অবধারিত। চেতনা-ভাবাদর্শ-স্বপ্ন তো বটেই, আমাদের চেনা বাস্তবও মৃত। অধিবাস্তব আর অধিপরিসরের সাম্প্রতিক পর্যায়ে প্রতিটি সকাল দেখা দেয় গত রাত্রির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির শববাহক হয়ে। প্রতিটি আগামীকাল গতকালের তুলনায় স্বতন্ত্র, একথা বলছি না। বলছি মৃত ও অবান্তর। মানুষ তার জগৎকে এবং নিজস্ব অস্তিত্বকে, নন্দনকে, জ্ঞানতাত্ত্বিক আকল্পকে প্রতিটি মুহূর্তে উদাসীন ঘাতকের মতো হত্যা করছে। ভাবছি, সত্তা কি নিছক বাচনের আশ্রয়? ভাষার কৃৎকৌশল কিংবা অস্তিত্বহীনতার ও নিরাশ্রয়তার সন্ত্রাস থেকে সত্তাকে মুক্ত রাখার জন্যে এ কি আমাদের স্বরচিত প্রতিরক্ষাব্যূহ! কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে আজকের অস্তিত্ব যদি অবান্তর হয়ে পড়ে, সমুদ্রসৈকতে পদচিহ্নের মতো মুছে যায়—তাহলে সত্তাজিজ্ঞাসার ইতিহাস পুনঃপাঠ করব কেন? ঐ ইতিহাসের পুনঃপাঠ থেকে শুধু এর সম্ভাব্য মীমাংসা-সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এমন কী, অজস্র কূটাভাসে কন্টকিত আধুনিকোত্তরবাদী পর্যায়ের চিন্তাবিদেরাও সবাই ইতিহাস নামক মহাসন্দর্ভের মৃত্যু ঘোষণায় সায় দেন নি। নইলে কীর্কেগার্দ-নীৎশের পুনঃপাঠ একালে দেখতে পেতাম না। দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক-সাহিত্যজিজ্ঞাসু প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চেতনার বীজতলি এঁদের ভাববিশ্বে যে খুঁজে পাচ্ছেন, তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অস্তিত্বের নতুন নন্দন নিয়ে ভাবি যখন, চিন্তায় অনন্য উদ্ভাসনের জন্যে যাই কীর্কেগার্দের কাছে, নীৎশের কাছে। তবে আজকের মনন নিয়ে।

কীর্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫) ও নীৎশে (১৮৪৪-১৯০০) যখন উনিশ শতকের ভাববিশ্বকে পুনর্নির্মাণ করছিলেন, তখন ডেভিড হিউমের মতো চিন্তাবিদও সেই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। 'A treatise of human nature' (১৮৭৪) বইটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হিউম বলেছেন, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা সত্তার ধারণা তৈরি করছি এবং তৈরি করতে করতে সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিবিড়ভাবে সচেতন হয়ে উঠছি। নিভৃত প্রাণের স্বপ্ন ও উৎকণ্ঠা, তার অমোঘ সারল্য ও শুদ্ধ অভিজ্ঞান সম্পর্কে আলাদা কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমাদের অনুভব ও প্রতীতি দিয়ে সারা জীবন ধরে সত্তাকে আমরা নির্মাণ করি, লালন করি। এমন কোনো প্রতীতি বা অনুভব অবশ্য নেই যা সুখ-দুঃখ-আবেগ-উল্লাস-যন্ত্রণার পরম্পরায় চিরকাল একই রকম থাকে। কোনো-একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে সমস্ত ধরনের অনুভব একসঙ্গে উপস্থিত থাকে না। তাদের এই বহুত্ব থেকেই গড়ে ওঠে সত্তার প্রকল্প। আর, যেহেতু সত্তা মূলত প্রকল্প, তাতে সৃজনী কল্পনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। অস্তিত্বের অভিজ্ঞান সম্পর্কে হিউমের এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'The identity which is ascribed to the mind of man, is only a fictitious one.' (তদেব ৫৪০)।

সত্তার বহুত্ব নিয়ে উনিশ শতকীয় ভাবনা বিশ শতকের শেষ প্রান্তে আধুনিকোত্তর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিন্তাপ্রণালীতে আরো গ্রন্থিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা যখন নিজেদের সিদ্ধান্তের সমর্থন খুঁজে পান উনিশ শতকীয় চিন্তাগুরুদের উচ্চারণে, অস্তিত্ব নামক প্রকল্পের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়ে উঠি। যেমন নীৎশের একটি প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনে পাচ্ছি 'The subject this is the term for our belief in a unity underlying all the different impulses of the highest feeling of reality : we understand this belief as the effect of one cause– we believe so firmly in our belief that for its sake we imagine 'truth', 'reality', 'substantiality' in general–'The subject is the fiction that many similar states in us are the effect of one substratum.' (১৯৬৮ ২৬৮-২৬৯)। বিষয়ী সত্তার সূত্রে আমরা সত্য, বাস্তবতা ও নিষ্কর্ষ সম্পর্কে কিছু সাধারণ বোধ তৈরি করে নিই। আমাদের কল্পনায় যা মূর্ত হয়ে ওঠে, সেই প্রকল্পিত বিশ্বাসকে নিজেরাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকি। দেখা যাচ্ছে নীৎশেও বিষয়ী সত্তাকে ভাবছেন কল্পনার উদ্ভাস (fiction)। আর, এই যুক্তিতে তাঁর মনে হয়েছে, ঐ সত্তা একান্তিক নয়—অনেকান্তিক 'The assumption of one single subject is perhaps unnecessary perhaps it is just as permissible to assume a multiplicity of subjects, whose interaction and struggle is the basis of our thought and our consciousness in general.' (তদেব ২৭০)।

সুতরাং এই চিন্তাসূত্র থেকে প্রত্ন-আধুনিকোত্তর পর্যায়ের আদল তৈরি করে নেওয়ার কথা ভেবেছেন কেউ কেউ। নীৎশের সঙ্গে যাঁর দূরত্ব দ্বিমেরুবিষম অথচ কিছু কিছু প্রবণতার নিরিখে যিনি যমজের মতো সংলগ্ন--সেই সোরেন কীর্কেগার্দ তাঁর নিজস্ব ধরনে ঐ প্রত্ন-আধুনিকোত্তর পরিসরের পূর্বাভাস দিয়েছেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে বিকলাঙ্গ শরীর ও তীব্র আত্মিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে সংঘর্ষ করে জীবন ও জগতের সঙ্গে সত্তার নির্যাস সম্পর্কিত উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম বই 'Either/or' এর বয়ানে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে চিন্তাপ্রণালীর পুরোপুরি নতুন ধরন লেখকের অন্বিষ্ট। 'Philosophical Fragments' (১৮৪৪) ও 'Concluding unscientific postscript' (১৮৪৬) বই দুটিতে কীর্কেগার্দের অস্তিত্ব-ভাবনাটি যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনই দেখা গেছে যে তিনি কোনো নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ দর্শন-প্রস্থানকে অনুসরণ করতে চাননি। বিশুদ্ধ চিন্তা তাঁর কাছে উদ্ভট একটি ধারণা যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় সত্তা। বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্যে না-গিয়েও বলা যায়, এই উচ্চারণে অস্তিত্ববাদী ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল।

ছাত্রজীবনে খ্রিস্টীয় জীবনচর্যা প্রত্যাখ্যান করে তিনি হেগেল পাঠে মনোযোগী হয়েছিলেন। অস্তিত্বের সত্য আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে হেগেলীয় মতই ছিল কীর্কেগার্দের আশ্রয়। যৌবনে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা-প্রকরণ সম্পর্কে অবিশ্বাসী ও সংশয়গ্রস্ত হওয়াটা যেন জরুরি প্রাক্‌শর্ত। অন্বিষ্ট সত্যই অস্তিত্বের আশ্রয়। কিন্তু সেই সত্যে পৌঁছানোর জন্যে যেতে হয় সত্যভ্রম, মিথ্যা, কুহক ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে। আমাদের মনে পড়ে যায় বিখ্যাত একটি সংস্কৃত শ্লোকের কথা 'ন সংশয়ম্‌ অনারূহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি/সংশয়ং পুনরারূহ্য যদি জীবতি পশ্যতি।' অতএব অবিশ্বাস ও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংশয় নিছক নেতিবাচক নয়। কীর্কেগার্দও এই সুরে নিজের চিন্তাকে বেঁধেছেন 'The youth is an existing doubter. Hovering in doubt and without a foothold for his life, he reaches out for the truth in order to exist in it.' (১৮৪৬ ২৭৫)। আজকের আধুনিকোত্তর দুনিয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত যথাপ্রাপ্ত যখন বাতিল হয়ে যাচ্ছে কিংবা নেতি ও নৈরাজ্যের সন্ত্রাস তৈরি করছে গোলকধাঁধার আকল্প—সে-সময় প্রাগুক্ত মন্তব্য হয়ে ওঠে পুনঃপাঠের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি একটি প্রসঙ্গ। সত্তার নির্যাস ও আকরণ এখন নানা ধরনের জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ হচ্ছে। ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামাজিক অস্তিত্বের নানা স্তরে। এবং তাদের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে পূর্ব-নির্ধারিত কোনো মান্যতার প্রকরণ সংশয়ের বাইরে নয় আর। কূটাভাসের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে অহরহ কেননা আস্তিত্বিক পরিস্থিতি এখন চূড়ান্ত অস্থির ও অনিশ্চিত।

তিন

সত্তার নিভৃত ও প্রকাশ্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অনন্বয় অনিবার্য বলে আততির পরিসর ক্রমবর্ধমান। প্রতিদিন পুর্ননবায়িত হচ্ছে পার্থক্যের উপলব্ধি যা সর্বদা সৃজনশীল নয়। বিশ্বাস-নৈতিকতা-ভাবাদর্শ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনো ধ্রুববিন্দু যেহেতু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যৌক্তিকতা ও অনুভবের পরিসরে সত্তা এখন যুগপৎ অনন্বয়প্রবণ ও অসহায়। কীর্কেগার্দের বিশ্ববীক্ষা অবশ্যই আধুনিকোত্তর জগতের পক্ষে প্রত্ন-সময়ের প্রকল্প বলেই গণ্য। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি, তাঁর চিন্তার নির্যাস সাম্প্রতিক কালের উপলব্ধিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। প্রতীয়মান ও প্রকৃত তত্ত্ববস্তুর মধ্যে ব্যবধান যেভাবে সাম্প্রতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে অবভাস ও প্রকল্পনার পরা-পরিসর তৈরি করেছে, তার ইশারা কীর্কেগার্দের চিন্তাবিশ্বেও ছিল। অস্তিত্ব মানে গতি; গতিহীন অস্তিত্ব আর সোনার পাথরবাটি একই কথা। যাকে বাস্তব বলি, তা গতিময় অস্তিত্বের বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণের ফসল। বিষয়ীসত্তা যে-তাৎপর্য খোঁজে, তার সম্ভাবনা অনবরত কর্ষণ করে যেতে হয়। কীর্কেগার্দের উদ্ভাসনী চিন্তাসূত্র এখনও দিগ্‌দর্শক 'a valid thought is a possibility' (১৮৪৬ ২০২)। তবে চিন্তার বৈধতা বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বিস্তারিত বিশ্লেষণ দাবি করলেও এখানে আমরা লক্ষ করব শুধু এইটুকু যে এই বৈধতা অস্তিত্বের গতিময়তায় সম্পৃক্ত।

কীর্কেগার্দ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন 'The difficulty facing an existing individual is how to give his existence the continuity without which everything simply vanishes.'। আর, নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন 'The goal of movement for an existing individual is to arrive at a decision and to renew it.' (তদেব ৩০৫)। আধুনিকোত্তর চিন্তা-প্রণালীও অস্তিত্বের বহুরৈখিক সম্ভাবনার ধারাবাহিক অভিব্যক্তি সন্ধান করে এবং বারবার অন্তর্বৃত অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, কূটাভাস মেনে নিয়েও গতিকে পুনর্নবায়িত করে। চিন্তা ও কল্পনার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আনুপাতিক গুরুত্ব অস্তিত্বে কতখানি, সম্ভাবনা ও বাস্তবতার সম্পর্ক কতটা গ্রাহ্য—এসব নিয়েও গভীরভাবে ভেবেছেন কীর্কেগার্দ। একের বিনিময়ে অন্যটিকে চাননি তিনি অর্থাৎ একের মহিমা মানে অন্যের অপলাপ নয়। তিনি এদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন এবং সমান্তরালতার উপলব্ধিতে তাদের সম্পৃক্ত করেছেন—'The medium in which they are unified is existence.'। অস্তিত্বকে যে-সমান্তরালতার উপলব্ধিতে পৌঁছানোর মাধ্যম বলে ভেবেছেন কীর্কেগার্দ, তা আধুনিকোত্তর চিন্তাবিশ্বেরও অন্যতম প্রধান উপজীব্য। শিশু অবস্থা থেকে নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বয়স্ক হয়ে ওঠে মানুষ এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুতে সব যাত্রার সমাপ্তি এই আকরণে বিশিষ্টতা নেই কোনো। কারণ, এ নিয়ম জান্তব বলেই অস্তিত্বের গৌরব সন্ধান করতে হয় অন্যত্র। আজও আমাদের প্রাণিত করে এই বক্তব্য, বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত ব্যক্তির জীবনে আস্তিত্বিক সমান্তরালতার তাৎপর্য অনুধাবনই আসল কথা—'In the life of the individual, the task is to achieve an ennoblement of the successive within the simulaneous, the unification of the different stages of life in simultaneity is the task set for human being.' (তদেব: ৩১১)। অস্তিত্বের হয়ে ওঠার যে-চিন্তাবীজে দার্শনিক সকল ভাবনা-কল্পনা-অনুভূতি-বৌদ্ধিকতার নির্যাস খুঁজে পান, তিনি কখনও মানব-পরিস্থিতির বিশেষ আকরণকে বিষমানুপাতিক গুরুত্ব দেন না। অস্তিত্বের প্রতিটি অনুপুঙ্খ অভিনিবেশ দাবি করে এবং সংযোগের সার্বিক বিন্যাসে প্রতিটি অনুষঙ্গ নিজস্ব পরিসরের দ্যুতি পৌঁছে দেয়। যথার্থ চিন্তাশীল মানুষের অস্তিত্ব আসলে একটি নিটোল শিল্পকর্ম এবং মানবিক সমৃদ্ধির অনন্য নিদর্শন। এই অনন্যতার ওপর বিশেষ জোর দিতে চান অস্তিত্ব-সন্ধানী ভাবুকেরা। ব্যক্তি-অস্তিত্ব যখন আলাদাভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তাতে হয়তো কিছুটা একপেশে ব্যাপার এসেই যায়; কিন্তু একে প্রকৃত মহত্ত্বের পরোক্ষ স্বীকৃতি বলে ধরে নিতে হবে। শুধু ব্যক্তি-অস্তিত্বই নয়, প্রতিটি যুগই কোনো-না-কোনোভাবে একদেশদর্শিতায় ভোগে। কিন্তু দেখা যায়, নানা ধরনের প্রবণতার সংশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত ঐ যুগ অনন্য বলে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধিক অস্তিত্ব এক ধরনের সর্বজনীন সংযোগের অবভাস তৈরি করে।

একটু আগে যাকে সম্ভাবনা বলেছি, তারই প্রণালীবদ্ধ বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি জীবন ও জগৎকে আরো সম্ভাব্য রূপান্তরের পথে প্রতিষ্ঠিত করে। আস্তিত্বিক সমান্তরালতার বোধ যত বেশি কর্ষিত হয়, ততই কালগত অন্ধবিন্দু থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে ভাবনার বিচিত্র সমৃদ্ধি। এমন কোনো যুগ নেই, বাহ্যিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও যার মধ্যে অন্ধবিন্দু আবিষ্কৃত হয়নি। আমাদের সমকালীন আধুনিকোত্তর কালও তার ব্যতিক্রম নয়। সমগ্রায়নের আদিগন্ত ব্যাপ্ত সন্ত্রাস অস্তিত্ববোধকেও নিরালম্ব করে দিয়েছে। তবু এই সময়পর্বেও আমাদের খুঁজে নিতে হচ্ছে অজস্র অন্ধবিন্দু এবং গোলকধাঁধার সম্ভাব্য প্রবেশ ও নির্গমদ্বার। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে উনিশ শতকের প্রেক্ষিতেও কীর্কেগার্দের মনে হয়েছিল 'Each age has its own characteristic depravity. Ours is perhaps not pleasure or indulgence or sensuality, but rather a dissolute pantheistic contempt for the individual man.' (তদেব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩১৭)। একুশ শতকের সূচনায় দেখছি, সর্বপ্লাবী বিশ্বায়ন ও যন্ত্র-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উৎক্রান্তি অনেকান্তিকতার নামে মানুষকে নির্মানবায়নের কুহকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ব্যক্তি-অস্তিত্ব তুমুল গতির ঘূর্ণাবর্তে ও নির্যাসহীনতার চোরাবালিতে কোথাও কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিশ শতকীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা যদি একুশ শতকের আসন্ন দিনগুলিতে অস্তিত্ব-ভাবনার সম্ভাব্য প্রবণতা নিয়ে ভাবি, কীর্কেগার্দ কথিত 'depravity' এর তাৎপর্য নিবিড় পুনঃপাঠ দাবি করে।

অস্তিত্বকে যাঁরাই চিন্তার নির্যাস ও কেন্দ্রে স্থাপন করবেন, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অন্যোন্য-উদ্ভাসন থেকেই তাঁদের ভাবনার রসদ সংগ্রহ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে নীৎশের এই বিখ্যাত মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য 'It makes the most material difference whether a thinker stands personally related to his problems, having his fate, his need, and even his highest happiness therein; or nearly impersonally that is to say, if he can only feel and grasp them with the tentacles of cold, prying thought'। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বেঁচে থাকার ইচ্ছাই তাঁকে নিজস্ব দর্শনপ্রস্থান রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় সত্তার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয় জ্ঞান। জ্ঞাতা অহং বা বিষয়ী সত্তা আবার নিজেই একটি প্রক্রিয়ার ফসল। নীৎশের মতে কোনো বস্তুই স্বয়ম্ভু নয় অর্থাৎ কোনো কিছুর পূর্ব-নির্ধারিত স্বভাব বা নির্যাস নেই; সমস্তই গড়ে ওঠে সত্তার সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায়। তাই অস্তিত্বের ইতিহাসই আমাদের উপজীব্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে জ্ঞানের কোনো সাধারণ চরিত্র নেই, আছে শুধু 'unique individual relations, perpetual perspectives, interpretations, evaluation!' নীৎশে সত্তা ও সত্যের তাৎপর্য ও আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে যে বহুস্বরিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেছেন, তা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে ব্যবহারিক জ্ঞান মূলত নির্মিতি। ব্যক্তিগত সত্যের যে-বিচ্ছুরণ ঘটে বস্তু-বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক-বিন্যাসে ও অনুভব-প্রতীতির বিশৃঙ্খল সমবায়ী অভিব্যক্তিতে—তারই সরলীকৃত অভিধা হলো জ্ঞান। তিনি মনে করেন, বিষয়ী-সত্তা যখন নিজেকে এবং তার উপজীব্য বিষয়কে সার্থক ভাবে সৃষ্টি করে, জ্ঞানের উদ্ভাসন আমরা লক্ষ করি। কিন্তু তা চাতুর্যময় ও প্রয়োজনীয় মিথ্যার বিন্যাস মাত্র তাকে সত্য বলা যায় না। সত্যকে অর্জন করা যায় না কখনো; কার্যত তা ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাইরে।

চার

কীর্কেগার্দ জীবনে পুনরাবৃত্তির মহিমা লক্ষ করেছিলেন নীৎশের 'Eternal Recurrence' বা চিরন্তন পুনর্ঘটমানতার তত্ত্ব এর কাছাকাছি। এইচ. জে. ব্ল্যাকহাম লিখেছেন, এই তত্ত্ব 'expresses the crass senselessness of things, the eternal lack of telos in the universe; so that to will the eternal cycle, with enthusiasm and without hope is the ultimate attainment of

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

affirmation, (১৯৯৭ : ৩৫)। আর কীর্কেগার্দ লিখেছেন, জীবন মানে পুনরাবৃত্তি—এই তার সৌন্দর্য। তাঁর ভাষায় কাব্যিকতার ছোঁয়া লেগেছে যখন তিনি আরো জানিয়েছেন—'...repetition is life's daily bread, which satisfies and blesses. When a man has circumnavigated the globe it will appear whether he has the courage to understand that life is repetition and the enthusiasm to find therein his happiness... In repetition inheres the earnestness and reality of life, whoever wills repetition proves himself to be in possession of a pathos that is serious and mature'! অন্তিম বাক্যটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যিনি পুনরাবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পক্ষে বেদনা অপার। অথচ এটাই জীবন, এটাই অস্তিত্বের ইতিবৃত্ত। বস্তুত অস্তিত্ববাদী ভাববিশ্বে 'পুনরাবৃত্তি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আকল্প যা নানাভাবে নানা তাত্ত্বিকের বয়ানে ফিরে ফিরে এসেছে। মার্সেল যখন 'fidelity'-এর কথা উত্থাপন করেন কিংবা হাইদেগার দর্শনের প্রাথমিক স্তরের কিছু প্রশ্নে নতুন ভাবে আগ্রহ দেখান কিংবা য়াসপের্স ও সার্ত্রের বয়ানে প্রত্যাহার ও পছন্দের ছন্দলয় বিশেষ গুরুত্ব পায়—ব্যক্তি-অস্তিত্বে উপলব্ধ ও অর্জিত অভিজ্ঞতার মর্ম উদ্ঘাটন হয়ে ওঠে নতুন দর্শনরীতির প্রধান প্রকল্প। কীর্কেগার্দ ও নীৎশের চিন্তায় এমন অনেক কিছু আছে যা হয়তো পরবর্তী পর্যায়ের ভাবুকদের তুলনায় বিপরীত মেরুর সূচক। কিমিতিবাদী অবস্থান বা ধ্বংসাত্মক আবেগ অস্তিত্বকেই নিরাকৃত করে যেন—এরকম মনে হয়। কিন্তু সত্তা ও শূন্যতাবোধের জটিল গ্রন্থনা নেতিপন্থায় বিকশিত হলো বলে নীৎশের চিন্তাপ্রণালীতে বিপ্রতীপ উদ্ভাসন ও আত্ম-আবিষ্কারের মুক্ত পরিসর খুঁজে নিতে পারছি। হয়তো এই দ্যোতনাগর্ভ ক্ষেত্রে ফুকো-দেরিদা-লিওতার-দেলেউজের মতো বিশিষ্ট আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা নীৎশেকে পুনর্গ্রহণ করতে পারেন নানা ধরনের সত্তাতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও প্রতাপতাত্ত্বিক-প্রত্ন-সন্দর্ভের সূত্রধার হিসেবে।

প্রচলিত দর্শন-প্রস্থানগুলির বিতর্ক থেকে নয়, যুগ-যন্ত্রণা ও যুগাকাঙ্ক্ষার প্রত্যক্ষ অনুভব জনিত সমস্যাবলী থেকে নিজের চিন্তাপ্রণালীর আধার ও আধেয় সংগ্রহ করেছিলেন নীৎশে। আপন অস্তিত্বে সময় কীভাবে ধূপছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে, পুরোনো বিশ্বাস ও ভারসাম্যকে বিচলিত করছে—তা বিশ্লেষণ করেই তিনি দর্শনের বয়ান রচনা করেছিলেন। এইজন্যে অস্তিত্বের নন্দন সন্ধানই তাঁর অন্যতম প্রধান আকল্প—এই সিদ্ধান্ত এখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। নিজেকে সমকালের যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপিত করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আস্তিত্বিক সংকট সমাধানের সম্ভাব্য পথ ও পাথেয়। এই তাঁর দর্শনের অন্বিষ্ট; কোনো মতবাদ বা বিতর্ক-পদ্ধতি নির্মাণ অভিপ্রেত ছিল না তাঁর। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে-প্রগাঢ় অনুভব থেকে লেখেন—'আমার ভিতরে আছে সর্বাঙ্গরঙ্গীন পথগুলি/তাতে সব হবে'—যেন বা দার্শনিকদের মধ্যে মহত্তম কবি নীৎশেও ঐ একই উপলব্ধিতে শানিত করতে চেয়েছেন সচেতনতা ও সংবেদনশীলতাকে, উপপত্তিকে দিতে চেয়েছেন আরো গভীরতা, লক্ষ্যাভিমুখী করতে চেয়েছেন আকাঙ্ক্ষাকে এবং নতুন-নতুন সম্ভাবনাকে দিতে চেয়েছেন আরো গতি ও তীক্ষ্ণতা। 'Beyond Good and evil'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বইতে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, ভবিষ্যতের দার্শনিক বলবেন—আমার অভিমত আমারই অভিমত, অন্য ব্যক্তিকে খুব সহজে ঐ উপলব্ধির অধিকার দেওয়া যাবে না। (পৃ ৪৩) অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জ্ঞানস্পৃহা বা জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সম্পর্কে খুব একটা আস্থা ছিল না তাঁর।

পরবর্তী অস্তিত্বতাত্ত্বিকদের মধ্যেও দেখা গেছে এই মনোভঙ্গি। কোনো অভিমতের অন্তর্মুখিনতা তৎসংশ্লিষ্ট সত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; ব্যক্তিগত এষণায় ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের অভিব্যক্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে—একক বাচনের উদ্ভাসনে সাধারণ মানুষেরা গ্রহীতা হতে পারে না সহজে। সাম্প্রতিক আধুনিকোত্তর কালপর্বে অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আকল্পগুলি এত চূড়ান্ত মাত্রায় গহনচারী ও অস্থিতিস্থাপক হয়ে পড়েছে যে গোলকধাঁধা বলে মনে হয় তাদের। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো প্রাসঙ্গিকতা যেমন নেই, তেমনই বৌদ্ধিক বর্গের কাছেও এদের সমান গ্রাহ্যতা দেখতে পাই না। এদিক দিয়ে নীৎশের বক্তব্যে এসময়ের প্রবণতার দূরাগত পূর্বাভাস লক্ষ করি। সাম্প্রতিক চিন্তাবিশ্বে নীৎশের অনতিক্রম্য বিনাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব যেন বিচিত্র অনুষঙ্গে ও তাৎপর্যে পুনঃপঠিত হচ্ছে। অজস্র ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে বিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস যেভাবে মথিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ মানবিক নির্যাস সন্ধানের বদলে নির্মানবায়নের কৃষ্ণবিবর উন্মোচিত করেছে—তাতে মনে হয় সত্তার স্বাধীনতা, মূল্যমান, উত্তরণ-প্রকল্প, ক্ষমতার অধিবিদ্যাগত আকাঙ্ক্ষার বিচ্ছুরণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এখন সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কীর্কেগার্দ ও নীৎশের চিন্তাবীজগুলি যখন এ সময়ের প্রান্তে পুনর্বিশ্লেষিত ও পুনর্গৃহীত হচ্ছে—বিশ শতকের সামাজিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পরিসর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাতে বারবার হস্তক্ষেপ করে। হওয়া ও হয়ে ওঠার মৌল আকল্পের নিরিখে ব্যক্তি-সত্তাকে বিবেচনা করি যখন, লক্ষ করি, আধুনিকোত্তর সময়ের অজস্র অন্ধবিন্দু তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে অস্তিত্ববিষয়ক প্রত্যয়ে রৈখিকতা আবিষ্কার করে সমস্ত মৌল প্রকল্প সম্পর্কেই সংশয় প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশ। অস্তিত্বের সম্ভাবনা কিংবা ক্রমোন্নতি সম্পর্কে যেসব ধারণা এতদিন মান্যতা পেয়ে এসেছে, সাম্প্রতিক পর্যায়ে তারাও অভূতপূর্ব জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ হচ্ছে। যেসব পদ্ধতিতে আমাদের সত্তা কাঙ্ক্ষিত শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছাতে চেয়েছে, তাদের ব্যর্থতায় নতুন নতুন সংকট দেখা দিচ্ছে। ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতার বিপ্রতীপতা ছাড়াও তৃতীয় অন্তর্বর্তী স্তরের কথাও ভাবছেন কেউ কেউ। স্বভাবত এই সূত্রে জানার প্রকরণ সম্পর্কেও পুনর্বিবেচনা শুরু হয়েছে। এইসব জটিলতার আদিপাঠ কেউ কেউ নীৎশের 'the joyful wisdom' ও 'The dawn of day' নামক বয়ানে খুঁজে পেয়েছেন। আসলে চিন্তার বিকাশও যে রৈখিকভাবে হয় না, আধুনিকোত্তর পর্বের বিশ্লেষণ এ-সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিয়ত সচেতন করে তুলছে। অস্তিত্বের নতুন নন্দন এই নিরিখেই বিচার্য।

বিশ শতকে মানব-পরিস্থিতি মুহুর্মুহু রূপান্তরিত হয়েছে বলেই অন্যান্য দর্শন-প্রস্থানের মতো অস্তিত্ব-ভাবনাও ক্রমশ সমৃদ্ধতর ও জটিলতর হয়েছে। কার্ল য়াস্‌পের্স, গ্যাব্রিয়েল মার্সেল, মার্টিন হাইদেগের ও জাঁ পল সার্ত্র চিন্তা-বিবর্তনের পুরোধা স্থপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়, তবে মানব-পরিস্থিতির ভাষ্যকার ও আবিষ্কারক হিসেবে তাঁদের গ্রহণ করতে চাই। মানববিশ্বের অতি-উদ্ভাসিত পরিসরের সমান্তরাল অপর হিসেবে রয়েছে যে-রহস্যময় ধুপছায়া ও অনালোকিত পরিসর—এ সম্পর্কে আমাদের নানাভাবে অবহিত করে তুলেছেন তাঁরা। মূল প্রশ্ন তো এই, মানুষ হওয়ার অর্থ কী? আমাদের সত্তা কতখানি ধর্মীয় বা গোষ্ঠী-পরিচয়ে নির্ণীত হয়ে থাকে? সর্বজনীন মান্যতা ও বোধগম্যতার নিরিখে ব্যক্তিসত্তাকে নির্ধারণ করাই কি একমাত্র পথ? শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত পদ্যপঙক্তির মতো প্রশ্ন করা যায় নিজেকেই 'কী আমার পরিচয় মা?' এই প্রশ্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তুমুল বিস্ফোরণের পর্বে নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। উপগ্রহ প্রযুক্তি-ইন্টারনেট-জৈব প্রযুক্তি-ক্লোনিং মানববিশ্বের ভিতর ও বাহিরকে একসঙ্গে উন্মথিত করছে। স্টিফেন হকিং-কার্ল শাগানের প্রতিবেদনে সময়বোধ-মহাবিশ্ব-চেতনাজগৎ এমনভাবে উন্মোচিত হয়েছে যে বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব অভূতপূর্ব ভাবে মিশে যাচ্ছে একই পাঠকৃতিতে। ব্যক্তিসত্তার সীমা-সংজ্ঞা আমূল পরিবর্তিত এখন। আবার এও সত্য যে বোধ সর্বজনীন হয়েও নিঃসঙ্গতার আকর। চিন্তা ও অনুভূতির ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছেদ, নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তা যুগপৎ স্বীকার্য যখন, অস্তিত্বের সূচনাবিন্দু বা সমাপ্তিবিন্দু বলে কিছু নেই। ক্রমজায়মান জীবনে সক্রিয় শরিক হতে হতে নিজেকে নিজেই অহরহ সৃষ্টি করছে ব্যক্তি-সত্তা। নিজেই নিয়ম তৈরি করছে এবং পরমুহূর্তেই তা মুছে দিচ্ছে।

গভীর হাহাকারের মতো উঠে আসে এই বার্তা 'We have lost our naivety' (১৯৯৭ ৪৪)। কীর্কেগার্দ-নীৎশে থেকে কতটা দূরে সরে এসেছিলেন য়াসপের্স-মার্সেল কিংবা হাইদেগের-সার্ত্র এই পর্যালোচনা এখানে নয়। প্রত্ন-আধুনিকোত্তর ভাবনার মুকুল যে উনিশ শতকেও লক্ষণীয়, সেদিকে তর্জনি সংকেত করে এই সত্য বুঝতে চেয়েছি যে অস্তিত্বের নতুন সত্যও পুরোপুরি নতুন সত্য নয়। বিজ্ঞান ও দর্শন আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বিকশিত হয় যেমন, তেমনই এদের মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ-লালিত সম্বন্ধও থাকে। ব্যক্তির প্রস্তুতিহীন দর্পণেও রূপান্তরশীল জগতের চিহ্নায়ন প্রকরণ প্রতিফলিত হতে পারে। তবে দর্পণ যত পরিচ্ছন্ন, তাৎপর্য-প্রতীতি তত নির্ভরযোগ্য। এখানেই প্রণালীবদ্ধ চিন্তার প্রয়োজন স্পষ্ট। এও ঠিক, বিজ্ঞান বা দর্শন বা সমাজতত্ত্ব আধিপত্যবাদী প্রবণতা দ্বারা জ্ঞাতসারে প্রভাবিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে রয়েছে নিজস্ব অন্বিষ্টকে প্রাধান্য দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও। অনবরত নতুন ধারণার জন্ম দেওয়া, নবজাত ধারণাগুলির উপযোগিতা পরীক্ষা করা এবং শেষ পর্যন্ত চিন্তাবিশ্বে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম গ্রহণ এই সবই অনস্বীকার্য সত্য। জিজ্ঞাসু ও জাগ্রত সত্তাকে সর্বদা মনে রাখতে হয় যে নির্মীয়মান চিন্তাবিশ্বে সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দিতেই হবে। অস্তিত্বের ক্রমজায়মান প্রতিবেদনে কোনো তথ্য ও ভাষ্য কখনও চূড়ান্ত হতে পারে না। সত্তার হয়ে ওঠার ইতিহাস সর্বদা সমসাময়িকতার ছন্দে-লয়ে গাঁথা। বস্তুবিশ্ব যুগপৎ প্রকৃত ও প্রতীয়মান, চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত, তত্ত্ববস্তু ও অবভাস। চেতনা ও মুক্তির ধারণা শ্লাঘ্য যদিও, আজকের এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রায়ই তা প্রমাণিত হচ্ছে রিক্ত শূন্যায়তন হিসেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

যখন কেন্দ্র নেই কোথাও, কেন্দ্রের ধারণা নিছক বিভ্রম, সত্তা দেখছে, নৈর্ব্যক্তিক বস্তুবিশ্বের সঙ্গে ধারাবাহিক কোনো সম্পর্কের বিন্যাস বা সংযোগের সেতু গড়ে উঠছে না। মুক্তির বিপুল আবহ আছে কিন্তু বস্তুভিত্তি নেই; জ্ঞান চূড়ান্তভাবে অনিশ্চিত অথচ তথ্যের বিস্ফোরণ আছে। কল্পিত এক সম্বোধিত অস্তিত্ব আছে, সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়া আছে তবু উত্তম পুরুষে বিন্যস্ত সত্তাটি নিরাশ্রয়। যা প্রতীয়মান, সত্তা তা নয়; কিন্তু তার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে এবং তা কাঙ্ক্ষিতও। জীবনের প্রতিটি সচেতন মুহূর্তে নিজেকে নির্মাণ করে যেতে হয়, সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয় এবং যাবজ্জীবন পুনর্নবায়িত করতে হয় নির্মিতি-প্রকরণ ও সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসাকে। অথচ এও মনে রাখতে হয়, আদিগন্ত ব্যাপ্ত নেতির চোরাবালিতে ব্যক্তিসত্তা প্রহর যাপন করছে; মাথার উপর মহাশূন্যের নিরবয়ব বিস্তার। কে আমি—এ প্রশ্ন যদি কেউ করে এখন, নিঃসঙ্গতা ও মুক্তির চেতনায় লালিত সত্তার গভীর থেকে উঠে আসবে প্রশ্নের প্রতিধ্বনি শুধু। হয়তো এই প্রক্রিয়ার নির্যাস হলো সত্তা মানে সম্ভাব্য অস্তিত্ব তাই প্রতিটি অস্তিত্ব অনন্য; অনিবার্যতাই তার নিষ্কর্ষ। আমার জীবন, আমার বিকাশ, আমার মৃত্যু আমারই; এর পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। এইজন্যে অস্তিত্বের কোনো বিকল্প নেই। হয়ে-ওঠার সমস্ত প্রাক্‌শর্ত থাকা সত্ত্বেও আত্মচেতনাকে যদি কেউ উদ্বোধিত করতে না পারে কিংবা ঐ শর্তগুলির প্রতি মান্যতা দিতে অস্বীকার করে—তাহলে 'ব্যর্থ-অস্তিত্ব' নামক বিকল্প দেখা যেতে পারে। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে এই ব্যর্থতার বহুগুণ বেশি জটিলতর অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। বিমানবায়ন স্তর থেকে নির্মানবায়ন স্তরে পৌছাতে-পৌছাতে যত ধরনের অভিজ্ঞতা অতিদ্রুত অর্জন করেছে মানুষ, তাতে মনে হয়, অস্তিত্বের নতুন নন্দন আসলে প্রতিনন্দনের সহগামী।

এ সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, য়াসপের্স ও মার্সেলের চিন্তাবিশ্ব থেকে সমকালীন প্রবণতাকে অনেকখানি বুঝে নেওয়া হয়তো সম্ভব। মুক্তি ও স্বাধীন সঞ্চরণের মধ্যে ব্যক্ত হয় সত্তার নিষ্কর্ষ ; কিন্তু পদে পদে প্রতাপের নানা সাংগঠনিক কৃৎকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণ সত্তার নিষ্কর্ষ অর্জনের পথকে বিঘ্নিত ও লক্ষ্যকে ঝাপসা করে দেয়। নিজের পথ অবশ্যই নিজেকে বেছে নিতে হয়। বাছাই করার এই প্রবণতায় অস্তিত্ব-চেতনার প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি সত্তার অকাট্য মান্যতা ও যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিকোত্তর পর্বে সব ধরনের মান্যতা ও যাথার্থ্য আক্রান্ত, মুক্তি ও চেতনা প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি। তাই মুক্তির যে-চেতনা সত্তার উদ্বোধক এবং ব্যক্তি-অস্তিত্বকে জাগতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রাণিত করে—সেইসব নানা ধরনের প্রতিপ্রশ্নে বিদ্ধ হচ্ছে এখন। তবু য়াসপের্সের বিশ্লেষণ সাম্প্রতিক জটিল কালপর্বেও সত্তা-জগৎ-বাস্তবতা-অন্বিষ্ট-মুক্তির বৈধতা প্রভৃতির অস্তিত্বতাত্ত্বিক সংহিতা পুনঃপাঠে অত্যন্ত জরুরি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই চিন্তাসূত্র যে সংযোগের আবহে যৌক্তিক বিন্যাসের দ্বারা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত অস্তিত্বের এককগুলি অনবরত ঐক্য-প্রতীতির সন্ধান করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ব মানে নিরবচ্ছিন্নভাবে অংশীদার হওয়ার প্রত্যয়। সত্তার হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নিজস্ব অন্বিষ্ট জীবন-প্রকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অপর পরিসরদের ক্রমাগত আত্ম-স্থিতিতে সংলগ্ন করার মধ্য দিয়ে নিজেকে অপরের কাছে উন্মোচিত করে। এই উন্মোচনেরই নামান্তর হলো সংযোগ। প্রত্যেকের অনন্যতাকে মান্যতা দিয়েই পরস্পরের অংশীদার হতে হয় কেননা সংযোগ মানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া নয়। সংযোগ মানে দ্বন্দ্বের অবসানও নয়; তবে বিভিন্ন সত্তার মধ্যে মিত্রতামূলক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই একে অপরের স্বতন্ত্র বাস্তবতাকে মান্যতা দেয়। তাই একে দ্বিরালাপ বলাই সঙ্গত। প্রত্যেকের সত্যই তার নিজস্ব সত্য এবং সেইজন্যে এর কোনো বিকল্প নেই। সংযোগের এই অন্তঃসার আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্বীকৃত হয় না। সর্বত্রব্যাপ্ত আধিপত্যবাদের উদ্ধত কেন্দ্রীকরণ প্রবণতায়। তবু অনস্বীকার্য এই বক্তব্য : 'Communication, the most essential of existential tasks, is the most precious and the most fragile of all possible achievements.' (ব্ল্যাকহাম : ১৯৯৭ ৫৮)।

সভ্যতার নামে চোখ-ধাঁধানো মুখোসের আড়ম্বর ও প্রসাধনের প্রগলভতা ইদানীং সামাজিক অস্তিত্বে বিপ্রতীপতার সমাবেশকে প্রকট করে তুলছে। জীবনের কোথাও উত্তরণ আর প্রাসঙ্গিক নয় যেন। অথচ অস্তিত্বের দর্শন উত্তরণের নিঃশব্দ এবং অমোঘ উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নিজস্বতার আদল ও নির্যাস অস্তিত্বে জাগিয়ে তোলার জন্যে ব্যক্তি-সত্তাকে নিরন্তর সোচ্চার ও নিরুচ্চার বয়ানের সূত্রধার হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। ঐক্য ও সমগ্রতার সন্ধানে যুক্তির বিন্যাস যেমন প্রয়োজন, তেমনি উত্তরণের প্রতীতিও কাম্য। অস্তিত্ব স্বয়ংপ্রভ ও স্বয়ংশাসিত হলেও কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার যা হওয়ার কথা, তা-ই সে হয়ে থাকে; যথাপ্রাপ্ত জগৎ তার ওপর সীমা ও গণ্ডি আরোপ করলেও মুক্তির জায়মান চেতনায় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নিয়ত বিকশিত হয়। সত্তা তার হয়ে ওঠাকে আপন আকাঙ্ক্ষায় মুকুলিত করে তোলে। আকাঙ্ক্ষার পরিসরেই সত্তা পুনর্নবায়িত করে নিজেকে এবং উত্তরণের পথ ও পাথেয় নিজেই নির্ণয় করে নেয়।

সত্তা যতক্ষণ সার্বভৌম, ততক্ষণই তা অমোঘ ও মান্য। সাম্প্রতিক আধুনিকোত্তর পর্বের গোলকধাঁধায় সত্যভ্রম নিরঙ্কুশ হলেও জীবন সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় উপলব্ধি এই যে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্বকে পুনর্নবায়িত না করে গেলে এর সজীবতা ও প্রাণশক্তি বাষ্পের মতো মিলিয়ে যাবে। কোনো-একটি নির্দিষ্ট আকরণের বিন্যাসে বা প্রকরণের বিধিতে অস্তিত্বকে যখন বুঝতে চেষ্টা করি, দেখি, স্বতশ্চল ভাবে তা সরে যাচ্ছে অন্য এক স্থিতিতে। কিন্তু বৈপরীত্য ও কূটাভাস অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না; ক্রমিক উত্তরণের মধ্যেই অস্তিত্বের তাৎপর্য নিহিত। আজকের গ্রন্থিল সময়ে য়াসপের্সের বয়ান যখন পুনঃপাঠ করি, বিশেষজ্ঞের এই অভিমতের সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না 'The world is, so to speak, a secret text which can never be translated into public language. It is only intelligible to personal existence and can only be deciphered by each for himself.'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

(ব্ল্যাকহাম ১৯৯৭ ৬০)। একুশ শতকের সূচনায় চারদিকে অজস্র বিভ্রান্তির আয়োজন সত্ত্বেও এই উপলব্ধিকে মনে হয় দিক্‌দর্শক। কেননা চিন্তার এই প্রকরণে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সমাজতত্ত্ব একটি অভিন্ন অবতলে এসে মিলতে পারে।

তাৎপর্য সন্ধানের ধরন একেক পথে একেক ভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। জটিলতা যতই বাড়ুক, অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসায় চূড়ান্ত স্থিতি নেই বলে অজস্র টানাপোড়েনের মধ্যেও অব্যাহত থাকে সত্য ও সত্যভ্রমের দ্বিরালাপ, নন্দন ও প্রতিনন্দনের যুগলবন্দি। আসল কথা, মার্সেলের বাচনে বলা যায়, এই 'The essence of man is to be in a situation' (তদেব ৬৮)। আমরা আমাদের যথাপ্রাপ্ত অবস্থান এবং সেই অবস্থানের অন্তর্বর্তী কূটাভাস, প্রগতি ও প্রতিগতির দ্বন্দ্ব আর ক্রমিক উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাকে ঠিকমতো বুঝতে পারছি কিনা—এটাই সবচেয়ে জরুরি। অস্তিত্বের রহস্য অফুরান; মুক্তির প্রকল্পও স্থায়ী। এই মৌল উপলব্ধি থেকে সৃষ্টির নন্দন জাগে, জেগে ওঠে তাৎপর্যবহ বাস্তবতা। অস্তিত্বের ব্যক্তিগত ও সামূহিক অভিব্যক্তি সক্রিয় মানুষই সতত নির্মাণ ও বিনির্মাণ করে চলেছে। বাখতিনের অন্যতম মৌল চিন্তাসূত্র মনে পড়ে 'অস্তিত্ব মূলত ঘটনা' (existence is an event) যা শুধুমাত্র সক্রিয় যোগদানের মধ্য দিয়েই নিজস্ব সংরূপ অর্জন করে। আমাদের বাস্তবতা হলো অস্তিত্বের হয়ে ওঠায় যোগদানের একটি বিশেষ ধরন। আমরা কে কীভাবে যোগ দিচ্ছি, তার নিবিড় পাঠ করেই অস্তিত্বের নবায়মান নন্দন ও চিহ্নায়ন প্রকরণের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

হাইদেগার-সার্ত্র অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসাকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে উত্তীর্ণ করেন নি কেবল। সার্বিক ভাঙনের এই পর্যায়েও তাই আমরা তাঁদের বয়ান থেকে জীবন পুনরাবিষ্কারের ও পুনর্বিশ্লেষণের রসদ খুঁজে পাচ্ছি। কিন্তু সে-কথা এখানে নয়। মানব-সভ্যতার জটিলতর কালবেলায় দাঁড়িয়ে বরং নিজেদের কাছে এই বার্তা বয়ে আনি 'Being is incalculable because inexhaustible and that is the ground of joy and hope' (তদেব ৮২)। হ্যাঁ, এইজন্যেই অস্তিত্ব ও মুক্তি সমার্থক; আর, অস্তিত্বের নতুন নন্দনের প্রমিতিও অফুরান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও